No. 412. May, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৭ বর্ষ। ৪১২ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩০৬—মে, ১৮৯৯। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সাল।

ইং ১৮৯৯-১৯০০।

শকাব্দা ১৮২১, সংবৎ ১৯৫৬।৫৭

ব্রাহ্মাব্দ ৭০-৭১।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে
†১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
শ	সো	বু	শু	ম	বু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু
বু	শ	বু	শ	বু	শ

‡১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৭	১৬	১৫	১৪	১২	১৪
বু	শ	সো	ম	বু	শ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩০
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	৯	৮	৫	৪	১	২৯
পূর্ণিমা	১৩	১২	৯	৭	৫	৩
কৃঃ এঃ	২৩	২২	১৯	১৮	১৫	১৪
অমা—	২৭	২৬	২৩	২২	২০	১৮

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী। কৃঃ এঃ—কৃষ্ণ একাদশী।

*** পরীক্ষা—১৩ই বৈশাখ মঙ্গল বার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার পূর্ণিমা। ২৭এ বৈশাখ মঙ্গল, ২৬এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার অমাবস্যা।

* বৈ—বৈশাখ বৃহস্পতিবারে আরম্ভ, ৩১শে শেষ। এ-এপ্রেল শনিবারে আরম্ভ, ৩০শে শেষ ইত্যাদি।

† ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

‡ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবি ২রা সোম ইত্যাদি।

বৈ—বৃহ—১,৮,১৫,২২,২৯; জ্যৈ রবি ১,৮,১৫,২২,২৯; ১৪,২১,২৮ এপ্রেল শনি; ১৪ ২১, ২৮ মে সোম ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূঃ	২	২	৩	২	৩	৩
কৃঃএঃ	১৪	১৩	১৪	১৪	১৪	১৪
অঃ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৭

*** পরীক্ষা—২৮এ কার্ত্তিক সোমবার, ২৮এ অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্ল একাদশী। ১৪ই কার্ত্তিক সোম, ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল বার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ করিতে হইবে।

নববর্ষ।

১

বরষ গিয়াছে কেঁদে কেঁদে,
তা বলে কি আজি হাসিব না?
অবসাদে হরেছে চেতনা,
তা বলে কি আজি জাগিব না?
নিরাশার আঁধার মাঝারে
কে বাজায় আশার বাঁশরী
ঘোষি—"সমাগত শুভদিন,
উঠ সবে দেব-কৃপা স্মরি।"

২

ঐ যে বসন্তাগমে নব,
কি সুন্দর কুসুম পল্লব
ধরেছে পাদপ লতাগণ—
আছে যার কণিকা-জীবন!
মৃতপ্রায় কণ্টক-লতিয়া
দুটী ফুল-হাসি বিকাশিয়া
ধন্য বলি জীবন-দাতারে
সেও আজি চাহে বরিবারে।

৩

শত কণ্ঠে বিহগ-নিকর
চারি দিকে ছড়ায় সুস্বর,
মধুর কোকিল কুহরিছে
দয়েল পাপিয়া তার পিছে,
বায়স নীরব নাহি রয়,
উচ্চে গায়—"জগদীশ জয়।"
যার যথা শকতি-বিধান,
প্রাণ ভ'রে করে স্তুতি গান।

৪

নগর কানন গ্রাম ছাড়ি
ভেটিলাম পয়োধি সুদূর,
তরঙ্গ তরঙ্গোপরি নাচি
শুনায় সঙ্গীত সুমধুর।
সমীর বহিয়া মহাবেগে
খেলা করে জলরাশি সহ,
স্বন্ স্বন্ নাহিক বিরাম,
স্তুতিগীত হয় অহরহ।

৫

বিশ্বভরা আনন্দ বাজার,
সমাচার—আনন্দ প্রচার!
জড় জীব সবে মাতোয়ারা,
ছুটেছে সুখের শত ধারা!
রবি শশী তারকা নাচিছে,
বায়ু মেঘ জলধি গাইছে!
পশু পক্ষী কীট সুখী সবে,
কে আজি নীরব মৃত রবে?

৬

জাগ উঠ করি হরিধ্বনি
যে যেখানে আছ নারী নর,
রুগ্ন ভগ্ন হৃদয় লইয়া
বল"জয় রাজ-রাজেশ্বর।"
জীবনের মহামেলা মাঝে
থেক না নির্জীব অচেতন,
পুরাতন লয়েছে বিদায়,
নববর্ষে সকলি নূতন।

৭

"গতস্য শোচনা" বৃথা আর,
ত্যজ শোক বিষাদের ভার।
"ভবিষ্য" কি জানি তুমি আমি,
কেন ভেবে মরি দিবা যামী?
বর্ত্তমান বিধির বিধান,
এক রতি নহে বৃথাদান।
পলে পলে হয়ে সচেতন,
ডাকি দেবে সফলি জীবন।

৮

যত ক্ষুদ্র—যত মন্দ—আমি
—অসারের হই না অসার,
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিকণা—
আদরের বস্তু বিধাতার।
বুদ্ধি বল দিয়াছেন যাহা,
করি তার যোগ্য ব্যবহার,
জীবনের উদ্দেশ্য মহান্
সাধি—লভি দেব-পুরস্কার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সংবাদ—পঞ্জিকার মতে এ বৎসর রবি রাজা, বুধ মন্ত্রী। রাজফল ভাল নয়, মন্ত্রীর গুণে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

মহারাণীর জন্মদিন—ভারত সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ৮০ বর্ষ পূর্ণ করিতেছেন, এজন্য আমরা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

বড় লাট ও ছোট লাট—বড় লাট সিমলায় গুরুতর পরিশ্রমে রত হইয়া পীড়িত হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় করুন্। ছোট লাট এই প্রখর গ্রীষ্মেও রাজধানীর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে দুঃসহ ক্লেশ ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া ১লা মে দার্জিলিঙ গমন করিয়াছেন। তিনি আরও সতেজ ও সবল হইয়া রাজধর্ম্মপালনে সম্যক্ সমর্থ হউন।

বিনা তারে টেলিগ্রাফ—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইংলিস চ্যানেল নামে যে অখাত আছে, তাহার দুই তীরে ৩২ মাইলের মধ্যে বিলাতের বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার ব্যয় যেমন অল্প, কৌশলও তেমনি সহজ। ক্রমে তারের সংবাদ সর্ব্বত্র বিনা তারে চলিবে।

মহীশূর-শতবার্ষিক-উৎসব—১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের পতন হইয়া মহীশূরে হিন্দুরাজত্ব পুনঃ-স্থাপিত হয়, ইহার স্মরণার্থ সমারোহে এক উৎসব হইয়াছে। মহীশূরের বিধবা মহা-রাণী এ বিষয়ে উদ্যোগিনী।

মেয়ে পোষ্ট মাষ্টার—হুগলীর পোষ্ট মাষ্টার বিদায় গ্রহণ করাতে তাঁহার স্থানে কুমারী হেবারলেট নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য কার্য্যক্ষেত্র যত উন্মুক্ত হয়, ততই ভাল।

সেন্সস্—আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যার পুনরায় গণনা হইবে। রিজলি সাহেবের উপর অধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ঘটনা—ইংলণ্ডে একটী স্ত্রীলোক ২৩ বৎসরকাল বোবা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার এক কন্যা আগুনে পুড়িয়া মরাতে কন্যাশোকে হঠাৎ তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরা একটী বঙ্গালী স্ত্রীলোকের বিষয় জানি, তাঁহার পুত্র তাঁহার অজ্ঞাতে হঠাৎ বিদেশে যাওয়াতে তাঁহার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়, কয়েক বৎসর পরে তাহার সুসংবাদ পাইয়া তিনি পুনরায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন।

কুমারী সোরাবজী—বিলাতে শিক্ষিত এবং ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও বোম্বাইয়ে যেমন এলাহাবাদেও সেইরূপ ব্যবসায় চালাইতে নিরাশ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সভ্য ইংরাজ জজ-দিগেরও কুসংস্কার কত দিনে দূর হইবে?

বিবি ধর্ম্মপ্রচারিকা—রামকৃষ্ণ পরমহংসের দলে তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটী বিবিকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুমারী নিবেদিতা ও অভয়ানন্দ স্বামী এদেশে আসিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বিপদে শুভ লক্ষণ—কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক বিশেষ ভাবে স্বস্ব ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেছেন। হিন্দুরা যেমন মহোৎসাহে হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন, মুসলমানেরাও সেইরূপ দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জেন্‌কিন্‌স্ দম্পতী—কলিকাতা হাইকোটের সুপ্রসিদ্ধ জজ জেন্‌কিন্‌স্ বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়া গিয়াছেন। ইনি এবং ইহাঁর গুণবতী পত্নী এ দেশের লোকদিগের বন্ধু ছিলেন এবং সকল সৎকার্য্যে উৎসাহ দান করিতেন। বঙ্গদেশ ইহাঁদিগকে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

শ্যাম ফরাসী বন্ধুত্ব—গত ১৬ই এপ্রেল ইণ্ডো চায়নার ফরাসী গবর্ণর ব্যাঙ্ককে আসিয়া শ্যামরাজ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। শ্যাম দেশে ফরাসী ভাষা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে।

মাদাগাস্কারের অবনতি—ইহার সুযোগ্য রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসীরা দেশের কি উপকার করিয়াছেন জানি না। ইতিমধ্যে এই দ্বীপের লোক-সংখ্যা অনেক কমিয়াছে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্তান বিবাহিত লোকদিগের উপর এক নূতন টাক্‌স বসাইয়াছেন।

সর্পাঘাতের ঔষধ—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, গাজীপুরের রেবরেণ্ড লরবিয়ারের ঔষধে বিষাক্ত সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতেছে। দুই টাকায় ৩ শিশি ঔষধ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান রহস্য।

সমুদ্রগর্ভ ও দীপ মৎস্য।

সমুদ্রগর্ভ বা সমুদ্র-তলদেশ যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, উহা অতীব শীতল; এমন কি পৃথিবীর উপরিভাগস্থ পদার্থ সকল তথায় নীত হইলে অত্যন্ত শৈত্য প্রযুক্ত জমিয়া গিয়া থাকে। তথায় কিছুমাত্র আলোক নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যেমন গভীর অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকার-মধ্যে ক্ষুদ্র দীপমক্ষিকা ও খদ্যোতিকা বন ও বনস্পতি সকল আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাসমুদ্রের মহান্ধকারময় সুগভীর গর্ভ দীপমৎস্য সকল দ্বারা আলোকিত হয়। এই সকল মৎস্য আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, ইহাদিগের পুচ্ছ ও ডানা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়। ইহারা যেমন অগাধ জলমধ্যে অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ স্বল্পতোয় মধ্যে অথবা সমুদ্রের উপরিভাগেও ইতস্ততঃ বিহার করিয়া বেড়ায়। নৈশ সামুদ্রিক আলোকের প্রবাদ বোধ হয় এই সকল দীপমৎস্য দর্শনেই কল্পিত হইয়া থাকিবে। দীপমৎস্যের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব হেতু আলোকেরও স্বল্পতা ও আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে আলোকের এত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় যে, বোধ হয় যেন সমুদ্রের বিশাল বক্ষে প্রবল অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে! সূর্য্যাস্ত হইলে নগরী যেমন শ্রেণীবদ্ধ দীপমালায় পরিশোভিত হইয়া থাকে, সমুদ্রতলের কোন কোন অংশ ঠিক্ সেইরূপ আলোকিত হইতে দৃষ্ট হয়। গভীর জলসঞ্চারী দীপ-মৎস্য সকল যখন দলে দলে দুই বা তদধিক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জলবিহার করিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিভ্রমণ করে, তখন বোধ হয় যেন দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত সকল শ্রেণীবদ্ধ আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়া বেগে সিন্ধুদেশ পরিমাণ করিতেছে। সমুদ্র যত গভীর, জলের ভার (চাপ) তত অধিক হইয়া থাকে। প্রত্যেক সহস্র ফেদমের (৪০০০ হস্ত গভীরতা) মধ্যে এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত জলের ভার প্রায় এক টন অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ বস্তু তথায় নীত হইলে তাহার ভার ১৬০ গুণ বৃদ্ধি হয়।

গভীরজলসঞ্চারী মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু সমগভীরতা না হইলে সঞ্চরণ করিতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। তাহারা সমতল ছাড়িয়া জলের উপরি-ভাগে আসিলে মরিয়া যায়, পাঁচ শত ফেদম জলবাসী মকর উপরি ভাগে আনীত হইয়া মৃত হইয়াছে। কখন কখন স্বল্পগাধ জলসঞ্চারী ও জলবাসী জন্তু সকল প্রবল শক্তি বা বেগ দ্বারা তাড়িত হইয়া অগাধ জলে নীত হয়। তথায় তাহাদের পূর্ব্বাবস্থার

অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। নয় শত ফেদমের নিম্নেই তাহাদের দৈহিক বিকার সংঘটিত হইয়া থাকে এবং চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। সহস্র ফেদম নিম্নে আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ক্রমে যত নিম্নতলে পতিত হয়, ততই তাহাদের দৈহিক বিকার সাধিত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয়।*

বৈদ্যনাথ, রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম।

বামাবোধিনীর পাঠিকারা অনেকে দেওঘরের নাম শুনিয়াছেন। শুনিয়াছেন কেন আশা করি দেওঘর দর্শনও করিয়াছেন। দেওঘর সাঁওতাল পরগণার একটী স্বাস্থ্যকর নগর এবং হিন্দুর এক প্রাচীন তীর্থস্থান। আজকাল অনেকে স্বাস্থ্যোদ্দেশে মাঝে মাঝে ঐ অঞ্চলে গিয়া থাকেন এবং বহুকাল হইতে ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য দেওঘরে অনেক যাত্রীর আগমন হইয়া আসিতেছে। হাওড়া হইতে রেলপথে উহা ২০৫ মাইল দূর এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেল-ভাড়া প্রায় ২॥০ টাকা।

অনেকের বিশ্বাস বৈদ্যনাথ দেবের অনুকম্পায় নানা রোগ আরোগ্য হয়; এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানা স্থান হইতে কুষ্ঠরোগীরা দেওঘরে আইসে। ইহাদের অনেকেই দরিদ্র, অনাথ এবং নিরাশ্রয়। তাহারা একবার দেওঘরে আসিয়া পড়িলে সেই স্থানেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই হতভাগ্যদের অবস্থা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। একে উৎকট রোগের যাতনায় অধীর, তাহার উপর ইহাদিগকে এক মুঠা আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কুষ্ঠরোগীকে কেহ সহজে আশ্রয় দেয় না। অনাথ অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া অনেক হতভাগ্যের দুঃখময় জীবনের অবসান হইত।

ইহাদের অবস্থা দেখিয়া লোকের প্রাণ অবশ্য কাঁদিত; কিন্তু প্রাণ অনেক সময় কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হয়। যাহা হউক এক সময়ে দেওঘরের তিনটী প্রাণ কুষ্ঠরোগীদের জন্য সুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু, বৈদ্যনাথের একজন পুরোহিত পণ্ডিত গিরিজানন্দ দত্তঝা এবং দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু স্থির করেন যে, দেওঘরের হতভাগ্য কুষ্ঠীদের জন্য কিছু করা আবশ্যক। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সাধারণের নিকট কুষ্ঠীদের জন্য প্রথম সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের আবেদনের মর্ম্ম এই যে, ৩০।৪০ জন রোগীর বাসোপযোগী একটী বাড়ী

*Scientific American, 20th January 97.

চাই এবং তাহাতে প্রায় ১০০০ টাকা ব্যয় হইবে। ১৮৯১ অব্দের প্রারম্ভে পূর্ব্বোক্ত যোগীন্দ্র বাবুর ও সুরভির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসুর স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় প্রার্থনাপত্র বাহির হয়। ১৮৯১ অব্দের জুলাই মাসে প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত তৃতীয় প্রার্থনাপত্র বাহির হয়। ইহাতে ৫০ জন রোগীর বাসোপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণের কথা এবং তাহাদের অন্ন বস্ত্র, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কথা থাকে। প্রার্থনাকারীদের হস্তে তখন ৭২৬৶৫ জমিয়াছে।

কুষ্ঠাশ্রমের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু এ সময় উৎকট রোগশয্যায় শায়িত এবং পণ্ডিত গিরিজানন্দ দত্তঝা পরলোকগত। প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু কুষ্ঠাশ্রম সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক পদস্থ থাকিয়া ইহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ দেওঘর যান। যোগীন্দ্র বাবু চাঁদার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। তখন রোগীদের জন্য খড়ুয়া ঘর নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ছিল এবং অনুষ্ঠাতৃগণ কেবল মাত্র ৫০০ টাকা চাঁদার আশ্বাস পাইয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু দেওঘরে থাকিয়া কুষ্ঠীদের অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যদি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত করিবার বাধা না থাকে, তাহা হইলে তিনি উহার জন্য পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিবার সমগ্র ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। অনুষ্ঠাতারা মহেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন।

সহরের প্রায় ১ মাইল দূরে বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী বেশ সুন্দর স্থান আশ্রমনির্ম্মাণের জন্য মনোনীত হয়। ১৮৯২ অব্দের ১২ই জুলাই সেই সময়কার বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার চার্লস্ এলিয়ট আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন। ৬০০০ টাকার উপর খরচ করিয়া মহেন্দ্র বাবু আপাততঃ ২৪টী রোগীর বাসোপযোগী সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেন। তাঁর গুণবতী পত্নীর নামানুসারে আশ্রমের নাম হয় "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম।" ভিত্তি স্থাপনের সময় অনুষ্ঠাতাদের হস্তে ৭০০০ টাকা আসিয়া জমে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট দ্বারবঙ্গের সর্ব্বজনপ্রিয় লোকান্তরিত মহারাজা আশ্রমের দ্বার উন্মোচন করেন। এক কথা এখানে বলা উচিত। মহেন্দ্র বাবু আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও অনেক প্রকারে ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

কুষ্ঠাশ্রমের উদ্দেশ্য—১ম রোগীদিগকে আশ্রয় দান; ২য় কুষ্ঠরোগ ব্যাপ্তি নিবারণোদ্দেশে তাহাদিগকে একত্র সংস্থাপন, ৩য় রোগ-চিকিৎসা এবং তৎসম্বন্ধে গবেষণার সাহায্য করা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেওঘরে নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগী অনেক। ইহাদের যথেচ্ছ পরিভ্রমণের ফল এই

দাঁড়াইয়াছে যে, নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যেও রোগ সংক্রামিত হইতেছে। যদি অন্ততঃ ৫০ জন রোগীর বাসস্থান, আহার, ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আশ্রমের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আংশিক সংসাধিত হইবে। এতদিন আশ্রমে গড়ে ২০টী রোগী আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ মন্দিরের সদাব্রত হইতে অনেক সাহায্য হইত। এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং কাজে কাজেই মূলধন ভাঙ্গিয়া আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। ইহার যদি কোন প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে আশ্রমটী কখনই স্থায়ী হইবে না। ইহার স্থায়িত্ব বিধান ও উপকারিতা প্রসারণ উদ্দেশে গত ১লা জানুয়ারিতে দেওঘর স্কুলগৃহে একটী সভা অহূত হয়। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভা কর্ত্তৃক একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক। সমিতির সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন যে, ৫০ জন কুষ্ঠরোগীর আহার ও চিকিৎসাদির জন্য মাসে অন্যূন ২৪৫৲ টাকা আবশ্যক। সমিতির হাতে কেবল মাত্র ১২০০ টাকা আছে। অতএব আরও ৭০০০ টাকা মূলধন চাই। সভ্যেরা আশা করেন যে, তাহা সংগৃহীত হইলে মূলধনের সুদ ও স্থানীয় সাধারণের সাহায্যে তাঁহারা আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে সক্ষম হইবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। চাঁদাই হউক, এককালীন দানই হউক বা বস্ত্রাদিই হউক, যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রম স্থানীয় ব্যাপার নহে। ভারতের সর্ব্ব স্থান হইতে কুষ্ঠ রোগী এখানে আসিয়া থাকে। এমন হিন্দু পরিবার অল্পই আছেন, যাঁহাদের কেহ না কেহ একবার বৈদ্যনাথ ধামে পদার্পণ না করেন। সমিতির সভ্যেরা আশা করেন যে, দেওঘরের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থান ও পুণ্য ভূমির মঙ্গলার্থে হিন্দুরা তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ দয়া প্রদর্শনে কৃপণতা করিবেন না।

বামাবোধিনীর পাঠিকা অনেক। বঙ্গনারী হৃদয়ের কোমলতায় অতুলনীয়া। তাঁহাদেরই হৃদয়ের প্রভাবে অর্থনীতি-পাঠে বিকৃতমস্তিষ্ক শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী বাবুর গৃহ হইতে দোষগুণ-জড়িত মুষ্টি ভিক্ষার প্রথা আজও তিরোহিত হয় নাই। তাঁহাদের দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ ও কোমলতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই মহেন্দ্রবাবু. তাঁর স্ত্রীর নামে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য দেওঘরের হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের প্রতি বঙ্গমহিলার মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রতি মাসেই সাধ্যানুসারে দেবোদ্দেশে কিছু কিছু উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের কাছে লেখকের বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা দিনান্তে, সপ্তাহান্তে, মাসান্তে বা বৎসরান্তে "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের" উদ্দেশে যথাসাধ্য কিছু কিছু তুলিয়া রাখেন। যাহা রাখিবেন তাহা দেবতায় অর্পিত ভিন্ন আর কিছুই হইবেক না।

শ্রীদে।

দেবলরাজ।

চৌবেড়িয়ার যে স্থানে বুড়োশিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অরণ্য;—সেই অরণ্য-পরিধির বহির্ভাগে বহুসংখ্যক কেদার খণ্ড। সেই সকল কেদার খণ্ডে প্রতিদিনই অনেক কৃষক ও রাখাল স্ব স্ব কার্য্য করিত। যে দিন দেবনাথ পাল বুড়োশিবের মন্দিরে দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, তাহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বোক্ত রাখাল কৃষকগণ মধ্যে মধ্যে অপরাহ্নে শিবের মন্দির হইতে নরকণ্ঠ-সমুত্থিত কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইত। সে ধ্বনির মর্ম্ম এই,—"আমায় পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তোমরা কে কোথায় আছ, আসিয়া আমায় রক্ষা কর।" রাখাল কৃষকগণ এবং দুই চারি জন ভ্রমণকারী কি পথিক সেই ধ্বনি শুনিয়া অরণ্যমধ্যে মন্দির-স্থানে ছুটিয়া আসিত। কিন্তু মন্দির সমীপে জনপ্রাণীও দেখিতে পাইত না—সেই কাতর ধ্বনিও শুনিতে পাইত না। ক্রমে ক্রমে সকলেরই বিশ্বাস হইল, ইহা বুড়োশিবের এক প্রকার লীলা খেলা। কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন্দির-দ্বারে লোক জনের গতাগতি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গেল।

যে দিন প্রাতঃকালে দেবনাথ পাল ও তাঁহার জননী আপনাদিগের চাক-ঘরে সোণার কোদাল ও সোণার দা প্রাপ্ত হন, তাহার পূর্ব্ব দিন প্রদোষকালে চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের মন্দিরে ও চতুষ্পার্শ্বের অরণ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। সেই প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল। অরণ্যস্থ পশুপক্ষী বিকট চিৎকার সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। মন্দির মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক জন ছুটিয়া আসিত, আজ জনপ্রাণীও আসিল না; কেননা তাহারা ঐ ধ্বনিকে বুড়োশিবের এক প্রকার লীলা মাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ বহুধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। বিদীর্ণ লিঙ্গ মধ্য হইতে একটী অগ্নি-বর্ত্তুল নির্গত হইয়া অতি বেগে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পতিত হইল। তাহার জ্যোতিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ অগ্নিশিখা যেন মলিন হইয়া গেল। অগ্নি-বর্ত্তুল প্রাঙ্গণে পতিত হইবামাত্র সেই জনপ্রাণিশূন্য অরণ্যমধ্যে কোথা হইতে

একটী জটা-ত্রিশূলধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর শুভ্রমূর্ত্তি উপস্থিত হইলেন এবং অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই অগ্নিবর্ত্তুল গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদেশে একটি প্রবাদ আছে যে "এক মাণিক সাত রাজার ধন"। চৌবেড়িয়ার শিবলিঙ্গ-মধ্যস্থ যে স্পর্শমণি, মহাদেব শ্রীনগরের অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীকে লইতে আদেশ করেন, তাহা সামান্য বস্তু নহে,—সাত রাজার ধন মাণিক। আজ সেই মাণিক, লিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া অগ্নি বর্ত্তুলাকারে বহির্গত হইল। যে মূর্ত্তি তাহা গ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইলেন, তিনি সেই শ্রীনগরের ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী। এই মাণিকটিই পরদিন প্রত্যূষে দেবনাথ পালের চাক-ঘরের আড়ায় লম্বিত ঝোলার মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল।

১১

শিবভক্ত ক্ষত্রিয় সাধুকে যে কোন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি শ্রীনগরের শার্দ্দূল-অজাগরপূর্ণ ঘোরারণ্যে রক্ষা করিয়া থাকে, শৈব সাধু তাহা পদে পদে অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাহা যে তাঁহার দয়াল প্রভুরই কৃপা, তাহাও বুঝিতে পারিতেন। চৌবেড়িয়া গমন করিয়া কিরূপে বুড়োশিবের হৃদয়স্থ স্পর্শমণি লাভ করিতে হইবে, একদা নিদ্রাকালে স্বপ্নযোগে সেই শক্তির দ্বারা তাহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই চৌবেড়িয়া গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে গহ্বরমধ্যে বাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে গ্রাম নগরে ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং ঘুঁটে কুড়াইয়া মন্দিরপার্শ্বে তদ্দ্বারা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত রচনা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছেন। যখন দেখিলেন আবশ্যক পরিমাণে ঘুঁটে স্তূপীকৃত হইয়াছে, তখন হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জনগণকে তাঁহার উৎকট কার্য্যে সতর্কতাশূন্য করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কাতর ধ্বনি করিতে আরম্ভ করেন। একাদশাধ্যায়ে যে দিনকার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সে দিন পূজা অর্চ্চনার গোলযোগ শেষ হইবামাত্র মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঘুঁটে সাজাইয়া প্রদোষকালে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। পাছে সেই সময়ে দৈবাৎ লোক জন আসিয়া কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, এজন্য তাহাদিগকে দিশাহারা করিবার উদ্দেশে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে এবং অরণ্যের স্থানে স্থানেও অনেক অগ্নিকাণ্ড করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সেদিন শিবমন্দিরাধিষ্ঠিত অরণ্যে যেন ভীষণ দাবানল উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শিবের বেশে আত্ম-গোপন করিয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। মণি নির্গত হইবামাত্র গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। মণি হস্তগত হইতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল; তাহার পর, পাছে এত সাধনের ধন অপরে কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে, মনুষ্য-গতাগতির পথ ত্যাগ করিয়া বিপথাবলম্বনে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া হাঙ্গরী-

বাঁকে উপস্থিত হইলেন। তখন রজনী অবসানপ্রায় এবং প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সাধুর ইচ্ছা ছিল না যে, কোথাও বিশ্রাম করেন। এক টানা দেশে যাইবেন এবং "সাত রাজার ধন" মাণিক দুঃখিনী সাধ্বী পত্নীর হস্তে অর্পণ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী ও নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দৈবচক্র কে অতিক্রম করে? প্রবল বারিবর্ষণ জন্য পথিপার্শ্বস্থ দেবনাথ পালের চাকঘরে আশ্রয় লইলেন।

সন্ন্যাসিগণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ, বা গোবর্দ্ধন শিলাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-ঝোলার মধ্যে এক বাণলিঙ্গ ছিল। মণিটিও প্রাপ্তিমাত্র সেই ঝোলায় রাখিয়া ছিলেন। চাকঘরে প্রবেশ করিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আমাশয়ে এমন প্রবল বেগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, মণি বাহির না করিয়াই ঝোলাটী চালার আড়ায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ঠাকুর থাকেন বলিয়া কখনই ঝোলা শুদ্ধ শৌচোদ্দেশে গমন করিতেন না। দীন দরিদ্র সন্ন্যাসীর ঝোলা কেহ স্পর্শ করিবে না, এই বিশ্বাসে তাহা যেখানে সেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যথা তথা বিচরণ করিতেন। আজ যে সাত রাজার ধন ভিক্ষুর ঝোলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শৌচক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দৈবচক্রে চক্রগৃহে প্রত্যাগত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। এই অবসরে দেবনাথের জননী ঊষার আলোকে সমস্তই দর্শন করিলেন। মাতা-পুত্রে পরামার্শ করিয়া সেই মণি হরণ করিলেন।

কি সত্য, কি অসত্য, কি সম্ভব, কি অসম্ভব, এককালে সে সকলের বিচার বিতণ্ডা না করিয়াই ইতিহাস ও দেশ-প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসারেই এই আখ্যায়িকা বিবৃত হইতেছে। আশা করি, পাঠক পাঠিকাগণও 'বিচার বিতণ্ডা পরিশূন্য হইয়া এই উপন্যাস পাঠ করিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুশীলনে অবগতি হয় যে, "স্পর্শমণি" নামে একপ্রকার মহামূল্য ও মহাগুণ-সম্পন্ন রত্ন আছে, তাহা প্রতিদিন শতভার স্বর্ণ প্রসব করে, অথচ নিজে সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কোন কোন স্থলে ঐ স্বর্ণ প্রসবের অন্যরূপ ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা বলে যে, ঐ মণির সহিত স্পর্শ হইবামত্র লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা এই উপন্যাসে স্পর্শমণির যে ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি, তদনুসারে ঐ ব্যাখ্যার আরও একটু সূক্ষ্ম টিপ্পনী করিতে পারি। স্পর্শমণির সহিত যেরূপ স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, সেই স্পর্শ বিবিধ,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। স্পর্শমণির সহিত পরোক্ষ স্পর্শেও লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। তাহার প্রমাণ এই বৃষ্টির জলে সন্ন্যাসীর ঝোলা ভিজিয়াছিল,—ঝোলার সহিত মণি ভিজিয়াছিল,—সেই মণির গাত্র-ধৌত জল স্পর্শে লোহার কোদাল ও দা স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছিল।

(১২)

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহুদিনের তপস্যার আশাতীত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আনন্দের পরিসীমা নাই। শৌচক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দেবনাথ পালের চক্রগৃহে শুভাগমন করিলেন। ঝোলাটী স্কন্ধে লইয়াই প্রস্থান। কোথাও অবস্থান করিলেন না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না, পাছে কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গীতে মাণিকের কথা কেহ জানিতে পারে। মাণিক যে এদিকে দেবনাথের প্রতি প্রযুক্ত দৈববাণীর সফলতা সম্পাদনার্থ তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, সন্ন্যাসী তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই। অন্তর আনন্দে গরগর করিতেছে। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে উপস্থিত হইলেন। সাত রাজার ধন মাণিক হস্তে দিবেন বলিয়া সহাস্যবদনে গৃহিণীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ঝোলার মধ্যে মাণিক পাইলেন না। এই ঘটনায় ক্ষত্রিয় সাধুর কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উপস্থিত হইল, পাঠক পাঠিকা কল্পনায় অনুভব করুন্—লেখক তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। সাধুকে এই ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মহাদেব প্রথমে তাঁহাকে ধন দিতে স্বীকার করেন নাই। ফলে মনুষ্যজীবনে যাহা হইতে অধিক বিড়ম্বনা আর নাই, মাণিকের শোকে সাধু সেই স্তম্ভিত বায়ু রোগে আক্রান্ত হইলেন। দুঃখের অবধি রহিল না। এই সাধুটী বাস্তবিক অনাসক্ত ও পরমার্থপরায়ণ ছিলেন, ঘটনাচক্রে বিষয়লালসা করিয়া এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ভগবৎ-প্রিয় সাধুগণ বিষয়াসক্ত হইলে এইরূপ দণ্ডই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীকে আপাততঃ এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল। ইনি বহুদিন পরে আর একবার আমাদিগকে দর্শন দিবেন।

এখন আমরা একবার দেবনাথ পালের গৃহে গমন করিব এবং সাত রাজার ধন মাণিক পাইয়া মাতা পুত্রে রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে কিরূপ কথোপকথন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিব। দেবনাথ জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মা, এ সব কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি?" দেবনাথ-জননীর রূপ যেমন রাজকন্যার ন্যায়, বুদ্ধিশুদ্ধিও তদ্রূপ। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"তোমার মা পাগল,—তোমার মার সাত গোষ্ঠী পাগল,—সন্ন্যাসী ঠাকুর পাগল,—দৈবজ্ঞের কথাও বিশ্বাস করিবার যোগ্য নয়,—এমন স্থলে এ সকল যে কি, আমি তা কিরূপে কহিব?" এই কথা কহিয়া আরও হাসিতে লাগিলেন। দেবনাথ যেন একটু অপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন,—

"কেন মা! বুড়োশিবের ঘরে দৈববাণী শুনিয়া অবধি আমিত তোমাদের সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াছি।"

"তা যদি করিয়া থাক, তবে যা বিশ্বাস করিয়াছ, এ সকলও তাই। যে মাণিক

সাত রাজার ধন, বুড়োশিব আজ তোমাকে সেই মাণিক দিলেন। ঐ মাণিকের শক্তি দেখ! মাণিকের গা ধুইয়া বৃষ্টির জল পড়ায় তোমার লোহার কোদাল ও লোহার দা সোণা হইয়া গিয়াছে। উহার সঙ্গে যত লোহা ছোঁয়াইবে,—ততই সোণা পাইবে!" দেবনাথ, জননীর কথা যত শুনিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে ততই অবসন্ন হইতেছিল। জননীর কথা শেষ হইবামাত্র, দেবনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

দেবনাথ পাল হাঁড়ীগড়া কুমারের পুত্র হাঁড়ীগড়া কুমার মাত্র; এ সকল উচ্চ অঙ্গের কোন সংবাদই রাখিতেন না। যে বস্তুর স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, সেই বস্তু তাঁহার ঘরে আসিয়াছে, এ আনন্দের বেগ সহিতে পারিলেন না। মূর্চ্ছিত হইবামাত্র বুদ্ধিমতী জননী ধরিয়া তাঁহার মস্তক আপন উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই দেবনাথ সংজ্ঞা লাভ করিরা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন অতিশয় ভীত হইয়া জননীকে কহিলেন,

"মা, আমাদের ত এই অবস্থা! এ সকল দ্রব্য কিরূপে সামলাইব?" জননী কহিলেন,—

"তুমি হাঁড়ীগড়া কুমারের ছেলে, তোমার রাজা হওয়া যত কঠিন বোধ হইতেছে,-আমার কিন্তু রাজার মা হওয়া তত কঠিন বোধ হইতেছে না। তুমি প্রতিদিন যেরূপ কাজ কর্ম্ম করিয়া থাক, আমি যে কয়দিন চৌবেড়িয়া হইতে ফিরিয়া না আসি, সেই কয়দিন সেইরূপ কাজ কর্ম্ম কর। আমি আজি বিকালে পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরমার্শ করিবার জন্য চৌবেড়িয়া যাইব।" পুত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া দেবনাথ-জননী স্বর্ণময় কোদাল, দা ও মাণিক অতিশয় যত্নসহকারে সিন্দুকে রক্ষা করিলেন এবং দেবনাথকে সেই সিন্দুকের উপর প্রতি রাত্রে শয়ন করিতে আদেশ করিয়া আহারান্তে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

ইংরাজী শিক্ষা ও জাতিভেদ।

ভারতের অন্যত্র কি তাহা বিশেষ জানি না, কিন্তু বাঙ্গলায় শুনিতে পাই আজকাল প্রধানতঃ দুইটী জাতি মাত্র বর্ত্তমান—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ অবশ্য নানাপ্রকারের আছেন; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর আদান প্রদান দূরে থাকুক অন্ততঃ প্রকাশ্যে আহার পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই। শূদ্র যে কত প্রকারের আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাইঃ—অবশ্য বৈদ্যের শূদ্রত্ব সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাঁদিগকে

বাদ দিলেও কায়স্থ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই শূদ্রশ্রেণীভুক্ত। এ সব কথা আমরা অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট শুনিতে পাই। তাঁহাদের কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য পাঠক পাঠিকারা বিচার করিবেন। তবে একটা কথা অনেকের মনোমধ্যে উদয় হয়, চতুর্বর্ণের মধ্যে আমাদের এই মাতৃভূমি বঙ্গদেশে কি ২য় ও ৩য় বর্ণের একেবারেই শুভাগমন হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা আজিকালি কোথায়? এবং যদি তাঁহারা কষ্ট করিয়া আর্য্যভূমি হইতে এতদূর না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরাও যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কি কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয় না?

যাহা হউক উপরি-উক্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা আজ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানিয়া লইলাম বাঙ্গলায় কেবল মাত্র ১ম ও ৪র্থ বর্ণের পদার্পণ হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আজকালকার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাতিভেদ প্রথার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না।

ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী বিজ্ঞান, ইংরাজী নীতিশাস্ত্র, ইংরাজী ব্যবহারশাস্ত্র এবং ইংরাজচরিত্র যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাসম্বন্ধে জাতিভেদের বিরোধী তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাম্যবাদ ইংরাজীর মূল মন্ত্র। ইংরাজ আসিবার ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন। মুসলমান দেশের রাজা হওয়াতে দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিকে পারসী—এমন কি আরবী পর্য্যন্ত পড়িতে হইয়াছিল। ইংরাজ এদেশের লোকের সঙ্গে মিশেন না সত্য, কিন্তু মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। মুসলমান বিজয়ের কিছুদিন পরেই মুসলমানেরা এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার হিন্দুদের কতদূর আনুগত্য জন্মিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে এবং ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত। মুসলমানদের সঙ্গে মিশামিশি খুব ছিল বটে, দেশের অনেক লোক যে কারণেই হউক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বটে এবং মুসলমান সংযোগে হিন্দুদের মধ্যে নানা বিষয়ে কতক কতক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ প্রথার উপর মুসলমান সহবাস এবং মুসলমান সাহিত্য-চর্চ্চা যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা বিস্তার করিয়া উঠিতে পারিয়াছিল তাহা বোধ হয় না।

ইহার দুইটী কারণ অনুভূত হয়। (১) মুসলমানেরা এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হিন্দু সংঘর্ষে তাঁহাদের চাল চলনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। (২) মুসলমান-সাহিত্য দেশে বিশেষ কিছু জ্বলন্ত নূতন ভাব আনয়ন করে নাই। সুধু তাহা নয়, অনেক বিষয়ে মুসলমান সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্টই ছিল। আর এক

কথাও এখানে বলা যাইতে পারে, ইংরাজী চর্চ্চার ন্যায় পারসী ও আরবী চর্চ্চার বহুল প্রচার হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নূতনত্ব সাম্যবাদ দেশের প্রথম ইংরাজী-শিক্ষার্থীদের মধ্যে কি বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। বিপ্লবের দুইটী কারণ ছিল; (১) ইংরাজী সভ্যতা ও সাহিত্য হঠাৎ দেশের মধ্যে কামানের জ্বলন্ত গোলার ন্যায় আসিয়া পড়ে। ইহাতে লোককে শশব্যস্ত করিয়া তোলে। নূতনত্বের খরবেগ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। (২) তখনকার হিন্দুসমাজের অপেক্ষাকৃত কঠোরতা। সমাজের মধ্যে নানা দোষ প্রবেশ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করিলে তখন শীঘ্র পার পাওয়া যাইত না। এখন আর সে দিন নাই। ইংরাজী বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নূতনত্বের মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল হইয়াছে; হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে; ইংরাজী এখন ঘরকন্নার একটা সাধারণ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সমাজবন্ধন এখন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং কাজে কাজেই লোকে অধিকতর উদারতা অবলম্বন করিয়াছে। আচার-বিরুদ্ধ কি সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় চারি দিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায় না। জাতিনাশের বিভীষিকা এখন একপ্রকার অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরুতর সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য নিতান্ত প্রকাশ্যভাবে না করিলে আর কোন উৎপাতই নাই। এখন—

> "এক টেবিলে বামন যবন
> উইলসনের খানা খান,"

এবং তাহার পরেই ব্রাহ্মণসন্তান হয় গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, না হয় আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়োদ্‌ভাবনে মস্তিষ্ক পরিচালিত করেন। যাঁহারা আপনাদিগকে খাঁটি হিন্দু বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে শুনিয়াছি—"আহারে ও ধর্ম্মে সম্বন্ধ কি? পশ্চিম যাইতে হইলে সুবিধামত অন্য কোন স্থানে ভাল আহার পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে যদি কেল্‌নারের হোটেলে আহার করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুত্বে কি দোষ পড়িল?" কি দোষ পড়িল? সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কথা কেহ বলিতে সাহসী হইতেন কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজীশিক্ষার বৈপ্লবভাবের খর্ব্বতার কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্যের নূতনত্বের ধাঁধা অনেকটা ঘুচিয়াছে এবং সমাজবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে। এই শৈথিল্য ইংরাজী শিক্ষারই ফল। এখন জিজ্ঞাস্য সমাজবন্ধনের শৈথিল্য জাতিভেদ প্রথার প্রতিকূল কি না? আমাদের

ত এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বৈপ্লবভাব এখন নাই সত্য, কিন্তু ইহার মূলমন্ত্র কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? যখন নদীতে বাণ আসে, তখন গ্রাম প্রান্তরাদি ভাসিয়া যায়, অনেক স্থান নদীগর্ভে নিখাত হয়, এবং নদীর ভয়ঙ্করত্ব ও ধ্বংস ক্ষমতার জীবন্ত ছবি মনে অঙ্কিত হইয়া যায়! কিন্তু বাণ অল্পকাল স্থায়ী এবং সেই জন্য ইহার বিনাশিনী শক্তিও সীমাবদ্ধ। নদী নিঃশব্দে প্রত্যহ বহিয়া বহিয়া স্থলের যেরূপ ধ্বংস সাধন করিতেছে, তাহার সঙ্গে বাণকৃত ধ্বংসের তুলনাই হয় না। অথচ এই ধ্বংস কয় জনের মনোযোগ আকর্ষণ করে? ইংরাজীশিক্ষার প্রথম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা অল্পে অল্পে জাতিভেদের মূল যে আল্‌গা করিয়া দিতেছে, তাহা অনেকে দেখেন না।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একটু বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কেহ কেহ বলিবেন সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজকাল ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে। বিপ্লবের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, ইংরাজীর নূতনত্বের চটক কমিয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু নামের গৌরব বুঝিতে পারিতেছেন, এক টেবিলে বামন যবনের খানা খাওয়া কমিতেছে এবং যাঁহারা আহার ও ধর্ম্মের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পান না, বিশাল হিন্দুসমাজের তুলনায় তাঁহারা আজও মুষ্টিমেয়। তর্কের অনুরোধে যদি এ সব কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও গুটিকত কথা বলিবার আছে।

(১) জাতিভেদের প্রচণ্ড কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া অনেকে আজকাল বলিয়া থাকেন সামাজিক নিয়ম সব সময়ে খাটে না। কোনও সামাজিক কার্য্যে যাঁহার সহিত এক সঙ্গে ভোজন কি একত্র উপবেশন অসম্ভব, বন্ধুতার খাতিরে সচরাচর তাঁহার সঙ্গে পান ভোজনাদি করা যাইতে পারে। অনেক জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ দেখা গিয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের শূদ্র বন্ধুর বাড়ীতে অন্ন ছাড়া আর প্রায় সবই আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও সামাজিক ব্যাপারের সময় হয়ত তাঁহারা সেই শূদ্র বন্ধুর বাটীতে পর্য্যন্ত আসেন না। এরূপ লোক দেশে বড় বিরল নন। কি যুক্তি দ্বারা তাঁহারা সামাজিক ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে পার্থক্য সংস্থাপন করেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। আমাদের ত মনে হয় ইহা ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম ফল এবং ইহাতে জাতিভেদ বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলিবেন উপরে যাহা উক্ত হইল উহা সাধারণ নিয়ম নয়, তাহার ব্যভিচার মাত্র। হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যেন মনে রাখেন "ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়।"

(২) জাতিভেদ ত ব্যবসা লইয়া। ব্রাহ্মণের ব্যবসা যাজন ও অধ্যাপনা;

ক্ষত্রিয়ের রাজকার্য্য ও যুদ্ধ; বৈশ্যের কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের প্রথম তিন বর্ণের সেবা। কিন্তু এখন প্রায় ইহার কিছুই নাই। যাজন অবশ্য ব্রাহ্মণেরা আজও করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য এখন তাঁহাদের হস্ত হইতে একরূপ গিয়াছে বলিলেই চলে। দেশে যে কয়টী টোল আছে, তাহাতে অবশ্য ব্রাহ্মণ অধ্যাপক আছেন, কিন্তু এখন টোলই বা কত এবং তাহারাই বা আর কতদিন? যদি ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার স্রোত এইরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশে প্রাচীন ধরণের টোল আদৌ থাকিবে কি না সন্দেহ। ইংরাজাগমনে নূতন যে অধ্যাপকশ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩৬ জাতি বিরাজমান। এক দিকে যেমন অধ্যাপনার ভার ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে যাইতেছে, অপর দিকে তেমন অন্যান্য ব্যবসায়ের দিকে তাঁহারা হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। চণ্ডীপড়া হইতে জুতাগড়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে আজিও নাই করুন, জুতার ব্যবসা পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানও আজকাল ওকালতী ও অন্যান্য ব্যবসা এবং কেরাণীগিরি ও অন্যান্য চাকরী করিতেছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাঁহারা কি জাতিভেদের মূল শিথিল করিতে সাহায্য করিতেছেন না?

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যত বাঙ্গলায় নাই। বাঙ্গালীকে যুদ্ধ করিতে হয় না, সেইজন্য ক্ষত্রিয় না থাকাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না, কিম্বা অন্য কোন জাতি দ্বারা তাহাদের কার্য্য করাইয়া লইবারও আবশ্যক হয় না। বৈশ্যের কার্য্য না হইলে কিন্তু সমাজ চলে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই এখন বৈশ্যের কার্য্য করিতেছেন। একটু আলোচনা করিলে দেখা যায় ইংরাজীর ঢেউ অনেক দূর পৌঁছিয়াছে। সুধু যে ইংরাজী-শিক্ষিত লোক ব্যবসায় সম্বন্ধে জাতিভেদের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন এরূপ নহে, অনেক নিরক্ষর অথবা ইংরাজী-অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যেও জাতিব্যবসা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক কর্ম্মকারকে স্বর্ণকারের ব্যবসায়, অনেক অন্যজাতীয় লোককে সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ব্যবসায় সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা যে ইহা ছাড়া আর নাই এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। একটু চিন্তা করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে কত লোক আছে যাহারা জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, আমরা কি কি প্রশ্নের উৎপাদন করিয়াছি :—

(ক) ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে জাতি-

ভেদের কঠোর শাসন আহারাদি সম্বন্ধে কতকটা শিথিল হইয়াছে। সামাজিক নিয়ম ও অসামাজিক নিয়ম বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর জাতিভেদে ব্যবসায়ের পার্থক্য এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাও আর ব্যবসা যে জাতিগত, এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে অপারগ।

(গ) অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের মনেও ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

উক্ত বিষয়গুলির কারণ কি? তাহার আভাসও দিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, ইংরাজদিগের এ দেশে আগমন ও ইংরাজীশিক্ষার প্রচারই একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। অনেকের মতে এই জাতিভেদ বন্ধনের শৈথিল্য ইংরাজী শিক্ষার একটী কুফল; এবং সেই জন্য তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কিয়ৎপরিমাণে দণ্ডায়মানও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি ইংরাজীশিক্ষার স্রোত রোধ করিতে পারিবেন? যখন দেখিতেছি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র সংস্কৃত চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া উকীল বা হাকিম হইবার জন্য ইংরাজী অধ্যয়ন করিতেছেন এবং অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাটীতেও ইংরাজী পুস্তক ক্রয়ার্থ টাকা খরচ একটা প্রধান খরচের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তখন কি করিয়া বলিব ইংরাজীশিক্ষার গতি কখন প্রতিহত হইবে? আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ইংরাজী না পড়িয়াই আপনাদের সুবিধামত ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবার কি উপায় আছে? সমাজের কি এমন কিছু শক্তি আছে যে, তাহাদিগকে এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ হইতে বিরত করে? সমাজে এমন কেহ আছেন—কি জন্মাইবেন কি—যাঁহার কথা তাহারা শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন জাতি ব্যবসায় পরিত্যাগের সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে? যদি ইংরাজী চর্চ্চা বন্ধ করিতে না পারা যায়, যদি ইংরাজী প্রবেশের দ্বার অবারিত থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যভাব হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার যে কি উপায় আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। যদি ইহা শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইবে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে আজ হউক, কাল হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, জাতিভেদ বন্ধন যে শ্লথ হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সমাজনেতৃগণ ভাবিয়া দেখুন রোগের কোনও ঔষধ উদ্‌ভাবন করিতে পারেন কি না।

শ্রীদে, না, ব।

সরোজিনীর মায়ের পরিত্রাণ।

সরোজিনীর মা এক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভবা বিধবা। সে বালবিধবা ছিল কি না বলিতে পারি না। বিক্রমপুরের কোন এক গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহাকে রূপবতী না বলিলেও নিতান্ত রূপহীনা বলা যায় না। গ্রামে যখন বাস করিতেছিল, তখন কোন এক কুলোকের কুহকে পড়িয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়। এইরূপ বুদ্ধিবিহীনা কুপথগামিনী স্ত্রীলোকদিগের পরিণাম যাহা ঘটিয়া থাকে, সরোজিনীর মায়ের তাহাই ঘটিল।

পাপের পথ অতি মসৃণ, একবার পদ স্খলিত হইলে কাহারও দাঁড়াইয়া থাকিবার যো নাই। সরোজিনীর মাও এতাদৃশ বিপদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। জীবনের এই দুর্দ্দিনে কোথায় কি ভাবে জীবন কাটাইয়াছে, আমি তাহা পাঠিকাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তাহার জীবনতরী অবশেষে আসিয়া ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হয়। এখানে সে কোন এক রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী সাজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র কন্যা বালিকা সরোজিনী তাহার সঙ্গে ছিল। সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা আপনার ও সন্তানেরও ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। ইহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ঢাকা নগরীতে "উদ্ধারাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল বারাঙ্গনা বালিকাদিগকে পাপের পথে চালাইবার জন্য প্রস্তুত, তাহাদিগের হস্ত হইতে ঐ সকল বালিকাকে উদ্ধার করাই উক্ত আশ্রমের উদ্দেশ্য।

সরোজিনীর মা যখন এই আশ্রমের বৃত্তান্ত শুনিল, তখনই তাহার কন্যা সরোজিনীকে তথায় প্রেরণ করিবার সংকল্প করিল।

সরোজিনীর মা পাপে ডুবিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভদ্র পরিবারের কন্যা বলিয়া তাহার অন্তর হইতে সমস্ত সদ্‌গুণ বিদায় গ্রহণ করে নাই। সদ্ভাব ও বাৎসল্য তখনও তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। কিসে সরোজিনীর কল্যাণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিত। সরোজিনীকে পাপের কূপে ডুবাইয়া স্বার্থ সাধন করিবে ইহা তাহার নিকট জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু আপনাকে নিরুপায় ভাবিয়া কিছুই স্থির মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে বিধাতা পুরুষ তাহার সহায় হইলেন। সরোজিনী উদ্ধারাশ্রমে প্রেরিত হইল। সন্দেহবাদিগণ সরোজিনীর মায়ের অভিসন্ধির প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবিলেন সরোজিনীর মায়ের কন্যা প্রেরণ কেবল মেয়ে-ধরা ফাঁদ পাতা মাত্র। সরোজিনীর সঙ্গে আরও কয়েকটী মেয়ে ধরিয়া

আনিবে উদ্দেশ্য করিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে। বিধাতার কি লীলা! এক দিন সরোজিনী ও আশ্রমস্থ অন্যান্য আরও কয়েকটি বালিকা রাত্রিকালে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। তখন সন্দেহবাদীদিগের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল, সন্দেহের তরঙ্গ গড়াইয়া যাইয়া সরোজিনীর মায়ের উপর পড়িল। পাপের শাস্তি কি ভয়ানক! পাপী নির্দ্দোষী হইলেও অনেক সময় নিস্তার পাইতে পারে না। যে একবার সমাজের চক্ষে অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছে, সে সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সরোজিনীর মা নির্দ্দোষী হইলেও পুলিস কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বয়ং বিধাতা পুরুষই যেন তাহাকে রক্ষা করিলেন, তাহা না হইলে হয়ত তাহাকে বিচারালয়েও শাস্তি পাইতে হইত। পলাতক বালিকাগণ পরে ধৃত হইল এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে ওরূপ করিয়াছিল এই কথা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনার পর সরোজিনীর মা কন্যাকে পুনরায় আপনার নিকট আনয়ন করে। কিন্তু বিধাতা পুরুষ যাহাদিগের সুখের সোপান খুলিয়াছেন, তাহাদিগকে বন্ধ করে কে? সরোজিনী তদবধি আশ্রম-বাসিনী হইল। মাতা কন্যার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাইত, তদুপলক্ষে আশ্রমের অধ্যক্ষ শশি বাবুর সহিত তাহার পরিচয় হয়, এবং এই উপলক্ষে আরও দুই এক জন সাধু-চরিত্র পতিতা-নারীদিগের উদ্ধারাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতও তাহার আলাপ হইল। এইরূপে তাহারও জীবন-পরিবর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু যত দিন পাপের পথ মধুর বোধ হয়, তত দিন ধর্ম্মোপদেশ ভাল লাগে না। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহার পরিত্রাণের সময় নিকটবর্ত্তী, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ গূঢ়ভাবে পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। উপদেষ্টা কিংবা উপদিষ্ট কেহই হয়তঃ প্রথমাবস্থায় তাহা জানিতে পারেন না, কিন্তু যখন জীবন বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সকলেই তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে। সরোজিনীর মায়ের প্রাণে এইরূপ গূঢ় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। অবশেষে যখন তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল, তখন সরোজিনীর মা পবিত্রতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইল। যতক্ষণ মানুষ অন্ধকারে বাস করে, ততক্ষণ অন্ধকারকেই ভাল বলিয়া মনে করে, কিন্তু এক বার আলোর সঙ্গে দেখা হইলে আর অন্ধকার ভাল লাগে না। সরোজিনীর মায়ের তাহাই ঘটিল। সে এক দিন শশি বাবুর নিকট তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। শশি বাবু তাহার এই মানসিক পরিবর্ত্তন সাময়িক মনে করিয়া আরও প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সরোজিনীর মায়ের পাপের জ্বালা তখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর পাপ জীবনের বিভীষিকাময় দৃশ্য

দেখিতে পারিল না। শশি বাবুকে তাহার উদ্ধারের জন্য জিদ করিতে লাগিল। যখন দেখিতে পাইল শশি বাবু তাহার প্রস্তাবে তখনও অসম্মত, তখন বলিল "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, এক ভদ্রলোকের বাসায় রাঁধুনির কাজ কর্ব্ব, তবু এ ভাবে জীবন যাপন কর্ব্ব না। আপনি যদি আমায় নাই লন, তবে আমার ঐ কাজ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।" শশি বাবু তাহার এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সোণার বালা কি কর্ব্বে?" তখন সে বলিল "ইহা সরোজিনীর জন্য রেখেছিলেম, নিন আপনি নিয়ে যান," এই বলিয়া খুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। শশি বাবু তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। এখন সে আশ্রম-বাসিনী। এখন বিষয়-বৈরাগ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। সে মস্তকের সুন্দর কেশদাম খর্ব্ব করিয়া কাটিয়াছে, রঞ্জিত শাড়ীর পরিবর্ত্তে থান কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বরের দিকে তাহার মন গিয়াছে। এখন তাহার বয়স ৩৩ কিংবা ৩৪ হইয়াছে। ভগবান্ সুমতি দিয়াছেন, সে আশ্রমের বালিকা-দিগের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ মনের মত খাটিতে পারিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করে। সরোজিনীর মায়ের পরিত্রাণের পথ খুলিয়াছে, ভগবানের বিধান কে বুঝিবে? তিনি কন্যাকে দিয়া মাতাকে আকর্ষণ করিলেন। ধন্য তাঁহার মহিমা! ধন্য তাঁহার শক্তি।

উদাসীন।

মানবদেহের বৃদ্ধি।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার মার্টিনো বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানবসন্তান এক একটী ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ডিম্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এমন কি ইহার ব্যাস এক ইঞ্চের ১২০ এক শত বিংশতি ভাগের এক ভাগ। সুতরাং তাহা দূরবীক্ষণ ব্যতীত নগ্ন চক্ষে ভাল দৃষ্ট হয় না। যদি একটী ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে এরূপ ক্ষুদ্র ডিম্ব হইতে মানবের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। যাহা হউক মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"মায়ের উদরে জন্ম জনক ঔরসে।
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বিদ্যুৎ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাড়ে অতিশয়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা যেমন বাড়য়॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাই মাংসপিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদ গতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে॥

সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময়॥
মায়ের ভোজন রসে বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্ট মাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে॥"
(শান্তিপর্ব্ব কাশীরাম দাস)

ক্রমে দশম মাসে পূর্ণাবয়ব হইলে জীব ভূমিষ্ঠ হয় এবং স্তনপান দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উদ্ধৃত কবিতার বৈজ্ঞানিক বিচার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝেন, তাঁহারা তাহা অনায়াসে করিতে পারিবেন, আমরা কেবল অভিজ্ঞান-জাত প্রত্যক্ষ বৃদ্ধির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম পঞ্চ বর্ষ বালক ও বালিকা উভয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বালকেরা বালিকাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বালিকারাও একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকদিগের অপেক্ষা অধিকতর বাড়িয়া উঠে। বালকেরা একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় হয়, কিন্তু বালিকারা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পরিমাণে ভারী হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়সের পর বালিকারা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সে পূর্ণকায় হইয়া থাকে। পঞ্চদশ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বালকেরা আবার অধিকর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৎসরে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দৈহিক ভার ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকেরা কিছু দিন সমভাবে থাকিয়া হঠাৎ বাড়িয়া উঠে। বাড়িবার এই সময় তাহারা স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত হইলে কৃত্রিম উপায়ে সবল ও সুন্দর হইতে পারে। ব্যায়াম এই সময়ে বিশেষ উপকারী, তদ্দ্বারা দৈহিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কান্তি ও শ্রীবৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ক্ষীণ দীর্ঘকায় কদাকার যুবা, যাহার মাংশপেশী ও ধমনী শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম কৌশলে সেও সবল, দৃঢ়কায় ও সুন্দর হইতে পারে। ৩৫ বৎসর বয়সে এক ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছিল, দুই মাস ক্রমাগত ব্যায়াম দ্বারা তাহার বৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে এবং বক্ষঃস্থল উন্নত ও ৪৷৷০ ইঞ্চ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর একটি উনবিংশ বর্ষ-বয়স্ক ক্ষীণকায় দীর্ঘকায় যুবকের নয় মাস কাল ব্যায়াম করিয়া দৈহিক দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তে বক্ষঃস্থলের প্রসারতা ৪৷৷০ ইঞ্চ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা পরীক্ষিত বিষয়।

ব্যায়াম বহু প্রকার—"ডন" ফেলা ও মাংসপেশী সম্বর্দ্ধক ব্যায়াম দ্বারা হৃদয় প্রশস্ত ও ফুস্‌ফুস্ বিস্ফারিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ সৌকর্য্য হেতু শরীরের স্ফূর্ত্তি ও স্বচ্ছন্দতা সংসাধিত হয়। ইহা স্থূলতা নাশের মহৌষধ।

পদব্রজে ভ্রমণ, দৌড়ন, লম্ফপ্রদান, সন্তরণ ইত্যাদি অনায়াসসাধ্য ব্যায়াম-গুলিও শারীরিক পুষ্টিদায়ক ও শক্তি-সম্বর্দ্ধক। ব্যায়াম দ্বারা কেবল শারীরিক নহে, মানসিক শক্তি সকলেরও বিকাশ হয়, এবং আত্মপালন ও আত্মনির্ভরের ভাবও প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা সকল অবস্থার সকল লোকের পক্ষে ব্যবস্থিত। প্রাচীন স্পার্টার রমণীরাও ব্যায়াম করিত এবং বীরমাতা নামের যোগ্য হইত।

ঘটিকা যন্ত্র।

সময় নিরূপণ করিবার জন্যই ঘটিকা যন্ত্রের উদ্ভাবন। সভ্যতার অভ্যুদয়ে শ্রম ও বিশ্রামকাল বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে এবং বিভাগ সমানাংশে নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই ঘটিকার প্রয়োজন। আধুনিক শিল্পজাত ঘটিকার ন্যায় প্রাচীন কালে যে কোন প্রকার সময়-নিরূপক যন্ত্র ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু তখন কৌশল দ্বারা ঘটিকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যই ঘটিকার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু মেঘাবৃত দিবসে বা অন্ধকার সময়ে সূর্য্য কার্য্যকারী হয় না; কারণ তখন ছায়া থাকে না। এই অসুবিধা নিবারণ জন্যই অন্য কৌশল আবশ্যক হইয়াছিল। ইহাই জলঘড়ি ও বালিঘড়ি।

জলঘড়ি। একটী সছিদ্র তাম্র বাটী অথবা অন্য ধাতুময় পাত্র জলপূর্ণ করিয়া অপর একটী পাত্রে বসাইয়া রাখিলে, যতক্ষণে সমস্ত জল বাহির হইয়া বাটী বা পাত্র শূন্য হয়, ততক্ষণ এক ঘণ্টা বা ঘটিকার পরিমাণ। অথবা সছিদ্র শূন্য পাত্র জলমধ্যে কৌশলপূর্ব্বক অবস্থাপিত হইলে যতক্ষণে তাহা পূর্ণ হয়, ততক্ষণই এক ঘটিকার পরিমাণ। শেষোক্ত জলঘড়ি রোমদেশে ব্যবহৃত হইত।

বালিঘড়ি। ডম্বরুর ন্যায় কাচপাত্রের অর্দ্ধাংশ বালুকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে সমস্ত বালুকা নিঃসৃত হইয়া অপরাংশে পতিত হইতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণই এক ঘড়ির পরিমাণ। এই উভয়বিধ ঘটিকাই আমাদিগের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন্ সময় হইতে যে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কোন লিখিত বিবরণ নাই, প্রত্যুতঃ আমরা কোথাও তাহার উল্লেখ দেখি নাই।

কথিত আছে যে খৃষ্টীয় শকের ২৬৭৯ অব্দ পূর্ব্বে চিন সম্রাট্ কোঙার রাজত্ব-কালে জলঘড়ি চিন দেশে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দি পুর্ব্বে ইহা মিসরে প্রচলিত হয়। সিপিও নাসিকা গ্রীশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া রোমে জলঘড়ির প্রচলন করেন। সেই সময়ে ইহার ব্যবহার গলদেশে (ফ্রান্সে) প্রচলিত হয়। জুলিয়াস্ সীজর এই ঘড়ি দেখিয়া

চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে শ্যাম-দেশ ও ব্রহ্মদেশ, মঙ্গোলিয়া, পারস্য, মিসর, গ্রীশ ও রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশ সকলে জলঘড়ির ব্যবহার ছিল, এবং অদ্যাপিও কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। অষ্ট্রোগথের রাজা থিয়োডরিকের আদেশে বোইস্ নামক একজন রোমীয় একপ্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি নির্ণীত ছিল; এই ঘড়িটী বরগণ্ডিয়ার রাজা গণ্ডিবণ্ডকে উপহার দেওয়া হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে গাজার চৌবি-সিএন, একপ্রকার ঘড়ি নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে ১২টী পিত্তলের ঈগল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষিত ছিল, প্রত্যেকের চঞ্চুতে এক একটী মুকুট ছিল। উপরিভাগে সূর্য্য-দেব একহস্তে গোলক ও অপর হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। দণ্ড বিস্তার করিলেই হারকুলেশ উপস্থিত হইত; অমনি ১২টী ঈগল ১২টী মুকুট তাহার মস্তকে পরাইয়া দিত। ইহা হারকুলেশের দ্বাদশ শ্রমের পুরস্কার এবং রাশিচক্র ও দ্বাদশ মাস ও দ্বিপ্রহর বেলার পরিমাণ ছিল।

পারস্য-রাজদূত আবদুল্লা, জর্জ এবং ফেলিক্স নামক জরুসলমের দুইজন সন্ন্যাসীর সমভিব্যাহারে কালিফ্ হারণ অল-রাসেডের নিকট হইতে সম্রাট্ সারলামানের জন্য উপঢৌকন লইয়া যান, তন্মধ্যে একটী জলঘড়ি ছিল। তাহাতে ঘণ্টার সংখ্যানুসারে পিত্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল ছিল। তাহার এক একটী প্রত্যেক ঘণ্টায় তাম্রপাত্রে পতিত হইত। ঘণ্টা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পাত্রের উপরিভাগে বারটী দ্বার দিয়া ১২টী অশ্বারোহী আসিত এবং দ্বারগুলি অমনি বন্ধ হইত, পরে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহারা চলিয়া যাইত, এই ঘড়িটী এ-লা-সেপল্ প্রাসাদে রক্ষিত ছিল।

৭৬০ হিজরা অব্দে আবুহাসনের রাজত্ব-কালে একটী বৃহৎ শিশাময়ী জলঘড়ি নির্ম্মিত হয়, তাহা একটী অপরূপ বস্তু বলিয়া অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে। ইহার উপরিভাগে একটী রৌপ্যময় গুল্ম নির্ম্মিত আছে; একটী পক্ষী তাহার শাখায় বসিয়া পক্ষ দ্বারা শাবকদিগকে ঢাকিয়া রাখি-য়াছে। বিবর হইতে একটা সর্প শনৈঃ শনৈঃ বাহির হইয়া শাখায় উঠিয়া একটী শাবককে লক্ষ্য করিতেছে। ঘণ্টা পূর্ণ হইবার অব্যবহতি পূর্ব্বে দুইটী ঈগল দুইটী দ্বার দিয়া আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং ঠিক্ সময় হইলে দুইটী তাম্র বর্ত্তুল ঠোঁটে করিয়া তাম্র পাত্রে ফেলিয়া দেয়, অমনি সর্প গর্জ্জন করিয়া গুহাস্থ একটী পক্ষিশাবককে দংশন করিয়া কবলসাৎ করে। সেই সময় হঠাৎ অপর একটী দ্বার দিয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বাহির হইয়া সম্রাট্কে অভিবাদন (সেলাম) করিয়া বামহস্ত আস্যদেশে অর্পণ করে এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি পুস্তক প্রদর্শন করে—তাহাতে কালিফের প্রশংসাসূচক কবিতা খোদিত। মূহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত দৃশ্য

অন্তর্হিত হইয়া স্বাভাবিক ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

জলঘড়ির পরেই আধুনিক শিল্পজাত ঘটিকাযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

মশকের উপকারিতা।

দূষিত জলবায়ু, দুর্গন্ধময় প্রদেশ ও জঞ্জালপূর্ণ স্থানে মশকের উৎপত্তি, সুতরাং ইহার আবার উপকারিতা শক্তি কি? অনেকে ইহা বলিতে পারেন। কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর কোন পদার্থই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই। ইহা মনে হইলে আর বিস্ময়ের কারণ থাকে না। মশকেরা ম্যালেরিয়া অর্থাৎ জলাভূমিজাত বা আর্দ্র স্থান হইতে উৎপন্ন বিষাক্ত বায়ু—যাহা জন্তুশরীরে সংলগ্ন ও প্রবিষ্ট হইলে জ্বর উৎপন্ন করে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। ইহাদিগের জন্মস্থানের যেরূপ বিধান, আহারেরও সেইরূপ ব্যবস্থা। মশক না থাকিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইত। মশকেরা বিষাক্ত বায়ুর সেই জ্বরবীজ আহার করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সংসাধন করিতেছে।

মশক যখন দংশন করে—অর্থাৎ যখন তাহার দংষ্ট্রা বা শুণ্ড জীবশরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া রুধির শোষণ করিতে থাকে, তখন তাহার সেই শুণ্ড দিয়াও একপ্রকার সূক্ষ্ম দ্রব দ্রব্য জন্তুশরীরে নিহিত হয়। উহাই বিষাক্ত বায়ুগত ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ। বসন্তরোগের টীকার ন্যায় এই বীজ মশককর্ত্তৃক আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরস্থ ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বীজাঙ্কুর বিনষ্ট করে। টীকা দ্বারা যেরূপ বসন্তরোগের ভয় নিবারিত হয়, মশকের দংশনও সেইরূপ ম্যালেরিয়া-জ্বর-নিবারক টীকা। মশকেরা মনুষ্যের প্রাণদায়ী রক্ত পান করে না। ইহারা কেবল দূষিত ও ম্যালেরিয়া-বীজ-মিশ্রিত রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই মশকের দংশনে শরীর বিবর্ণ ও ঈষৎ স্ফীতও হইয়া থাকে। কিন্তু শোষণকালে ইহার শুণ্ডস্থ দ্রব পদার্থও বিবর্ণ দৃষ্ট হয়।

যে সকল লোক ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বায়ু স্পর্শে অক্ষুণ্ণ, অর্থাৎ যাহাদিগকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে অশক্ত, তাহাদিগের শরীরে মশকের দংষ্ট্র প্রবিষ্ট হয় না। মশকেরা কখন অনর্থক দংশন করে না। আমরা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মশক যখন দংশন করে, তখন তাহাদিগকে নিবারণ করা—মারা বা তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা রক্ত পান করিয়া শরীরের উপর পূরীষ পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়; তাহার দুর্গন্ধে

বিরক্ত হইয়া আর কোন মশক সেই শরীরে বসে না; কিন্তু যদি প্রথম হইতে মশককে মারা যায় বা উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দলে দলে মশক আসিয়া বিষম উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা সপ্রমাণ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ইহা যে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিপোষক, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। মশকের দংষ্ট্রানীত ম্যালেরিয়া-বীজ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রক্ত শোধিত হইয়া বসন্ত-টীকার প্রক্রিয়ানুক্রমে আর তাহাতে ম্যালেরিয়া-বিষ প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং তাহাতে আর মশকও দংশন করে না।

মশকের আতিশয্য বায়ুমধ্যে বিষাক্ত বীজের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে স্থলে বা যে গৃহে মশকের প্রাদুর্ভাব, তথাকার বায়ু নিশ্চয় দূষিত, তাহা সেবনে পীড়া অবশ্যম্ভাবী। মশকগণ তাহা আহার করিয়া আমাদিগের পরম হিতসাধন করিয়া থাকে, নতুবা আমরা ম্যালেরিয়া বিষাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতাম। পথে বা মাঠে ভ্রমণকালে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, মশকের দল সকল কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মস্তকের উপর চক্রাকারে উড্ডীয়মান হইয়া ভ্রমণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ সেই স্থান নিশ্চয়ই ভ্রমণ বা বিহারের অনুপযুক্ত, তথায় কিছুক্ষণ থাকিলেই অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্যই মশক সকল আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, সুতরাং সেই স্থান তদ্দণ্ডেই পরিত্যাগ করা উচিত। মশক এইরূপে আমাদিগের অনিষ্টের কারণ না হইয়া বরঞ্চ মহোপকারী বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাকে।*

অভিমানের প্রতি।

১

কে বলিল সে দেবতা বড়ই নিঠুর,—
কে বলিল বুকে তার,
সেই স্মৃতি নাহি আর,
কে বলিল সে প্রতিমা করেছে সে চুর ?
সে মোর তেমন নয়,
তাও কি সম্ভব হয়,
প্রিয় স্মৃতি ভুলে কবে বিয়োগ-বিধুর ?

২

তেমন পবিত্র হৃদি মিলে না ধরায়,—
যতই পরিধি চাই,
ভল তার নাহি পাই,
নীরবে উচ্ছ্বসি সে যে নীরবে মিলায়।
জগতের রীতি জানি,
দেহ ল'য়ে টানাটানি,
হেন তুচ্ছ ভালবাসা সেও নাহি চায়।

*English Mechancis or World of Sceince—30th April 1892.

৩

ফুলের সুরভি যথা বাতাসে মিলায়,
সে চায় তেমনি করে,
হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে,
দেহের সম্বন্ধ চায় সে দলিতে পায়!
সে প্রেম অমৃতময়,
নাহিক একটু ক্ষয়,
নভেলের "হাহতোস্মি" মিলে না তাহায়।

৪

তা বলে নিঠুর আমি বলিব কি তায় ?
"সে মোরে ভুলেছে" বলে,
অভিমানে যাব চ'লে,
প্রেমের মুরতি তবে দেখিব কোথায় ?
ভবে সে দেবতা সম
আরাধ্য উপাস্য মম,
প্রেম যদি থাকে, আছে তারি সে হিয়ায়।

৫

কাঠিন্য কোমল হয় তার সে ছায়ায়,—
সাগর শুকাতে পারে,
তবু সে ভুলিতে নারে,—
তার সেই স্নেহলতা প্রেম-প্রতিমায়।
দূর হরে অভিমান,
'তার সে প্রাণের টান—
কমেছে'—ভুলি না আমি তোর ও ছলায়।

৬

বড় তুই ঈর্ষাভরা বুঝেছি এখন,—
প্রেমের বন্ধন হায়,
চাহিস দলিতে পায়,
সদা চাস ভেঙে দিতে সুখের স্বপন।
সে আমার—তার আমি,
জানেন অন্তরযামী,
যমুনা জাহ্নবী সম এ দুটী জীবন।

৭.

তুই কেন ক'রে দিতে চাস ব্যবধান ?
এ দুটি প্রাণের প্রেম,
অনল-কষিত হেম,
নারিবি ভাঙিতে তাহা দিয়া বজ্র টান।
দেহে হেথা নাহি টান,
শুধু বিনিময় প্রাণ,
কি করিবি হেথা তুই তুচ্ছ অভিমান ?

মর্ম্মগাথারচয়িত্রী—বোলপুর।

সংসারাশ্রম।

পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ইত্যাদি সহযোগে একত্র বাস করার নামান্তর সংসার। সংসার জীবনের মহা শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান। এখানে যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সুখ ও শান্তি এবং পরলোকে পরমানন্দ লাভের অধিকারী হন। সংসার একটি আশ্রম। শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার পক্ষে প্রেমই উৎকৃষ্ট সাধন। সেই পবিত্র প্রেম শিক্ষার ইহাই একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে আমরা পিতা মাতার

নিকট, ভ্রাতা ভগিনীর নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেম শিক্ষা করিতেছি। এই প্রেম ঊর্দ্ধমুখীন হইয়া শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়। কিন্তু আমাদের প্রেম বড়ই সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানের অমূল্য চরণ বিস্মৃত হইয়া "আমার আমার" করিয়া তুচ্ছ সংসারে ডুবিয়া আছি। "আমি কে, আমার কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব" আমরা সংসারের থরশাণ চক্রে আবদ্ধ হইয়া তাহা একবারও ভাবিবার অবসর পাই না। আমরা প্রতি নিয়ত অমূল্য প্রেমরত্ন মনুষ্য-পদে ঢালিয়া দিতেছি, প্রেমকে ঊর্দ্ধমুখীন করিতে পারিতেছি না। তাহাতে শান্তি পাওয়া দূরে থাকুক, প্রাণ কেবল বিস্তৃত শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে।

বলিতে পার যেখানে বাস করিয়া শান্তি নাই, সে আশ্রম শ্রেষ্ঠ কিসে? আমরা নিজের শান্তি নিজেই নষ্ট করিতেছি— সংসারের দোষ কি? আমাদের সংসার ভগবৎ-প্রদত্ত। আমরা সংসারে থাকিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, তবে আর ভয় কি? শ্রীভগবান্ সংসারীদিগকে মায়াহ্রদে ডুবিয়া থাকিতে বলেন নাই। সংসারীকে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনের উপদেশ বহু শাস্ত্র গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রী গৌরাঙ্গ দেবও বলিয়াছেন,—

"গৃহে বসি নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইবা।" চৈ চঃ

অনেকেই সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা নহে। অধুনা যে এত সন্ন্যাসী দেখা যায়। অনেক গৃহস্থের দ্বারেই "হাম সাধু হ্যায়, ঘিউ দেও, দাল দেও, আটা দেও" বলিয়া যে সকল সাধু সমাগত হন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সাধু আছেন? সে সকল সাধু উদরান্নের জন্য মাত্র। সেরূপ সন্ন্যাসী সাজা কেবল বিড়ম্বনা! সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন পরিধান করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারা যায় না। যাবৎ হৃদয়-জাত প্রত্যেক কামনা বিবেকানলে পুড়িয়া ভস্মাবশেষ না হয়, তাবৎ কেহই প্রকৃত সন্ন্যাসী নামের যোগ্য নহেন। সংসার-বিরক্ত চিরকুমারদিগের চিত্তই অধিক পরিমাণে কলুষিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে অবস্থান করত ভগবৎপ্রেম সাধন করাই কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী সাজিলেই চিত্ত কামনা-রহিত হয় না, বরং অধিক ত্যাগাভিমানীদিগের চিত্তই অধিক আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "বেশী ত্যাগী হইও না, অধিক ত্যাগী হইলে শেষে কৃষ্ণ ত্যাগ হইয়া বসে।" বাস্তবিক কথাটি বড়ই মূল্যবান্। এই যে আধুনিক বৈরাগিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিসহ এক একটি মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতেছেন, ইহা কি প্রশংসার বিষয়? ইহা অপেক্ষা সংসারাশ্রমে থাকিয়া

সাংসারিক সুখ সকল উপভোগ সহ ভগবন্নাম গ্রহণ কি অধিক প্রশংসার নহে? ফল পাকিলেই আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, বৃন্ত খসাইবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। তদ্রূপ জীব-হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাতে ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞানোদয় হইয়া মায়া বন্ধন বিদূরিত হয়। "গুরু অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে"। অতএব তজ্জন্য দৌড়াইয়া গাছ তলায় যাইতে হইবে এরূপ কোন বিধি নাই। সংসারে থাকিয়া শান্তি লাভ করিতে হইলে অহিংসা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিঃস্বার্থতা, দয়া, মমতা, ক্ষমা, পরদুঃখ-কাতরতা, পরলোকে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মনীতির অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলিয়া থাকেন জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার চলে না। ইহা অতি ভ্রমাত্মক কথা। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণচ।
অহিংসয়াচ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

মনু। ৬—৬০।

মনুর মতে ইন্দ্রিয় সকল দমন, রাগ ও দ্বেষ বিনাশন এবং অহিংসা দ্বারা জীব সকল অমৃতত্ব লাভ করে। সংসার পালনের জন্য অজিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, ইহা কোনও শাস্ত্রে লেখা নাই। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, তবে বড়ই বিষময় হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি"।

ভীষ্মপর্ব্ব।

সমুদ্রে প্রবল বায়ু দ্বারা যেমন নৌকা জলমগ্ন হয়, সেইরূপ যে মন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। অতএব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সংসার পালন করিতে না পারিলে সংসার অশান্তি-ময় ও সেই অশান্তির তীব্র তাপে জীবন দগ্ধ হইয়া থাকে।

সংসারেই জীবের শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রেমের অবতার শ্রী গৌরাঙ্গ—চির অবৌধত নিত্যানন্দকে দারপরিগ্রহ করাইয়া সংসারী করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে সংসারই যদি শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তবে শ্রী গৌরাঙ্গ নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন? শ্রী গৌরাঙ্গ নিজের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, জীবকে হরিনাম বিতরণের জন্য তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল। রূপ সনাতন প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও নিজের জন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ তৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অস্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাহারও দ্বারা লুপ্ত তীর্থোদ্ধার, কাহারও দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হইয়াছিল এবং সন্ন্যাস জীবনে মহা প্রভু স্বয়ং সংসার-বিরাগী সাধকদিগের আদর্শরূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। নচেৎ তিনি সংসার ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন

না, বরং ধর্ম্মার্থীদিগকে সংসারে থাকিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বারান্তরে সংসারীদিগের কর্ত্তব্য বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আনি বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতি-পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বিলাতের এক খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী থাকিয়া ক্রমে কিরূপে ব্রহ্মবাদিনী হইলেন, তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই অসাধারণ, বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ইংরাজরমণী হিন্দুজাতির সহিত একাত্মা ও একপ্রাণ হইয়াছেন এবং এই পতিত জাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও উন্নতির সহায়তা বিধানার্থ কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। ‘বিদ্যা সকল উন্নতির মূল, ইহা অনুভব করিয়া ইনি একটী আদর্শ মহাবিদ্যালয় স্থাপনার্থ উদ্যোগিনী হইয়াছেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতার টাউনহলে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির সম্মুখে ইনি এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তৎশ্রবণে আমরা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইলে ভারতের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দুমাত্রেরই ইঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া এবং প্রাণপণে ইহাঁর কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আনি বেসাণ্ট কাশী মহানগরে একটী আদর্শ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশীর মহারাজা ইহার জন্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের এক বৃহৎ বাটী দান করিয়াছেন। ইহার জন্য একটী ফণ্ড সংস্থাপনার্থ অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। আনি বেসাণ্ট টাউন হলের বক্তৃতাতে বলেন কাশীতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে ইহা হিন্দু জাতির একটী অতি প্রাচীন ও প্রধান তীর্থ স্থান; এখানকার বিদ্যালয় সকল হিন্দুরই সহানুভূতি, আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইবে; আর এই বিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। বিবি বেসাণ্টের শিক্ষার আদর্শ অতি উচ্চ ও উদার। তিনি মানব-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শিক্ষা দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল হইবে এবং মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সমঞ্জস ভাবে সাধিত হইবে। ইনি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র সকল হইতে সাধু দৃষ্টান্ত সকল সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দানে প্রয়াসী, কিন্তু কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক হিন্দুমত শিক্ষা দিবেন না।

যে সকল মত সকল শ্রেণীর হিন্দুর আদরণীয় ও গ্রাহ্য, সেই অসাম্প্রদায়িক সাধারণ হিন্দু মত ও ভাব সকল এবং হিন্দু সদাচার সকল তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পরম হিতৈষিণী ইংরাজরমণীর শুভানুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের নিকট ইহাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধির প্রার্থনা করিতেছি।

আনি বেসাণ্টের অভ্যর্থনার্থ কবিবর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় যে অভিনন্দন-কবিতা রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সাদরে প্রকটিত করিলাম।

জয়

তারা ব্রহ্মময়ী মা

কল্যাণী শ্রীমতী আনি-বেশান্ত-দেবী

করকমলেষু।

আশাজ্যোতিস্ত্বমসি খলু নো ঘোরদুঃখান্ধকারে
মাতর্বন্দ্যে সকলজগতামানি-বেশান্ত-দেবি!
শক্তিঃ সাক্ষান্মৃতজনগণোজ্জীবনী পাবনী ত্বং
সৃষ্টা নূনং সদয়বিধিনা ভারতোজ্জীবনায়॥ ১॥

মা বিশ্বপূজ্যে দেবি! আনি-বেশান্ত! আমাদের গভীর দুঃখময় অন্ধকারে তুমি আশরূপ আলোক। বিধাতা আমাদের উপর সদয় হইয়াছেন, তাই তিনি এই মৃত ভারতকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য মৃতসঞ্জীবনী লোকপাবনী সাক্ষাৎ মহাশক্তি—তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ১

জাতা বংশে ত্রিদশমহিতে পূর্ব্বজন্মন্যভূস্ত্বং
ব্রহ্মর্ষীণাং ধরসি হি ততঃ পাবনং ব্রহ্মতেজঃ।
নো চেদুদ্ঘোষয়সি নু কথং দেবি দেবর্ষিগীতং
পূণ্যং লোকেঽখিলনরগতিং শাশ্বতং ধর্ম্মতত্ত্বম্॥২॥

হে দেবি! তুমি পূর্ব্বজন্মে দেবগণ-পূজিত ব্রহ্মর্ষি-কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলে, সেই জন্যই তুমি জগৎপাবন ব্রহ্মতেজ ধারণ কবিতেছ; নহিলে, দেবর্ষিগণ যাহার মহিমা গান করিয়াছেন, সেই অখিলজীব-নিস্তারণ, সনাতন, পাবন, ধর্ম্মতত্ত্ব তুমি কিরূপে বিঘোষিত করিতেছ?। ২।

সাক্ষাদ্ বাণী ত্বমসি বদনস্যন্দিতা বাক্সুধাস্তে
শ্রোতুস্তেজঃ কিমপি হৃদয়ে সদ্য উদ্দীপয়ন্তি।
ক্ষীণেঽপ্যাশার্চ্চিষি বত চিরং ভারতাভ্যুন্নতেস্তত্
চিত্তে চিত্তে জ্বলতি বচনৈর্ভূয়এব ত্বদীয়ৈঃ॥ ৩॥

মা! তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী, তোমার মুখচন্দ্র-বিনির্গত অপূর্ব্ব বচনসুধা শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ কি এক অনির্ব্বচনীয় তেজ উদ্দীপিত করে! এ ভারত যে আবার সেই মহতী সমুন্নতি লাভ করিবে, আমাদের সে আশা প্রায় নির্ব্বাণ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার তেজোময় বাক্যে, সে আশা প্রত্যেকের হৃদয়ে আবার প্রদীপ্ত হইতেছে। ৩।

শিক্ষাবীজং জনগণহিতায়ার্য্যবিদ্যালয়াখ্যং
কাশীক্ষেত্রে বপসি যদহো সর্ব্বতীর্থোত্তমে ত্বম্।
তস্মাজ্জাতঃ শিবময়মহাপাদপো ব্যাপ্য বিশ্বং
কীর্ত্তিস্তম্ভস্তব হি ভবিতা ভাস্বরোঽনশ্বরশ্চ॥ ৪॥

অহো! তুমি ভারতবাসী আর্য্যসন্তান-গণের মহোপকারের জন্য, সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীক্ষেত্রে হিন্দুকলেজ নামে যে সুশিক্ষা-বীজ বপন করিতেছ, সেই বীজ-সম্ভূত মঙ্গলময় মহাবৃক্ষ অচিরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, তোমার জাজ্বল্যমান

ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে পরিণত হইবে। ৪।

ভিন্নাচারা পরবিষয়জা ভিন্নভাষা বিজাতি-
র্যোষাহপ্যস্মজ্জনপদহিতে চেষ্টসেহশ্রান্তযত্না।
চিত্রং চিত্রং বয়মবিরতং বোধ্যমানাস্ত্বয়া যৎ
নোত্তিষ্ঠামোহশুভময়মহামোহতল্পাদ্ ধিগস্মান্ ॥ ৫ ॥

তুমি বিজাতীয়া ও বিদেশীয়া, তোমার বর্ণ, ভাষা আচার, প্রকৃতি, এ দেশীয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও এবং তুমি নারী হইয়াও, আমাদের দেশের মঙ্গলার্থে অবিশ্রান্ত যত্ন করিতেছ। তুমি আমাদিগকে স্বকর্ত্তব্য সাধনের জন্য নিরন্তর জাগরিত করিলেও, আমরা অশুভময় মোহ-শয্যা হইতে উত্থিত হইতেছি না। অহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমাদিগকে ধিক্। ৫।

মন্যেহস্মাকং ক্ষয়মুপগতা তামসী দুঃখরাত্রিঃ
কল্যাণি ত্বং নবরবিবিভেবোদিতা ভারতে তৎ।
হংহো লোকা ন খলু ভবতামেষ মৌনস্য কাল-
স্তামুদ্ধর্ত্তুং ত্রিভুবননুতামার্য্যকীর্ত্তিং যতধ্বম্ ॥ ৬ ॥

আমাদের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না দুঃখ-রজনীর বুঝি অবসান হইল; হে কল্যাণি! তাই তুমি ভারতাকাশে অরুণালোকের ন্যায় উদিত হইয়াছ। হে লোকবৃন্দ! তোমাদের এ সময় নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার সময় নহে। প্রাচীন আর্য্যজাতির সেই ত্রিভুবনধন্য গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য তোমরা উত্থিত হও। ৬।

আচণ্ডালাখিলজনগণান্ বালবৃদ্ধাবলাদীন্
যাচে সর্ব্বান্ ধনবদধনজ্ঞানিমূর্খান্ নতোহহম্।
বিত্তৈশ্চিত্তৈস্তনুভিরসুভিশ্চাপি যূয়ং সমন্তাৎ
সাহায্যং ভোঃ কুরুত মিলিতা আনি-বেশান্ত-দেব্যাঃ ॥ ৭

এ দেশের জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত--বালক, বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ, রমণী—সমস্ত লোককে আমি নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি,—তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবী আনি-বেশান্তের সহায়তার জন্য—ধন, মন, দেহ ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ কর। ৭।

ন স্যাদীদৃক্ পুনরবসরঃ সার্থকীকর্ত্তুমর্থং
ভূয়োভূয়ঃ করুণবচনৈঃ প্রাঞ্জলির্বো বদামি।
আস্তে কাচিদ্ যদি হি মমতা লুপ্তভাগ্যে স্বদেশে
মা মা যূয়ং শুভমবসরং ব্যর্থমেতং কুরুধ্বম্ ॥ ৮॥

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে বার বার তোমাদিগকে বলিতেছি,--তোমরা নিজ নিজ অর্থ সার্থক করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। এই বিলুপ্ত-ভাগ্য জন্মভূমির প্রতি তোমাদের যদি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, তবে তোমরা এমন দুর্লভ সুযোগ ব্যর্থ করিও না। ৮।

বিদ্যাহদ্য সা ব্যপগতা বিগতং যশস্তৎ
তন্নামশেষমধুনা সুকৃতং চ বীর্য্যম্।
দৃষ্ট্বা শ্মশানমিব শোচ্যমশেষদেশ-
মদ্যাপি হা কথমুদেতি ন চেতনা বঃ ॥ ৯ ॥

হায়! আমাদের সে বিদ্যা ও সে কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে! আমাদের সে পৌরুষ ও সে পুণ্য এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত! সমস্ত ভারতবর্ষ আজি শ্মশানের ন্যায় শোচনীয়! জন্মভূমির এ দশা দেখিয়াও অদ্যাপি তোমাদের চেতনা হইল না!। ৯।

সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা বিভবা ভবেহস্মিন্
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুচলস্বভাবাঃ।

পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো-
নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোহস্তি পুণ্যম্ ॥ ১০ ॥

এ সংসারে ধন-সম্পদের শোভা, সান্ধ্য মেঘের শোভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; মনুষ্য-জীবন, তৃণাগ্র-লগ্ন বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল। পুণ্যই মানবের ইহকালের ও পরকালের একমাত্র বন্ধু; স্বদেশের হিতসাধনের ন্যায় মহাপুণ্য আর কিছুই নাই। ১০।

পুরা যা ভূরেকাহখিলভুবনশিক্ষাগুরুরভূৎ
পথভ্রষ্টা সেয়ং প্রলয়জলরাশিং প্রবিশতি।
অয়ে তারে মাতঃ পতিতজননিস্তারিণি শিবে!
পুমার্য্যাণাং ভূমাবিহ বিতর কারুণ্যকণিকাম্ ॥ ১১ ॥

* ॥"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ॥*

যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে নিখিল জগতের ধর্ম্ম-শিক্ষার অদ্বিতীয় গুরু ছিল, আজি সেই মহাদেশ আচার-ভ্রষ্ট হইয়া প্রলয়-সাগরের অতল সলিলে নিমগ্ন হইতেছে! মা গো! তারা ব্রহ্মময়ি! পতিত-নিস্তারিণি! সর্ব্বমঙ্গলা! তুমি এই আর্য্যভূমির উপর তোমার একবিন্দু কৃপা বিতরণ কর। ১১।

মুদ্রা-স্তোত্র।

হে শুভ্রবর্ণ রাজ্ঞী-মুখাঙ্কিত সাল সুশোভিত মুদ্রে! তোমায় নমস্কার। তুমি গঠনে ক্ষুদ্র হইলেও বিক্রমে বিক্রমাদিত্য অপেক্ষা বলীয়ান্, দীপ্তিতে দিবাকর অপেক্ষাও তেজোময়। ভূপতিগণ তোমার পূজা করে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তোমার আরাধনা এবং কৃষক তোমার চরণ সেবা করে। তুমি ধন্য! হে জগৎ-বিমুগ্ধকারী রজত-কান্তি টাকা, আপন বীণাবিনিন্দিত মধুর-স্বরে ত্রিভুবন ভুলাইয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রলোভন দেখাইয়া দেশ দেশান্তর হইতে কত পঙ্গপাল আনিয়া ভারতক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছ। হে মনোমোহন সংসার-স্থিতি-বন্ধ-হেতু ক্ষুদ্রাবয়ব টাকা, তোমাকে নমস্কার।

হে বহুরূপী রজত-খণ্ড, তুমি কখন আপন স্বাভাবিক ধাতুতে অবস্থিতি কর, কখন কাগজরূপী হইয়া আবির্ভূত হও এবং কখনও সুন্দর সুবর্ণদেহে রূপান্তরিত হইয়া থাক। হে বহুমূর্ত্তে! তোমায় নমস্কার। অপর শ্রেণীর ব্যক্তি অপেক্ষা বণিক্ তোমার বিশেষ ভক্ত বলিয়া তাহাদিগের গৃহে তোমার গতিবিধি ঘন ঘন হইয়া থাকে। বাণিজ্য তোমার ঐশ্বর্য্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। তুমি বাণিজ্যের খাতিরে জলে জাহাজ ভাসাইয়াছ, স্থলে তাড়িতের তার দোলাইয়াছ এবং লৌহবর্ত্মে বাষ্পরথ ইঙ্গিতে ছুটাইতেছ। হে বাণিজ্যবর্দ্ধয়িত্রী সৌভাগ্য-লক্ষ্মী টাকা, তোমায় নমস্কার।

তুমি কাহাকেও হাসাইয়া থাক, কাহাকেও কাঁদাইয়া থাক, কাহাদিগের মধ্যে

আত্মীয়তার সূত্রপাত কর, কাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ রোপণ কর। হে মায়াময়! তোমার মায়া বুঝে সাধ্য কার? তুমি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইয়া থাক এবং বৃক্ষতলবাসী মোছাফেরকেও ছিন্ন কন্থায় শয়ন করাইয়া তোমার লক্ষাবয়বের স্বপ্ন দেখাইয়া উচ্চ সৌধ শিখরে তুলিতে পার। তুমি সাগরকে গোষ্পদ, হস্তীকে মশক, এবং ধরাকে সরা মনে করাইতে পার। অতএব হে মায়াবী বহুরঙ্গ-রূপী টাকা, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

হে অধমতারণ পতিত পাবন, তুমি যাহাকে স্পর্শ কর, তাহার পাপ-রাশি বিদূরিত হইয়া যায়, তাহার কীর্ত্তি-মেখলায় বসুধা বেষ্টিত হইয়া পড়ে এবং সে গোজন্ম হইতে মনুষ্য জীবন, মনুষ্য জীবন হইতে দেবজীবনে আরূঢ় হয়। স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, শিশুহত্যা পিতৃমাতৃহত্যা, শত মহাপাতকের পাতকী হইলেও তোমার প্রভাবে মানব ত্রিভুবনপূজ্য হয়। হে মহাপাতকনাশন, মহাযশা ও পুণ্যকীর্ত্তি-ধ্বজ মুদ্রা, তোমাকে নমস্কার!

হে কল্পতরু, কামরূপ তোমার মন্দি-রের দুয়ারে কতশত লোক অহরহ হত্যা দিতেছে। হায়! অনাহারে কত জনের দেহে অস্থিচর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুমি কাহার প্রতি প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বরদানে তাহার অভীষ্ট সাধন করিতেছ এবং কাহার প্রতি বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে চক্ষুর জলে ভাসাইতেছ। সকলি তোমার লীলা! হে লীলাময়, তোমাকে নমস্কার।

তুমি আমেরিকায় সিলবর কিং, বিলাতে রথচাইল্ড এবং কলিকাতায় এজরা ও গব্বয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।

তুমি সংসার আবর্ত্তে যাহাকে রাখ, সেই থাকে; যাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় তলাইয়া যায়। যাহাকে রাখ, তাহার জন্য কত নূতন খেয়ালের সৃষ্টি কর, তাহাকে কত নব নব সুখ সম্পদের অধিকারী কর। তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় সকলি করিতে পার—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল তোমাতে, তুমি একে তিন, তিনে এক। অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! তোমায় নমস্কার।

তুমি নব্য অপরিণামদর্শী যুবকের হস্তে যাইলে সে সরলপ্রাণ বয়স্যদিগের মজ-লিসে তোমার প্রতি যথেচ্ছাচার করিয়া তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। তুমি তখন মৃদুমধুর হাস্যে তাহাকে নানা ঐহিক সুখে বিভোর করিয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য করিয়া তোল। সে ক্রমশ সুখের কুসুম-শয্যায় গড়াইতে গড়াইতে উৎসেদের নরককুণ্ডে আসিয়া পড়ে। তুমি তখন তাহাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাও। অতএব হে যুবজনসুলভ বিলাসবিধাতা, সংসার রঙ্গ-ক্ষেত্রের রঙ্গপ্রদাতা, তোমায় নমস্কার।

তোমার জন্য কত শত লোক ব্যতি-ব্যস্ত, তাহা কে বলিতে পারে? বারিষ্টর,

উকিল, মোক্তার তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিবার জন্য নানা বাক্‌পটুতায় তর্কজাল বিস্তার করিতেছেন, ডাক্তার রোগীদিগের বাটীর দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, ইঞ্জিনিয়ার কাদা ধূলা মাখিতেছেন, বণিক্ দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই তোমার জন্য লালায়িত। অতএব হে সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত টাকা, তোমায় নমস্কার।

হে অনাথের নাথ কাঙ্গালের গতি, পতিতপাবন, দীনবন্ধো, তোমায় নমস্কার। তোমার বিরহে সুখের ঘরে দুঃখের বাসা, হাসির মুখে বিষাদের রেখা, আনন্দের সংসারে নিরানন্দের মেঘ, উৎ-সাহের উৎসে নিরুৎসাহের আবিলতা, সুস্থশরীরে ব্যাধির মন্দির, সাহসের পদে ভয়ের সঞ্চার—এই সমস্তই ঘটিয়া থাকে, অতএব হে সংসারবন্ধো দীনতারণ, তোমায় নমস্কার।

তুমি সর্ব্বকাল সর্ব্বস্থানে বিরাজমান। লোকে জাগ্রত ও স্বপনে তোমায় ভাবিয়া থাকে ও তোমার সেবা করে। অতীত কাল তোমার জন্য লালায়িত, বর্ত্তমান তোমার জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং ভবিষ্যৎ তোমার জন্য চিন্তিত। হে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালাধিপতি মুদ্রে তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

রথ বা মহাবোধিমহোৎসব।

রথ এ দেশের প্রধান উৎসব। এ পর্ব্বোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের উল্লাসের সীমা থাকে না। কিন্তু রথযাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনেকেই অবগত নহেন। এই হেতু এ প্রস্তাব তাঁহাদের আলোচ্য হইবে সন্দেহ নাই। রথের অর্থে শরীর, ইহাতে যানও বুঝায়, যাত্রা অর্থাৎ উৎসব। শরীরোৎসব রথ যাত্রার প্রকৃতার্থ; গাড়ী টানা পর্ব্ব মনে করা উচিত নহে। বিবিধ চিত্রবিলেখিত, "সপ্তরত্ন" সমন্বিত, তুঙ্গ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট সচক্র যানই রথ। রথযাত্রা ঐতি-হাসিক ব্যাপার, পৌরাণিক কল্পনা নহে।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাসংযুতা,
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মা ভদ্রয়াসহ।"

পুরুষোত্তম তত্ত্ব।

আষাঢ়ীয় শুক্ল দ্বিতীয়াবধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত রথোৎসব হয়। ইহার কারণ কি? জগন্নাথ দেবের অস্পষ্ট আকৃতি কেন? রথস্থ ত্রিমূর্ত্তির অর্থ কি? বস্তুত রথ-যাত্রার ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বঙ্গ দেশে সাধারণত রথসম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস পুরাণ শাস্ত্রানুগত। পৌরাণিক প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক ও নীতিপ্রদ হইলেও ইহাকে সর্ব্বতঃ ঐতিহাসিক বর্ণনা বলা যাইতে পারে না। এইজন্য রথযাত্রা সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও কল্পনা ও মিথ্যার আবরণে ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত উৎকল খণ্ডে এই পৌরাণিক উপাখ্যান উক্ত আছে।

একদা নৈমিষারণ্যে* মুনিগণ জৈমিনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনে! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, সকল তীর্থমাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত আছেন। সকল তীর্থের সার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ভগবান্ কিরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।" জৈমিনি বলিলেন, "আমি মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবার জন্য মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। লোকনাথ মহাদেব শিখি-বাহনের নিকট যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, ষড়ানন দেবসভায় তাহা বলিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন সুন্দর কথা তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ সূর্য্যবংশ সমুৎপন্ন অবন্তীর অধিপতি পরম ধার্ম্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি একদা ইষ্ট দেবের পূজা করিবার জন্য বিষ্ণু মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাজপুরোহিত ও নানা তীর্থবাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতকে সম্ভাষণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! চর্ম্ম চক্ষুতে শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি, এমন পুণ্যতম মহাতীর্থ কোথায় অবস্থিত? পুরোহিত সমাগত তীর্থ-বাসী পণ্ডিত-গণকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র এক সুবক্তা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি বাল্যকালাবধি বহু তীর্থের ইতিবৃত্ত অবগত হইয়াছি। ভারত দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্ত্তী ওড্র নামে প্রসিদ্ধ দেশ আছে, নীলমাধব তথায় অবস্থিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে ঐ স্থান ভগবানের বপুস্বরূপ। ধরাধামে এমন তীর্থ আর নাই। রাজা পুরোহিত বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের অনুসন্ধান জন্য ওড্র দেশে প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি বহুদেশ ভ্রমণ করত এক নির্জন অরণ্যময় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় ব্যাধগণের আবাস ছিল। সেই স্থানে বিশ্বাবসু নামে বৃদ্ধ শবর-পতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

"যত্রাস্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবরদীপনঃ।
পশ্চিমস্যাং দিশি বিভো বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ।
দদর্শ শবরাগারং বেষ্টিতং সর্ব্বতো দ্বিজৈঃ।
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পড়িতাঙ্গকঃ।
ইত্যাদি।

সেই বৃদ্ধ ব্যাধ ব্রাহ্মণ দর্শনে অতিমাত্র পুলকিত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন করত যথোচিত আতিথ্য সৎকার করিল। বিদ্যাপতি শবর-পতিকে কহিলেন:—আমি নীল-মাধব মূর্ত্তি দর্শনার্থ বহুক্লেশ সহকারে এস্থানে উপনীত হইয়াছি। যদি সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি, তবেই গৃহে প্রত্যা-গমন করিব, নতুবা এ প্রাণ আর রাখিব না। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের মন্দিরে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে এক সঙ্কীর্ণ পথে ব্রাহ্মণকে লইয়া চলিল।

তস্মাৎ একপদী মার্গো যেন বিষ্ণ্বালয়ং ব্রজেৎ।
যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।"
উৎকলখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

*নিমিষান্তর মাত্রেণ নিহিতং আসুরং বলং
যত্র ততস্তৎ নৈমিষঃ অরণ্যমিতি। নারদকল্পদ্রুম।

অনন্তর বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া ওড্র দেশে গমন-পূর্ব্বক তথায় এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাবসানে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিলেন" রাজন্! ভারত মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক আশ্চর্য্য তরু উপনীত হইয়াছে। উহা অতীব বিস্ময়জনক। ঐ বৃক্ষ সূর্য্যের ন্যায় মহা তেজস্বী, উহার সৌগন্ধে সমুদ্র-কূল আমোদিত করিয়াছে। এরূপ আশ্চর্য্য তরু কেহ কখনও দর্শন করে নাই। বোধ হয় উহা দেবতরু। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে ঐ বৃক্ষ এ স্থানে সমাগত হইয়াছে। রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্? ঐ মহাবৃক্ষ কি নিমিত্ত এ স্থানে উপনীত হইয়াছে?" নারদ কহিলেন, নরদেব! ইহা আপনার পরম সৌভাগ্যসূচক। স্বপ্নে যে মহাজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, ইনিই সেই ভবভয়াপহারী,* আপনার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলস্বরূপ পরম করুণাপূর্ণ স্বয়ং বিধাতা দারু শরীর ধারণ করিয়াছেন। উহাতে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন চক্র নির্ম্মিত হইবে। ঐ মূর্ত্তি দর্শনে মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। রাজা বলিলেন, ঐ মূর্ত্তি চতুষ্টয় কে নির্ম্মাণ করিবে? ঐ সময়ে দৈববাণী হইল, এক বৃদ্ধ সূত্রধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইবে। দৈববাণী সফল হইল। বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশ ধারণ করত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও অচিন্তনীয় জ্ঞানরূপী সুদর্শন চক্র* এবং সিদ্ধ ও অমর-বৃন্দ-শোভিত রথ নির্ম্মাণ করিলেন। জগন্নাথ ও রথের উৎপত্তি এই-রূপ স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টা-বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত পুরুষোত্তম তত্ত্বে বলিয়াছেন,

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষং।"
ইহার সাংখ্যায়ণ ভাষ্য।

"আদৌ বিপ্রকৃষ্ট দেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতা শরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং।" তীর্থকাণ্ড কল্পতরু, বামণপুরাণ, অথর্ব্ববেদ।

ভগবানের শরীর জলে ভাসিয়া আসিয়া-ছিল, পুরুষোত্তম তত্ত্বেও বলিয়াছেন।

ভগবানের শরীর ভারত মহাসমুদ্র কূলে ভাসিয়া আসিয়াছিল, এ প্রবাদ শুদ্ধ পুরাণেই আছে এমন নহে। লঙ্কার মহাবংশ নামক পালী শাস্ত্রেও ঐ কথা উল্লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে, বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণ হইবার পরে কুশি নগরস্থ মল্ল নৃপতিগণ তাঁহার শব দাহ করিয়াছিলেন। শবদাহের পর চিতা ভস্ম, অস্থি ও অঙ্গার প্রভৃতি ওজন করিয়া অষ্ট দ্রোণ অর্থাৎ ৬।৬ ছয় মণ

* উৎকল খণ্ড ১৬শ অধ্যায়।

*এ চক্রকে জ্ঞানরূপী বলিবার অভিপ্রায় কি? চক্র বুদ্ধের প্রতিরূপ, অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা।

ষোল সের হইয়াছিল।* পরে মল্ল নৃপতিগণ ঐ সমস্ত চিতাবশিষ্ট অস্থি, ভস্ম ও অঙ্গারাদি অষ্টভাগ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে লইয়া গিয়া অষ্ট স্তূপ বা চৈত্য স্থাপিত করেন।†

রামগ্রাম এবং শ্বেত দ্বীপ এই উভয় স্থান হইতে মহা শরীর ভারত মহাসাগরে নীত হয়। এই উভয় প্রবাদের কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বুদ্ধের অস্থি ও চিতাবশিষ্ট ভস্ম অঙ্গারাদির বিষয় ঐতিহাসিক, কিন্তু শ্বেত দ্বীপের শরীর বৃত্তান্ত আদৌ ইতিবৃত্তমূলক বোধ হয় না। জগন্নাথ দেব যে বিষ্ণুর শরীর শ্বেত দ্বীপের নির্ণয় না হইলে কিরূপে বিশ্বাস করিব? ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, শবর কর্ত্তৃক সেবিত নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন জন্য তিনি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নীল মাধবের আদি তত্ত্ব কি? ইংলণ্ডের অনুগ্রহে আমাদের চোক কান ফুটিতেছে, শারীরবল সঞ্চার না হউক, মাথা খেলিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ইহার বিচার করিতে পারিতেছি। নারদ সংবাদ যৎকালে রচিত হইয়াছিল, তখন রাহুল কুনাল, শুদ্ধোদন, মায়া দেবী কে? ত্রিপেটক

* ৮২ সেরে ১ দ্রোণ হয়।

† বুদ্ধের অস্থি শরীর বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রে ইহাকে ধাতুও বলে। মহাযান স্থবর্ণ প্রভাস গ্রন্থে উক্ত আছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর ঐ শরীর ভূলোক এবং দেবলোকে পূজনীয় হয়। কাথালিকেরা বলেন—

"That to revere the relics of the saints, especially their bones and hairs, is not only no superstition, but is even acceptable to God.

Beauty of the Gospels p. 310.

বৌদ্ধ মতে, বুদ্ধের অস্থির পূজা করিলে জীবনের পরম উৎকর্ষ লাভ হয়। মহারাজাধিরাজ অশোক বুদ্ধের স্তূপ হইতে পুর্ব্বোক্ত অস্থি সংগ্রহ করিয়া তদুপরি ৮৪,০০০ সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামগ্রামের স্তূপে বুদ্ধের যে সকল অস্থি ছিল, তাহা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতৎ সম্বন্ধে একটী অপুর্ব্ব গল্প আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ স্তূপ গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত ছিল। স্রোতপ্রভাবে তাহা ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হয়। গাঙ্গেয় খর স্রোতে ধাতুপাত্র বা অস্থ্যাধার পরিচালিত হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের রত্নোজ্জ্বল বেলায় নীত হইয়াছিল। সেই অস্থি হইতে পরিণামে জগন্নাথ দেবের উৎপত্তি হয়, ইহার সংশয়মাত্র নাই। উৎকলখণ্ডে বলিয়াছেন, শ্বেত দ্বীপ হইতে প্রভুর শরীর ভাসিয়া আসিয়াছে। প্রভুর শরীর শ্বেত দ্বীপে গেল কেন? মাদল পঞ্জিতে লেখা আছে নাকি? শ্বেতদ্বীপ কোথায়? পুরুষোত্তম তত্ত্বের টীকাতে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখই নাই। অগ্রে আপনারা এই দ্বীপটা কোথা স্থির করুন।

"The said stupa, which stood at Ramagamo on the bank of the Ganges by the action of the current (in fulfilment of Budha's prediction) was destroyed. The casket containing the relics being drifted into the ocean stationed itself on the point where the stream of the Ganges spread into the opposite direction on encountering the ocean on a bed of gems dazzling by the brilliancy of their rays."

Pilgrimage of Fa Heau, 215.

বস্তুটী কি? কপিলবাস্তু কোথায়? বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘের প্রকৃত অর্থ কি? এ সকল এদেশে দুজ্ঞেয় ছিল। সেই ঘোরতর অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে কৃষ্ণদাস নারদ সংবাদ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন জগন্নাথ দেব বুদ্ধেরই প্রতিরূপ। এ কিম্বদন্তির মূল কি?

"সিন্ধুতট নীলগিরিবর মধ্যে স্থাপনং।
ধন্য কীর্ত্তি ধন্য ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনং।
নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপং দেহি পদে শরণং।

নারদসংবাদ ৩৫।

নীলাচলটা তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার কারণ কি ছিল? কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

"অবশেষে অস্থি মম যে কিছু রহিবে।
ব্যাধগণে সেই অস্থি লইয়া যাইবে।
নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন।
নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব্বজন।
সেই রূপ কিছুদিন থাকিব গোপনে।
যে রূপে প্রকাশ হব শুনহ শ্রবণে।
নীল গিরি মধ্যে অতি গোপনীয় স্থান।
ভূতে রাখিল কেহ না পায় সন্ধান।

নারদ সংবাদ ২৪।

কার অস্থি কে লইয়া যায়, ভাবিয়া দেখিবেন কি? আরও দেখুন—

এত বলি নারায়ণ হলেন অন্তর্দ্ধান।
বহু যত্নে রাজা মম পাইবে সন্ধান।
যত্ন করি আমারে আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে।
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
ঐ নিম্ব বৃক্ষ ভাসি আসিবে আপনি।
সেই কাষ্ঠে চারি মূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
হেন মতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার।
হইল কহিল মুনি প্রকার তাহার।

নারদ সংবাদ ২৫।

অতঃপর—

"শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস।"

ইহাতে নীলাচলস্থ জগন্নাথ মন্দির বৌদ্ধ চৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি? উপরিউক্ত জনশ্রুতির কি বিশেষ কোনও কারণ নাই? যাহাহউক বিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা এ শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া হয়ত অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিব।

(ক্রমশঃ)

প্রভাতী

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শীতল চন্দ্রমার স্নিগ্ধ রশ্মি অভ্যুদয়ের কালে রঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রে প্রশস্ত বক্ষস্থল বিভূষিত করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "অনিল! আমিত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে যে ব্যক্তি সংসার সৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ হয়, সে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দেয়। তোমার সঙ্গী বিষ্ণুপদ এখন সংসার হইতে অনেক দূরে গিয়াছে। সে যে স্থলে গিয়াছে, সে স্থলে সুখের মেলা, দেবতার খেলা। সেখানে কেবল পুণ্যের সরোবরে শান্তির স্রোত প্রবাহিত। বাছা দীর্ঘজীবী হউক।

অনিল কোন কথা কহিল না। তখন প্রভাতীর ইচ্ছায়, অনুরোধে ও আয়োজনে সন্ন্যাসী অনিলের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। স্বামীর সহিত মধুমতীর বিবাহ হইয়া গেলে প্রভাতীর সেই বিষাদক্লিষ্ট গম্ভীর মুখের উপরে একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কেন? তখন কি তাহার মনে এই বলিয়া গর্ব্ব হইয়াছিল যে সে অন্যের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য স্বামীরত্ন দান করিতে পারিয়াছে এবং স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এক সতিনী ঘরে আনিতে পারিয়াছে? না, তাহা নয়। স্বামীর পাশে মধুমতীকে দেখিয়া তাহার মনে একটু সুখের উদয় হইয়াছিল যে আজ প্রাণের সাথী মধুমতীর চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল এবং প্রাণের প্রিয়তম স্বামীর মনোদুঃখও আজ দূর হইল। তখন প্রভাতী হৈমন্তিক প্রভাতবায়ু-বিকম্পিত পদ্মফুলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর হস্ত ধরিয়া মধুমতীর হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল "মধুমতি সখি! তুমিই যথার্থ নারীজন্ম ধারণ করিয়াছিলে।" এই কথাটি প্রভাতী পূর্ব্বেও একদিন মধুমতীকে বলিয়াছিল। বস্তুতঃ সে শৈশব কাল অবধিই মধুমতীকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত। তারপর স্বামীর পদধূলি লইয়া প্রভাতী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়কালে যদিও তাহার চক্ষুযুগল অশ্রুশূন্য ছিল, তথাপি তাহার প্রাণের ভিতরটা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় তোলাপাড়া করিতেছিল। বিদায় লইয়া যাইবার সময় প্রভাতী অনিল ও মধুমতীকে বলিয়া গেল 'তোমরা এখন থাক, তোমাদের আপাততঃ যাইয়া কাজ নাই, কারণ তোমাদের বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে। তোমরা দুইজন দুই বিভিন্ন জাতি, এখন হঠাৎ ইহা প্রকাশ হইলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। আমি সময় বুঝিয়া জানাইব, তখন তোমরা দেশে ফিরিও।

অনিল কোনও কথা কহিল না। তখন তাহার কথা কহিবার শক্তিও ছিল না। কিন্তু মধুমতীর মলিন মুখের উপর একটী নিদারুণ ক্লেশের ছায়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখ খানিকে আরও সুন্দর— আরও মধুর করিয়া তুলিল। গোলাপ ফুল যেমন দল বিকশিত করে, মধুমতীও তদ্রূপ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সখীর কণ্ঠালিঙ্গন করিতে চাহিল। কিন্তু প্রভাতী স্বামীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল, প্রাণের মধ্যে দারুণ অভাব অনুভব করিতে লাগিল। যেন আজ নিতান্ত

বিপন্ন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত নিরাশ্রয়। প্রভাতী প্রাণের শান্তি হারাইয়া শান্তি-ময়কে ডাকিতে ডাকিতে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপনীত হইল। সন্ন্যাসী তৎকালে ধ্যানমগ্ন ছিলেন না, প্রভাতীকে দেখিয়া কহিলেন "আজ তোমাকে এত উতলা দেখিতেছি কেন মা?"

প্রভাতী কথা কহিল না। সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন "নারীর পাতিব্রত্যধর্ম্ম উজ্জল অলঙ্কার। পতি-সেবাজনিত যে ধর্ম্ম, তাহাই অক্ষয়। কিন্তু স্বামীত চির কালের জন্য নয়, স্বামী-ধনত নশ্বর, ইচ্ছা করিলে বিধাতা আজই তোমার নিকট হইতে এ ধন কাড়িয়া লইতে পারেন। অতএব এ নশ্বর ধন দ্বারা যে তুমি অন্যের সুখ সম্পাদন করিতে পারিয়াছ, এ তোমার পক্ষে অতি সুখের হইয়াছে, তবে আজ তোমাকে এত উতলা দেখিতেছি কেন মা?"

প্রভাতী। হাঁ বাবা, তুমি যাহা বল্‌ছ, সে সবি সত্য। আমি আজ তোমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতে এসেছি। তুমি আমাকে কিছু ধর্ম্ম কথা শুনাও।

সন্ন্যাসী। কি শুনিবে তুমি মা?

প্রভাতী। এই পৃথিবীর বৃহৎ হইতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র সকলি কি অনন্তের অনুগৃহীত?

সন্ন্যাসী। হাঁ, তিনি সকলেরই স্নেহ-ময় পিতা।

প্রভাতী। সকল কথার পূর্ব্বে আমাকে বল পাপীজন এবং পুণ্যবান্ সকলেই কি তাঁহার অঙ্ক-অধিকারী?

সন্ন্যাসী। হাঁ, তিনি সকলেরই মুক্তি-দাতা।

প্রভাতী। এই সৃষ্টি কিরূপে হইল তাহা আমি জানিতে চাই, এবং কবেই বা লয় হইবে এবং লয় হইবে কি না হইবে, তাহা অধীনীর নিকট বর্ণনা কর।

সন্ন্যাসী। অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেব মানবের সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদয় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়-শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ-প্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। শ্রবণ কর মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না। কেবল প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন। তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের জননীস্বরূপ। অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উদয় হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি

করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ কল্পিত হইল।"

তখন সন্ন্যাসীর কথায় বাধা দিয়া প্রভাতী যোড়হাত করিয়া কহিল, "প্রভু! দাসীর ধৃষ্টতা মাপ কর। আমি আর এ সব কিছুই শুনিতে চাই না। এ সব শুনিয়া আমার কিছু ফল নাই—শান্তি নাই। প্রভু! ছোট বেলা হইতে ত শুনিয়া আসিতেছি বার বৎসরে এক যুগ উত্তীর্ণ হয়, তাই কি সত্য যুগের সময় বিভাগ? আমার নিকট বর্ণনা করিয়া কৌতূহল নিবারণ কর।"

সন্ন্যাসী। যে সময় সমস্ত পুরাণ ধর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হয়, সমস্ত পুরাণ মানবের ধ্বংস হয়, সমস্ত পুরাণ দ্রব্যের ক্ষয় হয়, পূর্ব্বের কিছুই থাকে না, সমস্তই নূতন হইয়া দাঁড়ায়, সেই সময়কে এক যুগ অন্তে অন্য যুগ আসিয়াছে কহে অর্থাৎ সময়ের ঘোর পরিবর্ত্তনকে যুগান্ত কহে।

প্রভাতী। পঞ্চভূত কি কি?

সন্ন্যাসী। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

প্রভাতী। না, এ সব জানিয়া আমার শান্তি নাই। আমায় বিদায় দিন্।

সন্ন্যাসী। মা তুমি মর্ত্ত্যলোকের মানবী হইয়া স্বর্গলোকের দেবীর ন্যায় কাজ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্ব দুঃখ ও অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

প্রভাতী। প্রভু, আমি কেমন করিয়া এ সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব?

সন্ন্যাসী। তাহা আমি কহিব না, ভগবান্ ইহার নিরাকরণ করিবেন। যাও তুমি বৎসে! এই পর্ব্বতের একটী গহ্বর-অভ্যন্তরে একজন পক্বকেশা বৃদ্ধার দেখা পাইবে। তাহার কাছে যাও, তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন।

প্রভাতী সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় ও বরালিকার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল।

পথিমধ্যে সে এত বিহ্বল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অবশেষে তাহাকে সেই বৃদ্ধা দেবীর অঙ্কশায়িনী হইতে হইয়াছিল।

আমার ভ্রমর।*

১

আমার ভ্রমর—
তোমরা ভেব না কালো,
সে যে আঁধারের আলো,
পারিজাতে শুয়ে ছিল রাঙা মধুকর,
কে জানে কি ভালবেসে,

*ভ্রমর—পাঁচ মাসের শিশু।

মরতে পড়েছে এসে,
পুষেছি গরিব আমি প্রাণের ভিতর;
"কালামুখো অলি" নহে আমার ভ্রমর।

২

আমার ভ্রমর—
মন্দার পাতিয়া কোল,
সদা তারে দি'ত দোল,
মুছা'ত গায়ের ঘাম নিজে শশধর,
সমীরণ চুপে চুপে,
ঘুম দিত কোনরূপে,
স্বরগ-পাপিয়া তারে শিখাইত স্বর,
সেই আদরের ধন, আমার ভ্রমর।

৩

আমার ভ্রমর—
মোর সে অমূল নিধি,
হাসি'তে গড়িলা বিধি,
তাই সে যে হাসি-মাখা আছে নিরন্তর,
চাঁদের সুধার সম,
তার হাসি মনোরম,
তা' দেখি বিভল হয় মানব-অন্তর,
সোণার পুতুল মোর সাধের ভ্রমর।

৪

আমার ভ্রমর—
সবারি আশীষ চায়,
তোমরা বলিও তায়,
থাক্ তার প্রাণ যুড়ি বিধাতার বর,
মা বাপের কোল যুড়ে,
থাক সে আনন্দপুরে,
সিত পক্ষ শশি-সম হোক নিরন্তর;
জগত হৃদয় খুলে—
—তার শিরে দিতে তুলে—
স্নেহাশীষ, প্রীতিধারা—হোন অগ্রসর;
হোক সে বিভুর দাস,
পূর্ণ হোক শুভ-আশ,
সুকীর্ত্তি করুন তারে অজর অমর,
মানুষ করুন বিধি আমার "ভ্রমর"। মা।

আত্মসংযম।

(৪০৭ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

৫ম—আত্মাদর। আত্মপ্রীতি হইতেই আমাদিগের আত্মাদর প্রবৃত্তির বিকাশ। সংসারের অনেক হীনতা ও নীচতা হইতে, আত্মাদর প্রবৃত্তি মানবকে রক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির প্রকৃত আত্মাদর আছে, সে ব্যক্তি আপনাকে সহজে কোনও নীচ কার্য্যে লিপ্ত করিতে পারে না। "আমি এমন সদ্বংশে জন্মিয়াছি"—অথবা "আমি এত সুশিক্ষা পাইয়াছি"—অথবা "আমি ক্ষুদ্র হই, নীচ হই, মূর্খ হই, আমিও সেই দেবাদি-দেব ভগবানের সন্তান; আজি একটা রিপুর উত্তেজনায় আমি এত দূর জঘন্য কাজ করিব, কি করিয়া?" এইরূপ চিন্তা আমাদের জীবনের বর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে। সে কালের অর্জ্জুন হইতে একালের গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত যে কোনও মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিলে

তাঁহাদিগের আত্মাদরের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। মহত্ত্বের উপাদানস্বরূপ আত্মাদর প্রবৃত্তিকে আমরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলিতেছি এই. জন্য যে, এই প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া বিকৃত হইলেই “অহঙ্কার” নামক দুর্জ্জয় রিপু হইয়া থাকে।

অহঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিলে, আপনার বিশেষত্ব লইয়া মানব অস্থির হইয়া যায়। যে পরিমাণে নিজের রূপ, গুণ, ধন, যশ লইয়া সে উন্মত্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহার প্রকৃত অবনতি সাধিত হইতে থাকে। সকলেই জানেন, মানব-জীবন বহু ক্রটিপূর্ণ, সেই সকল ক্রটি বুঝিয়া, তাহা সংশোধন করাই মানবের উন্নতির সোপান; তাহাই মানবের মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান উপায়। ক্রটি বুঝিতে হইলে আত্মদোষানুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু যে অহঙ্কারী, সে এক-দেশ দর্শী; নিজের দোষানুসন্ধান দূরে যাউক, গুণ বা ক্ষমতার গর্ব্বেই সে মত্ত; তাহার নিজের কোনও দোষের বিষয় সে নিজেও বোঝে না, যদি অন্য কেহ— এমন কি তাহার পরম বন্ধুও সে কথা বুঝাইতে চাহে, তাহার প্রতিও খড়্গহস্ত হয়। সুতরাং তাহার ক্রটি ও দোষ সকল ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার নীচতা সাধন করে। আবার এ জগতে অহঙ্কারী ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধুবান্ধবশূন্য হয়; সে কাহাকেও নিজের “সমকক্ষ ব্যক্তি” মনে করে না; পক্ষান্তরে মানব-হৃদয় সকলকে আপনার করিতে চাহে, কিন্তু অহঙ্কারী লোককে সহানুভূতি করিতে চাহে না। অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রীতি-মমতা-শূন্য, কারণ তাহার হৃদয় পরেতে মিশিতে জানে না; অহঙ্কারী এ জগতে সুখশান্তিশূন্য, কেননা সে জগতের বাজারে আপনার গুণ বা গৌরব বেচিয়া যে অনন্যদুর্ল্লভ যশঃ কিনিতে ব্যতিব্যস্ত, তাহার কোন দিকে একটু ক্ষতি অনুভব করিলেই সে মরমে মরিয়া যায়!—আহা, অহঙ্কারী কি কৃপা-পাত্র। এমন রিপুর হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এ জগতে রূপ, ধন, যশঃ প্রভৃতি হইতে মানবের অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে। সুরূপ রূপ লইয়া অহঙ্কার করেন, সুকবি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির, সুবক্তা তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির, ধনী তাঁহার প্রভূত ধন-রাশির অহঙ্কার করেন।—যিনি যে সৌভাগ্য অধিকতর প্রাপ্ত হন, তাঁহার তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয় যে, যিনি ভগবান্ হইতে যত দূরে, তাঁহারই মনে অহঙ্কারের ভাব তত বেশী। যিনি সকল কার্য্যের ভিতরে ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, তিনি জানেন সৌন্দর্য্য, কবিত্ব, বক্তৃত্ব, ঐশ্বর্য্য এ সব কিছুই আমার নিজের আয়ত্তাধীন নহে; সেই অদৃশ্য দেবতা তাঁহারই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এই সব আমাকে দান করিয়াছেন, অতএব তাঁহারই জিনিস

লইয়া, তাঁহারই অন্যান্য সন্তানদিগকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবার আমি কে?” এইরূপ চিন্তাতেই মানবের অহঙ্কার চূর্ণ এবং মন বিনীত হইয়া থাকে।

আত্মোৎকর্ষের আলোচনা, নিজের সৌভাগ্য বা শ্রেষ্ঠতার সুখ্যাতি শ্রবণ, অহঙ্কারের সোপানস্বরূপ। অতএব সেই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া পরের গুণের প্রতি মনোযোগ করা আমাদের কর্ত্তব্য। পরের গুণের প্রতি আমরা যতই আকৃষ্ট হইতে পারিব, আমাদের অহঙ্কারের ভাবও ততই দূর হইয়া যাইবে। সেই জন্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাদিগের পুণ্যময় চরিত হইতে প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তির সদ্‌গুণ আলোচনা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, আমরা যাহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষা করি, সে ব্যক্তির এমন কোনও সদ্‌গুণ আছে, যাহাতে আমরা তাহার অনেক নিম্নতলে রহিয়া গিয়াছি। যাহা হউক এইরূপে পরের গুণ গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের গুণগ্রাহিতা শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, অহঙ্কার রিপু দূর হইয়া আত্মাদর বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, আমরা মনুষ্যত্বের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু নীতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৫০। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

৫১। কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

৫২। সন্তান হইলে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও সে ঋণ পরিশোধ করা যায় না। অতএব সন্তান প্রাণপণে পিতা মাতার সেবায় যত্ন করিবেক।

৫৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ সন্তান তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা স্বীয় শরীরের ন্যায়, আর দাসবর্গ ছায়া স্বরূপ। ইহাদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

৫৪। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, তাহা শ্মশানতুল্য।

৫৫। পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

৫৬। পুরুষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত পত্নী নহে। স্ত্রী-রত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করা যায়।

৫৭। কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন

অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

৫৮। যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণ প্রাপ্ত হয়।

৫৯। দক্ষতা, সন্তান, সম্পত্তি, সাধ্বীত্ব, প্রিয় বচন এবং পতির আনুকূল্য, এই সকল গুণযুক্ত ভার্য্যা স্ত্রীরূপধারিণী লক্ষ্মী।

৬০। যে কুলে অপস্মার (মৃগী) রোগ, ক্ষয়রোগ, অথবা কুষ্ঠ রোগ আছে, বিবাহ সম্বন্ধে সে সকল কুল পরিত্যাজ্য।

৬১। রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, সৌম্য-বদনা, মৃদুভাষিণী এবং আপনার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবেক।

৬২। হীনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অতিদীর্ঘা, অতিকৃশা, লোমহীনা এবং অতিলোমা এবং যাহার কেশ রুক্ষবর্ণ এই সকল কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

৬৩। কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না। সদ্বংশজাত, সদাশয়া ও সুলক্ষণা কন্যা পতির আয়ু যশ এবং সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির কারণ হয়।

৬৪। সন্তান উৎপত্তির জন্য স্ত্রী সকল বহু কল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

৬৫। স্ত্রী পুরুষ মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপে তাহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

৬৬। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

৬৭। যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করেন।

৬৮। সেই ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা; সেই ভার্য্যা, যিনি সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা, যাঁহার মন বাক্য এবং কর্ম্ম শুদ্ধ এবং যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

৬৯। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনু-গতা এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন।

৭০। কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না, এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে স্বামীর বিরোধিনী হইবেন না।

৭১। স্ত্রীরা স্বামীদিগের বাক্য প্রতি-পালন করিবেন। স্বামী সদাচারা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হন।

৭২। স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশেষরূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল সকলেরই শোকের কারণ হয়।

৭৩। বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা

অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

৭৪। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ।

৭৫। পতি হীনচরিত্র এবং নির্গুণ হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিবেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবেন।

৭৬। বেদিয়া যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয়, সতী স্ত্রী সেইরূপ পাপ-কূপ হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া উভয়ে মিলিয়া ইহকালে পবিত্র সুখ ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করেন।

৭৭। যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সেই গৃহে দেবতারা আনন্দ করেন। যে গৃহে নারীদিগের সমাদর নাই, তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল।

৭৮। দম্পতীর পরস্পর আনুকূল্য ত্রিবর্গ প্রাপ্তির হেতু। পত্নী যদি সাধ্বী ও অনুকূলা হয়, তবে সংসারাশ্রম অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের আর স্থান নাই, এবং স্বর্গে প্রয়োজন কি? আর পত্নী যদি অসতী ও প্রতিকূলা হয়, তবে তদপেক্ষা নরকভোগ আর কি আছে?

৭৯। সন্তান প্রসবে ও সন্তান প্রতি-পালনে যাহাতে ব্যাঘাত না হয়, তদ্বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অপ্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

৮০। নারী বিধবা হইলে মৃত পতি ও ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন, বিলাস ও বেশভূষা পরিত্যাগ করিবেন, আশ্রয়-কুলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন এবং আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর অনুমতি লঙ্ঘন করিয়া কোনও কার্য্য করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের নামাবলী।

অনন্ত মহিমাময় বিশ্বপতির কোনও নাম ও উপাধি নাই, অথচ তাঁহার অনন্ত নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভক্তগণ হৃদয়ের এক এক ভাব লইয়া তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন। কবি ও ভাবুকগণ তাঁহার এক এক গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া এক এক নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের নামের অনন্ত মহিমা; এবং নামের গুণে ধর্ম্মরাজ্যে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়াছে। নামের গুণে অনেক অস্পৃশ্য মহাপাতকী উদ্ধার পাইয়া পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছে। নামের গুণ এইরূপে কীর্ত্তিত হয়—"নামে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধিরে শুনে! নামে পাষাণ গলে, মরা মানুষ বেঁচে উঠে।" ঐহিক ভাবে এরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্ভব না হউক, আধ্যা-ত্মিকভাবে ইহা যে পরম সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নামে

অজ্ঞানান্ধ জীব জ্ঞানচক্ষু পাইয়াছে, গতি-শক্তিহীন সদ্গতি লাভ করিয়াছে, পাপে মৃত ব্যক্তি নবজীবনে পুনর্জীবিত হইয়াছে; অকৃতী অধম লোক অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

সকল ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মাই নামের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নামে জীবের পরিত্রাণ এই উপদেশ দিয়া অবিশ্রান্ত ইষ্টনাম জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে যে প্রার্থনার আদর্শ দিয়াছেন, তাহার প্রথমেই আছেঃ—"Our Father which art in heaven, hallowed be thy name" হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা! তোমার নাম ধন্য হোক।" ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম; কলিযুগে মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। মহাপ্রভুর মতে জীবে দয়া ও নামে ভক্তি ধর্ম্মসাধনের এই দুইটী প্রকৃষ্ট উপায়। কবীর বলেন "রাম নাম সত্য।" বাবা নানক নামের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন "হে প্রভো, তোমার নামের এমনি গুণ যে, তাহার প্রভাবেই লোকে আমার ন্যায় নির্গুণ লোককে পূজা করিতে আইসে।" বিশ্বাসী মহম্মদ বলিয়াছেন "ঈশ্বরের নাম লইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।" মুসলমান সাধুরাও হিন্দুদিগের ন্যায় জপমালার সহিত ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ যে নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদিগের মধ্যেও সিদ্ধ মহাত্মাদিগের নামজপের বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। ঈশ্বরের অষ্টনাম, দশনাম শতনাম, সহস্র নাম, কবিতাবদ্ধ করিয়া কত স্থানে কত ভক্ত আবৃত্তি ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা আত্মার শান্তি ও কল্যাণ অনেক পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন। যেন, তেন প্রকারেণ ঈশ্বরের নাম সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে পারিলে জীবের কল্যাণ। এ নিমিত্ত কেহ কেহ দেহ নামাঙ্কিত করেন, কেহ নামাবলী বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া রাখেন। নাম মহামন্ত্র, ইহার স্মরণে অন্তরের বাহিরের দুর্জ্জয় রিপু সকল পরাস্ত হয়, মহাশক্তি লাভ হয়। নাম অভ্যাস করিবার জন্য জপ, তপ, ধ্যান, ধারণার কত প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে! নাম সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হইলেও সরল বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ইহা লইতে হয়, তবে সুফল লাভ হয়। অশ্রদ্ধা বা ঔদাস্যভাবে নাম করিলে নামাপরাধ হয়, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

আমরা ভগবদ্ভক্তগণের স্মরণের সহায়তার জন্য অকারাদি বর্ণ ক্রমে নামের যে একটী ক্ষুদ্র তালিকা করিয়াছি, তাহা বামাবোধিনীতে ক্রমে প্রকাশ করিব। ইহা ভগবানের গুণবাচক, সুতরাং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইবে, আশা করা যায়। এ স্থলে বক্তব্য ঈশ্বর মানুষের ন্যায় পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক

নহেন অথচ মানব ভাষার শব্দ সকল পুং, স্ত্রী বা ক্লীববাচক। এইজন্য তাঁহার পর্য্যায়ে আমরা নানা স্থলে নানা লিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করিব, আর স্থানে স্থানে বিদেশীয় ভাষোক্ত নামেরও অনুবাদ দিব, তাহাতে কেহ আপত্তি না করেন এই প্রার্থনা। শব্দের প্রকৃত ভাব লইলেই প্রকৃত বস্তুর সহিত পরিচয় হইবে।

অকারাদি বর্ণ ক্রমে ঈশ্বরের নামাবলী।

অ, অউ ম (ওঁ-সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, কর্ত্তা), অকম্পন, অকর্ণ, অকলঙ্ক, অকল্মষ (অপাপ), অকায়, অকারণ, অকাল, অক্ষর, অক্ষয়, অকিঞ্চন-ধন, অকিঞ্চনগুরু, অকিঞ্চননাথ, অকূল-কাণ্ডারী, অকৃতিজননী, অখণ্ড, অখিল-পতি, অখিলগুরু, অখিলতারণ, অখিল-নাথ, অখিলপিতা, অখিলমাতা, অখিল-বন্ধু, অগতির গতি, অগম্য, অগোচর, অঘনাশন, অঘোর (শান্ত), অঙ্গবিহীন, অচঞ্চল, অচলশরণ, অচিন্ত্য, অচ্যুত, অচ্যুতানন্দরূপ, অচক্ষু, অছিদ্র (দোষ-শূন্য), অজ, অজয়, অজর, অজ্ঞেয়, অটল, অণোরণীয়ান, অণুভ্যোঽণু, অতল, অতনু, অতিদ্বয় (অদ্বিতীয়), অতিমহান্, অতিমহাপাতকনাশন, অতিসুন্দর, অতীন্দ্রিয়, অতুলন, অত্যদ্ভুত, অদীর্ঘ, অদৃষ্ট, অদ্বয়, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত, অদ্ভুতকর্ম্মা, অধর (যাঁহাকে ধরা যায় না), অধিষ্ঠাতা, অধমতারণ, অনতিমহান্, অনাদি, অনন্ত, অনন্তবাহু, অনন্তশীর্ষ, অনির্ব্বচনীয়, অনণু, অন্ত, অন্তরঙ্গ, অন্তরতর, অন্তরতম, অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী, অনাথনাথ, অনাথবন্ধু, অনাথশরণ, অনুত্তম, অনিকেত, অন্নপূর্ণা, অন্নদা, অন্তিমশরণ, অপরব্রহ্ম, অপরাজিত, অপরাধভঞ্জন, অপরূপরূপ, অপাণিপাদ, অপাপবিদ্ধ, অপূর্ব্ব, অপার, অপ্রকাশ, অপ্রতিম, অপ্রতিহততেজঃ অবাক্, অবদ্ধ, অবাধ, অবর্ণ, অবাঙ্মনসোগোচর, অবিনাশী, অব্যক্ত, অব্যয়, অভয়, অভাজনবন্ধু, অভাবনীয়, অভিভাবক, অভিরাম, অভীষ্টফলদাতা, অমনা, অমর, অমরবন্দন, অমৃত, অমৃতানন্দরূপ, অমূর্ত্ত, অমোঘ, অম্বক, অম্বা, অম্বিকা, অম্লান, অযোনি, অযোনিজ, অযোনিসম্ভব, অযোধ্য, অয়নাধীশ, অরজঃ, অরিসূদন, অরিষ্টসূদন, অরূপ, অর্ঘ্য, অর্চ্চিমৎ, অর্থপতি, অর্হণীয়, অলক্ষ্য, অলখনিরঞ্জন, অলঙ্ঘ্য, অলৌকিক, অশব্দ, অশেষ, অশেষগুণধারী, অশোক, অশ্রোত্র, অসঙ্গ, অসাধারণ, অসীম, অস্তুত, অস্থাবির, অস্পর্শ, অস্বপ্ন, অসংখ্যনামা, অহিংসক, অহেতুক, অহিতনাশন, অংশহীন, অংশিহীন (লা-সরিক)।

(ক্রমশঃ)।

সতীর হাট।

(উদ্ধৃত)

মেদিনীপুর সহরের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রকালী ও অলঙ্কারপুরের নিকটে "সতীর হাট" নামে এক বিখ্যাত হাট আছে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এই হাটে ৪।৫ হাজার লোক সমাগত হইয়া থাকে। এখানে নানাপ্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। অনেক বিদেশীয় ক্রেতা এখানে উপস্থিত হইয়া মেদিনীপুর-জাত মাদুরাদি দ্রব্য ক্রয়পূর্ব্বক কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান দেন। এই হাটের নাম "সতীর হাট" কেন হইল? এই বিষয়টী অনুসন্ধান করায়, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন—তাহা নিম্নে লিপি-বদ্ধ করা হইল।

পূর্ব্বে এই ভদ্রকালীর নিকট দিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার পথ ছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখনকার সেই পুরাতন পথের অল্প অল্প চিহ্ন ও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশ হইতে শত শত ব্যক্তি এই পথে যাতায়াত করিত। প্রাচীনকালের পথ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নিরুপদ্রব ছিল না। তখনকার পথের উভয় পার্শ্ব বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল দুর্গম স্থানে যেমন হিংস্র শ্বাপদ জন্তু, তেমনি অধিকতর হিংস্র দস্যু তস্করাদি আশ্রয় করিয়া থাকিত এবং সুযোগ বুঝিয়া পথিকগণের উপর আক্রমণ করিত; তথাপি জগন্নাথ দর্শনার্থিগণের গমনাগমনের বিরাম ছিল না। "জয় জগন্নাথ" বাক্যে দশদিক্ মুখরিত করিয়া, প্রভুর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, অসংখ্য নরনারী আনন্দে কাতারে কাতারে এই পথে চলিত।

সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় এক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এই পথে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে একদল দস্যু এই স্থানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। দুরাচার দস্যুগণ ব্রাহ্মণের জীবন বিনষ্ট করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ করে। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী কতই অনুনয়ে ও কাতর-বাক্যে পতির প্রাণ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় দুরাচার দস্যুগণ কর্ণপাত করিল না! যখন পতির মৃত্যু হইল, তখন সতীর জীবনে আর ফল কি? তিনি দস্যুগণের নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, তোমরা স্বামীকে হত্যা করিয়াছ, আমারও প্রাণ বিনাশ কর।

দুরাত্মারা প্রস্থান করিল। সতী পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সাবিত্রীর ন্যায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। বিধুরা ব্রাহ্মণ-বালার বৈধব্য রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে দুই দশ জন করিয়া চারি-দিক্ হইতে সকলে সমাগত হইল। যাহারা পুরুষোত্তম যাইতেছিল, তাহারাও স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সতীর নয়নে অশ্রু নাই—মুখে হাহাকার নাই—বদনে কাতরতা নাই; সে একভাব—সে ভাব বর্ণনার অতীত, ভাষার অতীত, বাক্যের অতীত!

সতী সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ সব, তোমরা আমার সন্তান, অভাগিনী আমি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; তোমরা আমার মুখ চাহিয়া, একটী চিতা সাজাইয়া দাও—সন্তানের কাজ কর।"

সতীর বচন শুনিয়া কেহ মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কেহ ধূলায় লুটিতে লাগিল—কেহ হাহাকার করিতে লাগিল। অপার বিষাদ-সিন্ধু যেন সতীর বচনরূপ ঝটিকায় সদম্ভে স্ফীত হইয়া উঠিল!

যথাসময়ে চিতা প্রস্তুত হইল। রক্তবস্ত্র পরিধান—ললাটে সিন্দুর—গলায় ফুলহার, এই অপরূপ রূপে দশদিক্ আলো করিয়া সতী চিতারোহণ করিলেন। দশমীর বিসর্জ্জন শেষ হইলে বালকগণ যেরূপ প্রতিমার বেশভূষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, সেইরূপ সমাগত ব্যক্তিগণ সেই পবিত্র চিতার পবিত্র ভস্ম লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল।

সহস্র লোক যাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারে, এইরূপ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এই বট বৃক্ষের নিকট চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। তদবধি সেই পবিত্র দিন স্মরণ করিয়া বহু লোক সপ্তাহে সপ্তাহে এই স্থানে আসিতে থাকে। সেই সূত্রে এই সতীর হাট সংস্থাপিত হইয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি এই হাট সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর পবিত্র নামের ঘোষণা করিতেছে। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন এই ঘোষণার বিরাম হইবে না"।—ব-বা।

উন্নতি কাহাকে কহে?

আজি যে পৃথিবীর ঈশ্বর, কালি সে পথের ভিখারী। আজ যে পথের ভিখারী" কাল সে মহারাজা। লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে রাজা হওয়া বা ভিখারী হওয়া উন্নতি বা অবনতির অবস্থা বলিয়া পরিগণিত। রাজ্য লাভ করিলে উন্নত হওয়া যায় ভাবিয়া আরঙ্গজীব পিতাকে পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া, রাজা হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যকেই আবার বিশ্বামিত্র শাক্যসিংহ উন্নতির অন্তরায় ভাবিয়া, পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। অনেক লোকে কৃষকের

অবস্থাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, অবনতির অবস্থা মনে করে। আমেরিকার কয়েকজন প্রেসিডেণ্ট কিন্তু স্বহস্তে হলচালনা করিতেন, রোমের ডিক্টেটর সিনসিনেটসও তাহাই করিতেন। কৃপণ হইয়া যদি কোন লোক অনেক টাকা উপায় করে, অনেকে তাকে বড় মানুষ বলে, উন্নত-অবস্থাপন্ন মনে করে। আবার সকলে কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হরিশ্চন্দ্র রাজাকেও বড় লোক বলে—উন্নত মানব মনে করে। ফলতঃ উন্নতির একটা কোন ধরা বাঁধা দর নাই। নাই বোধ হয় মানবের হিতেরই জন্য, কারণ জগতের অধিকাংশ লোকেই উন্নতির দিকে ধাবিত, উন্নতির আশায় আশান্বিত। যদি সকলে রাজা হইত, তবে প্রজা কে হইত? যদি সকলেই সন্ন্যাসী হইত, তবে সন্ন্যাসীকে অন্ন দিবার জন্য গৃহস্থ কে হইত? সকলেই যদি বক্তা হইত, তবে শ্রোতা কে হইত? সকলেই যদি সৈন্যাধ্যক্ষ হইত, সৈনিক তবে কে হইত? বাস্তবিক এইজন্যই আমরা দেখি যে, যে জাতির মধ্যে, যত অধিক লোক কর্ত্তা হইবার জন্য ব্যস্ত, সে জাতির অধঃপতনের মাত্রাও তত অধিক। যাহাহউক দেখা যাইতেছে যে রাজপদ, সেনাপতির পদ, কি বক্তার পদ কিছুই জগতের উন্নতির পরিচায়ক নহে, অথচ ভিন্ন রুচি অনুসারে সমস্ত নির্দ্দোষ পদই উন্নতির পরিচায়ক। প্রকৃত উন্নত যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি কি রাজপদে, কি সৈনিকত্বে, কি সেনাপতিত্বে সর্ব্বত্রই সমুন্নতি করিবে এবং লোকসমাজে আপনাকে উন্নত বলিয়া পরিচিত করিবে।

দারুণ অন্ধকারে যেমন বিদ্যুৎ চমকাইয়া পথিকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া তাহাকে দ্বিগুণ আঁধারে নিক্ষেপ করে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন একবার সুন্দররূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কতকগুলি উন্নতি সেইরূপ অবনতির পূর্ব্বসূচনা মাত্র। লোকে ইহাকে উন্নতি বলে, তাই উন্নতি বলিয়া আমরাও ইহাকে অভিহিত করিলাম। মাতাল, চোর, জালিয়াৎ ইত্যাদি সমাজের অনিষ্টকারী পাপিগণের উন্নতি এইরূপ। যাঁহারা এই সকল লোকের ক্ষণিক উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন, তাঁহারা যেন ইহাদের পরিণাম একবার দেখিতে চেষ্টা করেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, অনেক ব্যক্তি অসৎকার্য্য দ্বারা যদিও কিছুদিন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে তাহাদিগের যে প্রকার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাতে কখনই উন্নত-অবস্থাপন্ন বলা যায় না। ফ্রান্সের ১৫ পঞ্চ দশ লুই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। যাঁহারা তাঁহার শেষ জীবনের বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পাপের সমুচিত সাজা হইয়াছিল কি না। ফলতঃ অসৎকর্ম্ম দ্বারা যে উন্নতি হয়, তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে।

অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া নিজের পরিণাম কার্য্যকারিতা-শক্তি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ইহাদের উন্নতি যে প্রকৃত উন্নতি নহে এবং ইহারা যে সমাজদ্রোহী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা যায় না।

তাই বলি, অর্থ কিম্বা যশ উন্নতির চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত উন্নতি নহে। যে বন্দুক উৎকৃষ্ট শিকারীর হস্তে শোভা পাইয়া থাকে, সেই বন্দুক যদি তাহার ব্যবহারানভিজ্ঞ কোন কুলি স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তবে কি তাহাকে একজন উৎকৃষ্ট শিকারী বলিতে হইবে?

যাহার অন্তর ও বাহির বেশ পরিষ্কার, সুস্থ ও সবল, তিনিই উন্নত। যাঁহার হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সুস্থ ও কর্ম্মঠ এবং উহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ মনের দ্বারা পরিচালিত, তিনিই প্রকৃত উন্নত। যদি তিনি উন্নতির কোন সাকারা মূর্ত্তি দেখাইতে অভিলাষী হন, তবে তাঁহার সে অভিলাষ কখনই অপূর্ণ থাকে না। কি রাজার কার্য্যে, কি সৈনিকের কার্য্যে, কি সন্ন্যাসীর কার্য্যে, কি শিক্ষকের কার্য্যে, কি ছাত্রের কার্য্যে, সর্ব্বত্রই তিনি জগতের সমক্ষে আপনাকে উন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। যাহার শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ, যাহার মন বিদ্যা ও বিনয়ভাবানত, ধর্ম্ম যাহার প্রধান অবলম্বন, কর্ত্তব্য যাহার পরিচালক, "ইহলোকে ও পরলোকে আমার ভীতির পাত্র কেহ নাই" বলিয়া যাহার বিশ্বাস, তিনিই প্রকৃত উন্নত। এরূপ মহাত্মা যদি জগতে উন্নত না হন, তবে আর কে? তবে কি ঐ খল প্রজাপীড়ক দস্যুবেশধারী রাজা, ঐ সুখ-শয্যায় শায়িত বিলাসগর্ভে নিমজ্জিত ধনী, জগতে উন্নত? যাহার মস্তক সহস্র অসির লক্ষ্যস্থানীয়, যাহার মৃত্যুতে সহস্র লোকে আনন্দিত হইবে—আপনাদের কণ্টক দূর হইল ভাবিবে, সেই ব্যক্তিই যদি জগতে উন্নত হয়, তাহার অবস্থাই যদি জগতে স্পৃহণীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে উন্নতি অতল সাগর জলে নিমজ্জিত হউক, তবে উন্নতির রেখা পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক। সত্য বটে উন্নত মহাপুরুষদের মস্তক পাপিষ্ঠের অসিঘাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহে, সত্য বটে তাঁহাদিগেরও বিপদ আছে, তাঁহাদিগেরও অপমৃত্যু ঘটে; কিন্তু সে বিপদ, সে অপমৃত্যু তাঁহাদিগের পরীক্ষা মাত্র। তাঁহাদিগের মৃত্যুতে কোটি কোটি লোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তাঁহাদের অনিষ্টকারীকে দণ্ড দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ধাবিত হয়। প্রকৃত উন্নত ব্যক্তি মৃত্যুই ঘটুক, আর যাহাই ঘটুক, কিছুতেই নিজের কর্ত্তব্যের রেখা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। আরঙ্গজীব যখন শিখবন্দিগণকে তাহাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বা মস্তক প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহারা

সন্তুষ্টচিত্তে মস্তকই প্রদান করিয়াছিল, ধর্ম্ম দেয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বরী মেরী যখন বিশপদ্বয় লাটিমার ও ক্রান্মারকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ধর্ম্ম দেন নাই—জীবন দিয়াছিলেন—অগ্নিতে পুড়িয়াছিলেন। লোকে যে জীবনকে পরমপ্রিয় মনে করে, সেই জীবন ইহাঁরা অবহেলে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিলেন? কোন্ শক্তির বলে ইহাঁরা সেই অসাধ্য সাধন করিলেন? সেই শক্তিকেই উন্নতি কহে। প্রাণ পরিত্যাগ উন্নতি নহে, তাহা উন্নতির সাকারা মূর্ত্তি মাত্র। যে উন্নতি এত দিন নিরাকারভাবে তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা তাহাদের মৃত্যুতে প্রকাশিত হইল মাত্র। সকলেরই উন্নতির সাকারা মূর্ত্তি যে একই হইবে তাহা নহে, ক্রানমার বা লাটিমার যে উন্নতি যাজকত্বে দেখাইয়াছেন, নিউটনও সেই উন্নতি বিজ্ঞানে দেখাইয়াছেন, আবার নেপোলিয়ান সেই উন্নতিই সেনাপতিত্বে দেখাইয়াছেন। ফলতঃ একই উন্নতিকে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন মাত্র।

বলেন্দ্র ও বলবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত নীল আকাশের তলে স্নিগ্ধ সান্ধ্য বায়ু হিল্লোলিত সমুদ্র। সে সমুদ্রের কূল নাই, কিনারা নাই। অনন্ত নীলাকাশের ন্যায় সমুদ্রও অনন্ত নীল, কিন্তু আকাশের ন্যায় নিস্তব্ধ নহে, সমুদ্র সর্ব্বদা শব্দায়মান। তরঙ্গ উঠিতেছে—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিতেছে। ঐ যে নীল পর্ব্বত তুল্য সফেন তরঙ্গমালা নাচিতে নাচিতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার দেখিতে দেখিতেভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এই সান্ধ্য সমুদ্রতটে সান্ধ্য সমীর-সেবিতা পুষ্প-শোভিতা ব্রততীর ন্যায় বসিয়া এ কে? এ একজন রমণী।

"রমণীর গৌরকান্তি নয়ননীলিমা,
রঞ্জিত সায়াহ্নরাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরী রূপ অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর?"

রমণী অনিমেষলোচনে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছে। নীলাকাশে অতি সুন্দর নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অতি ভয়ে ভয়ে ক্ষীণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, সময় সময় রমণীর দৃষ্টি তাহার উপরেও পড়িতেছিল। সান্ধ্য নক্ষত্রের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সিন্ধুসলিলে প্রতিফলিত হইতেছিল, রমণী এক একবার তাহাও দেখিতেছিল। কিন্তু সান্ধ্যপ্রকৃতির এ রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াও তাহার চিত্ত স্থির হইল না। বহুক্ষণ সমুদ্রের

দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাহার বাঞ্ছিত কেহ আসিল না, তখন সে গাইল ঃ—

অনন্ত নীল জলে, অনন্ত বায়ু খেলে,
অনন্ত লহরী ছুটিছে তায়,
অনন্ত অম্বর, দিক্ ও দিগন্তর,
যেন অনন্ত তরঙ্গে গ্রাসিতে চায়।
অনন্ত ফেনরাশি, হাসে অনন্ত হাসি,
আকাশে উত্থিত হয় সে ফণি-
গর্জ্জনে ঘনস্বন, পরাস্ত পুনঃপুনঃ
হয়—জগত কম্পিত সে স্বর শুনি।
যেন—উদিত নিমজ্জিত হইছে আদিত্য,
উষায় সন্ধ্যায় তোমার নীরে,
যেন মধ্যাহ্নে নীল জলে, লাল মুকুতা জ্বলে,
যেন সুবর্ণ লহরী অধীরে খেলে।
দিবসে একবার নিমেষে একবার,
জোয়ার ভাঁটাতে করিছ কেলি,
রবি করে উজ্জ্বল, সমীরণে চঞ্চল,
তটেতে অযুত বালুকাবলী।
মরি কিবা সুন্দর, মরি কি মনোহর,
তরঙ্গমালাময় মহান্ সিন্ধু।
আহা কি চমৎকার, মহিমা বিধাতার,
অনন্ত ঈশ্বর জগতবন্ধু।

সঙ্গীতের প্রতি পদ যখন কোমল কণ্ঠ-নির্গত হইয়া সুস্বরে সুতালে উঠিতে পড়িতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "বলবতি!" রমণী ভীত-কম্পিত-চিত্তে চাহিয়া দেখিল তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান—বলভদ্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বলভদ্র ডাকিল "বলবতি"। বলবতী তাহার দিকে চাহিল না, কোনও কথা কহিল না। বলভদ্র কহিল "তুমি জান বলবতী আমি কে?" বলবতী এবার কথা কহিল। সে স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিল "হাঁ জানি, তুমি এই বিদ্যাধর গ্রামে একজন ধনী লোক।"

বলভদ্র বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল "আর তুমি নিজে কে তা জান কি?"

বলবতী পরিষ্কার স্বরে কহিল "হাঁ তাহাও জানি। আমি একজন দরিদ্র-কন্যা—পিতৃমাতৃহীনা অনাথা ও তোমার অন্নে আজীবন প্রতিপালিতা এবং তোমার গৃহ-আশ্রিতা।

বলভদ্র। তবে তুমি কোন্ সাহসে আমার কথার অসম্মান কর?

বলবতীর অবনত চক্ষু হইতে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল, সে জড়িতকণ্ঠে কহিল "দেখ বলভদ্র"—

বলভদ্র তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল "আর কথায় আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কিম্বা বল।" বলবতী মুক্তকণ্ঠে কহিল "না।"

বলভদ্র। তুমি আমাকে ভালবাস না?

বলবতী। ভালবাসি না ত কি? ভগ্নী কি ভ্রাতাকে ভালবাসে না।?

বলভদ্র। ভ্রাতা ভগ্নীর কথা আমি চাই না, আমি তোমাকে যে ভাবে ভালবাসি, তুমি আমাকে সে ভাবে ভালবাস কি না?

বলবতী। না।

বলভদ্র। তুমি বড় মূর্খ, আপনার সুখ দুঃখ কিসে হয়, তোমার সে বোধ নাই।

বলবতী। সুখ কাহাকে কহে আর দুঃখ কাহাকে কহে, তাহা তোমার বোধগম্য হয় নাই বলিয়াই এমন কথা বলিতেছ।

বলভদ্র। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি যথেষ্ট সুখী হইবে, নচেৎ তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর দুঃখময়।

বলবতী। তোমাকে বিবাহ করাই আমার দুঃখ, নচেৎ আমি সুখী।

বলভদ্র দুঃখে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া কহিল "তুমি জান, আমি ইচ্ছা করিলে এখনি তোমাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে পারি।"

বলবতী। আমি সব জানি।

বলভদ্র। কি জান।

বলবতী। তুমি আমাকে কখন জোর করিয়া বিবাহ করিতে পার না, তাহাই জানি।

বলভদ্র। তুমি কি জান না যে গ্রামের মধ্যে আমি প্রধান, ইচ্ছা করিলে আমি সবই করিতে পারি?

বলবতী। তুমি ইচ্ছা করিলে সব করতে পার সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার সাধ্যাতীত কর্ম্ম।

বলভদ্র। আমিত তোমার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছি না, তোমাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

বলবতী। তুমি কিরূপে আমাকে বিবাহ করিবে বল? পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বলভদ্র। কোথাকার একজন লোক, তাকে তুমি চোখে দেখিয়া ভালবাসিয়াছ, এইত বিবাহ। ইহাতেই যদি অধর্ম্ম হইত, তবে এত দিন পাপে সংসারের অর্দ্ধ ভাগ ডুবিয়া পড়িত।

বলবতী। বর্ত্তমান জগতের অর্দ্ধখানা পাপে ডুবিয়া পড়ে নাইত কি? কিন্তু সে দৃশ্য ধর্ম্মচক্ষু ব্যতীত পাপ চক্ষুর গোচর নহে। ধর্ম্মের কথা কহিলেত তোমার কর্ণে প্রবেশ করে না। মহাভারত রামায়ণের সঙ্গে বোধ হয় জীবনে দেখা সাক্ষাৎ নাই। মহাভারতে পড়িয়াছি সাবিত্রী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। তিনি বনভ্রমণ করিতে গিয়া সত্যবান্ নামে এক রাজপুত্রকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চাতে মুনিগণপ্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন যে, সত্যবান্ অতি অল্পায়ু। তাহার পিতা মাতা তাহাকে সত্যবানের কথা ভুলিতে কহিলেন এবং অন্য এক রাজপুত্রকে বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন। কহিলেন

"যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি,
জীবন মরণে সেই সত্যবান্ স্বামী।"

এই সাবিত্রীই এক দিন ক্রুর মৃত্যুর করাল কবল হইতে প্রাণপতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাম নাম শুনিলে ভূতেরা বড় অসন্তুষ্ট হয়, ধর্ম্ম প্রস্তাবে পাপীরাও বড় বিরক্তি প্রকাশ করে। তাই আজ বলবতীর কথায় বলভদ্রের বড় রাগ হইল, কর্কশ

স্বরে কহিল "বলবতী, তুমি নিশ্চয় জানিও এই এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে জোর করিয়া বিবাহ করিব, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া সেই কোমল মধুর নিরুপম-সৌন্দর্য্য দেবী-প্রতিমার দিকে রোষ-কষায়িত লোচনে চাহিতে চাহিতে বলভদ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

যে সময় বলভদ্র ও বলবতীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে সময় সায়াহ্ন-সময় নহে—অপরাহ্ণ। যে স্থানে তাহারা উপবিষ্ট ছিল, সে স্থান সিন্ধুতট নহে—সে স্থান সুদূর-প্রসারিত এক ভূমিখণ্ডে রমণীয় কুসুমোদ্যানের উপর বৃহৎ বাটীর একটি নির্জ্জন কক্ষ। সে কক্ষের সম্মুখস্থ স্থান স্নিগ্ধ ও ছায়াপ্রধান তরুনিকরে পরিশোভিত।

(ক্রমশঃ)

শেষ জীবন-সঙ্গীত।

ভোলা মন সব ভুলে যা, ভুলিস না সেই নিত্যধনে,
(ভুলিস না সেই) (সত্য ধনে) (ব্রহ্মধনে), (হরি ধনে)
সার ধন পরম রতন সম্বল জীবন মরণে।
দেহ গেহ ধন জন, কিছুই নহে আপন,
ভুলে যা মায়ার ধোঁকা—দারা সুত পরিজনে।
সে যে রে সাধনের ধন, সাধনে হবে মিলন,
কর ধ্যান, কর জ্ঞান, সাধন কর প্রাণপণে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

এথিলিনা কক্স	প্রাইবেট	১ম বিভাগ।
ই, এ ডি সুজা	ডবটন কলেজ	"
বার্থা ফিস্চার	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট	"
প্রভাবতী রায়	বেথুন কলেজ	"
ইন্দুলেখা বসু	বেথুন "	২য় বিভাগ।
কমলা	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ	"
প্রসন্নকুমারী চৌধুরী	"	২য় বিভাগ।
এনি কর্ণেল	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট	"
হেমন্তকুমারী দাস	ব্রাহ্মবালিকা স্কুল	"
মৃণালিনী দাস গুপ্ত	বাঁকিপুর এফ এইচ স্কুল	"
সুরবালা দাস গুপ্ত	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ	"
এগনিস ঘোষ	"	"

জুলিয়া মেডিসন রেঙ্গুণ কনভেণ্ট ২য়
লুসি সেণ্ট ক্লেয়ার ,, ,,
এমিলি নিকোলাস সেণ্ট জোসেফস ,,
বিনোদিনী সরকার ব্রাহ্মবালিকা ,,
অনসূয়া সিংহ বেথুন ,,
মণিহারময়ী সিংহ ব্রাহ্মবালিকা ,,
ক্ষিরোদ বালা ভট্টাচার্য্য
ক্রাইষ্ট চার্চ্চ ৩য় বিভাগ।
ডেসি চেলুসন সেণ্ট জোজেফ্স
কনভেণ্ট মোলমিন ,,
বেলা ডিভাইন্ শিক্ষক ,,
টি, এল্ ফন্সিকা প্রাইভেট ,,
মে জর্জ্জ সেণ্ট জোজেফ্স ,,
জেসি ল্যাম্বার্ট্ রেঙ্গুণ কনভেণ্ট ,,
হেমপ্রভা মজুমদার প্রাইভেট ,,

এফ্, এ পরীক্ষার ফল।

অমিয়া রায় ১ম বিভাগ
প্রেসিডেন্সী কলেজ
পি কেটি ১ম প্রাইবেট
রাজকুমারী বসু ২য় বেথুন কলেজ
শরৎকুমারী দাস ,, ,,
লেনা ঘোষ ,, প্রাইবেট
চারুবালা মণ্ডল ,, ,,
চারুলতা রায় ,, প্রেসিডেন্সী
মৃন্ময়ী সেন ,, বেথুন
আশালতা চৌধুরী ৩য় ,,
বিভুবালা দত্ত ,, ,,
এল্ সি ডি সুজা ,, নাগপুর সেণ্ট ফ্রান্সিস

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

ইসাবেলা জি সামুয়েল (অনর ইংলিস) ২য় বিভাগ — রাবেন্সা কটক
স্নেহলতা মজুমদার (অনর গণিত) ২য় বিভাগ — বেথুন
লিলী ক্রিশ্চিয়ানা ডভটন
সুপ্রভা গুপ্ত বেথুন

নূতন সংবাদ।

১। গত ১লা মে বাঙ্গলার ছোট লাট দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। সিয়ালদহে প্লেগ-পরীক্ষক ডাক্তারের নিকট তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

২। ইংলণ্ডেশ্বরীর শুভ জন্মদিনের উৎসব সর্ব্বত্র ২৪শে মে সম্পন্ন হইয়াছে, কেবল লণ্ডনে ৩রা জুন হইবে।

৩। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি বাবু গোপাল লাল মিত্রের লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অতি সুবিদ্বান্ ও সুযোগ্য লোক ছিলেন।

৪। ছোট লাট ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়া ইহার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

৫। দিল্লীর হিন্দু কলেজ যতদিন

স্বপোষণক্ষম না হয়, ততদিন লালা শ্রীকৃষ্ণ দাস নামক এক ধনী বণিক্ ইহার সমুদায় ব্যয় ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। যত মনুষ্য জন্মে, তাহার সিকি ৬ বৎসর ও অর্দ্ধেক ১৬ বৎসর না হইতে হইতে মরিয়া যায়।

৭। বিলাতে স্মিথ নামক এক সাহেব ভারতবাসী কুষ্ঠ রোগীদিগের সাহায্যার্থ ১৮০০ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন।

৮। পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রুষ রমণী ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্ ডি উপাধি পাইয়াছেন।

৯। পক্ষীর মধ্যে সোয়ান সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ইহা ৩০০ বৎসরেরও অধিক বাঁচিয়া থাকে।

১০। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ৩৫২৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০০২ প্রথম, ১৬৬৬ দ্বিতীয় এবং ৮৫৯ তৃতীয় শ্রেণীস্থ। এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৫৭, তন্মধ্যে ৪৩ প্রথম, ২৩৮ দ্বিতীয় এবং ৯২৬ তৃতীয় শ্রেণীস্থ। বি এ ৪৭৬ উত্তীর্ণের মধ্যে পাস ৩৬৪, অনর ১১২ মাত্র।

১১। গত ২০এ মে গৌহাটীতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে, কম্পন ১৫ সেকেণ্ড ছিল।

১২। ২৪এ মে মহারাণীর ৮০ বার্ষিক জন্মদিনে উইণ্ডসর কাসলের চতুরস্র ভূমিতে নগরের সকল গানবাদ্য-সমিতি মিলিত হইয়া এক মহা তূর্য্যোৎসব করিয়াছিল, মহারাণী তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৩। মহারাণীর জন্মদিনে (২৪এ জুন) কলিকাতার হারিসন রোড ও অন্যান্য রাজবর্ত্মে মহোৎসাহে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। ঐ দিবস মহারাণীর সম্মানার্থ ভারতের সর্ব্বস্থানে যথোচিত তোপধ্বনি হইয়াছে।

১৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডার সীমাবর্ত্তী ডসন নগর সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়াছে। এই নগরটী নূতন প্রতিষ্ঠিত এবং স্বর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। অনেকে আশা করেন, এই অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা নগরের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে।

১৫। এক জন ভারতবাসী মুসলমান মরিচ সহরে বাণিজ্য করিয়া ২ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে।

১৬। হঙ্গেরীর গালেসিয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশুদ্ধ গৈরিক লবণের খনি আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৫০, প্রস্থে ২০ মাইল এবং ২৫০ ফিট পুরু।

১৭। ত্রিবোঙ্কুরে স্ত্রীশিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে। গত বৎসরের রিপোর্টে জানা যায়, তথায় ছাত্রীসংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, ভারতের আর কুত্রাপি এরূপ দেখা যায় না।

১৮। বিলাতে ভারতবাসী ১৫০ ছাত্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

১৯। গত ১৯শে মে হইতে ২১শে মে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। ফরিদপুরের বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রশংসার সহিত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

২০। ভিয়েন্না নগরবাসী সুবিখ্যাত দানশীল ব্যারণ হার্সের বিধবা পত্নী অপুত্রক থাকায় মৃত্যুর পূর্ব্বে দরিদ্রদিগের জন্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি(৩৬০০০০০০০) ছত্রিশ কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ সাধুদৃষ্টান্ত কবে দেখা যাইবে?

২১। বি, এ, পরীক্ষায় ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের কন্যা কুমারী স্নেহলতা গণিতে ও সামুয়েল ইসাবেলা ইংরাজীতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বাবু রজনীনাথ রায়ের কন্যা কুমারী অমিয়া রায় এফ, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছেন। ইনি সাহিত্যে প্রথম স্থানীয় পুরস্কার পাইবেন।

বামারচনা।

নববর্ষ আবাহন।

এস এস নববর্ষ অবনী মাঝার,
কি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হৃদি পারাবার!
হাসিমাখা বিম্বাধরে, কত আশা থরে থরে,
হৃদয় কন্দরে আহা করিছে বিহার।
শুভ দিনে শুভক্ষণে বসি ধরা সিংহাসনে,
রাজদণ্ড ধরি কর ন্যায় ব্যবহার—
অভেদে অপক্ষপাতে করো সুবিচার। ১
এস এস নববর্ষ ডাকি বারে বার,
চারি দিকে করে সবে মঙ্গল আচার।
তোমারে বরিতে ঊষা, পরিয়া কনক ভূষা
আনন্দে হাসিছে খুলি পূরব দুয়ার।
ওই যে ঊষার পাশে, কনক তপন ভাসে,
হেরিতে ভূপতি আজি বদন তোমার,
খুলিয়াছে অরুণাক্ষ, হাসিছে সংসার। ২
মঙ্গল বাজনা অই বিটপী বাজায়,
তালে তালে সমীরণ নেচে চলে যায়।
ভুবনে পড়েছে সাড়া, জেগেছে পাখীর পাড়া,
আগে ভাগে ছুটে তব যশোগান গায়।
বসি রাজ-সিংহাসনে, সুখী কর জগজনে,
করুন মঙ্গলময় মঙ্গল তোমার,
ফেলাওনা আঁখিজল—কাঁদাওনা হায়! ৩
খুলিয়া গিয়াছে আজি সপ্ত স্বর্ণ দ্বার,
প্রফুল্ল মন্দারফুল সৌরভসম্ভার—
বহিছে সমীর চল, আশীর্ব্বাদে দেবদল,
যাচিছে অমরীগণে মঙ্গল তোমার,
মহান্ আদেশ রাশি, সমীরণ স্রোতে ভাসি,
আসিতেছে তব পাশে বিশ্ব বিধাতার;
প্রাণপণে পালিও হে আদেশ তাঁহার। ৪
তোমারি মতন হায় কত শত জন
এসেছিল হেসে হেসে প্রফুল্ল আনন।
শত যত্নে নারী নরে, লয়েছিল সমাদরে,
প্রেম প্রীতি ভক্তি পুষ্পে করিয়ে পূজন,

গেঁথেছিল আশা-নালে মালা সুশোভন।
আদরে পরিল গলে, সুখে রবে মহীতলে
ফুটিল বাসনা ফুল নয়ন-রঞ্জন,
অকালে শুখায়ে শেষে হয়েছে পতন। ৫
জ্যেষ্ঠগণ এসেছিল তোমার মতন
জল স্থল ব্যোম করি সুখে নিমগন,
এমনি নবীন বেশে, এসেছিল হেসে হেসে,
কে জানে উদরে তীব্র গরল ভীষণ
রেখেছিল লুকাইয়ে, মর ভবে ছড়াইয়ে,
জর্জ্জরিত করে গেছে নর নারী-মন,
কাঁদিয়া কাঁদায়ে শেষে করেছে গমন। ৬
কত অশ্রুনীর হায় হয়ে প্রবাহিণী
বহিতেছে ধরা-বক্ষে দিবস যামিনী।
ধবল হৃদয়ভাগে, কত যে কালির দাগে,
রঞ্জিয়াছে মুছিবেনা থাকিতে জীবনী।
অশনি অনল জ্বলে, অঙ্গার দিয়েছে ঢেলে,
উঠিয়াছে সুধার্ণবে জীবন-ঘাতিনী,
উদ্গারিয়ে হলাহল কাল ভুজঙ্গিনী। ৭
হয়োনা কদাচ তুমি তাদের মতন,
প্রাণপণে করো ভবে মঙ্গল সাধন।
ঢেলনাকো হলাহল, সুখে রেখো মহীতল,
মঙ্গল-নিদান হোক্ তব আগমন।
শুভ কর্ম্মে দিও মন, সুখে রবে অনুক্ষণ,
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ আছে এক জন—
ধর্ম্মে জয় অধর্ম্মের অবশ্য পতন। ৮

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী।
বনফুলহার-রচয়িত্রী।

নব বর্ষের প্রার্থনা।

তোমারি মঙ্গল হস্তে গড়েছ এ বসুন্ধরা,
তাই এ জগত সদা নবীন সৌন্দর্য্যে ভরা।
নবীন প্রভাত, সন্ধ্যা, নিতি আসে ধরা-তলে,
মৃতেরে জীবন দিতে—হাসাইতে ফুলদলে।
একটি বরষ তুমি দিয়েছিলে ভগবান্!
পুরাণ মানবগণে দিয়ে যেতে নবপ্রাণ;
কত আশা, কত সাধ, দেছিলে তাহার সনে;
জাগাতে ঘুমন্ত যারা,—হাসাতে ব্যথিত জনে।
আজ সে বরষ তব হয়ে গেছে পুরাতন,
যা করিতে এসেছিল, হয়েছে তা সুসাধন,
আমরা কালিমা দিয়ে মলিন করেছি তারে
বিদায় চাহিছে এবে মানবের দ্বারে দ্বারে।
যাক্ চলে পুরাতন, এই কর দয়াময়!
নবীন বরষে যেন নবীন জীবন হয়।
মলিন প্রাণের তলে যা কিছু কালিমা আছে,
তোমার পবিত্র হাতে দাও তাহা—দাও মুছে।
আজ হ'তে এ সংসারে তুমি হও ধ্রুব-তারা,
বরিষ হে নিশিদিন আশীষ অমৃতধারা।
তাহলে জীবন মন হয়ে যাবে মধুময়,
সংসার স্বরগ হবে এ কথা কল্পনা নয়।

শ্রীবনলতা দেবী।

বোন।

কেন কাঁদি যদি নাহি ঝরে অশ্রুজল ?
কেন ভাবি যদি নাহি ফাটে হৃদিতল ?
ভোরে উঠি সাঁঝে ডুবি ফিরি মহীতল,
ঘুরে মরি নাহি পাই কোথা লক্ষ্যস্থল।
পথ দীর্ঘ তাহে অতি পদ দুরবল,
দিবা নিশি ভয়ে তাই পরাণ বিকল।
হাসি খেলা বলা কহা সকলি নিষ্ফল,
ভবহাটে কেনাবেচা চলে অবিরল।
পার যদি লহ কিনি হীরা মুক্তাদল,
বেলা গেল সন্ধ্যাকালে হবে 'চল চল'।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সবি ভুল।

পূরব গগন প্রান্তে ওই শশী নিভে যায়,
মোর জীবনেরে যেন উপহাস করে হায় !
ওতো গো উদিবে পুনঃ ওই শুভ্র নীলাম্বরে,
জীবন কি গেলে পুন ফেরে দেহ কারাগারে ?
এ ধরণী ছলনার কুহক-স্বপন ভরা,
ভালবাসা সেও ভুল, মায়াময়ী এই ধরা।
হরষ আনন্দ যেথা, ভালবাসা সেইখানে,
দুঃখীর দারুণ ব্যথা পশে না তাহার প্রাণে।
চির-রোগী যে সংসারে, কেবা তারে ভাল-
বাসে ?
নবীন মাধুরী-হীন, বাসিবে বা কোন্
আশে ?
নাহি হাসি নাহি প্রীতি সুখে অশান্তির
প্রায়,
আপন মরমে মরে আছে সংসারেতে হায় !
এ সংসার উপকূলে লয়ে চির দুঃখ-স্মৃতি,
ভুল সে ভেঙ্গেছে মোর আজ কোথা
আশা প্রীতি ?

পঙ্কজ কুমারী দেবী।

শেষ।

সাঙ্গ আজি মরমের ব্যথা
জীবনের কথা আজি শেষ,
মরণের তীরেতে দাঁড়ায়ে
গণিতেছি প্রত্যেক নিমেষ।
ধীরে ওই ডুবিছে দিবস
শিয়রেতে আঁধার ঘনায়,
যারা ছিল নিকটে আমার
ক্রমে ওই দূরে চলে যায়।
সুখ দুঃখ হাসি যাহা ছিল,
লুকায়েছে মরণের ছায়ে,
নিজবলে জানিতাম যারে
কাহিনী বলিয়া মনে হয় !
মরণের মরণ মাঝারে
হেরিতেছি জীবন নূতন,
পুরাতন জীবন যা ছিল
মনে হয় শুধু গো রোদন ॥

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

ব্রততি !

নিরিবিলি বসিয়া নীলাকাশে চাহিয়া
কি দেখিছ ব্রততি ?
কোলে তোর বালিকা কুসুমের মালিকা
ঢালে মৃদু বিভাতি।
নভ পটে থাকিয়া মৃদু আলো ঢালিয়া
তারা করে পিরীতি,
সমীরণে ঢলিয়া শ্যাম বাহু তুলিয়া
কর তারে প্রণতি।
মুখ-ভরা জোছনা হাসে কত শোভনা
তুলি সুধা লহরী।
শ্যাম বনে পাপিয়া পাদপেতে থাকিয়া
দেখে তব মাধুরী।
অমিয়ার সরসে মন-পঙ্কজ বিকাশে
তোরে দেখে রূপসী।
কোথা তুই পাইলি কোন্ খানে শিখিলি
এ পবিত্র সুহাসি ?

শ্রীমতী অম্বুজা।

নিবেদন।

(আষাঢ় শুক্ল পক্ষ দশমী রথ যাত্রার দিন সন্ধ্যার সময়)

ব্যাকুলে ডাকিছে সখা ! তব দীন দাসী,
নিদ্রা পরিহর,
উঠ প্রাণাধার !
একি বেলা ঘুমাবার ?
পশ্চিম-গগনে দেখ শ্রান্ত দিবাকর।
শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্য বাজে দেখ দেবালয়ে
(আজি) বাহুড়া দশমী;*
বিভু পাদপদ্ম স্মরি,
উঠ নিদ্রা পরিহরি,
কার্য্যে তৎপর হও বিভুরে প্রণমি।
করেছি কি কোন দোষ তব শ্রীচরণে
বল প্রিয়তম !
নিদ্রা ত্যজি প্রিয়তম !
ক্ষম যত দোষ মম,
ভুলিলে কি আজি তব ধরম করম ?
একি সখা ! এত নিদ্রা এত অভিমান
বল কি কারণে ?
দেখ ভ্রাতা পিতা মম,
তব বন্ধু গুরুজন,
ডাকেন তোমারে কত করুণ বচনে।
একি সখা ! বল দেখি একি অভিমান
একি এ শয়ন ?
তব হৃদাকাশ চন্দ্র,
ইন্দিরা, সুধীরচন্দ্র,
ডাকিছে সচ্চিদানন্দ তব প্রিয় ধন।
যাদের মধুর ডাকে ভাসে প্রাণ মন
আনন্দ সলিলে,
সেই তব প্রাণধন,
প্রিয় পুত্রকন্যাগণ
নাহি শোন আজি কেন কাতরে ডাকিলে ?
বুঝিয়াছি এবে আমি এযে মহানিদ্রা
অনন্ত শয়ন !
বিশ্ব-জননীর কোলে,

*আষাঢ় শুক্ল পক্ষ দশমী জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রার দিন।

ঘুমিছ অতি বিহ্বলে,
নিশ্চল নিঃস্পন্দ মরি কি ধ্যানে মগন!
লভেছ যাঁহার ক্রোড়,—অমৃত সদন
ছাড়ি মর ধাম
অনন্ত নিত্য বৈভব,
তার কাছে তুচ্ছ সব,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য রাশি ধূলির মতন।
পেয়েছ যে স্নেহ প্রেম বিশ্বজননীর
অমূল্য অক্ষয়,
কলঙ্ক কালিমাময়,
সংসারের স্নেহ প্রেম,
টানিতে কি পারে তব প্রাণ মন?
তাইহে আমার ডাক না শুনিলে সখা!
না ভাবিলে তুমি
কি তীব্র যাতনা ভার,
কেন বহে অশ্রুধার,,
কা'র কথা দিবানিশি ভেবে মরি আমি

শ্রীমতী রেবারায়।

শোকসন্তপ্তা জননীর বিলাপ।

হায় বুলু হায় বুলু প্রাণের তনয়া!
কোথা গেলে করি শূন্য জননীর হিয়া?
নন্দনের পারিজাত ইন্দ্রাণী গলে
পরিতে স্খলিত হস্তে পড়িল ভূতলে,
ত্রিদিবের আদরিণী স্বর্গ পুষ্পহার!
গেলি চলি মাতৃ-হৃদি করিয়ে আঁধার।
কোলে ছিল পুত্র ধন তুমি বুলু আর।
"মা"ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার॥
এখনও মনে পড়ে সে দিন আমার।
এ জনমে সেইদিন ভুলিব না আর॥
তোমার সঙ্কট পীড়া হেরিয়ে নয়নে,
এক মনে ডাকিলাম দেব দেবীগণে॥
কিঞ্চিৎ হইল দয়া দেবীর অন্তরে।
কাটিল রজনী বুলু তোমা কোলে করে॥
আশা মাত্র নাহি ছিল, কিন্তুরে আবার
অভাগীর মনে হ'ল আশার সঞ্চার॥
ভাবিলাম তুমি মম যতনের ধন,
কোথা যাবে শূন্য করি মায়ের ভবন?
'তরুলতা' নাম দিল দাদাটী তোমার।
তরুলতা-পাশে বদ্ধ হৃদয় আমার॥
সেই লতা যদি কভু শমন ছিঁড়িবে।
লতা সনে এ হৃদয় উপাড়ি যাইবে॥
হায় বুলু! হায় বুলু যতনের ধন!
তোমার বিহনে আছে এ দেহে জীবন!
হবেনা মরণ মম বুলু কন্যা-শোকে।
কতই দেখেছি ভেঙ্গে প্রস্তর মস্তকে॥
সে সময় স্মরি মম কাঁপয় হৃদয়।
কণ্ঠাগত প্রাণ তব অন্তিম হিক্কায়!
আকুল নয়নে বুলু চাহিতে চাহিতে।
ত্রিদিবের ফুল গেলে ত্রিদিব পুরীতে॥
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী যাও পলাইয়ে,
দেখরে জনক তোর আছে মুখ চেয়ে॥
তোর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র কচি শিশু হায়!
বুলু বুলু করে দেখ ভূ-লুণ্ঠিত কায়?
কচি শিশু মিষ্ট ভাষি ভাসে অশ্রুজলে।
"খুলি মা কোতায় বুলু এনেদে তাহালে॥"
দেখ আসি দশা তব দুখিনী মাতার।
দেখ রে সোণার বুলু দেখ একবার॥

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

No. 414. July, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৭ বর্ষ। ৪১৪ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩০৫—জুলাই ১৮৯৯। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সম্মিলন—রুসীয় সম্রাট সস্ত্রীক অবিলম্বে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। ইংরেজ ও রুষ এখন পৃথিবীর বেশী ভাগের প্রভু, ইহাঁদের সম্মিলন জগতের পক্ষে শুভসূচক মনে করা যায়।

ভারত-গৌরব—এ বৎসর কেম্ব্রিজ গণিত ট্রিপোতে একজন ২৩ বর্ষীয় ভারতীয় যুবক সকলকে পরাভব করিয়া "সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান স্থানীয় হইয়াছিলেন। ইনি বোম্বাইবাসী, ইঁহার নাম রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরঞ্জপি। ১৮৯১ সালে ১৫ বৎসর বয়সে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ইনি সর্ব্বপ্রথম হন, মধ্য পরীক্ষাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ১ম শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম হন। ১৮৯৬ সালে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ইনি স্বদেশহিতৈষিতা ও ত্যাগস্বীকারেও আদর্শস্থল। ইনি ফার্গুসন কলেজের ছাত্র, র‍্যাঙ্গলার হইয়া আসিলেও তথায় ২০ বৎসর কাল অনধিক ৭০ টাকা মাসিক বেতনে কার্য্য করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন।

রাজ-প্রতিনিধির সৌজন্য — রঘুনাথের পরীক্ষার সুফল বাহির হইবামাত্র মহাত্মা কুর্জন ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ্যগণের নিকট তারযোগে মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এইত প্রকৃত প্রজা-বাৎসল্য।

হাইকোর্ট জজদের শুভগ্রহ—ষ্টেট সেক্রেটারী আদেশ করিয়াছেন হাই কোর্টের জজেরা অতঃপর মাসিক ৩৭৫০ স্থলে ৪০০০ টাকা বেতন পাইবেন এবং ৫৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারিবেন, আর ১৪॥

বৎসর স্থলে ১১॥ বৎসর জজীয়তী করিলে পূরা পেনসন পাইবেন।

ভারতবাসীর উচ্চ সম্মান—ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষাগুরু আবদুল করিম সম্প্রতি বিকৃটোরিয়ান্ অর্ডারের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—লেডী কুর্জ্জন সিমলায় ইহার সেণ্ট্রাল কমিটী লইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং ইহার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন।

রুসিয়ায় দুর্ভিক্ষ—উত্তর ও মধ্য প্রদেশে দারুণ শীতে শস্য নাশ এবং দক্ষিণ প্রদেশে অনাবৃষ্টি হেতু রুসিয়াতে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। ভারতের দুঃসময়ে রুসিয়া অনুকূল হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন! ভারতবাসীদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ উপযুক্ত সময়।

হাতী ধরা—আসামের নানা হাতি-খেদা হইতে এ বৎসর ৩২৮টী হাতী ধৃত হইয়াছে। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪৮০০ টাকা লাইসেন্‌স কর পাইয়াছেন।

নিম্ন স্ত্রী-শিক্ষা পরীক্ষা—গত বৎসর বঙ্গদেশে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় ৪ জন, মধ্য বাঙ্গলায় ১৬ জন, উচ্চ প্রাইমারীতে ৮২ জন এবং নিম্ন প্রাইমারীতে ৮৯৯ জন বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছে। দিন দিন আরও ভাল ফল ফলিবে আশা করা যায়।

মাজেষ্ট্রেটী পরীক্ষার ফল—বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, ও শরৎকুমার রাহা বি, এ, ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছেন। ৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছোট লাটের অনুগ্রহে সব-ডেপুটি পদ পাইয়াছেন।

বিলাত যাত্রা—বরদার গুইকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন।

উচ্চাঙ্গের বিবাহ—কুচবিহারের মহারাজার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের পুত্র সিবিলিয়ান্ জ্যোৎস্না ঘোষালের শুভ বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নির্ব্বিঘ্নে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হউক।

বিজ্ঞান রহস্য।

সমুদ্রের বিস্তার ও গভীরতা।

স্থল ও জলময়ী পৃথিবীর স্থলভাগাপেক্ষা জলভাগ অনেক অধিক। এখনকার বৈজ্ঞানিক গণনানুসারে স্থলাংশের পরিমাণ প্রায় পাঁচকোটি দশলক্ষ বর্গ মাইল, কিন্তু জলাংশের পরিমাণ তের কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল; সুতরাং জলভাগ স্থলভাগাপেক্ষা আড়াই গুণেরও অধিক। ভূগোলের আধুনিক নিয়মানুসারে জলখণ্ড প্রধান পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটী,

জলভাগ মহাসাগর নামে খ্যাত। আমাদিগের পুরাণোক্ত সপ্ত সাগরের মধ্যে লবণ সাগর আধুনিক ভারত মহাসাগর বলিয়া বোধ হয়, অন্য ছয় সাগর খুঁজিয়া মিলে না। দধি ক্ষীর ইত্যাদি সাগরের অস্তিত্ব কেবল কাব্যে বা কল্পনায়—তাহা বহির্জগতের ব্যাপার নহে। পাঠিকাদিগের মধ্যে যাহাঁরা ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পাঁচটি মহাসাগরের নাম কি কি। আসিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার আয়তন ছয় কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল, ইহার আকার ডিম্বের ন্যায়। তৎপরে, আতলান্তিক মহাসাগর। ইহা দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত, পরিমাণ তিন কোটি দশ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার পূর্ব্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম দিকে আমেরিকা। ভারত মহাসাগর ভারতবর্ষের নিম্নে অর্থাৎ দক্ষিণে। ইহার পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, পরিমাণ আড়াই কোটি বর্গ মাইল। পৃথিবীর উত্তর মেরু-বেষ্টিত উত্তর মহাসাগর, পরিমাণ প্রায় ছয় কোটি; ও দক্ষিণ মেরুবেষ্টিত দক্ষিণ মহাসাগর, পরিমাণ আট কোটি বর্গমাইল। প্রশান্ত মহাসাগর যেমন আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ ইহার গভীরতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার গভীরতম খাদ ২৯,৪০০ হাত। নদী ও তড়াগাদির গভীরতা যেমন মধ্যস্থলেই অধিক হইয়া থাকে, সমুদ্রের গভীরতা সেরূপ নহে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে মহাসমুদ্রের গভীরতম খাদ স্থলের নিকট। জাপানের উত্তর পূর্ব্ব কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের স্থল হইতে কেবল ৫৪ ক্রোশ দূরের সমুদ্রখাত ৪৬৫৫ ফেদম অর্থাৎ ২৭০০০ পাদ, কিন্তু ইহার ৩০ ক্রোশ উত্তর বা পূর্ব্বে তাহা স্বল্পগাধ ও অগভীর। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উপকূল হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে সমুদ্রের গভীরতা ৪১৭৫ ফেদম। অন্যান্য স্থানেও স্থল হইতে অল্প দূরেই সমুদ্রের গভীরতম খাদ। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতার গড় পরিমাণ ২৫৮০ ফেদম* ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা কিঞ্চিদূন ২৪০০ ফেদম। প্রশান্ত মহাসাগরই সকল সাগর অপেক্ষা গভীর। পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকা ইহাতে ঢালিয়া দিলে ইহার সপ্তমাংশ মাত্র পূর্ণ হইতে পারে। আতলান্তিক মহাসাগর পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট অধিক পরিচিত। ইউরোপ ও আমেরিকার পোত সকল নিয়ত ইহার উপর দিয়া যাতায়ত করিতেছে, সুতরাং ইহার অনেক স্থানের পরিমাণ যথাযথ নির্ণীত হইয়াছে। ইহার গড় পরিমাণ ২২০০ ফেদম। ভারত মহাসাগরের অনেক অংশ দ্বীপসঙ্কুল ও মগ্ন পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, সিংহলের দক্ষিণ হইতে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত একটী বিস্তীর্ণ নগশ্রেণী আছে ও তাহার দক্ষিণেই এক বিশাল ভূখণ্ড ছিল, তাহা কয়েক সহস্র বর্ষ মাত্র জলমগ্ন হইয়াছে। সমুদ্রের জল হ্রাস

* ৬ ফিট বা ৪ হাতে এক ফেদম।

হইলে অদ্যাপিও স্থানে স্থানে মগ্ন নগরের ধ্বংস-চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যবদ্বীপের মহামেরুর অগ্ন্যুৎপাতে যখন তত্রত্য এক বিশাল ভূমিখণ্ড সমুদ্র-গর্ভসাৎ হয়, সেই সময়ে অনেক দূর সমুদ্রগর্ভে একটী নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও সভ্যতা-পরিজ্ঞাপক অনেক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা দুই সহস্র ফেদম। উত্তর ও দক্ষিণমহাসাগর সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন থাকাতে তথায় যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন অতি অল্প স্থানই আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের গভীরতা নির্ণয়েরও সুবিধা নাই। তবে অন্যান্য মহাসাগরের ন্যায় তাহাদের গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের অপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

লোক-মাতা ইবের* সমাধি-মন্দির।

মেক্কা বন্দরের সন্নিহিত জিডিয়া একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে লোকমাতা ইবের সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তর-ছাদ ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষ উথিত হইয়াছে; তাহারই নিম্নে আদি মাতা ইবের সমাধি। বৃক্ষটী আতপত্রের ন্যায় দিবারাত্রি বৃষ্টি-হিমাতপ হইতে পবিত্র-সমাধি ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। সমাধি-ক্ষেত্র সমুচ্চ শ্বেত প্রস্তরময় প্রাকারে বেষ্টিত। প্রতি সপ্তম বৎসরে এখানে এক একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। দূর দূরান্তর হইতে অনেক যাত্রী এই সময় সমাধি-মন্দির সন্দর্শনার্থ আগমন করে। বিশেষতঃ জুনের তৃতীয় দিবস অতি পবিত্র দিন। এই দিন এবেলের† মৃত্যু হয়। কেইন তদীয় ভ্রাতা এবেলকে এই স্থানে বধ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রথম শোণিতে কলঙ্কিত করে। এইদিন অনেক ভক্ত যাত্রীর আগমন হয়। মন্দিরের দ্বার চন্দ্রাতপের ন্যায় কবরের উপরে উদ্ঘাটিত হইয়া সমস্ত রজনী খোলা থাকে এবং নিশীথ-সময়ে সমাধি হইতে গম্ভীর শোকার্ত্ত-নাদ উথিত হয়, ভক্তবৃন্দ ইহা স্পষ্ট শুনিতে পান। আরবদিগের বিশ্বাস যে ঐ স্থানে এবেলের শবও নিহিত আছে। এই দিন তাঁহার প্রেতাত্মা সমাধি হইতে উথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। আরব্য পুরাণে উক্ত আছে যে ইব ২০০ পাদ অর্থাৎ কিঞ্চিদূন ১৩৪ হস্ত দীর্ঘ ছিলেন। সম্প্রতি

* ইহুদী ও মুসলমানদিগের মতে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম মনুষ্য আদম এবং প্রথম রমণী ইব। আর সকল মানব ইহাঁদেরই সন্তান।

† আদম ও ইবের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কেইন ও কনিষ্ঠ এবেল।

ফরাসী বিজ্ঞান সভার একজন কোবিদপ্রবর এই উপাখ্যানের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া লিখিয়াছেন যে, আদম এবং ইব উভয়ের দেহই দুই শত পাদ পরিমিত ছিল। ইহাদিগের বাসস্থান পবিত্র ইদন-উদ্যানে (garden of Eden) কর্ণ নামক একটী স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানটী বাগদাদ হইতে ফাও নগরে যাইবার পথে সাটেল আরব (টাইগ্রিস) নদের উপকূলে অবস্থাপিত। কর্ণও আরবদিগের একটী তীর্থস্থান। সেখানে তাহারা মিলিত হইয়া উৎসব করে।

ধূলিকণা।

বায়ু-হিল্লোলে ধূলিকণা পরিচালিত হইয়া প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে পরিবর্ষিত হইতেছে। ঘূর্ণবাত্যানীত ধূলিরাশি যখন গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঊর্দ্ধে উথিত হয় এবং সূক্ষ্মতর বায়ুমণ্ডল ভেদে অসমর্থ হইয়া চৌদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনকার দৃশ্য যেমন ভয়ানক, তাহার ফলও তদ্রূপ অনিষ্টকর। যাঁহারা নগরে বাস করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন রাজপথের সমস্ত না হউক, অধিকাংশ ধূলি প্রবল বায়ু সহকারে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল গৃহসজ্জা বিকৃত ও অঙ্গনাদি অপরিষ্কৃত করে না, ভক্ষ্য দ্রব্যাদিও স্পর্শ করিয়া ভোজনের ব্যাঘাত করে, ও শরীরে সংলগ্ন হইয়া ক্লেদকর ও ক্লেশকর হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের, বিশেষতঃ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী স্থলের তো কথাই নাই। তথায় নিয়ত ধূলিরাশি উথিত ও বর্ষিত হইয়া কেবল মনুষ্যের নয়—পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদ প্রভৃতিরও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত ধূলিরাশি অগ্নিময় বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে থাকে। এই সকল স্থূল ধূলির ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেক সমীরহিল্লোলে যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সূক্ষ্মতম ধূলিকণা অনবরত উথিত ও পতিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা দৃশ্যমান হয় না। তাহার কিয়দংশ মাত্র বাতায়নস্থ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দৃষ্ট হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিবিধ আকারের ধূলিকণা নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের গৃহসামগ্রী সকল ছাইয়া ফেলিতেছে, পানীয় ও ভোজ্যে মিশ্রিত হইয়া খাদ্যের গুণের পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যোগে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নানা ব্যাধির আকর হইয়া আয়ু হ্রাস করিতেছে। আবার অণুবীক্ষণ সহকারে যদি এই ধূলিকণার ব্যবহার সন্দর্শন করা যায়, তাহা হইলে অবাক্ হইতে হয়। আমরা ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে যে কি প্রকারে জীবিত আছি, তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি না। বাস্তবিক এই ভূমণ্ডলাচ্ছাদক বায়ুমণ্ডল ধূলিরাশি ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা বায়ুজীবী, সুতরাং ধূলিজীবী বলিলেও অসঙ্গত হয় না। অপর পক্ষে আমাদিগের শরীর ধূলিময় এবং খাদ্যও ধূলির বিকার, সুতরাং ধূলি হইতে আমাদিগের অনিষ্টাশঙ্কা কল্পনা মাত্র।

যে ধূলা হইতে এত অনিষ্টাশঙ্কা, সেই ধূলা হইতে জগতের কত প্রকার মহৎ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে। করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ? ধূলিকণা না থাকিলে অনিলে জলাংশের সম্ভাবনা থাকিত না; কুজ্ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতি কিছুই হইত না; পৃথিবীর উপরিভাগ নিরবচ্ছিন্ন কেবল শুষ্ক মৃত্তিকায় আবৃত থাকিত। বায়ুমণ্ডলে অহরহ যে সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ধূলিকণা ব্যতীত তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। আমরা কখন কখন নভোমণ্ডলের যে উজ্জ্বল সুনীল বর্ণ দেখিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করি, তাহাও ধূলিকণার কল্যাণে। সূর্য্যের সূক্ষ্মতম কিরণকণা ও সূক্ষ্ম আলোক-তরঙ্গ সুনীল বর্ণের। সূক্ষ্মতম ধূলিকণা বায়ুর উপরিস্তরে চালিত হইলে উক্ত কিরণকণা স্পর্শে নীলবর্ণ হয়, তাহাই আমাদিগের নয়নমণিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থূলালোক-তরঙ্গ হরিত, পীত, ও লোহিত; অপেক্ষাকৃত স্থূল ধূলিকণাও তাহা স্পর্শ করিয়া তৎ তৎ রঙ্গের হইয়া যায়। স্থূল ধূলি ধূসরবর্ণ। পৃথিবীর উচ্চ স্থলে সূক্ষ্ম ধূলির আবির্ভাব, সুতরাং তথায় রঙ্গেরও বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উচ্চতম পর্ব্বতশিখরের উপরিস্থ নভঃ সুনীলবর্ণ বোধ হয়—যেন তথায় ধূলি নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেশে স্থূল ধূলির প্রাচুর্য্য হেতু ধূলির বর্ণ দৃষ্ট হয়। শুষ্ক বায়ু না হইলে সূক্ষ্মধূলিকণা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপরিতন স্তর নিয়ত নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সূক্ষ্ম ধূলিকণা জলকণার সহিত বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে যখনি শীতল হয়, তখনি গাঢ় হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় এবং অবশেষে বারিধারা সহিত বর্ষিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সংসাধন করিয়া থাকে।

যাঁহারা মরুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম ধূলিকণার অত্যদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন ও জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে বিশেষ স্থানের বিশেষ অভাব পূরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না। আমরা এক সময় গ্রীষ্মের মধ্যভাগে রাজপুতানায় গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানকার মরুপ্রদেশ দিবারাত্রি উত্তপ্ত হইয়া থাকে, একটু মেঘের সঞ্চার হইলে তাহা কোথায় উড়িয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টিপাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। এক দিন গ্রীষ্মের এমন প্রখরতা যে বোধ হইল সপ্ত সূর্য্য উদয় হইয়াছে। গৃহপ্রাচীর, গৃহসামগ্রী, শয্যা যাহা স্পর্শ করি, উত্তপ্ত। রাত্রিকালেও বায়ুহিল্লোল অগ্নিময়! জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইল। অন্ধকার গাঢ় হইতে এমন গাঢ়তর, যে নিজের হস্তপদ নিজের দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা কি? প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, সে দেশের আঁধি বা সূক্ষ্ম ধূলাবৃষ্টি। এই আঁধির পর বায়ু এমন ঠাণ্ডা হইল যেন ভারী এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পরে সমস্ত দিন বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইল। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জল দ্বারা যে কার্য্য করেন, জলাভাবে ধূলা দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন!! তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাভারতের কথা।*

পুরা কালে ছিলা রাজা ভরত প্রবীণ,
যাঁ'হতে ভারতবর্ষ খ্যাত চির দিন।
তাঁর বংশধর কুরু পুরুষ প্রধান,
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যাঁ'হতে বাখান।
কুরু-কুলতিলক শান্তনু শান্ত ধীর,
যাঁর পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম মহাবীর;
প্রপৌত্র তাঁহার তিন খ্যাত তিনপুর,
জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, কনিষ্ঠ বিদুর।
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য না লভিল,
রাজা হয়ে পাণ্ডু প্রজাসকলে পালিল।
ধৃতরাষ্ট্র শত-পুত্র, জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন,
অধার্ম্মিক ঘোর ক্রূর পাষণ্ড দুর্জন,
অনুজ সকল গুণে তাহার মতন।
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ—পাঁচটী রতন।—
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ সবাকার,
দ্বিতীয় তনয় ভীম বীর অবতার।
তৃতীয় অর্জ্জুন ধরাধামে নর-দেব,
মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ নকুল সহদেব।
ভাগ্যদোষে পাণ্ডু রাজা অকালে মরিল,
কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী সহমৃতা হৈল॥
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী পঞ্চ শিশু কোলে লয়ে,
বঞ্চেন দুঃখেতে কাল অন্ধের আলয়ে।
ক্রূরমতি দুর্য্যোধন সদা ছিদ্র ধরে,
পাণ্ডবনিধন তরে নানা যুক্তি করে,—
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ হয় তবে তার,
পাণ্ডবের মৃত্যু বিনা চিন্তা নাহি আর।
প্রধান সহায় কর্ণ—অঙ্গদেশ-পতি,
মাতুল শকুনি আর অন্ধ দুষ্টমতি;—
মন্ত্রণা করিয়া শেষে পাণ্ডুপুত্রগণে,
পাঠায় বারণাবতে জননীর সনে।
কৌশলে গালার ঘর করিয়া নির্ম্মাণ
নিরূপিল তাহাদের তরে বাসস্থান।
অর্দ্ধ নিশাকালে, যবে রহিবে নিদ্রিত,
অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া মারিবে নিশ্চিত।
বিদুরের সাহায্যে বিপদে হয়ে পার,
পলাইয়া রক্ষা পায় পাণ্ডু-পরিবার।
দ্বাদশ বৎসর করি অরণ্যে ভ্রমণ,
লক্ষ্য বিদ্ধি দ্রৌপদীরে করিলা গ্রহণ।
এক লক্ষ রাজা এসেছিল স্বয়ম্বরে,
সবাকারে ভীমার্জ্জুন জিনিল সমরে।
মাতার আদেশ আর ধাতার লিখন,
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিলা পঞ্চজন।

পূর্ব্ব অপরাধ স্মরি লজ্জিত হইয়া,
তোষিল পাণ্ডবে অন্ধ রাজ্য ভাগ দিয়া।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিয়া নির্ম্মাণ,
রাজ্য কৈল পঞ্চ ভাই ইন্দ্রের সমান।
মহাযজ্ঞ রাজসূয় অনুষ্ঠানফলে
সার্ব্বভৌম সম্রাট্ পাণ্ডব ধরাতলে।—
হইয়া অস্থিরচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন,
পাশা ক্রীড়া ছলে হ'রে নিল রাজ্য ধন;
করি পণ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস—
একবর্ষ অজ্ঞাত না হইবে প্রকাশ;
প্রকাশে পুনশ্চ বনবাস সুনিশ্চয়,
কপট পাশায় পাণ্ডবের পরাজয়।
বার বর্ষ নারী সনে ভ্রমি বনে বনে,
বিরাটে অজ্ঞাত বর্ষ বঞ্চে পঞ্চ জনে।
সময় কাটিয়া দেশে দিলা দরশন,
রাজ্যভাগ চাহিলা—না দিল দুর্য্যোধন।
অবশেষে মাগিলেন গ্রাম পাঁচখানি,
তাহাও না দিল দুর্য্যোধন অভিমানী।
"তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রভাগে যত ভূমি ধরে,
বিনা যুদ্ধে না দিব" কহিল দম্ভভরে।
অগত্যা পাণ্ডবগণ মহা ক্ষুণ্ণমন,
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা করে আয়োজন।
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন,
কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিন ব্যাপী রণ।
মহারণে কুরুবংশ হইল সংহার,
ধর্ম্মবলে জয়ী পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপিলা,
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ কত অনুষ্ঠিলা;
অবশেষে রাজ্য দিয়া পৌত্র পরীক্ষিতে,
স্বর্গ আরোহণ কৈলা দ্রৌপদী সহিতে।
ভারত পঙ্কজ রবি মহাকবি ব্যাস,
মহাভারতের কথা করিলা প্রকাশ। *

* ইতঃপূর্ব্বে মহাকাব্য রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য মহাভারতের কথা সঙ্কলিত হইল। যাঁহারা সমস্ত ভারত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এতদ্দ্বারা মূল আখ্যায়িকা অবগত হইতে পরিবেন।

বলেন্দ্র ও বলবতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বলবতী দেখিল আর রক্ষা নাই। তখন সে জীবনের আশা ত্যাগ করিল— ভাবিল এ দুঃখাবহ অসার জীবন আর চাহি না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।

পরিচারিকা বলবতীর আহারের জন্য ক্ষীর সর নবনী লইয়া আসিল, দাসী কুঙ্কুম-বাসিত শীতল জল আনিয়া দিল।

বলবতী কহিল "তোমরা এ সব লইয়া যাও, আজ আমি কিছুই খাইব না। দাসীরা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধা আসিয়া কহিল "বাছা কিছু খেলে না?"

বলবতী। না, আহারে আর ইচ্ছা নাই।

বৃদ্ধা তখন অতি যত্নের সহিত সেই বিমুক্ত কুঞ্চিত কৃষ্ণ অলকাবলী বিন্যাস করিয়া বিকশিত সুচারু পুষ্পে খচিত

করিয়া দিল। বলবতী কেশ খুলিয়া সে সব দূরে নিক্ষেপ করিল—কহিল এ সবে আমার আর কোন দরকার নাই।

বৃদ্ধা। কাল তোমার বলভদ্রের সহিত শুভ বিবাহ হইবে, আজ তোমার বাছা, বড় আমোদের দিন; কিন্তু প্রফুল্ল না হইয়া তুমি বিষণ্ণ হইয়াছ কেন? তুমি মা যেমন রূপবতী, তেমনি বিদ্যাবতী ও গুণবতী; স্বামীও তদ্রূপ লাভ করিতেছ, তবে তোমার এ মনোমালিন্যের অর্থ কি?

বলবতী। মা, আমি বলভদ্রের এক-জন কুটুম্ব পরিবারের কন্যা। পিতৃমাতৃ-হীনা নিরাশ্রয়া অনাথা হইলে দয়াপরবশ হইয়া তুমিই আমাকে এই গৃহে আনয়ন কর। তখন আমি সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা, আর বলভদ্র দশমবর্ষীয় বালক ছিল। বল-ভদ্রের মাতা নাই, তুমিই আমাদের উভয়ের মাতৃস্থানীয়া। বলভদ্রের অনু-গ্রহে তোমার যত্নে রাজকন্যার ন্যায় সুখে লালিতা পালিতা হইয়াছি। কোন দিন কোন কষ্টানুভব করি নাই। বলভদ্র ও তুমি আমাকে এ গৃহে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখিয়াছ। আজ দশ এগার বৎসর তোমার নিকট রহিয়াছি, তোমাকে মাতার সমান যত্ন ও ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু এক দিনের তরেও মনের কথা তোমাকে জানিতে দেই নাই।

বলবতী ক্ষণকালের জন্য নীরব হইল। বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বলবতী। মা, আগামী কল্য আমার জীবনের শেষ দিন বলিয়া জানিবে।

বৃদ্ধা বলবতীর মনোভাব বুঝিল— কহিল বুঝিলাম বলভদ্রকে বিবাহ করা তোমার অভিপ্রায় নহে।

বলবতী। আমি বলভদ্রকে বিবাহ করিব না, বরং প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে একবার আমি বড় পীড়িত হইয়াছিলাম, সে সময় বিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া দারজিলিং লইয়া যাও। সে স্থানে গিয়া অল্প দিনেই আমার ব্যাধির উপশম হইল। প্রত্যহ প্রভাতসময়ে ও সায়াহ্ন-কালে তোমার সঙ্গে পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিতাম।

সেই সময় একজন নর-দেবতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমাদের বাসার নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত, ক্রমে ক্রমে সম্বন্ধ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। প্রথমে তাঁহার চক্ষে চক্ষু সংলগ্ন হইলে লজ্জায় লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুটা-ইয়া পড়িতাম, পরিশেষে সেই চক্ষুতে আপন চক্ষু সংস্থাপন করিবার জন্য অধীর হইতাম। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইল। তাঁহার পরিচয়ে আমি জানিলাম তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের কুলপ্রদীপ, এক্ষণে দরিদ্র। আমার পরি-চয় তিনি জানিলেন। তোমার অগোচরে আমরা সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পিত কাননতলে নির্জ্জন গিরি-উপত্যকায় উপবেশন করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া

থাকিতাম। কখন বা তিনি আপন অঙ্কে আমার মস্তক তুলিয়া লইতেন, কত মধুর কথা কহিতেন, আপন চম্পকাঙ্গুলী দ্বারা ধীরে ধীরে আমার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেন। আমি হতভাগিনী সেই স্বর্গীয় সুখে বিভোর হইয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতাম। কিন্তু আমার সে সুখের স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। সে সুখের মন্দির অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। তুমি আমাকে লইয়া গৃহে আসিলে। ঐ যে প্রশান্ত সমুদ্র-তট, ঐখানে তিনি আমাকে আর একবার দেখা দিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কহিলেন কিছু দিন অপেক্ষা কর, এই নির্জ্জন সমুদ্র-তটে পুনরায় আমার দেখা পাইবে। তখন আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু কৈ সেত অনেক দিনের কথা হইল, নিত্যইত আমি সেই সমুদ্র-তটে গিয়া উপবেশন করি, নিত্যইত হৃদয়-দেবতার উপাসনা করি—অনুসন্ধান করি, কিন্তু এক দিনওত দেখা পাই না।

অকস্মাৎ বৃদ্ধার প্রাণ কম্পিত হইল—সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল—আপন অজ্ঞাতে অপাঙ্গদেশে অশ্রুজল বহিল। সে বলবতীকে সান্ত্বনা করিয়া বলভদ্রের নিকটে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ বলবতীর প্রাণের মধ্যে চিৎকারের উপর চিৎকার উঠিতেছে। বলেন্দ্র! তুমি কোথায়? বলেন্দ্র! তুমি কোথায়? বলেন্দ্র তুমি একবার আসিয়া দেখ তোমার বলবতীর কি শোচনীয় অবস্থা। কাল তাহার শুভ বিবাহ, কাল তাহার মৃত্যু। কিন্তু মরিতে সে ভয় পায় না, তোমাকে যে একবার না দেখিয়া মরিতে হইবে তাহাতেই সে এত কাতর। বলবতী তখন স্খলিত-অঞ্চলে, বিমুক্তকেশে বলেন্দ্রকে স্মরণ করিয়া কতই কাঁদিল, যুক্তকরে ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া কতই কাঁদিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কেহই তাহাকে দেখা দিল না, কেবল তাহার দুর্ব্বল মন নব বলে সতেজ হইল। সে উঠিল।

তখন রজনী গভীরা, কিন্তু আকাশে চন্দ্র নাই, তারা নাই। আকাশ ঘোর জলদাবৃত, সময় সময় বিদ্যুদ্বিকাশ হইয়া অন্ধকারকে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত করিতেছে।

বলবতী নৈরাশ্য-পীড়িত যন্ত্রণাময় হৃদয় লইয়া উঠিল, ধীরন্যস্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বলবতী চলিল—তারাশূন্য মেঘাবৃত তমিস্রাময় রজনী নিরীক্ষণ করিয়া সে ভয় পাইল না বা পশ্চাৎপদ হইল না। ক্ষণকাল পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রবল বায়ুভরে বৃক্ষশ্রেণী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভয় পাইল না বা পশ্চাৎপদ হইল না। মনোহর বিদ্যুৎ-রেখা-বিশিষ্ট মেঘ সকল তাহার সেই বিদ্যুৎ তুল্য

মধুর মূর্ত্তিখানি শত্রুর চক্ষুপথ হইতে আবৃত করিয়া রাখিল।

সে চলিল—একাকিনী চলিল। তাহার সেই বিষাদ-কাতর অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখের পানে কেহ চাহিল না—কেহ তাহাকে ফিরাইতে আসিল না। হৃদয়ের অতিরিক্ত আবেগে অস্থির হইয়া সে ঘোর অন্ধকারাবৃত বর্ত্মে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

যখন রজনী প্রভাত হইল, তখন সে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি তাহার ভয় দূর হইল না। শরীরে শক্তি নাই—হৃদয়ে বল নাই, দুর্নিমিত্ত-জনিত বিষাদে তাহার মুখারবিন্দ ম্লান হইয়াছে, তথাপি সে পথ চলিতে লাগিল।

সমস্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বলবতী এক গহন বিপিনে প্রবেশ করিল। সেখানে বলবতী তরুকুসুম ও কিশলয় দ্বারা পূজিত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল। কুসুমোদ্ভাসিত গিরিকাননমধ্যে ফুল্লচন্দ্রিকা-মণ্ডিতা মধুযামিনীর সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপতলে আলুথালুবসনা মুক্তকুন্তলা বলবতী প্রকৃত বনদেবী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন শিশির-সন্তাপ-শীর্ণা মৃণালিনীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতা বলবতী একাকিনী বসিয়া নানারূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল, সে তখন কাঁদিল। বলবতীর হৃদয়ের শিরা নিঙড়িয়া শত সহস্র ধারায় নেত্রপথ দিয়া অশ্রুজল বহিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বদেশে কুন্দ-কুসুম মালতীফুল শোভা পাইতেছিল, তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল না। সে তখন অবশ-শরীরে একটি নবতৃণাচ্ছন্ন স্থানে শয়ন করিল।

তখনও তাহার হৃদয় চিন্তায় বিদগ্ধ হইতেছিল। সেই মাতৃতুল্যা বৃদ্ধার স্নেহ ভালবাসার কথা তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সে আপনার পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিতে চাহিল, কিন্তু স্মরণ হইল না। পিতামাতার পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিতে চাহিল, ভাল স্মরণ হইল না, অস্পষ্ট মনে হইল। তৎপশ্চাৎ তাহার মনে দার্জিলিঙ্গের কথা উঠিল। সেই পর্ব্বতপথ—সেই নির্জ্জন স্থান—সেই একজনের পবিত্রমূর্ত্তি মনে হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত প্রেমাদরের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। সে যে তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু গাইত—

"একটু আদর সখে, একটি * ।"

তাহাও মনে হইল। সেই নৈশ নির্জ্জন সমুদ্রতটে তাঁহার পুনরাগমন ও পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনের কথা স্মরণ হইল। ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য গিরি উপত্যকা বনভূমি নদ নদী সমস্ত তাহার সম্মুখে প্রবলবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই সময় কে তাহাকে ধরিয়া তুলিল ও অতি আদরের সহিত আপনার কোলে বসাইল। (ক্রমশঃ)।

শান্তি-সাধনা।

বৃথা হায়, বৃথা এ জীবন,
বৃথা সব পিপাসা কামনা,
চিরদিন ঘুরে ফিরে, বেড়াইব সিন্ধুতীরে,
এ জনমে একদিনও
তোমারে পাব না! ১।

—তবে কেন উষা আসে নিতি,
তবে কেন হাসে শশধর?
তুলি সোণা মুখখানি, কেন ফোটে ফুলরাণী
"বউ কথা কও" কেন
ছড়ায় সুস্বর? ২।

তবে সে বসন্ত আসে কেন
উছলিয়া শ্যামল কিরণ?—
শরতের নীলাকাশে, অত শোভা কেন হাসে?
বরষা-সুন্দরী কেন
মাতায় জীবন? ৩।

কেন তবে বাঁশীর সঙ্গীতে
কার কথা আসে যেন মনে,
মানবের কেন আশা, কেন স্নেহ ভালবাসা,
স্বরগের ছবি কেন
শিশুর আননে? ৪।

প্রাণে কেন প্রেমের বন্ধন
বুকে কেন অটল বিশ্বাস?
কেন গো অতীত-স্মৃতি, মরমে জাগায় প্রীতি?
শূন্য ঘরে লাগে কেন
দেবের নিঃশ্বাস''। ৫।

আমি যদি তোমারে পাব না,
কেন সুখ সৌন্দর্য্য ধরায়?—
জগৎ মরিয়া যাক্, শব হয়ে পড়ে থাক্,
পুনঃ তার হাসি অশ্রু,
কেন সমুদায়? ৬

আমি যদি তোমারে পাব না,
জীবনের কিবা প্রয়োজন?
দুঃসহ অসহ ভার, কেন মিছা বহি আর?
কেন বহি আশা তৃষা,
সাধ আকিঞ্চন? ৭।

বৃথা তবে মানব-জীবন—
মনুষ্যত্ব বিফল আমার?—
বিফল ভূতলে আসা, বিফল সাধনা আশা,
এ সবি বিফল শ্রম
বিশ্ব-বিধাতার?— ৮।

—না না প্রভো, তাওতো হবে না—
সে যে বড় নিদারুণ কথা,
তবে আমি ঘর বাঁধি, গড়ি, ভাঙি, হাসি, কাঁদি,
তোমাতেই মিশে যাক্
আমিত্ব মমতা। ৯।

যাহা কিছু এই অভাগার,
তাহাই তোমার কর তুমি,
"জড় দেহ কিছু নয়, জীবনের বিনিময়"
আমি যেন বেঁচে থাকি
সেই পদ চুমি। ১০।

তোমা লাগি গড়িয়া মন্দির
সঁপিব তা' জগতের তরে,
তোমারি বাতাসে হিয়া শতকাজে ঢেলে দিয়া
করিব তপস্যা তব
প্রাণ মন ভ'রে। ১১।

তোমারি সোহাগ-হাসি মেখে
ভূমণ্ডল উঠিবে হাসিয়া,
তোমারি স্নেহাশ্রুজলে, বিশ্ব ভেসে যাবে চলে,
আমি সেই মহাস্রোতে
থাকিব ডুবিয়া। ১২।

তোমা ছাড়া আমার জগতে
অণুকণা যেন গো থাকে না,
আত্ম হ'তে, দূর বিশ্বে, হেরিব তোমারি দৃশ্যে,
তোমাহীন স্বর্গে যেন
দেবতা ডাকে না। ১৩।

তবে—
বৃথা নহে সাধনা কামনা,
বৃথা নহে জীবন আমার,
তোমারে পাব না তাই, তোমাতেই মিশে যাই,
মিলন বিরহ-ভরা ঘুচুক আঁধার,
আমি হয়ে মিছা ফাঁকি, তোমাতেই বেঁচে থাকি,
অশান্ত পরাণে শান্তি আসুক আবার;
আমার কিছুই নাই সকলি তোমার। ১৪।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দেবল-রাজ।

(১৪)

যে দিন দেবনাথ পালের জননী পিত্রালয়ে গমন করেন, সেই দিন হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে দেবনাথের অদৃষ্টচক্রে যে সকল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ বিবৃত হওয়া অসম্ভব। সে সকল বিষয়ের যথাযথ বর্ণন আখ্যায়িকা পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবারও আশা নাই। এজন্য এই অধ্যায়ে তাহার স্থূল বিবরণ মাত্র বিবৃত হইবে।

বঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভাগ সকলের মধ্যে যে দুইটি বিভাগের নাম ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ, পূর্ব্বকালে এই দুইটি বিভাগের নাম ছিল, বঙ্গ ও বগড়ী। এখনকার পরগণা সকল, তখন "চাকলা" নামে অভিহিত হইত। দেবনাথ পাল দেবলরাজ স্পর্শমণির প্রভাবে বঙ্গ ও বগড়ীর অন্তর্গত বিংশতি চাক্‌লার অধীশ্বর হইয়া "দেবলরাজ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হাঙ্গরী বাঁক্, দেবগ্রাম নাম ধারণপূর্ব্বক দুর্গ ও পরিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া দেবলরাজের রাজধানী হইয়াছিল। দেবগ্রামে এখন যে চারিটী খুব দেখা যায়, তাহাই দেবল-দুর্গের "বুরুজ" ছিল। উহার উপরিভাগ হইতে শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষিত হইত। এককালে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণে লোকে যে তৃণকুটীরময় দরিদ্রাবাসকে রাজপুরী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, দৈবচক্রে সেই আবাস সত্য সত্যই রাজপুরী হইয়াছিল। "দেওয়ান-

খানা," "নহবৎখানা," "হাওয়াখানা," "আমখাস্," অন্তরাবাস, যজ্ঞশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, তোরণ, অশ্বশালা, গোশালা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, টোল, অস্ত্রাগার, কারাগার, সৈন্যাবাস ইত্যাদি বহুসংখ্য সুধাধবলিত অট্টালিকায় দেবল রাজধানী দেবগ্রাম পরিশোভিত হইয়াছিল। সহর গোবর্দ্ধনের "মানস সরোবর" এবং গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীকুণ্ড যাইবার পথবর্ত্তী "কুসুম সরোবর" অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বে অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ দুইটী স্বচ্ছ-সলিল সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা কেহই ভুলিতে পারেন না। দেবল দীঘিও চতুষ্পার্শ্বস্থ অট্টালিকানিচয়ে এইরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মাতামহ রাজারাম পাল দেবলের করপ্রদ অধীন সামন্তরূপে পরিণত হইয়া "দাদা সাহেব" উপাধি ধারণপূর্ব্বক দেবলরাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মাতুল চতুষ্টয় রাজস্ব, সৈন্য, পূর্ত্ত ও সন্ধি-বিগ্রহের সর্ব্বতোমুখী প্রভু হইয়াছিলেন। দুই ভগিনীপতি দুইটি চাক্‌লার "ক্রোরীয়ানের" পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। এককালে যে দেবল বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও অসঙ্গতি নিবন্ধন দারপরিগ্রহে সমর্থ হন নাই, সেই দেবল, সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা ষট্ বরাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন করপ্রদ ও মিত্রভাবাপন্ন মণ্ডলগণের নিকট হইতে ছয়টী কন্যা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবলরাজপুরীতে ঐ দ্বাদশটী রমণীই রাজমহিষীরূপে সমাদৃতা হইয়াছিলেন। এই সকল মহিষীর মধ্যে নয় জনের গর্ভে দেবলরাজের ত্রিংশদধিক পুত্র কন্যার জন্ম হইয়াছিল। যে অবস্থায় মানবগণ "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, কমলার কৃপায় দেবলরাজ সে অবস্থার উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

যখন হাঙ্গরীবাঁকের হাঁড়ীগড়া কুমার দেবনাথ পাল দেবল রাজা হইয়াছিলেন, রাজারাম পালের কন্যা রাজমাতা হইয়াছিলেন, তখন যথাকালে একদিন রাজা ও রাজমাতায় যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠক পাঠিকার জন্য সঙ্কলন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জননী কহিলেন,—

"দেবল, তোমার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবৎ যে চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, ওটি কি?" দেবল এখন রাজা;—রাজোচিত শিক্ষা দীক্ষা অনেকই পাইয়াছেন। সৎ, অসৎ, উচ্চ, নীচ, বহুবিধ সঙ্গলাভ ঘটিয়াছে। রাজপদের সুখদুঃখ চিন্তা দ্বেষ ভয়াশা, সম্ভোগ ও প্রতিক্রিয়াদির সহিত বিশিষ্টরূপেই পরিচিত হইয়াছেন। জননীর প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন,—

"মা, বড় দুঃখিত হইতেছি যে, তোমার মনের মত উত্তর দিতে পারিলাম না। দৈবজ্ঞঠাকুর যখন ঐ চিহ্নকে রাজদণ্ড বলেন, তখন রাজপদকে সুখের অবস্থা বলিয়া আমার মনে ছিল। তখন ঐ অবস্থা আমার নিতান্ত দুর্লভ বলিয়াও

ধারণা ছিল। সেই জন্য তৎকালীন দুঃখ স্মরণ করিয়া উহাকে যমদণ্ড বলিয়াছিলাম। কিন্তু যমদণ্ডাপেক্ষা কোন গুরু দণ্ড আমার জানা থাকিলে, এখন ঐ চিহ্নকে তাহাই বলিতাম।" দেবল-জননী কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিতা ও বহুল পরিমাণে বুদ্ধিমতী হইলেও স্ত্রীজাতি, সাংসারিক সুখৈশ্চর্য্য ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, সংসার ভিন্ন আর কোন অধিকতর সুখের বস্তু আছে, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবেন না। তাঁহার সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, সকল দানধ্যান ব্রত নিয়মাদি সাংসারিক সুখের কামনামূলক। তাঁহার পুত্র রাজা এবং তিনি রাজমাতা, এজন্য তিনি আপনাকে এবং পুত্রকে অতিশয় সুখী মনে করিতেন। রাজপদ সুখের অবস্থা নহে, পুত্র-মুখে এই ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ম্রিয়মাণা হইলেন। কহিলেন,—

"দেবল, রাজা হইবার পূর্ব্বে তোমার কি অবস্থা ছিল, আর এখন কি অবস্থা হইয়াছে, একবার মনে করিতে পার কি"?

"পারিব না কেন? তখন আমার, এবং তোমার এবং দুই ভগিনীর এই চারিটীর উদরের অন্ন সংস্থান করিবার জন্য কত দুঃখ পাইতাম; কিন্তু সেই অন্ন সংস্থান হইয়া গেলে সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু এখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে; অথচ একদিন স্বপ্নেও সে সুখের মুখ দেখিতে পাই না। মা, আমার মনে হয়, যে মহাপুরুষের মণি হরণ করিয়া আমি রাজা হইয়াছি, আমার মনের এই শোচনীয় অবস্থা সেই মহাপুরুষের অভিসম্পাতের ফল। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, দেবগ্রামের রাজসিংহাসন তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আমি তাঁহার তৃণকুটীরে গিয়া বাস করি। বিশেষ গত রজনীর শেষভাগে রাজত্ব সম্বন্ধীয় যে ভীষণ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাবীর ও মহাসাহসী দেবলরাজের বদন বিষণ্ণ ও লোচন জলভারায়মান হইল। জননীও তদ্দর্শনে নীরব হইলেন। কৃষ্ণপক্ষীয়া কালসন্ধ্যা আসন্ন হইল। তাঁহাদের উপবেশ প্রকোষ্ঠের বাতায়ন পার্শ্ব দিয়া একটা কালপেঁচা বিকট চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
... ...
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥"

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি ভারতচন্দ্র মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যখন দিল্লীর শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তিন চারিটী ভৌমেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনার অধীন করপ্রদ সামন্তরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ বঙ্গে আগমন করেন। তিনি প্রথমে প্রতাপ আদিত্যের সহিত সন্ধি করিবার বাসনায়

তাঁহার নিকট বিবিধ বহুমূল্য "খেলাত" প্রেরণ করেন। প্রতাপ, খেলাতের অন্তর্গত কেবল তরবালখানি রাখিয়া অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য মানসিংহের নিকট ফেরত্ পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে একখানি লিপিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে লিপির মর্ম্ম এই,—"দিল্লীশ্বরের প্রেরিত খেলাত প্রতাপ বামচরণস্পর্শে পবিত্র করিয়া ফেরত দিলেন এবং যমুনার জলে ধৌত করিবার জন্য তলবারখানি মাত্র রাখিলেন।" দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ আদিত্যের এই সকল কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অবধিই দেবলরাজের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়ে তিনি একদিন স্বপ্নযোগে অবগত হন যেন প্রতাপ আদিত্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। জননীর সহিত কথোপকথনকালে এই স্বপ্নের আভাস দেন। কাল সন্ধ্যাকাল পেচক-কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনাকে তাঁহার সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। কেমন দৈবচক্র এবং কেমন ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য! দেবলরাজ সত্য সত্যই দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

যে দিন জননীর সহিত দেবলের কথোপকথন হইল, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নকালে বঙ্গবিভাগীয় রাজ্য হইতে একটি অশ্বারোহী দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দূত যে পত্র আনিয়াছিল, তৎপাঠে দেবল অবগত হইলেন—তাঁহার পুর্ব্ব রাজ্যের অধিকাংশ প্রতাপ আদিত্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। অচিরকালমধ্যেই রাজধানী আক্রমণ করিবেন। প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মানসিংহ-প্রেরিত বহুসংখ্য সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় ঐ রাজ্যে সমাগত হইতেছে। পশ্চিম দিক্ হইতে দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহী প্রতাপকে আক্রমণ করিবার জন্য মহারথ মহারাজ মানসিংহ দেবলকে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই পত্রে মানসিংহের নামাঙ্কিত মোহর ছিল। এই পত্রের মর্ম্মসহ দেবলরাজের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রাজধানী দেবগ্রামে ঘোষিত হইল। রণভেরি বাজিয়া উঠিল। সৈন্যমধ্যে যুদ্ধসজ্জা আবশ্যক হইল। অশ্ব, গজ, ভারবাহী উষ্ট্র গবাদি যূথে যূথে দেবগ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজধানী অভিনব দুর্গ প্রাচীর পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তথাপি সেই সকলের পর্য্যবেক্ষণ ও পুনঃসংস্কার আরম্ভ হইল। কেননা দেবলরাজের যে দুইটী ভগিনীপতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার একজন প্রতাপের নিকট প্রতিপত্তি ও ধন সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশায় প্রতাপকে দেবলের স্পর্শমণির সংবাদ দিয়াছিলেন। দেবলের অন্তঃপুর অপরিমেয় ধনরত্নে,—বিশেষতঃ পরমা সুন্দরী রমণীরত্নে পরিপূর্ণ, প্রতাপকে সে সংবাদও দিয়াছিলেন। এজন্য প্রতাপ, দেবল-রাজধানী আক্রমণ ও অন্তঃপুর লুণ্ঠন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। দেবলরাজ যুদ্ধযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে কোনও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী দ্বারা সেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। প্রতাপের

দুর্দ্ধর্ষচরিত্র দেবলরাজ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। যদি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়, কি সমরভূমি হইতে রাজধানী প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে প্রতাপ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন, তাহাহইলে মহিষীগণের ও অন্যান্য রাজ-পরিজনগণের কিরূপ অপমান ও বিড়ম্বনা ঘটিবে, কল্পনাযোগে তাহা ও পরিস্ফুটরূপে বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্যই রাজধানী ও অন্তঃপুর পরিরক্ষণের বিশেষ সুব্যবস্থা করেন। অভিযানের কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জননীসহ মহিষীগণ ও পুত্র কন্যাগণকে একত্র আহ্বান করিলেন। সকলকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া কহিলেন "জননি, মহিষীগণ এবং পুত্র কন্যাগণ, তোমরা সকলেই অবহিতচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর। যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য,—যিনি আমার মত চারি পাঁচটী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন;— দিল্লীশ্বরের খেলাত বাম পায়ে ঠেলিয়াছেন;—দিল্লীশ্বরকে কাটিয়া যমুনার জলে তলোয়ারের রক্ত ধৌত করিবেন, এ কথা প্রধান সেনানায়ক মহারাজ মানসিংহকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—আমি এই মুহূর্ত্তে সেই আদিত্য-প্রতাপ যশোহরাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব। যদি আমার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমার সংবাদবাহক ঘুঘু দুটিকে গড়ের বুরুজের উপর দেখিতে পাও, তবে এই পত্রে আমার যে আদেশ লিখিত আছে, তোমরা সকলে তাহাই পালন করিবে।" এই কথা বলিয়া জননীর হস্তে একখানি খাম-আঁটা লোহিতবর্ণের পত্র অর্পণ করিয়াই বেগে বহিস্তোরণে আগমন ও উচ্চৈঃশ্রবাবৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন। শরীররক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যগণও সম্মুখে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে সজ্জিত হইল। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দুর্গের বুরুজে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বন্দিগণ পুষ্পমালা, পতাকা প্রভৃতি হস্তে লইয়া শুভ যাত্রার মঙ্গল গীত গাইতে লাগিল। দেবলরাজ অভিনির্যান করিলেন। (ক্রমশঃ)

টিকটিকি ও ফড়িঙ্।

প্রকৃত ঘটনা।

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৬ এ মে) শুক্রবার সন্ধ্যাকাল অতিশয় গরম, বহিরাকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। চিদাকাশও তদ্রূপ। এদিকে যেমন অকস্মাৎ পবনহিল্লোলে দেহ ক্ষণকালের জন্য জুড়াইল, ওদিকে তেমনি কৃপা-হিল্লোলে অনেক

কালের জন্য সাংসারিক চিন্তা-মেঘ অপসৃত হইয়া তাপিত হৃদয় শীতল হইল। কিন্তু কোনওটী স্থায়ী হইল না, হইবার কথাও নয় ; যেহেতু নশ্বর জগতে থাকিয়া, নশ্বর দেহ লইয়া কিছুই স্থায়ী হইবার নয়, উহারাই বা হইবে কেন ? এপাশ ওপাশ করিতেছি। পুত্র পাশে বসিয়া পড়িতেছে। তাহার সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্বলিত। প্রেম-ময়ের সংসার প্রেমময়। আমি স্নেহভরে পুত্রের পাঠে মধ্যে মধ্যে কর্ণপাত করিতেছি। পতিপ্রাণা প্রণয়িনী সন্তান লালন পালনের ও স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিতেছেন। এমন সময় প্রেমিক এক পতঙ্গ—যাহাকে ভাষায় ফড়িঙ্‌ বলে—প্রদীপালোকের সম্মুখীন হইল এবং বোধ হয় প্রেমে গদ্‌গদচিত্ত হইয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জনও করিত, যদি না দীপাবরণ যথাসাধ্য অনুনয় বিনয় করিয়া দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক প্রদানে তাহার প্রাণরক্ষা করিত। কিন্তু সে জানে নাই, শমন তাহার নিকটে উপস্থিত। এক দিকে সে যেমন মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল, অপর দিক্ হইতে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইল। নিকটে, দেওয়ালের গায়ে এক টিক্‌টিকি উপস্থিত। সে অন্তরালে থাকিয়া উহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুযোগ পাইবামাত্রই তাহাকে আক্রমণ করিল। একটি মরণ কামড় দিতেছে, অপরটি তাহার মরণ কামড় সহ্য করিতেছে ও নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে—সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছে—কিন্তু কিছুতেই পলাইতে পারিতেছে না। ঘটনাটি হঠাৎ পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে বলিল "বাবা, একটা ফড়িঙ উড়িয়া আসিয়া বসিল। আমি বলিলাম "মারিও না, উড়াইয়া দাও, না হয়, আপনি উড়িয়া যাইবে।" এই কথা বলিতে না বলিতে যখন সে দেখিল যে, গৃহ-প্রাচীরস্থ টিক্‌টিকিটি উহাকে ধরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা ! ছাড়াইয়া দিব ?" আমি যাহা উত্তর করিলাম পরে বলিব। এখন বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি, একটি খাদ্য, অপরটি খাদক। সম্বন্ধ তো আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ দয়াপরতন্ত্র। আপনাদিগের সম্মুখে কোনও একটি প্রাণী মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি-তেছে, আপনারা চক্ষে দেখিয়া কর্ণে শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন কি ? মনে করুন্ ফড়িঙটি যদ্যপি একটি মনুষ্য হইত, আর টিক্‌টিকিটি যদ্যপি একটি ব্যাঘ্র হইত এবং আপনাদিগের কাহারও সম্মুখে এই ঘটনাটি যদ্যপি সংঘটিত হইত, আর যাঁহার সম্মুখে দুর্ঘটনাটি হইতেছে. তিনি আত্ম-রক্ষায় সম্যক্‌রূপ পারগ, অথবা উক্ত খাদকের তিনি আদৌ খাদ্য নন—হইলেও তাঁহার দিকে ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই ; অথচ তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মন্ত্রে দীক্ষিত—আপনিও জিঘাংসা করিবেন না, কাহাকেও করিতে দিবেন না,

এবং সকলের নিকট সনাতন ধর্ম্ম মূল মন্ত্র প্রচার করিতে কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইবেন। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ?

শ্রীন—

সাউথপোর্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সাউথপোর্টের বার্কডেল নামক স্থানে একটী ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে শারীরস্থান, শারীর বিধান, শরীরপালন, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূ-ষাদি শিক্ষাদান। এ, আলেকজাণ্ডার, এফ আর জি এস নামক এক সুশিক্ষিত বহুদর্শী সাহেব ইহার প্রধান শিক্ষক। অনেকগুলি বিবি শিক্ষয়িত্রী ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহার সহকারিতা করিয়া থাকেন। শিক্ষাদক্ষ লর্ড হিথ, কুমারী হেলেন, গ্লাড্‌ষ্টোন এবং লিডস, লিবারপুল প্রভৃতি অনেক স্থানের স্কুলবোর্ডের সভাপতিগণ এই বিদ্যালয়ের প্রতিপোষক। এই বিদ্যা-লয়ের শিক্ষাগুণে ছাত্রীরা বেশ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতেছেন এবং বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল প্রভৃতির কার্য্যের উপযুক্ত হইতেছেন। ইংলণ্ডের ৩টী প্রধান স্ত্রী-কলেজে এখান হইতে শিক্ষয়িত্রী সকল মনোনীত হইয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে এইরূপ শিক্ষয়িত্রীর জন্য এত আহ্বানপত্র আসিতেছে যে প্রয়োজন মত আয়োজন হইয়া উঠিতেছে না।

এই বিদ্যালয়ে যেমন স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদান হয়, সেইরূপ অনেকগুলি সুকৌশলসম্পন্ন যন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা বক্র শরীর ঋজু ও দুর্ব্বল শরীর সবল করা যায় এবং মেরুদণ্ডের নানাপ্রকার পীড়া যাহারা ভোগ করি-তেছে, তাহারা আরাম ও আরোগ্য লাভ করে। ইংরাজ রমণীরা তাহাদিগের বিলাসজনক পরিচ্ছদ দ্বারা অনেক প্রকার অঙ্গবিকৃতি সাধন করিয়া থাকেন, সে সকলের প্রতীকারের জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে।

এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যেরূপ গৃহকার্য্য সকলের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে, এবং আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, বিলাতী বিলাসিতা আমাদের রমণী-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া যেন কৃত্রিম অঙ্গ-বিকৃতি উৎপাদন করিয়া আবার তাহার প্রতীকারের চিন্তা আনয়ন না করে। তবে শারীর বিজ্ঞান, শিশুপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল শিক্ষা করা আমাদের রমণী-গণেরও কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বালিকা-বিদ্যালয় সকলে মানসিক শিক্ষার আধিক্য হওয়াতে ছাত্রীদিগের শরীর রুগ্ন, দুর্ব্বল

ও অকালে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গৃহকার্য্য করিবারও তত অবসর পায় না। ইহাদের জন্য বিশেষ ভাবনার বিষয়। ইহাদের জন্য বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও শারীর বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ মনোযোগী হন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

নারী-সুহৃদ্।

(২)

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিরাকার উপাসনা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহনরায় পিতা কর্ত্তৃক গৃহ-তাড়িত হন। এই অল্প বয়সে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া স্নেহ-বন্ধনসুলভ কোমল ভাবগুলি হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিল—সম্ভাবের মধুর সঙ্গ না পাইয়া দীর্ঘকাল সেগুলি সংসারের উত্তপ্ত ধূলায় লুণ্ঠিত ও শুষ্ক হইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তিনি দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রভাব অবগত হইতে অগ্রসর হন। এই তিব্বতদেশে অবস্থানকালেই নারীজাতির অশেষবিধ গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হন। ললনাকুলের কোমল ভাবই যে সংসারের লবণস্বরূপ, এই সংসার রমণীহৃদয়ের মধুমিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে বঞ্চিত হইলে হৃদয়ভাবের মার্ত্তণ্ড তাপ ইহাকে মরুভূমি সদৃশ শুষ্ক করিত—স্বার্থের মহাসংসর্গে ইহা কুরুক্ষেত্র সমান ভীষণ প্রান্তরে পরিণত হইত, মহাত্মা রামমোহন রায় পরের দেশে পরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাহার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে বিরাট পুরুষ শাক্যসিংহের সঙ্কল্প ও সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ পর্য্যালোচনা করিয়া ও তাঁহার শান্ত ও সমাহিত প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিয়া এবং তদ্দেশীয় লামাগণের জীবনে ও কার্য্যকলাপে তদ্বিপরীত আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্যথিত হইয়া পদে পদে প্রতিবাদ করিতেন। এই প্রতিবাদে অনেক সময়েই তাঁহার প্রাণ-সংশয় হইয়া পড়িত। কেবল রমণী-হৃদয়ের স্বভাবসুলভ স্নেহ ও অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত। এই বিদেশে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকমণ্ডলীর মধ্যস্থলে তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও তিব্বতীয় কামিনীকুলের করুণায় কতশত বার রক্ষা পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। ভিন্নদেশবাসিনী নিঃসম্পর্কীয়া ও অপরিচিতা রমণীগণের দয়া সৌজন্যই তাঁহার

বিশাল হৃদয়টীকে নারীপূজার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিষয়কর্ম্মে ও অন্য নানাবিধ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবার কালে তিনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নারীহৃদয়ের মহত্ত্ব ও বহু গুণের কীর্ত্তন করিতেন—তিনি যে প্রাণপণ করিয়া অবলা কামিনীগণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন—ইহার মূলে সেই পার্ব্বতীয়া নারী-হৃদয় পরিচালক-রূপে কার্য্য করিয়াছে। তাই বলিতেছি ভারতকামিনীর হিতসাধনে রামমোহনের লেখনীমুখে যে সকল কল্যাণকর কথা ফুটিয়াছে, তাঁহার বাচনিক আলোচনা ও তর্ক বিতর্কে অবলার বলবৃদ্ধিকল্পে যে সকল যুক্তি উক্ত হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে তিব্বত রমণীগণের অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—"তিব্বত-বাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।"

রামমোহনের নারীহিতৈষণা এক বিচিত্র ব্যাপার। কিরূপ হৃদয় লইয়া কিরূপ উপকরণের সহযোগে তিনি ভারত-মহিলার হিতসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ভারত-ললনাগণ কতটা সুখ সুবিধা সম্ভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনে যে সুখ সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, অর্দ্ধাধিক শতাব্দীর পূর্ব্বতন বঙ্গগৃহের সহিত বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের তুলনায় যে অশেষবিধ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির যে চিত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি, সে সকল উন্নতিসাধনের পথে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রামমোহনের সহৃদয়তা, চিন্তাশীলতা ও শ্রমপটুতার রাশি রাশি প্রমাণ পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল মহানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সে সকলের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সতীদাহ-নিবারণের চেষ্টা। এই কার্য্যে তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞান, কঠোর শ্রমস্বীকার ও অকাতর অর্থব্যয়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত বঙ্গ-জননীগণ কি তাঁহাদের ক্রোড়ে লালিত পালিত সন্তানদের হৃদয়ে সে সদ্দৃষ্টান্তের মহদ্ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন না? জাতীয় জীবনের মৃতবৎ অবস্থার মধ্য হইতে যখন এরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সজীব গৃহে শিশুরা সুশিক্ষা পাইয়া কি তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে না? যে নারীজাতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া—অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যদি সেই যুগাবতার জাতীয় মহাগুরু রাম মোহনের শিক্ষা দীক্ষায় আপন আপন সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে চেষ্টা না

করেন, তবে এ উৎকৃষ্ট ফলের উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ফল কি হইল?

ইহার পর রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির ধর্ম্মাধিকারের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মে পুরুষের ন্যায় রমণীরও ষোল আনা অধিকার আছে—ধর্ম্মার্জ্জনে স্ত্রী পুরুষের অধিকার-ভেদ নাই। স্ত্রীজাতির জগদ্ব্যাপী হীনাবস্থার মধ্যে ধর্ম্মাধিকারে রমণী পুরুষের সমকক্ষ, ইহার যাথার্থ্যের প্রমাণস্থলে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মেও গুণবতী ও তত্ত্বজ্ঞা রমণী বহু বহু পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট ফলের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। মহাত্মা রামমোহন রায় গুণগত ব্যক্তিত্বের উপর স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধ অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা।

সঙ্গীত সর্ব্বজন-মনোমোহন পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ নহে। আমেরিকার অরণ্যবাসী পশুবৎ অসভ্য জাতি হইতে বর্ত্তমান ইউরোপের সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণেই সঙ্গীতের মর্ম্ম জ্ঞাত আছে। অসভ্যের কঠোর মনে মৃগয়া-ক্লিষ্ট দেহে শান্তি প্রদানার্থ গিরিগুহায়, নিবিড় অরণ্যে সঙ্গীতের যেমন আবির্ভাব লক্ষিত হয়, সুসভ্যের রাজনীতি পর্য্যালোচনায় ব্যতিব্যস্ত ও ন্যায়ের সূক্ষ্ম মীমাংসায় প্রপীড়িত হৃদয়কে ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দানুভব করাইবার নিমিত্ত সযত্নে নির্ম্মিত, কারুকার্য্যমণ্ডিত, বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত রম্যহর্ম্ম্যেও ইহার তেমনি আবির্ভাব লক্ষিত হয়। দুর্ল্লভ সঙ্গীতের মোহন মন্ত্রে জীবসমূহ মুগ্ধ। পুরাবৃত্তালোচনায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পুরাকালের সুসভ্য দেশমাত্রেই সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল! প্রাচীন গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ ও পারস্য প্রভৃতি স্থানে মহাকাব্যসমূহ ও অপরাপর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নগরীর প্রত্যেক রাজবর্ত্মে গীত হইত, কেননা সে সময়ে লিখনপ্রণালীর প্রচলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সঙ্গীত হইতে তাহারা পুরুষানুক্রমে ইতিহাস ও কাব্যাদি আবশ্যক বিষয়সমূহ শিক্ষা করিত। যাহাহউক প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের সঙ্গীতালোচনার তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনেক রাগ রাগিণীর সুর, তাল, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কি সঙ্গীতের অবস্থা ক্রমশঃ অবনত

হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অধীনতার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বন্ধন, রুচি পরিবর্ত্তন, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের অভাব এবং সাংসারিক অভাবের আধিক্য বশতঃ সঙ্গীতবিদ্যা অবনত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ফলতঃ ধনীর সময়ক্ষেপণের অবলম্বন সঙ্গীত। শোকাতুরের শোক দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ সাধন সঙ্গীত। সাধারণতঃ ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির উপায়-বিধায়ক এবং সাধকগণের পারলৌকিক পথপ্রদর্শকই সঙ্গীত। হৃদয়ের নিঢ়গূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কে সমর্থ? দুর্দ্দম হৃদয়কে বশবর্ত্তী করিতে আর কে পারে? মর্ম্ম-স্থান স্পর্শ করিবার আর কাহার বা শক্তি আছে?

যাহা হউক, এক্ষণে সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত মূল সূত্র সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করা যাইতেছে। যথা—গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী সমবায়ে তৌর্য্যত্রিক নামে অভিহিত এবং যদ্দ্বারা তৌর্য্যত্রিক প্রণালীর সুশৃঙ্খল সূত্র জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে সঙ্গীত-শাস্ত্র বলে। তৌর্য্যত্রিকের মধ্যে গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যথা 'গানাৎ পরতরং ন হি।' কেননা ইহা কর্ত্তৃক চিত্ত দ্রবীভূত, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল, শোকানল নির্ব্বাপিত এবং আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইতে পারে। ইহারই মোহিনী শক্তিতে পশু পক্ষ্যাদি জীবসমূহ স্তম্ভিত হয়। বিশেষতঃ ইহাই ধ্যান আরাধনার প্রধান সাধন। ভাবুক ভক্তগণ ইহার মোহিনী সঞ্জীবনী শক্তিতে অনির্ব্বচনীয়রূপে ভক্তিরসাভিষিক্ত হইয়া যান, এমন কি ইহার সুমধুর লহরীতে অসাধুর পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইতে পারে। সম্রাট্ আকবর সাহের সভাসদ মিঞা তান্‌সেন, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ জয়দেব, উদয়পুরের মহারাণার পত্নী মীরাবাই, দোঁহাবলী-প্রণেতা তুলসীদাস, আর সুরদাস, আমির খস্রু, গোপাল, রাজা বাহাদুর, রামপ্রসাদ, নিধিরাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কগণ যে চিরস্মরণীয় ও অক্ষয় কীর্ত্তির আস্পদ, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আদিতে আকাশ হইতে নাদ অর্থাৎ ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এই ধ্বনিই সঙ্গীতের মূলভিত্তি। নাদ দ্বিবিধ; বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠতালুর সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই বর্ণাত্মক, আর দ্বিবিধ বস্তুর আঘাতে উৎপন্ন শব্দ বিশেষের নাম ধ্বন্যাত্মক। এই বর্ণাত্মক অথচ স্নিগ্ধ ও রঞ্জন গুণবিশিষ্ট ধ্বনিকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর অর্থাৎ সুর বলে। "যথা স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে।" যেমন প্রথম নয়টী অঙ্ক ও শূন্যই অঙ্কশাস্ত্রের মূল, সেইরূপ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ" এই সপ্ত স্বরই গীতের মূল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে এই সপ্তস্বর ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, শৃগাল, কোকিল, অশ্ব ও হস্তীর স্বরাবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সুরের উচ্চ গতির

নাম অনুলোম ও নিম্ন গতির নাম বিলোম।

স্বর, তাল সংযুক্ত হইয়া কণ্ঠে বা যন্ত্রে উচ্চারিত হইলে গীত হয় যথা—ধাতু-মাত্রা-সমাযোগঃ গীত ইত্যভিধীয়তে। আর নাভি, বক্ষ ও মস্তক হইতে যে স্বর-সপ্তক উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে উদারা, মুদারা, তারা বলে। গীতের চারিটী পদ আছে যথা—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গীত দুই প্রকার—কণ্ঠ্য ও যান্ত্রিক। অনুলোম ও বিলোম দ্বারা রাগাদির সম্যক্ বিস্তারের নাম তান। রাগ ছয়টি যথা, শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ ও নটনারায়ণ। প্রত্যেক রাগের ছয়টী রাগিণী, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী রাগিণী—যথা ভৈরবী, বিভাষ, আলাহিয়া, দেবগিরি, কুকুভা, বাগেশ্রী, বাহার, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, ললিত, ভূপালী, জয়জয়ন্তী, মুলতান, মল্লার, পুরবী, অহং, বেহাগ, কাফি, মিশ্র, কালাংড়া, আশোয়ারী, জংলা, টৌরী, রামকেলী, ইমন, সিন্ধু, গৌরী, দেওগিরি, সরফরদা, তুরু, সোহিনী ইত্যাদি। গীতের ছন্দানুযায়ী কালবিভাগের নাম তাল। গীতের যে যতি, তাহাকেই লয় বলে। যথা "লয়ঃ প্রবৃত্তির্নিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।" আর গীতের সময় যথায় তালের সংগতি হয়, তাহাকেই সম কহে। যে স্থান হইতে তাল আরম্ভ হয়, তাহাকে 'ফাঁক' বলে। এই তালের প্রারম্ভ হইতে গীতারম্ভ করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাদ্য যেমন গীতের অনুগামী, নৃত্য আবার সেইরূপ বাদ্যের অনুগামী। তালানুযায়ী হাবভাব কটাক্ষাদির সহিত পাদবিক্ষেপ করাকেই নৃত্য বলে। পুং নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য বলে। সর্ব্বাগ্রে তা, দিৎ, থু, ন্না, এই চারিটী তালের বোল উৎপন্ন হয়। এই চারি প্রকার তাল হইতে এক্ষণে চৌতাল, খটতাল, ধামাল, কাওয়ালী, মধ্যমান, তেওরী, ঠুংরী, ঠেকা, আড়া-ঠেকা, তিওট, যৎ, খ্যামটা, ঢিমেতেতালা, ত্রিতালী, একতালা, পোস্তা, আদ্ধা, সোয়ারী প্রভৃতি বাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক রাগ রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়ও সঙ্গীতশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—প্রত্যূষে রামকেলী, ভৈরবী, বিভাষ; মধ্যাহ্নে সিন্ধু, সারঙ্গ; অপরাহ্নে মুলতানী, পুরবী, পিলু; সন্ধ্যায় গৌরী, শ্রীরাগ; নিশীথে খাম্বাজ, বেহাগ এবং উষাতে ললিত রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়। ইদানীন্তন জনগণের মধ্যে কৃত্রিম কি শিক্ষালব্ধ ভাবের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে মানবহৃদয় প্রাকৃতিক ভাবে সতত পরিপূর্ণ থাকিত। সুতরাং পুরাকালের কবিগণের কবিত্ব কি পদাবলী নীরস কিম্বা কষ্টকল্পিত কৃত্রিমভাবে বিরচিত হইত না। পুরাকালে মানবের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং অনন্ত সুনীলাকাশের অত্যুজ্জ্বল প্রভা, অসীম সিন্ধুর

অনন্তবিস্তৃতি, অভ্রভেদী শৈলের শান্তিপূর্ণ বিশাল-বপু, তরঙ্গিণীর কল্লোল-নিনাদ, গিরিনির্ঝরের হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর-ধ্বনি, নিবিড় অরণ্যের মহান্ স্তব্ধভাব ও বন-বিহঙ্গকুলের হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী কূজন আদিম মানবেরা সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ করিতেন। আমরা শুদ্ধ মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি মাত্র, কিন্তু তাঁহারা শ্রবণ করিয়া তুষারের মত দ্রবীভূত হইয়া সঙ্গীতামৃতলহরীতে মিশিয়া যাইতেন ও সঙ্গীতামৃতে প্রেমানন্দে পান ভোজন ও বিচরণ করিতেন এবং অস্থি মজ্জা কি মাংসময় অবয়বকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। আমরা শুদ্ধ সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, কিন্তু তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিরস্ত হইতেন না, প্রত্যুতঃ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনে রত হইতেন। সে যাহা হউক পরাধীন ভারতভূমি সহস্র বিপ্লব ও লক্ষ পরিবর্ত্তনের মহা অবনতির মধ্যে ও ঘোর দুর্গতির আবর্ত্তাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া আত্মজ্যোতি বিকাশ করতঃ ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এবং শত বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। যদিচ পাশ্চাত্য ভূমি বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ভৈষজ্য ও রাজনীতি চর্চ্চায় প্রাচীন ভারতকে সুদূরে পরাহত করিয়াছে, তত্রাপি সঙ্গীত-বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারে নাই। অতীতের স্মৃতিপূর্ণ অমিয় সঙ্গীত এই বিশাল রঙ্গভূমির সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী অবিনশ্বর কীর্ত্তি বলিতে হইবে।

অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য্য ও গ্রহ নক্ষত্ররাজি যাঁহার গীতছন্দরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই অনাদি কবি পরমগুরু পরমেশ্বর পুণ্যাত্মাদিগের দ্বারা দুর্ল্লভ সুধাময়ী সঙ্গীত বিদ্যা বিশ্বরাজ্যে প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইহা স্বর্গীয় পদার্থ। রোগ, শোক ও দুঃখগ্রস্ত জনগণের যন্ত্রণা উপশম করণে; ক্লান্ত শ্রান্তের সান্ত্বনা প্রদানে; দুশ্চিন্তিতের তৃপ্তি-সাধনে; এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি কলুষিত রিপুসমূহকে নিরস্ত করণে অর্থাৎ পাপ প্রলোভন হইতে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করণে ইহা সততই সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে আনন্দ বিস্তার করিতে এবং গম্ভীর যোগ ধ্যান বর্দ্ধন করিতে সঙ্গীত যেমন তৎপর, এমন অন্য কিছুই নয়। এই সমস্ত মহামহোদ্দেশ্য-সাধক বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ ও চরম সিদ্ধান্ত করিয়া বলেন যে "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।" হায়! হায়! এতাদৃশ দুর্ল্লভ পবিত্র পদার্থকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কি অসদনুষ্ঠান জন্য কলঙ্কিত করা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুক্তি বিগর্হিত। যাহা হউক এতাদৃশ সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন, সর্ব্বসন্তাপহারী ও মোক্ষপ্রদ সঙ্গীতের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা মানব-নাম ধারণের অযোগ্য।

সংপ্রতি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় সহচর বাবু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিপুল যত্ন ও অধ্যবসায়—এমন কি প্রচুর অর্থ ব্যয়ের দ্বারা এই মুমূর্ষু সঙ্গীত

শাস্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহারা—বিশেষতঃ প্রথমোক্ত মহাত্মা—আমার ও সমস্ত বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আর বেশী বক্তব্য নাই, কারণ ইঁহারা যে গ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট।

শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

ভক্ত সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিয়োগ সংবাদে আমরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি। তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন একজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন এবং অনেক দিন তাঁহার সহিত আমরা এক পরিবারভুক্ত হইয়া বিশেষ আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ ছিলাম—নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই।

বামাবোধিনীর সহিত গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। যে কয়েকজন যুবক এই পত্রিকা প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হন, তাহার মধ্যে তিনি একজন। আজও মনে জাগিতেছে ১৬ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির উপায় বিধানার্থ যে একটী সুহৃদ্ সভা হয়, তাহাতে তিনি উপস্থিত হইয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য পত্রিকার নামকরণ "বামাবোধিনী" হইলে ঠিক হইয়াছে বলিয়া তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই নামের অনুমোদন করেন। প্রথম হইতেই বামাবোধিনীতে লিখিয়া অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আশাবতীর উপাখ্যান নামে একটী আখ্যায়িকা অনেক দিন ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব এবং ধর্ম্মজীবনের সমীচীন অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া যত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র বামাবোধিনী প্রচারে ও ইহার গ্রাহক সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বামাবোধিনীর ঋণ অপরিশোধ্য।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর এক কারণে বামাবোধিনীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি প্রাণপণে খাটিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে যখন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাহার অধ্যাপনার প্রধান ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। এই সময় তিনি বয়স্থা মহিলাদিগকে যে প্রকার সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিয়া সুফল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ এই সময় তিনি এক দিকে গুরুতর পরিশ্রমপূর্ব্বক বেহালা গ্রামের ম্যালেরিয়া-পীড়িত লোকদিগের নিত্য চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন, অন্য দিকে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহার

উপর নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালয়ের গুরু ভার বহন করিতেন। একজন লোক যত শক্তিশালী হউন না কেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্য অসাধ্য-সাধন। মহা-তেজ ও উদ্যমসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে এই সময়ে যে উৎকট হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, তাহাই তাঁহার সঙ্গের চিরসঙ্গী হইয়া দারুণ যাতনার কারণ হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপ-যোগী প্রবন্ধও পুস্তকাদি লিখিয়া ও তাহা-দের শিক্ষার সুবিধা বিধান করিতেন।

তাঁহার বাসগ্রাম শান্তিপুরে তিনি একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার রক্ষণ ও উন্নতি সাধন জন্য দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংস্থান করেন। বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ সম্পাদনে এবং পতিতা নারীদিগের উদ্ধার সাধনে এক সময়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হন। তিনি একাধারে এতশত লোকের কার্য্য-ক্ষমতা ধারণ করিতেন, ইহার মূলে তাঁহার গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে ভগবদ্-ভক্তি বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরম হংস ও তাঁহাতে একত্র ভাবোন্মত্ত হইয়া যে নৃত্য করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি—সে অতুলন স্বর্গীয় দৃশ্য কখনও ভুলিব না। শেষ জীবনে তিনি দিবা রাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ভক্তিরসে মগ্ন থাকিতেন, এবং সময় সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন, রামকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও সমাধি অনেক কষ্টে ভাঙ্গিতে হইত।

গোস্বামী মহাশয়ের দৈবজীবন ধর্ম্ম-প্রাণতা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, জন-হিতৈষিতা, পরসেবা, বিনয় ও সাধুভক্তি প্রভৃতি অনেক মহদ্‌গুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, আমরা এখন তদ্বিষয়ে কিছুই বলিব না। এরূপ জীবন ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই বিশেষ অনুকরণীয়। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।" বিজয়ের সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সার্থক। তিনি পবিত্র অদ্বৈত বংশের উপযুক্ত বংশধর। তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ সাধুভক্ত ভারতের চির-গৌরবস্থল।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, ত্রিপুরার মহারাজা দুঃস্থ অন্ধ বঙ্গ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এক-কালীন ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রুসিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থ রুস সম্রাট্ ৩০ লক্ষ রোবল মুদ্রা দান করিয়া আপনার প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। গত মধ্যপরীক্ষায় পঞ্জাবের ৩টী মুসলমান রমণী সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি শুভসূচক।

৪। মধ্য ভারতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে অধিক শিক্ষোন্নতি দেখা যায়। তথায় শতকরা ১৫ জন হিন্দু এবং ৩৮ জন মুসলমান বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ছাত্রীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ২ জন মুসলমান, কিন্তু হিন্দু ১ জনেরও কম।

৫। ব্রহ্মদেশের একটী প্রৌঢ়া রমণীর প্রতি গোরারা অত্যাচার করাতে রাজপ্রতিনিধি তাহার শাসনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ধন্য লর্ড কূর্জন।

৬। কুচবিহারের মহারাজা ইটালির প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের সম্মিলনীতে সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার্থ তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সিলকে পাঠাইতেছেন। ইনি এ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৭। বোম্বাইয়ে সম্প্রতি একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম সুরাজবাই। ইহাঁর ৯ বৎসরের সময় বিবাহ হইয়া ১০ বৎসরে বৈধব্য ঘটে, এখন ইহাঁর বয়স ২০ বৎসর।

৮। যে পুরুষোত্তম পাঞ্জেপি প্রধান "রাঙ্গলার" হইয়া জগৎকে চমৎকৃত ও ভারতকে মহা গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের এক চাষা ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বহস্তে হলচালনা করেন, তিনি ইংরাজী শিখিতে না পাইলে তাঁহারও সেই দশা ঘটিত।

৯। পৃথিবীর নানা স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ যুক্তরাজ্যের ২৪৯টী খৃষ্টীয় মিসনরী সমাজ আছে। উহাঁদের ষ্টেসন সংখ্যা ১৯৮৯৪ এবং মিসনরী সংখ্যা ১১৬৫৯ জন। স্থানীয় বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটী টাকা।

১০। স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সহোদর রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলার সাকনাড়া প্রভৃতি গ্রামস্থ লোকের উপকারার্থ ১০০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটী বড় পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছেন এবং স্থানীয় অন্যান্য উন্নতির জন্য আরও অর্থব্যয় করিতেছেন।

১১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই শোকসন্তপ্ত হইলাম ভারতের পরম গৌরবস্থল সুবিদ্বান্ ও আদর্শ-চরিত্র স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিবার ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ১৩ই জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী ওলাউঠা রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৈলঙ্গ স্বামীর পরে ইনিই কাশীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। History of India—স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌টর আবদুল করিম বি, এ ইংরাজীতে ভারতবর্ষের একখানি সুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা সরল ও সুপাঠ্য এবং ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী।

২। কৌতুককাহিনী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বিএ বিরচিত, মূল্য ৸৵০ মাত্র। ইহাতে ৯টী গল্প আছে যথা (১) ষণ্ডাসুর, (২) ত্রিশির দানব, (৩) বজ্রবাহুবীর ও দৈত্যগণ, (৪) মদিরা রাক্ষসী, (৫) মায়াবিনী কিরীটিনী, (৬) বীরদন্ত নাগ, (৭) সজীব কাষ্ঠপুত্তলি, (৮) পাতালেশ্বর তমোরাবণ, (৯) স্বর্ণপরশ বণিক্। গ্রন্থকার বিদেশীয় উপকথা সকল এরূপ নৈপুণ্যসহকারে ভাষান্তরিত করিয়াছেন যে, সে গুলি বঙ্গভাষার মৌলিক উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। নাম সকল উদ্ভাবনেও তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য আছে। যে ৩ খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি কিরূপ কৌতুকজনক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাহার পরিচয়স্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ইহা সমালোচকের হস্তে পাড়বার পূর্ব্বে বাটীর এবং পাড়ার পাঠক্ষম বালক বালিকারা একে একে ইহা গ্রাস করিয়াছিল বলিলে হয় এবং অতি কষ্টে শত ছিন্ন অবস্থায় ইহাকে উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহা গ্রন্থের পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ কিছুক্ষণের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারিবেন। আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি এইরূপ পুস্তক আরও প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যসমাজের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুন্।

বামারচনা।

জিজ্ঞাসা।

বল দেব, আজি তুমি
কোথা আছ কত দূরে,
কি কার্য্যে রয়েছ রত
আজি সে অমরপুরে?
এমন বিষাদপূর্ণ
শোকার্ত্ত মরমগীতি,
ছাড়ি এ ধরণী সীমা
পরশে কি তব স্মৃতি?
স্বরগে অমরপুরে
থাকি দেবতার সনে,

পড়ে নাকি মনে তব
মরধাম-প্রিয় জনে ?
কেমনে কাটিছে দিন
তব প্রাণ-প্রিয়জন,
জানিতে তাদের কথা
হতেছে কি ব্যগ্র মন ?
ছাড়িয়া তোমারে দেব
ভগিনী মায়ের পাশে,
ছিনু যবে বহু দূরে
বিদেশেতে পিতৃবাসে।
তখন প্রাণেশ তুমি
মম হস্তলিপি নিত্য,
না পেয়ে কাতর হতে
ব্যাকুল ব্যথিত-চিত্ত।
আজি কিহে মনে নাই
পীড়াতে শরীর ক্ষীণ
অক্ষম দিতে যে পত্র—
ছিনু আমি তিন দিন,
না পেয়ে আমার পত্র
লিখিছিলে যাহা সখা!
সে সবি কি ভুলে গেছ
পাষাণে জলের রেখা ?
(সাবাস্ প্রতিজ্ঞা তব !!
সাবাস্ স্মরণ বল !!!
এ নহে ক্ষমার যোগ্য !!
দেবতা কি জানে ছল ?)
তৃপ্তিহীন মানবের
অপূর্ণ অসীম আশা,
না জাগে কি প্রাণে আর
প্রাণের নীরব ভাষা ?
অকূলে ভাসায়ে জায়া
ছিঁড়িয়া সংসার-ফাঁস,
ছাড়ি সব প্রিয়জন
করি এবে স্বর্গবাস,
দূরে রাখি বাধা বিঘ্ন
পূজিছ কি সে চরণ
চির দিন পূজিবারে
ছিল যাঁরে আকিঞ্চন ?
অনন্ত শান্তির রাজ্যে
পুণ্যের অমৃত খনি,
তব আত্মা প্রাণ মন
এবে কি নিয়েছে কিনি ?
আত্মীয় স্বজন স্নেহ
সংসারের আকর্ষণ,
করে নাকি আজি তব
প্রাণ মন আন্দোলন ?
অদৃশ্যে জগত-পিতা
দেখিছেন দিবানিশি,
তুমিত তাঁহারি ক্রোড়ে
পার যদি দেখ বসি।
এ তব অভাগী জায়া
নীরব অশ্রুতে ভাসে,
অথির পরাণ তার
যাতনার তপ্তশ্বাসে।
তুমি তার সুখ শান্তি
ধর্ম্ম মোক্ষ ভগবান্,
হারায়ে এবে সে নিধি—
অকূলে—আকুল প্রাণ।
তুমি বিনা বিশ্ব তার
অসীম অনন্ত শূন্য,
সে বুঝে তাহার দুঃখ
বুঝিতে কি পারে অন্য ?

প্রাণে কি দারুণ ব্যথা
কেহ কি দেখেছে চক্ষে,
দেখিছ কি জানিছ কি
কি আছে এ পোড়া বক্ষে ?
আমি যে কেবল ছায়া
তুমি প্রাণ—তুমি কায়া,
নাহি প্রাণ নাহি কায়া
কেমনে রহিবে ছায়া ?
প্রাণ দিয়ে বেঁধেছিনু
প্রাণের অমূল্য নিধি,
ভাবি নাই এক দিন
কেড়ে নিতে পারে বিধি।
জানিছ সকলি দেব
বলিব কি আর কথা,
তুমি যদি না বুঝিবে
আর কে বুঝিবে ব্যথা ?
প্রসারি স্নেহের কর
লয়ে যাও তব পাশে,
থাকিতে চাহে না সে যে
দুঃখময় ভববাসে।

শ্রীমতী রেবা রায়।

নরেন্দ্র।

কোথায় প্রাণের ভাই নরেন্দ্র আমার।
বহু দিন ত্যজিয়াছ এ পাপ সংসার।
এ ভব ভবনে ভাই, তোমা হেন ধনে যেই
বঞ্চিত হ'য়েছে, তার কি সুখ জীবনে ?
দু দিনের তরে দিয়া, সুখ স্বপ্ন দেখাইয়া,
কাড়িয়া নিলেন বিধি হৃদয় রতনে।
না মিটিল কোন সাধ,সাধেতে সাধিয়া বাদ,
অকালে গ্রাসিল তোরে নিঠুর শমন। ১
কঠিন পরাণ তার নাহি লেশ করুণার,
ক্রন্দন তাহার কাণে করে না গমন।
কেমন করিয়া তুমি ছাড়িয়া জনমভূমি,
গমন করিলে হায়! অচেনা সে দেশে ?
ভয় হয় মোর চিতে, গিয়াছ অচেনা পথে,
অজ্ঞান বালক তুমি, পথহারা হও শেষে।
এখন মনেতে নাই, ভুলেছ সকল ভাই,
ভুলেছ এখন তুমি দুঃখিনী মাতারে। ২
একটু বিলম্ব হলে কাঁদিতে মা কোথা বলে,
সাত বর্ষ হ'লো এবে ভুলেছ তাঁহারে।
সে সকল মনে নাই, আর না কাঁদিবে ভাই,
ভুলিয়াছ এবে তুমি বিষম মায়ায়।
প্রভুহে!
জগতের পিতা তুমি, তোমার চরণে নমি,
দুখিনীর প্রতি তুমি হইয়া সদয়,
মোরে এই বর দিয়া, জুড়াও তাপিত হিয়া,
পুনঃ যেন নরেণের সঙ্গে দেখা হয়। ৩

শ্রীযামিনীপ্রভা দেবী।

স্মৃতি।

হৃদিবৃন্তে ছিল যে কুসুম,
প্রেমময় মৃণাল-আসনে,
দিবানিশি থাকিত ফুটিয়া,
এ মোর সাধের নিকেতনে।
কোথা সে আমার ? ১
বুকভরা ভালবাসা দিয়ে

আত্মহারা প্রেম দিয়ে যায়,
রাখিতাম চোখে চোখে যারে,
পাছে কভু শুখাইয়া যায়।
কোথা সে আমার ? ২

যদি কভু অযতনে মোর
মু'খানি মলিন হত তার,
অনিমেষে চেয়ে তার পানে
দেখিতাম জগৎ আঁধার।
কোথা সে আমার ? ৩

স্নেহে মুছাইয়া অশ্রুধার,
মুখখানি, চুমি বার বার,
কতই সোহাগে তারে পুনঃ
ধরিতাম হৃদয়ে আমার।
কোথা সে আমার ? ৪

ধীরে ধীরে মুখখানি তুলি,
লুকাইত হৃদয়ে আমার,
অশ্রুজলে বুক ভাসাইত,
নিমীলিত আঁখি দুটী তার!
কোথা সে আমার ? ৫

আসি বলে সে যে লুকায়েছে,
তাই বুক ভাসে অশ্রুনীরে,
শূন্য প্রাণে—শূন্যে চেয়ে আছি,
আর বুঝি আসিবে না ফিরে!!
কোথা সে আমার! ৬

ভাল করে দেখিনি সে মুখ!
ভাল করে কই নাই কথা!!
বলিব বলিব করি সদা,
বলি নাই হৃদয়ের ব্যথা!!
কোথা সে আমার! ৭

কে জানিত চির দিন তরে,
সে কুসুম শুখাইবে হায়!
তাহলে কি ছবিগুলি লয়ে,
কেঁদে কেঁদে দিন কেটে যায় ?
কোথা সে আমার! ৮

শুধু স্মৃতিখানি বুকে লয়ে,
দিবানিশি একভাবে যায়,
যেন সে মলিন ছবিখানি,
চায় আর ফিরে ফিরে চায় ?
কোথা সে আমার! ৯

পৃথিবীতে সব মুছে যায়!
স্মৃতি কেন রহেগো জাগিয়া ?
বল স্মৃতি! কার তরে আর,
আশাপথ রয়েছ চাহিয়া ?
কোথা সে আমার!। ১০

শ্রীস—

ভ্রম-সংশোধন।

গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের পত্রিকার নিয়মাবলীতে বামাবোধিনীর অগ্রিম মূল্য ২॥০ স্থলে ২॥৵০ হইবে। বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রবন্ধে ৮ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভের ২৭ ও ২৮ লাইনে ১২০০ স্থলে ১২০০০ এবং ৭০০ স্থলে ৭০০০ টাকা হইবে।

No. 415. August, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪১৫ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৬—আগষ্ট, ১৮৯৯। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিক্টোরিয়ার জয়—ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সালের জুন মাসে রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও ১৮৩৮ সালের ২৮এ জুন তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সমারোহে সম্পন্ন হয়। তাঁহার রাজত্বের ৬২ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দ-তোপধ্বনি হইয়াছে।

পিঁজরা পোল—গত ২৫এ জুন কলিকাতা পিঞ্জরাপোল সমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভা হয়, রায় বদ্রিদাস বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের স্থিত সহিত সমাজের আয় ৯৮,৮৭৫৷৶৫, ব্যয় ৬৯,৭৬২৷৵১০ বাদে ২৯,১১৩৷৵১৫ স্থিত। পিঞ্জরাপোলে গোরু বাছুর ২০৫৬, অশ্ব ছাগাদি ২৫০ এবং পক্ষী প্রভৃতি ২২১ প্রতিপালিত হইতেছে।

শিল্পশিক্ষা—রাওলপিণ্ডীর শিখেরা ২৫ হাজার টাকার এক কণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহার আয়ে পঞ্জাবী যুবকদিগের রুড়কী, কলিকাতা, বোম্বাই ও জাপানে কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষার সাহায্য করিবেন।

শ্বেত ব্যাঘ্র—আসামের জয়পুর খিরিনিরা নামক গ্রামে একটি আশ্চর্য্য শ্বেত ব্যাঘ্র হত হইয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৫॥০ হাত। চা বাগানে এক সাহেব ৬০ টাকা মূল্যে তাহার চর্ম্ম ক্রয় করিয়াছেন।

তারবিহীন টেলিগ্রাফ—ইটালি দেশে এই কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তত্রত্য সিনর টমাসি নামক এক বৈজ্ঞানিক

পণ্ডিত এই প্রকার টেলিগ্রাফের জন্য এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বৃহৎ ইক্ষু—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ বাবু নিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রাম হইতে এক প্রকার ইক্ষু আনিয়াছেন, তাহার পরিধি প্রায় এক হাত। এই কৃষি-বিভাগ হইতে অনেক প্রকার চাষের উন্নতি চেষ্টা হইতেছে।

মৃত্যু—(১) রুসসম্রাটের মধ্যম সহোদর জ্যেষ্ঠের সহিত ভারত ভ্রমণ করিয়া যান। সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর স্থলে ডিউক আলেকজাণ্ডার যুবরাজ হইয়াছেন। (২) কাশ্মীরের মহারাজার ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ রামসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। (৩) কাশীর সুবিখ্যাত ভাস্করানন্দ স্বামী ওলাউঠায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

কাকবংশ ধ্বংস—স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে হাজার হাজার দাঁড়কাক মরিতেছে—কোন কোন স্থান কাকশূন্য হইয়াছে। এজন্য কীট সকলের উৎপাত বাড়িতেছে।

অধিক বিদ্যায় সুফল—বিলাতের কুমারী ফসেটের নিম্নে কুমারী লোরা ল্যাপথরন্ একজন স্ত্রী-রাঙ্গলার। ইনি নিতান্ত বিনীতা, লজ্জাশীলা ও আড়ম্বর-শূন্যা। ইনি পিতৃভক্ত এবং এক রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে গরিব প্রতিবাসীদের সন্তানদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। কে বলে বিদ্যা শিখিলে অহঙ্কারই বাড়ে?

হাইকোর্টের দেশীয় চিফজষ্টিস—হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধিত্ব ভারতে প্রথমে স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাগ্যে ঘটে। মান্দ্রাজে সুব্রামানিয়া আয়ার এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতবাসী—বাবু বিপিন চন্দ্র পাল ইংলণ্ডে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইতেছেন। তিনি তথায় নারী-সভাসকলেও বক্তৃতা করিতেছেন। ইনি মাঞ্চেষ্টার তত্ত্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন।

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান।

চাপারো বৃক্ষ।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়া প্রদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিসহ, অর্থাৎ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না; প্রত্যুতঃ অগ্নি-তাপেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই আশ্চর্য্য গুণ থাকাতে ইহা অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশজাত কদলী বৃক্ষও এক প্রকার অগ্নিসহ বৃক্ষ বটে, কিন্তু তাহা শুষ্ক হইলে দাহ্য ও ক্ষার হয়; সুতরাং তাহা দ্বারা সর্ব্বভুকের জলন্ত মুখ হইতে কোন বস্তু রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর নহে।

সামান্য গৃহদাহে জলাভাবে কলাগাছ কাটিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে তাহা দাহের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। চাপারো বৃক্ষ কদলীর অনুরূপ নহে। ইহা অগ্নি-তাপেই ভাল থাকে এবং অগ্নিতাপেই পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহারা যে স্থানে জন্মে, আর অন্য কোন বৃক্ষ বা ওষধি সে স্থানে থাকিতে পারে না। যে প্রদেশে ইহা জন্মে, তত্রত্য অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে ইহার তলদেশে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ স্বর্ণের খনি আছে; কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। চাপারো বৃক্ষ সচরাচর ১৩।১৪ হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না। পরিণত গুঁড়ির ব্যাস প্রায় একপাদ হইয়া থাকে। ইহার অমসৃণ বা ফাটা ফাটা কাণ্ড ও প্রশাখা সকল গ্রন্থিময়, পত্র সকল কর্কশ এবং ফল ও পুষ্প সকলও দেখিতে সুন্দর নহে। প্রত্যেক পুষ্পে দুইটী করিয়া বীজ হইয়া থাকে এবং বীজ গুলি অগ্নিতাপে ফুটিয়া বিস্তৃত হয়। ইহার ত্বক্ প্রায় অর্দ্ধ বুরুল স্থূল। এই ত্বক্ অতি আল্‌গা, সুতরাং তাহা অনায়াসে ছাড়ান যায়। ত্বক্ খুলিয়া লইয়া ঘনরূপে কোন দ্রব্য আবৃত করিলে অথবা তাহা চূর্ণ করিয়া বাটিয়া কোনও বস্তুতে প্রলেপ দিলে প্রলিপ্ত বস্তু অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এই জন্যই ইহাকে অগ্নিসহ (fire-proof) বৃক্ষ বলে। পাঠিকারা অগ্নি-সহ লৌহ সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি দেখিয়াছেন, চাপারো বৃক্ষও সেইরূপ অগ্নি-সহ। বিশ্ব-পিতা যে কত স্থানে কত প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ রচনা করিয়াছেন, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে?

সিন্ধূর্ম্মির উচ্চতা।

সিন্ধূর্ম্মি অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গ নিয়ত গম্ভীর নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বিশেষতঃ যখন প্রবল বাত্যাঘাতে সিন্ধুপৃষ্ঠ আলোড়িত হয়, তখন উত্তাল তরঙ্গরাজি "চক্রনিভতন্বী তমাল তালাকারে" ভীষণ গর্জ্জনে ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে বেলা বিদীর্ণ করিতে থাকে। দূর হইতে এই হৃদয়-ভেদী গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে স্তব্ধ ও চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দ মন্দ সমীরহিল্লোলে শান্ত সিন্ধুলহরী সচরাচর তিন চারি হস্তের অধিক উত্থিত হয় না, ইহার গতিও প্রতি সেকণ্ডে ২৪০৬ পাদ অর্থাৎ প্রত্যেক ঘণ্টায় কিঞ্চিদূন ১৭ মাইল (১৬০৮ মাইল) প্রবাহিত হয়। অর্ণবযান এইরূপ গতিতেই পাইল ভরে গমনাগমন করিয়া থাকে। তরঙ্গের আকারের দীর্ঘতা ও গতির দ্রুততা বায়ুর প্রবলতা-সাপেক্ষ। প্রবল বায়ুবেগে তরঙ্গের আকার প্রায় ২৬০ পাদ দীর্ঘ হয় এবং উচ্চতাও

২০ হইতে ২৬।২৭ হস্ত হইয়া থাকে। তাহার গতিও এই সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬০ বা ৩৬৪ পাদ হইয়া থাকে। প্রচণ্ড ঝটিকা ও বাত্যাকালে উর্ম্মিরাজি ৪০০ হইতে ৪২৪ পাদ দীর্ঘ হইয়া থাকে; তাহাদিগের উচ্চতাও প্রায় ৩০ হস্ত হইয়া থাকে; কখন কখন ৪০ হস্ত হইতেও দৃষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে প্রত্যেক তরঙ্গের স্থিতিকাল প্রায় ৯ সেকেণ্ড, এবং তাহার গতিও ঘণ্টায় প্রায় (৩২॥) সাড়ে বত্রিশ মাইল। দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের অগ্নিকোণোত্থিত ভীষণ বাত্যা অতি ভয়ঙ্কর। তদাঘাতে সিন্ধু-দেশ বিষম সংক্ষোভিত হইয়া থাকে। উত্তাল তরঙ্গমালা ফেন উদ্গিরণ করিতে করিতে ৪০ হস্তের উপরেও উত্থিত হয়। প্রত্যেক উর্ম্মির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৯০ পাদ, স্থিতিকাল ১৫ সেকেণ্ড, কখন কখন দীর্ঘতা ১১৫০ পাদও দৃষ্ট হইয়াছে। কখন কখন ইহার গতিও প্রতি সেকেণ্ডে ৭৮০৭ পাদ অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫৩ মাইল হইয়া থাকে! অতি বেগগামী রেলওয়ে শকট প্রতি ঘণ্টায় ইহার অর্দ্ধেক পথও চলিতে পারে না!!

সংসারাশ্রম।

(৪১২ সংখ্যা—২৭ পৃষ্ঠার পর)।

হিন্দু শাস্ত্র মতে পিতা মাতার সেবা, স্ত্রী পুত্র কন্যাদির পালন ও সন্তানদিগকে সৎ শিক্ষা প্রদান, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করা, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু বৈষ্ণবে ভক্তি, অতিথি-সৎকার, পরোপকার, সর্ব্ব-জীবে সহানুভূতি, বিদ্যা ও ধর্ম্মার্জ্জন এইগুলি সংসারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

গৃহীদিগের পক্ষে মাতা পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—৮—২৫।

অতএব কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে পিতা মাতার সেবাপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে প্রসন্ন রাখিবে।

সহিষ্ণুতা কর্ত্তব্যপালনের প্রধান সহায়। সহিষ্ণুতা নষ্ট হইলে ধৈর্য্যহীনতা উপস্থিত হয়, ধৈর্য্যহীনতা ঘটিলে অকর্ত্তব্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, অকর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলেই জীব ঘৃণ্য হইয়া পড়েন, অতএব সহিষ্ণুতার দিকে লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সংসারে কাহাকে দুশ্চরিত্র দেখিলেও গৃহী সহসা তৎপ্রতি রুষ্ট হইবেন না, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

ন জ্যেষ্ঠমবমন্যেত দুষ্কৃতঃ প্রাকৃতোহপি বা।

যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়শ্চেত্তু তদাচরেৎ।
ধর্ম্মং হি শ্রেয় ইত্যাহুরিতি ধর্ম্মবিদো জনাঃ॥

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর পাপনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে সম্মান করিবে। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলেও তাহা-দিগের মঙ্গলার্থে তাহাদিগকে স্নেহদান-সহ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রেয় নষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ শ্রেয়কেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গৃহী নিজের এবং পরের শ্রেয় রক্ষণার্থ সতত যত্নপর হইবেন। ধর্ম্ম রক্ষণাপেক্ষা পুণ্যকার্য্য আর কিছুই নাই।

গৃহিব্যক্তি পত্নীকে স্বতঃই স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। স্ত্রীই সংসারের সোপান। যে পর্য্যন্ত স্ত্রী গৃহীত না হয়, সংসারী ব্যক্তি সে পর্য্যন্ত সংসারী নামের যোগ্য হন না। স্ত্রীহীন ব্যক্তি অসম্পূর্ণ, স্ত্রীর সহযোগে পুরুষ সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। স্ত্রীই—"শ্রী"। স্ত্রী সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

মনু—৯—২৬

পুত্র কন্যা উৎপাদনকারিণী বলিয়া স্ত্রী অশেষ কল্যাণ-পাত্রী। ইহাঁরাই সংসার উজ্জ্বল করেন। স্ত্রী ও শ্রী অভিন্ন। যে সংসারে স্ত্রীর মর্য্যাদা অক্ষত থাকে, সে সংসারে লক্ষ্মী অচলা থাকেন। সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যে পত্নীসহ একচিত্ত হইবেন। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, অতএব কি সংসার-জীবনে কি ধর্ম্ম-জীবনে স্বামী স্ত্রী কদাচ পৃথক্ হইবেন না।

সম্যগ্ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতীভ্যামহর্নিশং
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমনুব্রতবৃত্তিতঃ।

ব্যাসসংহিতা—২ অঃ।

সংসারী জীবের স্ত্রী পরম সুহৃদ্। সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে জীব যখন কাতর হইয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে, তখন কাহার প্রেমপূর্ণ মধুর সম্ভাষণে হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন হয়? অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত অথবা কোন কারণ বশতঃ সংসারী ব্যক্তি প্রিয় জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদূর প্রবাসে অবস্থানপূর্ব্বক যখন প্রিয়জনবিরহে কাতর হইয়া পড়ে, সহস্র কর্ত্তব্য পাদদলিত করিয়া যখন সেই ভগ্নহৃদয় গৃহাভিমুখে ছুটিতে থাকে, তখন কাহার মুখখানি মানস-ফলকে প্রতিফলিত হইয়া সেই মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলে? সে মুখ আর কাহারও নহে, তাহা প্রিয়তমারই প্রফুল্ল বদনমণ্ডল। স্ত্রী সংসারের অনন্ত সন্তাপহারিণী, তাই শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীর আসন অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ন চ ভার্য্যা সমং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভিষজাং মতং।
ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে॥

বনপর্ব্ব ৬১—২৯

চিকিৎসকদিগের মতে ভার্য্যার সমান আর ঔষধ নাই। স্ত্রী সত্য সত্যই সর্ব্ব দুঃখের মহৌষধ। সকলকে সম স্নেহ দান করা সংসারীর কর্ত্তব্য; যিনি তাহা পারেন, তাঁহাকে কদাচ সংসারে কোনরূপ অশান্তি ভোগ করিতে হয় না।

কেহ কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তৎপ্রতি রুষ্ট হইয়া কোনরূপ কটূক্তি

প্রয়োগ করিবে না বা অন্যের দ্বারা সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবে না, ইহাই মহত্ত্ব। যিনি এইরূপ উন্নত হৃদয় লাভ করিতে পারেন, সংসারে থাকিয়াও তাঁহার স্বর্গ ভোগ হয়।

চরিত্র রক্ষা করিতে স্বতঃই যত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। চরিত্রহীন ব্যক্তিকে সমাজ উপেক্ষা করেন, মাতা পিতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তির জীবন মৃত্যু সমতুল্য। চরিত্র লইয়াই মানুষ—হস্ত পদ লইয়া মানুষ মানুষ নহে। যাঁহার চরিত্র পঙ্কিল হইয়াছে, জীবন ধারণ তৎপক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুশাস্ত্র বলেন চরিত্রহীন ব্যক্তি ধন-বন্ধু-বেষ্টিত হইলেও তাঁহার ভাগ্যে কদাচ সুখলাভ ঘটে না।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এই তিন আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণই গৃহীদিগের নিকট অন্নাদি দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু সংসারী যদি অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি নিরয়গামী হয়েন। গৃহী সর্ব্বাবস্থাতেই যথাসাধ্য অতিথি-সেবা করিবেন।

গৃহী তাঁহার আয়কে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ ধর্ম্মার্থে, একাংশ সংসার পালনে, একাংশ কুটুম্ব পোষণে ব্যয় করিয়া একাংশ সঞ্চয় করিবেন। সঞ্চয়ও গৃহীর অন্যতম কর্ত্তব্য। সেই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুও গৃহীদিগকে কিছু কিছু সঞ্চয়ের জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

দাস দাসীদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করা গৃহীর কর্ত্তব্য। অনেকেই দাস দাসী-দিগকে কুক্কুরাপেক্ষাও নীচ জীব বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে শোণিত মজ্জায় আমাদের দেহ গঠিত, সেই উপাদানে বিধাতা তাহাদিগকেও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দাস দাসী বলিয়া তাহাদের দেহ বা জীবন পাষাণে গঠিত নহে, ইহা স্মরণ রাখিয়া তাহাদিগের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সাধন করা গৃহীর পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য।

যে কার্য্যে নিজের বা অন্যের দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক কোনরূপ ক্ষতি বা মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ বলিয়া বিবেচ্য। এরূপ কার্য্য হইতে সতত দূরে থাকা গৃহীর একান্ত কর্ত্তব্য! যিনি নিজ অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারেন, প্রতিনিয়ত অভাব অশান্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে।

ধৃতিক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

(মনু)

অর্থাৎ ধৃতি—সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীকেও মিত্র জ্ঞান, দম—বিষয়াদিতে অনাসক্ত থাকা, অস্তেয়—পরস্ব হরণ না করা, শৌচ—মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা দেহ শোধন এবং চিত্তের শুদ্ধতা, ধী—শাস্ত্রতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মনীতির অনুশীলন, বিদ্যা আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ অর্থাৎ দেহও আত্মার বিভিন্নতা পরিজ্ঞাত হওয়া সত্য এবং অক্রোধ—ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। যিনি

এই সকল লক্ষণযুক্ত, তিনিই ধার্ম্মিক, সংসারে তিনিই সুখী। সংসারী ব্যক্তিরও ধর্ম্ম-যাজন অবশ্য কর্ত্তব্য।

সদ্বৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি॥

উদ্যোগ—ব২।২৪৪৮।

যে ব্যক্তি সদাচারী, সচ্চরিত্র, প্রসন্নাত্মা, আত্মতত্ত্ববিদ্ ও সুপণ্ডিত, তিনিই ইহলোকে সম্মান লাভ করিয়া পরলোকে সুগতি প্রাপ্ত হন। অতএব সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা—বোলপুর।

মাগো জননী।

মাগো জননি, জুড়ায় পরাণী
লইয়ে তোমার নাম।
তুমি যে আমার, নিধি সারাৎসার,
সেবিয়ে তোমায়,
যাব স্বর্গধাম॥
তুমি সারতীর্থ, তুমি পরমার্থ,
তুমি ঐহিকের সুখ;
তব পদধূলি, লয়ে মাথে তুলি,
চতুর্ব্বর্গ হাতে,
থাকে ভরা বুক॥
জ্বালা যন্ত্রণা যা, যায় বলিলে 'মা',
মার মত নাহি কেহ।

দেবতা সবার, আছে নানাকার,
এ দেবতা যে গো,
মূর্ত্তিমতী স্নেহ॥
দেবতা সবার, তুমি যে আমার,
পরম দেবতা একা,
বিরাজ হৃদয়ে জানিয়াছি ধেয়ে,
হৃদয়ে মায়ের
শ্রীচরণ আঁকা॥
স্বর্গ তব ছায়, তোমাতে মিশায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
তোমার তুলনা, মিলেনা মিলে না,
ব্রহ্মাণ্ডে বিরল, 'মা' সুধা নাম॥

শ্রীন—

বলেন্দ্র ও বলবতী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মধুর স্বরে কে ডাকিল "বলবতী"। বলবতী সেই পবিত্র স্পর্শে কদাচিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, কিন্তু ভয়ে চক্ষু মেলিতে পারে নাই। এই মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবা মাত্র তাহার জীবনের নৈরাশ্য-পীড়িত-হৃদয় বলযুক্ত হইল। সে চক্ষু মেলিল—ডাকিল "বলেন্দ্র"!

বলেন্দ্র তখন বলবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বহুদিনের পিপাসিত হৃদয় শীতল করিল। বলবতীও বহু দিন পরে হৃদয়ের ধনকে লইয়া সকল সন্তাপ দূর করিল।

বলেন্দ্র এই পথে বলবতীর নিকটে যাইতেছিলেন। হঠাৎ বলবতীকে এই গহন বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ভাবে বলেন্দ্র ও বলবতীর মধুর মিলন সাধিত হইল। চারিদিকে জোৎস্না-প্লাবিত ফুল ফুটিয়াছিল। বলেন্দ্র ও বলবতী তাহা চয়ন করিয়া আনিল, এবং তাহা দ্বারা অতি মনোহর মালা গ্রথিত করিল। তখন আকাশপট পরিষ্কার হইয়াছিল—জোৎস্না উঠিয়াছিল।

যখন সেই কৌমুদী-প্রোদ্ভাসিত রজনী প্রভাত হয় হয়, তখন তাহারা উভয়ে উভয়ের গলে মাল্য দান করিল। এই ভাবে তাহাদের বিবাহ কার্য্য সমাহিত হইল। আজ বলেন্দ্র ও বলবতী বন-ফুলের মালায় সজ্জিত হইয়া পুষ্পরেণুতে চর্চ্চিত হইয়া নব বলে ঈশ্বরের পবিত্র চরণাম্বুজে প্রণত হইল।

ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল হইল। উভয়ে উভয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া অজস্র আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

এই সময় নীরবে বলেন্দ্রের বক্ষদেশে কে এক জন তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত করিল। বলেন্দ্রের বক্ষভেদ হইল, প্রবল-বেগে রক্ত ছুটিল। বলেন্দ্র আর একবারও প্রেয়সীর মধুরাননের অধরামৃত পান করিতে অবসর পাইল না—তাহার সেই নব বিবাহিত নবজীবন পাপ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

বলবতী চাহিয়া দেখিল—

বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া অতি রুদ্রবেশে বলভদ্র। সে তখন সব বুঝিতে পারিল।

পাপমতি বলভদ্র তাহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই বলবতী স্বামি-হৃদয় হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া লইল ও তাহা আমূল আপন হৃদয়ে বিদ্ধ করিল। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল। বলবতীও বলেন্দ্রের অনুসরণ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিল। যাও সাধ্বি! যাও অমরাবতী, সে স্থানে তুমি স্বামিসহ মন্দাকিনীকূলে মন্দার তরুচ্ছায়ার পবিত্র সরসিজাসনে উপবিষ্টা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

বলভদ্র বলবতীর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

পরলোকগতা নীরদবরণী।*

ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়;—
তবু সে মৃত্যুর মাঝে, অমৃত মূরতি রাজে,
মৃত্যু-শোক পরিহরি ওই সুখধামে যাই॥"

* পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সহোদর কর্ত্তৃক লিখিত।

সন ১২৭৯ সালের ২৪এ মাঘ সোমবার কলিকাতা আহীরীটোলায় আমাদের কনিষ্ঠা সহোদরা নীরদবরণী দেবীর জন্ম হয়। তিনি আমাদের পিতা মাতার সর্ব্বশেষ সন্তান এবং আমাদের উপর্য্যুপরি তিনটি ভ্রাতার পর এই কন্যা জন্মিয়াছিল বলিয়া, নীরদবরণী পিতা মাতার বিশেষ যত্নের ও স্নেহের পাত্রী ছিলেন। আমাদের মাতৃদেবী অপেক্ষাও আমাদের পূজনীয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী কন্যা-নির্ব্বিশেষে অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাঁহার লালন পালন করিতেন। শৈশব কালে নীরদবরণী এক প্রকার চিররুগ্ন ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এমন উৎকট পীড়া দেখা দিত যে, তাহাতে বাঁচিবার আশা অতি অল্পই করা যাইত। আমার মনে আছে, একবার জীর্ণা শীর্ণা কঙ্কাল-মাত্র অবশিষ্টা নীরদবরণীকে মাতৃদেবী বুকে করিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন বর্ষীয়সী সম্পন্ন গৃহের মহিলা তাঁহাকে তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা, কেন অনর্থক এই রোগা নেংলা ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্‌পেনে মেয়েটা বুকে ক'রে আছ? এটাকে এই পাতকূয়ায় ফেলে দাও।" অনেক চিকিৎসা, যত্ন ও শুশ্রূষায় এবং ভগবানের কৃপায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীরদবরণী আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব সুগঠিত ও শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নীরদবরণী আমাদের সকলের কনিষ্ঠা বলিয়া অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় তাঁহাকে কাঁধে করিয়া বেড়াইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের ছোট ভগিনী শৈশবাবধি অতি সুন্দর ও সরল ছিল। আমার মনে হইতেছে না যে, নীরদবরণী আমরণ কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমাদেরই কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। লেখা পড়াতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার স্বভাবটি যাহাতে অবিকৃত থাকে, সে দিকে আমাদের পরিবারস্থ সকলের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

দেখিতে দেখিতে নীরদবরণী বিবাহোপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিলেন। পিতা আমার, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় ব্যসন করিয়া বালীর সুবিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত কন্যার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন করিলেন। পূর্ণ বাবু অনেক দিন যাবৎ বালীর পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, এমন কি, সম্পন্ন বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ধনে ধান্যে, সুখসৌভাগ্যে, পবিত্রতা শান্তিতে পরিপূর্ণ পূর্ণ বাবুর সোণার সংসারে লক্ষ্মীস্বরূপিণী নীরদবরণা একমাত্র পুত্রবধূ হইয়া প্রবেশ করিলেন। কত

আনন্দ ! কত আশা ! তিনি শ্বশুর-বাটীতে এত স্নেহ, মমতা, আদর, যত্ন পাইলেন যে, সহজে পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিতে চাহিতেন না। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী কন্যানির্ব্বিশেষে তাঁহাকে সোণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আমি একবার দেখিয়াছিলাম, একদিন নীরদবরণীর শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিবার সময়, শাশুড়ী ঠাকুরাণী পুত্রবধূকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নীরদবরণীর বিবাহিত জীবনের কথা কত আর বলিব ? আমার অভিজ্ঞতায় আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে অনেক বঙ্গীয় হিন্দু-গৃহস্থের গৃহে শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়াতে কি অশান্তির বীজের বপনই হইতেছে ! ইহার পরিণাম ফল যে কি বিষময় দাঁড়াইতেছে, তাহা দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু নীরদবরণীদের সংসার এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল বলিলে আমাকে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না।

নীরদবরণীর দাম্পত্য জীবনও মধুময় ছিল। স্বামীর স্বাস্থ্য, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক মঙ্গলে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্বামীকে কোন দিন বিমনা বা অসুস্থ দেখিলে বিরলে অশ্রুপাত করিতেন। সে অশ্রু কেহ দেখিতে পাইত না। মধুর বচনে স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার পতিপ্রেম এত গভীর ছিল যে, তাহার তুলনা হয় না। সেই অতুলনীয়া নিরাবিলা প্রীতি লোকচক্ষুর অগোচরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইত। তিনি সেই প্রেমকে এত পবিত্র মনে করিতেন যে, তাঁহার সমবয়স্কাগণের সমক্ষে কথাপ্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন ; কেহ তৎপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিলে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তিনি সর্ব্বাংশে স্বামীর উপযুক্ত হইলেও আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করিতেন। কত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার স্বামী তাঁহার হৃদয় হইতে এই ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সমবয়স্কাদিগের সহিত কত প্রকারের আলাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু নীরদবরণী সে প্রকৃতির নারী ছিলেন না।

তিনি একদিকে যেমন বুদ্ধিমতী, অপর দিকে তেমনি গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে চঞ্চলতা বা ঔদ্ধত্য কখনও দেখা যায় নাই ; অথচ তিনি সরলতার আধার ছিলেন। তিনি সকলের সহিত সরল ও মধুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কেমন স্বাভাবিক মধুরতা ছিল, চিত্তাকর্ষণী শক্তি তাঁহার কেমন প্রবল ছিল যে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমাদের বাটীতে যখন আসিতেন, আমার ছোট ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রগুলি তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের বালস্বভাবসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ

তাঁহারই সমভিব্যাহারে থাকিত। অবস্থার উন্নতিতে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, অন্য পক্ষে বরং চরিত্রের গুণরাশির বিকাশের আরও সুযোগ ঘটিয়াছিল।

বাটীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে তিনি তাঁহাদের সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি প্রায়ই পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির আহারের পর আহার করিতেন। এমন অনেক দিন গিয়াছে, দাসদাসীগণকে পর্য্যাপ্ত পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তবে নিজে অন্নজল গ্রহণ করিয়াছেন। দাসদাসীগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইত। তিনি তাহাদিগকে কখন 'তুমি' ভিন্ন 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। এক্ষণে তাহারা তাঁহার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে ! পাছে পাচক ব্রাহ্মণে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন না দেয়, এই জন্য তিনি অনেক সময় তাহাদের আহার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং তাহাদের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

তিনি তাঁহার সোণার সংসারের এক প্রকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন; কিন্তু কখনও তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কিম্বা শাশুড়ী দেবীকে অতিক্রম করিয়া কোনও কার্য্য করেন নাই। সর্ব্বদাই অবনতমস্তকে আনন্দিত মনে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রবধূকে কি সোণার চক্ষেই দেখিতেন। শ্বশুর শাশুড়ী যে পুত্রবধূর বিয়োগে এত শোকার্ত্ত হন, ইহা আমার অভিজ্ঞতায় আমি কখনও দেখি নাই, কিম্বা শুনিও নাই। নীরদবরণীর যখন দেহ হইতে প্রাণ বিমুক্ত হইল, তখন তাঁহার শ্বশুর মহাশয় আমার অগ্রজ মহাশয়কে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন,—"আজ আমার সংসার হইতে লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন, এই বার তোমরা দেখিয়া লইও, আমার সংসার প্রকৃতই লক্ষ্মীছাড়ার সংসার হইবে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার একমাত্র ননদিনী পতি-পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাতে নীরদবরণীর শাশুড়ী দেবী একমাত্র কন্যার শোকে অত্যন্ত অধীর হন। নীরদবরণী সেই মাতৃহীন পুত্রকন্যাগুলি বুকে করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা এক্ষণে বড় হইয়াছে, কন্যাগুলি বিবাহিত হইয়াছে ; তথাপি তাহারা জানে, ইনিই আমাদের মা। নীরদবরণীর নিজের একটি কন্যা, দুইটি পুত্র ; আর ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী চারিটি ! এই সাতটি ছেলে মেয়ের তিনি মা ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বাড়ীর সাতটি ছেলে মেয়ে মাতৃহীন হইল। আহা ! মাতৃহীন বালক বালিকাগণের বিশুষ্ক বদন ও নিরাশভাব দেখিলে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ৬ষ্ঠ বর্ষীয় শিশু পুত্রটিকে তাহার পিতামহী এই বলিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন যে, "তোমার 'নিনু মা' আহিরীটোলায় তোমার মামার

বাটী গিয়াছেন।” অবোধ শিশু তাহার সাধের “নিনুমাকে” মামার বাড়ী হইতে লইয়া আসিবার জন্য সর্ব্বদাই মাতামহীকে অনুযোগ করিতেছে, আর কাঁদিয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিতেছে।

তাঁহার সন্তানপালনের প্রণালী এক স্বতন্ত্র ভাবের ছিল। ছেলেমেয়েগুলিকে প্রাণ অপেক্ষা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; কিন্তু তাহা বলিয়া কখনই তাহাদের অন্যায় আব্‌দার রক্ষা করিতেন না। ছেলেমেয়েগুলির শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার দিকে যেমন তাঁহার অনুক্ষণ দৃষ্টি থাকিত, তেমনি তাহাদের নৈতিক উন্নতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। তিনি কখনই ছেলেমেয়েদিগকে কোনও রূপ অন্যায় প্রশ্রয় দিতেন না। কখনই ছেলেমেয়েদিগকে প্রহার, তাড়না বা তিরস্কারের দ্বারা শাসিত করিতেন না। যদি কখনও তাঁহার কোন ছেলেমেয়ে তাঁহার কথঞ্চিৎ অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন “তুমি এই দোষ করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার সহিত দুই দিন কথা কহিব না।” ইহাতেই তাঁহার ছেলেমেয়ের মর্ম্মান্তিক লাগিত। ফলতঃ, যাহাদের এমন মা, তাহারা কখনই মন্দ হইতে পারে না। ছেলেমেয়েগুলি বেশ ধীর, শান্ত ও ভদ্র—লেখা পড়ায় মনোযোগী। চাকর দাসীরা ছেলেমেয়েদিগের গা মুছাইয়া দিলে, স্নান করাইয়া দিলে, কাপড় চোপড় পরাইয়া দিলে, তাঁহার পছন্দ হইত না; তিনি নিজে সে সমস্ত করিতেন। ইহাতে চাকর দাসীরা অতীব অপ্রতিভ হইত।

তাঁহার কি সুন্দর ধর্ম্মভাবই ছিল! তিনি একটি নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা ছিলেন। নিজের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত দুই বেলা পূজা আহ্নিক করিতেন। প্রত্যহ শাশুড়ী দেবীর চরণামৃত ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তবে আহারাদি করিতেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রায়ই কথকতা হইত। তিনি ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীর বিবাহ, সীতার বনবাস প্রভৃতি কথা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কোন প্রকার বাজে নাটক নভেল পাঠ না করিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া শাশুড়ী দেবীকে শুনাইতেন।

আজকাল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের অধিকাংশ নারীগণের থিয়েটার দেখা কেমন একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বলিতে কি, পুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অর্থের দ্বারাই দুর্নীতির আড্ডাঘর অনেক থিয়েটার হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে। থিয়েটার দেখার নামে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। তাঁহার স্বামী মধ্যে মধ্যে থিয়েটারে যোগ দিতেন বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত অনুযোগ করিতেন।

আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী মহাশয়ার সহিত আমার ভগিনীর শাশুড়ী

দেবীর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। পূজনীয়া আচার্য্যপত্নী মহাশয়া প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত করিতেন। তাঁহাকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। নীরদবরণী ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমাদের বাড়ীতে আসিলেই তিনি আমাকে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার অনুরোধে আমি গাইতাম বটে, কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার মত আমার প্রেম ভক্তি নাই—সুকণ্ঠ স্বরও নাই; তথাপি আমার মুখেই ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখা দিত, তিনি ভক্তিতে যেন ডুবিয়া যাইতেন। “আমি হে তব কৃপার ভিখারী”, “মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,” “যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি,” “আমায় ছ’জনায় মিলে পথ দেখায় বলে,” “একি করুণা তব ওহে করুণানিধান,” “তুমি যদি কাছে থাক মা, তবে কি দুঃখেরে ডরি,” প্রভৃতি গান তাঁহার বড়ই প্রিয় সামগ্রী ছিল। তিনি আমাকে বলিতেন, “তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কি ভাল আর কি মন্দ বুঝিতে পারি না, কিন্তু তোমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত অতি ভাল জিনিস। তিনি আমাদের জনৈক প্রিয়বন্ধু সুকণ্ঠ গায়কের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একদিন তিনি স্বামীর সহিত আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন, আমাদের সেই গায়ক বন্ধু তখন আমাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া ওস্তাদি গান গাহিতেছিলেন, সে গান কিন্তু নীরদবরণীর ভাল লাগিল না। তিনি লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, ওসব গান কেন? “যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি” গাইতে বল। আমি দেখিয়াছি, আমাদের গায়ক বন্ধুর সেই গান নিভৃত হইতে শুনিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমি এক দিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ব্রহ্মসঙ্গীত সকলের মুখে ভাল শুনায় না—বিশ্বাসী ভক্তের মুখেই ভাল শুনায়। তুমি আমাদের বিশ্বাসী ভক্ত ব্রাহ্মবন্ধু রা—বাবুর মুখে এই ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মসংকীর্ত্তন শুনিও, ভাল লাগিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা শুনা ঘটিয়া উঠে না।

একদিন আমার বিশেষ অনুরোধে তাঁহার স্বামী আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া গিয়া বাড়ীতে তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন। তদবধি নীরদবরণী আচার্য্য মহাশয়ের উপাসনা শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পাছে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ইহাতে অসন্তুষ্ট হন, এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে যাইতে সাহসী হন নাই। আমি যখন প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, তখন আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, শুদ্ধ নীরদবরণী আমার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দেখান নাই।

তিনি প্রতি বৎসর নিষ্ঠার সহিত সাবিত্রী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। আমি

দেখিয়াছি তাঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় তিনি কেমন নিষ্ঠার সহিত ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। পূজার সময় তাঁহার কত আমোদ, কত আহ্লাদ! আগমনীর গান শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যখন নীরদবরণীর শ্বশুর মহাশয় পূর্ণ বাবু সমস্ত পরিবার পরিজনের সহিত কাশীতে ছিলেন, তখন আমি দিন কতকের জন্য কাশীতে গিয়া তাঁহাদের নিকটে ছিলাম। সে গত পূর্ব্ব বৎসরের ডিসেম্বর মাসের কথা। এক দিন রাত্রিতে বাটীর স্ত্রীলোকেরা বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটীতে ফিরিলেন। আমি বলিলাম, যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে কি আপনাদের শীত ভোগ ভিন্ন আর কিছু ইষ্টাপত্তি হইল? ইহাতে নীরদবরণী হাসিয়া আমাকে উত্তর দিলেন "তুমি ব্রাহ্ম, তুমি সে আরতির মহিমা কি বুঝিবে?" এই সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া নানা সুখ স্বচ্ছন্দে তাঁহার বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হইল। কন্যার বিবাহ দিলেন, জামাতার মুখ দেখিলেন।

প্রায় দেড়মাস হইল, তাঁহার স্বামী প্রফুল্ল বাবু নিদারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহাতে সাধ্বী নীরদবরণীর ভাবনা চিন্তার সীমা পরিসীমা ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতিতে তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার ফলে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে তাঁহার হঠাৎ অত্যন্ত জ্বর হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ মস্তিষ্কের প্রদাহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কুলক্ষণ দেখা দিল। সুবিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি মহাশয়-প্রমুখ সুচিকিৎসকগণ দ্বারা তাঁহার বিধিমত চিকিৎসা করান হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই সুফল দেখা গেল না। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার সূর্য্যোদয়ের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি আত্মীয় স্বজনগণ, স্বামী পুত্র, শ্বশুর শাশুড়ী, বৃদ্ধা জননী ও ভগিনী ভ্রাতৃগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়সে নিত্যধামে গমন করিলেন। সোণার সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনগণের এত যত্ন—এত চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইল। সেই সর্ব্ববিজয়ী ভগবানের ইচ্ছার নিকট আমাদের ইচ্ছা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সেই স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুতে মৃতদেহের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে নাই। দেখিয়া বোধ হইল, নীরদবরণী যেন সহাস্য আস্যে নিদ্রা যাইতেছেন। মৃতদেহ উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া নিমতলার ঘাটে তাঁহার আত্মীয়গণ লইয়া গেলেন। আমাদের আশা ভরসা সব ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে সেই সোণার দেহ শ্মশানের চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সৎকারান্তে সকলে শূন্য হৃদয়ে বাটীতে ফিরিলেন। আহা! সেই পুণ্যপ্রেমে দয়াভক্তিতে পূর্ণ পবিত্র

সানন্দ মূর্ত্তিখানি আর দেখিতে পাইব না। যত কাল বাঁচিব, কিছুতেই তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ভুলিতে পারিব না। জগদীশ! তোমার লীলা কি বুঝিব—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা!!!

প্রকৃতির বীরত্ব।

১

প্রকৃতি গো! একি আজ করি দরশন,—
কোথা সে মোহিনী-বেশ,
কোথা সে চিকণ কেশ,
কোথায় সে বসন্তের কুসুম-ভূষণ?
ললাটে সিন্দুরবিন্দু,
কোথা সে শারদ ইন্দু,
কোথা সে তারার হার নয়ন-রঞ্জন?
শিশির-মুকুতা-মালা কোথা বা এখন?

২

বল বল তব ছবি কেন গো এমন?
মসীময় বর্ম্মে আজ,
কেন হেন বীর সাজ,
করেতে অশনি অসি, করে ঝন্‌ঝন্‌!
সমীরণ দ্রুত বয়ে,
কি বারতা যায় লয়ে,
কার সনে বল আজ বাধিয়াছে রণ?
বল বল এ বীরত্ব কিসের কারণ?

৩

প্রবল সিন্ধুর ঢেউ আজ কি কারণ,
আকুল পরাণে ছুটে,
পড়িছে আবেগে লুটে,
আতঙ্কেতে বেলা-পদ করিতে চুম্বন।
কেন আজ বেলা তায়,
গরবে না ফিরে চায়,
তারে ফেলে দেখাইছে গৌরব আপন।
শরণাগতেরে আজ কেন সে এমন?

৪

তরুগুলি নত মাথে কেন গো এমন,
পড়িয়া ধরণীতলে
ভাসিতেছে অশ্রুজলে
কার সনে সন্ধি তারা করিছে স্থাপন?
নদীতে তরণীকুল,
কেন হেন দিগ্‌ ভুল,
বরুণ তাদের কেন করে আবাহন?
সে কিগো বিপক্ষ তব বল বিবরণ।

৫

সুনীল আকাশে নাই চাঁদিমা তপন,
শুধু ঘন অন্ধকার,
ঢাকিয়াছে অঙ্গ তার,
কার শরজাল আজ রোধিল গগন?
কে আজি গো রোষ ভরে,
দারুণ তীখন শরে,
দীনের কুটীরগুলি করিছে ভগন!
কে নিঠুর দীনজনে কঠোর এমন!

৬

কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী তোমা করে আবাহন?
নারী হয়ে নর হেন,
প্রবল বীরত্ব কেন,

কেন গো জলদ কণ্ঠ-গরজে ভীষণ ?
কেন তীব্র হুহুঙ্কার,
কোন্ বীর অবতার
চাহেনি তোমারে কর করিতে অর্পণ ?
বল বল কেন আজ বীরত্ব এমন ?

মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা প্রণেত্রী।

দেবল-রাজ।

(১৬)

মানব-ধর্ম্ম প্রণেতা রাজর্ষি মনু বলিয়া গিয়াছেন, অধর্ম্মের দ্বারা প্রথমে মনুষ্যের যাবতীয় সাংসারিক উন্নতি হইতে পারে, চিরশত্রুও অধর্ম্মের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পরিণামে সেই অধর্ম্ম তাহাকে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলে। দেবল-রাজের চরিতবৃত্ত তাহার পরিস্ফুট নিদর্শন। সকল পাপের উপযুক্ত প্রতিফল ইহ সংসারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনেক উৎকট পাপ অচিরকাল মধ্যেই উৎকট ফল প্রসব করিয়া থাকে। দেবল-চরিত্রে তাহারও প্রমাণ আছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ক্ষত্রিয় সাধুর স্পর্শমণি অপহরণ করিয়া দেবল রাজা হইয়াছেন, পাঠক পাঠিকা এই আখ্যায়িকা মধ্যে আর একবার সেই সাধুর দর্শন পাইবেন। বহুদিনব্যাপী উৎকট তপস্যার ফলস্বরূপ মণি অপহৃত হওয়ায় তাঁহার ও তৎপরিজনের যে কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা দূরে থাকুক, কল্পনারও অতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিঃস্পৃহ সাধু ও ভক্ত বটে, কিন্তু জাতিতে ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়-হৃদয় স্বভাবতঃই প্রতিহিংসা-প্রবণ। পত্নী ও পরিজনগণের নিকট অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া এবং তাহাদিগের ভীষণ দারিদ্র্য-জনিত দুর্দ্দশা দর্শনে একদিকে যেমন উৎকট চিন্তার ফলস্বরূপ মরণাধিক যাতনাপ্রদ বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে প্রতিহিংসার অনলে তাঁহার অস্থি মজ্জা ভস্মসার হইতেছিল। অথচ তখনও স্থির হয় নাই যে, তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি কোথায় গিয়া চরিতার্থ হইবে। তাঁহার ভিক্ষা-ভাজন হইতে অমূল্য রত্ন কোথায় পতিত হইল, বা কোথায় কাহা কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, প্রথম দুই এক বৎসর তাহার কোনও সন্ধানই পাইলেন না। তবে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, ঐ মণি যদি কোনও মনুষ্যের হস্তগত হইয়া থাকে, তবে কাল-সহকারে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। যখন অবগত হইলেন, হাঙ্গরীবাঁকের যে কুম্ভকারের পোঁয়ানঘরে ভিক্ষাভাজন রক্ষা করিয়াছিলেন, সে বড়মানুষ হইয়াছে এবং ক্রমাগত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতেছে, হয়ত ঐ কুম্ভকার তাঁহার মণি হরণ করিয়াছে এবং তাহার প্রভাবেই ধনবান্ হইতেছে, মনে তখন এরূপ সংশয় হইল। কিন্তু যখন অনুসন্ধানে জানিতে

পারিলেন যে, শ্রীনগরের জঙ্গলে যে ব্যক্তির মস্তকে ফণী ফণছত্র ধরিয়াছিল, এই সেই ব্যক্তি, তখন তাঁহার মনে মণি বিষয়ক আর কোন সংশয়ই রহিল না। তখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন যে, হাঙ্গরীবাঁকের "দেবা কুমার" তাঁহারই সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া রাজা হইতেছে। মনে মনে আপন ইষ্ট দেবতাকে মনের বেদনা জানাইলেন—"আহা প্রভো! তোমার মনে ইহাই ছিল যে, আমার দ্বারা তোমার লিঙ্গ বিগ্রহ দগ্ধ করাইয়া দেবাকুমারকে রাজা করিলে? ভাল দেখি, এই পাপের উপর পাপ,—তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও ধনজন কতদিন রাখ।"

দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের আদেশে দেবলরাজ পশ্চিমদিক্ হইতে বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে অভিনির্যান করিলেন; কিন্তু প্রতিকূল গ্রহ সমাবেষ্টিত দৈবচক্রের দুর্দ্ধর্ষ গতি কে রোধ করে? দেবলরাজ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পূর্ব্ব রাজাস্থ রাজধানীর স্বীয় কারাগারে বন্দী হইলেন; কেননা তখন দেবলের পূর্ব্বরাজ্য প্রায় সমস্তই প্রতাপের কর-কবলিত হইয়াছিল। এই সময়ে একদা প্রতাপ স্বীয় শিবিরে দরবার করিয়া বসিলেন। বন্দী দেবলরাজও তথায় নীত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী ঠাকুরও সেই দরবারে উপস্থিত হইয়া দেবলের বিরুদ্ধে মণি হরণের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। দেবলকে সেই অভিযোগের উত্তর প্রদানের অবসর প্রদত্ত হইল। নিজের বর্ত্তমান অবস্থা, সন্ন্যাসীর ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র, প্রতাপের প্রচণ্ড স্বভাব, ভাবী দুর্ঘটনার্থ উদ্বেগ এই গুলি একত্র মিলিত হইয়া দেবলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ দেবলরাজ ও তৎপরিজনগণের ভাগ্যে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহার আয়োজন এখনও পূর্ণ হয় নাই। এই জন্য দেবল প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর ঝোলায় একটি মণি পাইয়াছিলাম এবং সেই মণির প্রভাবে আমার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী ও আমার অনেক বিদ্রোহী বিশ্বাসহন্তা কর্ম্মচারীর দ্বারা আপনি তৎসমস্তই জ্ঞাত হইয়াছেন; আমার ইচ্ছা হইলেও, ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রে তাহা অস্বীকার করিবার পথ রাখে নাই। কিন্তু একটি বিষয় এখনও আপনার অজ্ঞাত আছে। সেই মণি এখন আর আমার নিকট নাই। আমার নিকট হইতেও তাহা অপহৃত হইয়াছে। সেই মণি এই সন্ন্যাসীর বলিয়া যদি মহারাজের বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সেই মণির দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত রাজ্য সন্ন্যাসীকে অর্পণ করিয়া আমি উহাঁর সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রস্তুত আছি। কেন না এই রাজ্যই আমার এই শোচনীয় দশা আনয়ন করিয়াছে।" এই কথা শ্রবণে প্রতাপাদিত্য মহা ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—

"ওহে দেবলরাজ, যদি মণিটি এই

দরবারে অর্পণ করিয়া ঐ কথা বলিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার সাধুতা প্রকাশ পাইত বটে। বিশেষ তুমি যখন আমার বন্দী, তখন তোমার সমস্ত রাজ্যধন আমারই। সন্ন্যাসীকে রাজ্য দিবার তোমার কি অধিকার আছে? স্তেয় বস্তু (চোরা মাল) প্রত্যর্পণ করিলেই চোর নিষ্কৃতি পায় না। তুমি যেমন অসাধারণ চোর, তোমার প্রতি তেমনি অসাধারণ দণ্ড বিহিত হইবে। যে মণি তোমাকে হাঁড়ীগড়া কুমারের নীচ অবস্থা হইতে রাজেশ্বর করিয়াছে, তাহা অপহৃত হইয়াছে কি না, আমি স্বয়ং গিয়া তোমার অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিয়া আসি। যতদিন প্রত্যাগত না হই, তুমি এই অবস্থায় থাক।" সগর্ব্বে এই সকল কথা বলিয়া জয়োল্লাসে উন্মত্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্য দরবার ভঙ্গের আদেশ দিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। দেবলরাজ পূর্ব্বে রাজকীয় কারাগারে কেবল "নজরবন্দী" মাত্র ছিলেন। অদ্য হইতে তাঁহার বাসের জন্য সাধারণ বন্দীশালা নির্দ্দিষ্ট হইল।

(১৭)

দেবলরাজ স্বকীয় রাজধানী দেবগ্রাম হইতে যুদ্ধযাত্রাকালে জননীর হস্তে এক পত্র দিয়া যান। দেবল গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র জননী জ্যেষ্ঠ পৌত্র যুবরাজ দেবলকে পত্রখানি অর্পণ করিলেন এবং পাঠ করিয়া সকলকে শ্রবণ করাইতে আদেশ করিলেন। রাজপুত্র পত্র পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

"রাজমাতা ও রাজপরিজনগণের প্রতি দেবল রাজের অন্তিম আদেশ এই যে, তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে দুর্গের বুরুজে আমার সংবাদবাহক ঘুঘু দুইটিকে দেখিতে পাইবেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা সকলেই রাজপুরীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া রাজভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্ন ও সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির সহিত দীঘির জলে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।"

এই পত্র শ্রবণ মাত্র রাজ-অন্তঃপুরে হাহাকার শব্দে রোদনের ধ্বনি উঠিল। মহিষীগণের কেহ কেহ শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সেই শোকধ্বনি ক্রমে রাজপুরী ব্যাপিয়া রাজধানীকে মুখরিত করিল। বালক বালিকারা কিছু না বুঝিয়াই মাতৃগণের মুখ চাহিয়া তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে দেবরঞ্জিত দেবগ্রাম যেন শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কোথাও আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই,—কর্ম্ম চেষ্টা নাই,—যেন সর্ব্বত্রই পিশাচের হো হো শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। রাজ-পরিজন ও রাজধানীস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ একবার দেবলরাজের আগমন পথে,—একবার বুরুজের উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল।

এদিকে দেবলরাজকে চোর, ডাকাইত প্রভৃতি বদমাইসগণের সহিত এক কারাগারে বন্দী দেখিয়াও ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল না। এই সন্ন্যাসীই দেবলরাজের এত দুর্গতির মূল

কারণ হইয়াছিলেন। মাতার সহিত কথোপকথনে দেবলরাজের যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, বোধ হয় সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, দেবলরাজ নিশ্চয়ই তাঁহাকে মণি প্রত্যর্পণ করিতেন বা প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহার দুঃখ ঘুচাইতেন। কিন্তু, যিনি মণি অপহরণ করিয়া রাজা হইয়াছেন, তিনি একটা নরহত্যা করিয়া সকল গোল মিটাইতে পারেন, এই শঙ্কায় দেবলের নিকট যাইতে সন্ন্যাসীর সাহস হয় নাই। দেবলের বিশ্বাসহন্তা ভগিনীপতির সাহায্যে প্রতাপের শরণ লইয়াছিলেন।

দেবল কারাগারে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"যে ভীষণ পরিণাম কল্পনা করিয়া অন্তঃপুরের অন্তিম ব্যবস্থা দান করিয়া আসিয়াছি, ঠিক্ তাহাই ঘটিল। এখন দুর্দ্দান্ত প্রতাপ আমার রাজধানী স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সংবাদবাহক ঘুঘু ছাড়িতে হইবে। কি দুর্দ্দৈব! পনর বৎসরের মধ্যেই দেবল রাজত্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় উপস্থিত হইল! যাহাই হউক, এখান হইতে দেবগ্রাম পৌঁছিতে সসৈন্যে প্রতাপের ন্যূনকল্পে অষ্টাহ লাগিবে। রাজধানীর রক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি, নিতান্ত অল্পায়োজনে তথায় যাইতে পারিবেন না। মানসিংহের সৈন্যও আগতপ্রায়। আমার কারাবাসের সংবাদ তিনি দুই দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পাইবেন। অতএব দৈবচক্রের ঘূর্ণ্যমান নেমির প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবস্থান ব্যতীত সাত দিবস আমার কোন কর্ত্তব্য নাই,—অষ্টম দিবসে যাহা হয় করিব।"

দিল্লীশ্বরের অনুগত ও করপ্রদ সামন্ত দেবলের দুর্গতির সংবাদ মহারাজ মানসিংহ অচিরকাল মধ্যেই প্রাপ্ত হইলেন। প্রতাপকে বন্দী করিবার জন্য যেরূপ বেগে তাঁহার বাহিনী দেবলের পূর্ব্ব রাজ্যে আগমন করিতেছিল, সেই বেগ অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। কেননা তাঁহার প্রদত্ত খেলাতের সহিত প্রতাপের লিখিত অপমানজনক পত্র পাইয়া অবধি তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। আবার তাঁহার বঙ্গে অবস্থানকালের মধ্যেই প্রতাপের এতাদৃশ ধৃষ্টতা ও অত্যাচারের সংবাদ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিকে প্রতাপাদিত্যেরও অস্তগমন কাল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। প্রতাপ অনেক দিন হইতেই দেবল-রাজধানী দেবগ্রামের সংবাদ লইতেছিলেন। দেবলকে পূর্ব্ব রাজ্যে বন্দী করিলেন বটে, কিন্তু রাজধানী দেবগ্রাম লুণ্ঠন করিবার উপযুক্ত আয়োজন করিতে অতিশয় বিলম্ব হইয়া গেল। ইতিমধ্যে মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে দেবলের পূর্ব্ব রাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রতাপকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ জম্বুক-চাতুর্য্য আশ্রয় করিয়া তিন দিন যুদ্ধ চালাইলেন বটে, কিন্তু চতুর্থ দিবসে মানসিংহের সিংহবিক্রমে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না;—অচিরকাল মধ্যে বন্দিবেশে সেনাপতির

শিবিরে আনীত হইলেন। প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না,—কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ, মানসিংহ মহাবীর প্রতাপকে পিঞ্জর-নিবদ্ধ করিয়া দিল্লী নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

চন্দনতলার চাপ।

উড়িষ্যার মধ্যে পুরীসহর ধর্ম্মভাবোদ্দীপক একটী অতি রমণীয় স্থান। সমুদ্রের নীলবক্ষ হইতে ধবলবর্ণ মন্দিরবিশিষ্ট এই সহরটিকে অতি সুন্দর দেখায়। পুরীর অপর নাম পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমকে জগন্নাথ-ধামও কহে। এই স্থানে ৶জগন্নাথ দেব অবস্থিতি করেন। ৶জগন্নাথ দেবও পুরুষোত্তম নামেই বিখ্যাত। ভারতবাসী হিন্দু সন্তানমাত্রেই এই পুরুষোত্তমকে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বে রাস্তা ঘাটের বিশৃঙ্খলায় এই তীর্থ লোকের পক্ষে বড় দুর্গম ছিল। ইদানীন্তন ইংরেজ রাজার যত্নে ও সুশাসনে যাত্রীদিগের পক্ষে উক্ত পথ অনেকটা শান্তিময়। ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য দেব এই পবিত্র তীর্থে আসিয়া বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে এই স্থানেই তাঁহার তিরোভাব হয়। অধুনা অদ্বৈতপ্রভু বংশের ৶ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এই তীর্থধামে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

৶ জগন্নাথদেবের বাসভবন পুরী নামে অভিহিত। পুরীর মধ্যে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। স্বয়ং জগন্নাথ দেবের বাস-মন্দির "বড় দেউল" নামে প্রসিদ্ধ। মহাদেবের স্কন্ধস্থিত নারায়ণের সুদর্শনে ছেদিত সতীদেহ যে সব স্থানে নিপতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান পীঠস্থান বা মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উড়িয়ারা বলেন ঃ—

"ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকে চ, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা। ইন্দ্রাণী অমরাবত্যে, অম্বিকা বরুণালয়ে। যমালয়ে কালরূপা চ কুবেরভবনশোভা। মহানন্দা অগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং সিংহবাহিনী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা, সিংহলে দেবমোহিনী। সুরেশ্বরী মণিদ্বীপে, লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা। রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে। বিরজা উগ্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে। কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, বারাণস্যাং অন্নপূর্ণা। গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, ব্রজে কাত্যায়নী পরা। দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী।"

বড় দেউলের অদূরবর্ত্তী মন্দিরাভ্যন্তরেই বিমলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিমলা-মন্দিরের পার্শ্ব স্থানেই লক্ষ্মীদেবী, ষষ্ঠীদেবী ইত্যাদি দেবতার মনোহর মন্দিরগুলি ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। জগন্নাথদেব যে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট, সে পবিত্রাসন "রত্নবেদী" বা "রত্ন সিংহাসন" নামে অভিহিত। সেই রত্নবেদীর উপরে জগন্নাথ

ও বলরামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুভদ্রা জি বিরাজমানা। জনশ্রুতি আছে যে, একদা সমুদ্র সুভদ্রার পাণিগ্রহণেচ্ছু হন, কিন্তু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ভীতা হইয়া সুভদ্রা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়া লুকান। জগন্নাথ সুভদ্রাকে ভয়বিহ্বলা সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন ঃ—"আমার পুরী হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন কাহারও কর্ণগোচর হইবে না," তদবধি সুভদ্রা জগন্নাথ বলরামের মধ্যস্থানেই রহিয়াছেন। সমুদ্রের গর্জ্জন জগন্নাথের পুরী হইতে সত্য সত্যই কেহ শুনিতে পায় না।

প্রায় এক ক্রোশ ভূমি যুড়িয়া জগন্নাথের সুবৃহৎ পুরী শোভা পাইতেছে। পুরীর অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইবার ৪টী দরজা বিদ্যমান। দক্ষিণ দরজা, পূর্ব্ব দরজা, উত্তর দরজা ও পশ্চিম দরজা। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব দরজাই গমনাগমনের জন্য প্রশস্ত, এবং এই দরজাই সিংহ-দরজা নামে অভিহিত। এই দরজার দুই পার্শ্বে দুই সিংহ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব দরজা দ্বারা প্রবেশ করিলে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুর পতিতপাবনের মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হয়। কথিত আছে অনার্য্য জাতিগণের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। ইহারা পতিতপাবন দর্শন করিয়াই জগন্নাথ দর্শনের ফল লাভ করে। এই পতিতপাবনের দুই পার্শ্ব দিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য অনেক পরিমাণে বিক্রয়ার্থে সজ্জিত রহিয়াছে। এ সমস্ত দ্রব্যই জগন্নাথের প্রসাদী।

এখানে অনেক নূতন মিষ্টান্ন দেখিতে পাওয়া যায়, দুই একটির নাম উল্লিখিত হইল,—(১) জগন্নাথ-বল্লভ, (২) দন্তভাঙ্গা, (৩) অমালু, (৪) মগজ লাড়ু, (৫) খুরমা, (৬) চক্রীপীঠা, (৭) ভজমুণ্ডা ইত্যাদি।

পতিতপাবনের পরেই ইষ্টক-গ্রথিত এক সুবৃহৎ আঙ্গিনা। আঙ্গিনাটি অতি সুন্দর ও অতি পরিমার্জ্জিত। এখানে ২১টি সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি অতিক্রমপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। এখানেও অনেকানেক প্রসাদী খাদ্যদ্রব্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানগুলি সুসজ্জিত রহিয়াছে। পুরীর মধ্যেই আনন্দবাজার বসিয়া থাকে। এই আনন্দবাজার অতি আনন্দপ্রদ। সমগ্র জগতে বুঝি এমন স্থান আর নাই। এ স্থানে জগন্নাথের প্রসাদী অন্ন, এবং নানা প্রকার ডাল, তরকারী বিক্রয় হয়। পুরুষোত্তমে জাতিভেদ নাই। বহু শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক না কি পুরুষোত্তমের জাতিভেদ রহিত হয়। এই আনন্দ বাজার লোকে লোকারণ্য। এখানে আসিলে সদ্যই হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়—ভাবতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হয়। কণিকা মাত্র মহাপ্রসাদের জন্য রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সকলেই লালায়িত। এতদ্ভিন্ন যে আনন্দবাজারে প্রবেশ করিতেছে, সেই কণিকা মাত্র মহাপ্রসাদ তুলিয়া আহার করিতেছে। এইরূপ অনেকের অল্পাহারেও বহু প্রসাদ নিঃশেষিত হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

তাহার কোনরূপ কৈফিয়ত নাই। এখানে শৃগাল কুক্কুরের মুখ হইতে মহাপ্রসাদ লইয়া লোকে পরমানন্দে আহার করে। মহাপ্রসাদ সকড়ী বা উচ্ছিষ্ট হয় না। মহাপ্রসাদ আহার করিতে কোনরূপ দ্বিধার কারণ নাই, আচমন নিষিদ্ধ। শূদ্র ব্রাহ্মণের মুখে প্রসাদ তুলিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের সঙ্গে একাহারে রত হইতেছে। এমন স্বর্গীয় দৃশ্য আর কোনও তীর্থে আছে কি ?

এই বৃহৎ পুরীর মধ্যে কোথায় বা সুমধুর গীত গান, কোথায় বা সুমধুর বাদ্য ধ্বনিতে প্রাণ পুলকিত ও প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোথায় বা জন-কোলাহলে প্রাণ সশঙ্কিত, কোথায় বা মধুর ধর্ম্ম আলাপনে আত্মা পবিত্র হয়, কোথায় বা বন জঙ্গল, কোথায় বা পুষ্পোদ্যান, ফুলে ফুলে ভ্রমর ভ্রমরী নৃত্য গীতে নিরত। কোথায় বা লতা বিতানে সুরভিত বায়ুর ঢেউ বহিতেছে। কোথায় বা বিকচ পুষ্পসমন্বিত কুঞ্জ কুটীর, চারিদিকে কোকিল কোকিলা গান করিয়া বেড়াইতেছে। শুক শারিকা উড়িয়া বেড়াইতেছে, কপোত কপোতী বাক্‌বাকুম্‌কুম ধ্বনি প্রচার করিতেছে। শ্যাম পত্রাবলীর উপরে বলাকাকুল শোভা করিতেছে। কোথায় বা দাড়িম গাছের সরু শাখার উপর দয়েল দয়েলা নীরবে উপবিষ্ট। কোথায় বা বিল্ব বৃক্ষের পত্রাবলীর ভিতর হইতে পাপিয়ার শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইতেছে। কোথায় বা দেবদেবীর পূজার নির্ম্মাল্য পুষ্প স্তূপীকৃত! সেই পুষ্পের ভিতর অর্ঘ্যের চাউল পতিত থাকে। সেই চাউলের জন্য লোলুপ হইয়া নানা জাতীয় পক্ষিকুল সেইখানে উড়িয়া পড়িতেছে। বক, কাক, চিল, শারী, বাবুই, চড়ুই ইত্যাদি পক্ষী একত্রে সেই পুষ্পপুঞ্জ ভেদ করিয়া আহার অন্বেষণে ব্যস্ত, কেহ কাহাকে হিংসা করে না, প্রহার বা তাড়না করে না। এ দৃশ্য অতি মধুর! এই বৃহৎ পুরীর অসাধারণ সৌন্দর্য্যের বিষয় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। অতএব এই স্থানেই বিরত হইলাম, সময়ান্তরে এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। কথা প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি।

চন্দনতলার চাপ অর্থে চন্দনতলার পুষ্করিণীতে দেবতার নৌকারোহণ উৎসব। পুরী সহরে ছোট বড় অনেক পুকুর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে চারিটী পুকুর সুপ্রসিদ্ধ—ইন্দ্রদ্যুম্ন, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা ও চন্দনতলা। এই পুকুর চারিটি দর্শন করিলে আনন্দে প্রাণপদ্ম বিকশিত হইয়া উঠে।

এই চন্দন তলার জলে বৈশাখ মাসে জগন্নাথের প্রতিনিধি ৮ মদনমোহন জলক্রীড়া করিয়া থাকেন; ইহাকেই চন্দনতলার চাপ কহে। এই চন্দনতলা পুকুরের মধ্যে একটী নয়ন-রঞ্জন মন্দির অবস্থিত। ইহার নিম্নাংশ জলে নিমগ্ন। মদনমোহন লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বৈশাখী

বেলা ৪টার সময় পুরী হইতে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে ৮ পঞ্চপাণ্ডব ও ৮ রামকৃষ্ণ দেবের আগমন হয়। নানা প্রকার বাঁশী কাঁশী, বাদ্য, সঙ্গীত, সারঙ্গ এবং শত সহস্র লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। এই দেবমূর্ত্তিত্রয়ের কাষ্ঠ দোলা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক চালিত হয়। পথিমধ্যে নানা স্থানে মদনমোহনের ভোগ হয়। এই ভাবে পথক্রীড়া পরিসমাপ্ত হইলে মদনমোহন চন্দনতলার ঘাটে আনীত হন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব ও রামকৃষ্ণদেবের আগমন হয়। চন্দনতলার জলে তিনখানি নৌকা সজ্জিত হয়, সর্ব্বাগ্রে মদনমোহন লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ এক নৌকারোহণ করেন, তৎপশ্চাৎ রামকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবকে অন্য দুই নৌকারোহণ করান হয়। প্রথম মদনমোহনের নৌকা পরে অন্য দুই নৌকা ক্রমে ক্রমে জলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মদনমোহনের সম্মুখে একটী অলোক-সামান্য-লাবণ্যবতী বালিকা নর্ত্তকা অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করে। এ দৃশ্য অতি মধুর, অতি পবিত্র ও সুখদায়ক।

চন্দনতলার চাপের সময় চন্দনতলার ঘাটে নানাদেশীয় লোকের সমাবেশ হয়। এখানে সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ও সাধুর অভাব নাই। সকলেই ভক্তিভরে ভরপুর, প্রেমানন্দে অস্থির। কেহ নাচিতেছে, কেহ দর্শনে আনন্দানুভব করিতেছে, কেহ বা নেত্র নিমীলিত করিয়া চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে।

জলক্রীড়া পরিসমাপ্ত করিয়া যখন মদনমোহন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন ধূসরবসনা সন্ধ্যার সমাগম হয়। পট্টবস্ত্র-পরিহিত পূজকগণ দেবমূর্ত্তিত্রয়কে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট আর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার এক প্রকোষ্ঠে মদনমোহনকে ও তাঁহার সঙ্গী ঠাকুরদ্বয়কে স্নান করান হয়। অন্য দুই প্রকোষ্ঠে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবকে আসনাসীন করান হয়। বড় মন্দিরে লক্ষ্মী সরস্বতী সহ মদনমোহন উপবিষ্ট হন। তখন নানা প্রকার আয়োজনে ও উপাচারে পূজকগণ তাঁহাদের পূজা কার্য্য সমাধা করেন। সেই জলোপরিস্থ মন্দিরাভ্যন্তরে অনেক প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, এবং পূজান্তে মহাসমারোহের সহিত মদনমোহনের ভোগ হয়। ভোগ হইতে হইতে রজনী গভীরতায় পূর্ণ হয়। সেই গভীর রজনীতে মদনমোহনের পুনরায় চাপ হয়, পুনরায় সেই নৌকারোহণ—সেই জলক্রীড়া—সেই জনতা স্রোত—সেই হুহু ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ জয় জয় নাদ সমুত্থিত হয়। প্রায় ৩ ঘটিকার সময় মদনমোহন চাপ শেষ করিয়া জগন্নাথের পুরীর অভিমুখে গমন করেন। পরদিবস চন্দনতলার ঘাটে মদনমোহনের পুনরাগমন হয়। ২১ দিবস এইরূপ কার্য্য কলাপ ও আমোদ প্রমোদের পর চন্দনতলার চাপ সরিসমাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

আর্য্যজাতি।

আমরা এই প্রস্তাবে আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। জগতের আদিম সভ্যতার ইতিহাস এই আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস। এই জাতিকে আর্য্য কেন বলিত? অধ্যাপক মোক্ষমুলর-প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে পুরাকালে মধ্য আসিয়াখণ্ডের কোন স্থানে মনুষ্য জাতির আদি পিতৃকুল বাস করিতেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন বলিয়া আর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর্য্য শব্দ ঋ হইতে, তাহার অর্থ চাষ করা। পণ্ডিত মোক্ষমুলার ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি ধাতু হইতে সকল শব্দের অর্থ ঘটনা করেন। কিন্তু এই আর্য্য শব্দ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মত শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের এক স্থানে আর্য্যবর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে;—"ইন্দ্র দস্যুদিগকে ধ্বংস করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" আর একজন ঋষি ইন্দ্রের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথক্ করিয়া জান। যজমানের অনুকূল হইয়া ব্রতহীন দস্যুদিগকে শাসন করতঃ হিংসা কর। যজমানের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে তুমি সক্ষম। আমিও আনন্দকর যজ্ঞে তোমার সেই সকল কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে কামনা করি।'

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে আর্য্যগণ পঞ্জাবের আদিম-নিবাসী লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পঞ্চনদের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগকে "আর্য্য" বলিতেন এবং এদেশের আদিমনিবাসীদিগকে দাস, দস্যু, রাক্ষস, কৃষ্ণজাতি প্রভৃতি ঘৃণা-সূচক শব্দে উল্লেখ করিতেন। এই আদিম-নিবাসিগণের যে নিতান্ত বর্ব্বর অবস্থা ছিল তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক রাজা ছিলেন, প্রস্তর ও লৌহ নির্ম্মিত নগর ছিল। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। আর্য্যগণ তাহাদিগকে "ব্রতহীন" বলিতেন, ইহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে তাহারা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত না, অথবা আর্য্যদিগের ন্যায় যজ্ঞাদি করিত না।

ঋগ্বেদের আর একস্থানে ইন্দ্রকেও অর্য্য বা আর্য্য বলা হইয়াছে। কৃষক অর্থে কখনই ইহার ব্যবহার হয় নাই। আর্য্য শ্রেষ্ঠত্ব-বোধক শব্দ; পূর্ব্বতন ঋষিগণ আপনাদিগকে ও আপনাদের বংশকে আর্য্য বংশ অথবা আর্য্য বর্ণ বলিতেন।

আর্য্যেরা যে মধ্য আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও বৃত্তান্ত ঋগ্বেদে নাই। বরং অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির স্তুতি দ্বারা বোধ হয় যে

তাঁহারা হিমাচল অঞ্চলেই বাস করিতেন, ক্রমে পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের গাঙ্গ্য প্রদেশেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্র নামে দুইটী প্রাচীন প্রদেশ ছিল। এই স্থানে আর্য্যগণ বাস করিতেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরদিকে ইন্দ্রালয় নামে একটী পুরাতন স্থান ছিল, এখানে আর্য্যদিগের আর একটী উপনিবেশ ছিল। বোধ হয় এইটীই তাঁহাদের পুরাতন বাসস্থান। ঋগ্বেদের এক স্থানে এই পুরাতন বাসস্থানের উল্লেখ আছে। যাহা হউক আর্য্যগণ যে হিমপ্রধান স্থানে প্রথমে বাস করিতেন, তাহা দুই একটী ব্যবহার দ্বারা অনুমান হয়। তাঁহারা হিম, শরৎ, ঋতু দ্বারা বৎসর গণনা করিতেন। হিমালয়ের নাম তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞেতে যে সোমরস ব্যবহার করিতেন, তাহা হিমালয় প্রদেশে উৎপন্ন হইত।

যাহাহউক আর্য্য-জাতির প্রথম বাসস্থান সম্বন্ধে আমাদের তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই! তাঁহারা হিমালয় অঞ্চলেরই অধিবাসী হউন কিম্বা ভারতবর্ষের উত্তর স্থিত বাল্হিক (বাল্খ) দেশ প্রভৃতি হইতেই ভারতে আগমন করুন, তাঁহাদের অসামান্য বুদ্ধিবলে তাঁহারা ক্রমে সমুদায় পঞ্জাবদেশ অধিকার করিয়া অনার্য্য জাতিদিগকে পর্ব্বতাদি প্রদেশে তাড়িত করিয়াছিলেন। পঞ্জাবাধিকারের পর হইতেই তাঁহাদের ইতিহাস বেদ ও মনুস্মৃতিতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু যে ব্রহ্মাবর্ত্তের কথা লিখিয়াছেন, তাহাই আর্য্যদিগের ভারতবর্ষের প্রথম বাসস্থান। ঐ দেশে যে সকল আর্য্য ছিলেন, তাঁহারা শুদ্ধাচারী। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর মধ্যস্থানে যে প্রশস্ত দেশ আছে, তাহাদিগকেই ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। ঐ দেশের যে আচার পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সদাচার বলিয়া মনু বিধান করিয়াছেন। আর্য্যদিগের বংশ যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা আরও পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, অর্থাৎ কাণ্যকুব্জ দেশ এবং মথুরা পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। এই দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিত, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্তাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। পরে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং কুরুক্ষেত্র প্রয়াগের মধ্যস্থিত প্রদেশে উপনিবেশ করিলেন। এই দেশকে মধ্যদেশ বলিত। এইরূপে তাঁহারা ক্রমে হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরি এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানই তখন আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল। ইহাই আর্য্যাবর্ত্ত। এই দেশ ভিন্ন অন্য সকল দেশ তখন ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া গণ্য হইত। ম্লেচ্ছ দেশের তাঁহারা আর একটী লক্ষণ দিয়াছেন—যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভা-

বিক অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই দেশ যজ্ঞীয় দেশ; তদ্ভিন্ন স্থান মনুর মতে ম্লেচ্ছ দেশ। আর্য্যগণ পঞ্জাব প্রদেশের শোভা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঋগ্বেদে সিন্ধু প্রভৃতি নদী, হিমগিরি প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে তাঁহারা ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করিয়া কৃষিবাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং আদিম নিবাসিগণকে পরাজয় করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে বহিস্কৃত করিলেন।

কৃষি।

প্রথমে আর্য্যগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঋগ্বেদে ইহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করিবার সময় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত, আমরা এস্থলে ঋগ্বেদ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র কর্ষণ করিব, তিনি আমাদিগের গো ও অশ্ব সকলের পুষ্টিসাধন করুন এবং আমাদিগকে সুখী করুন। ওষধি সকল আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ এবং অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক। ক্ষেত্রজাত আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমাদিগকে যেন কেহ হিংসা না করে।"

"বলীবর্দ্ধ সমূহ সুখে বহন করুক, কৃষকেরা সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ সমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে চালন করুক।"

"হে ইন্দ্র! হে সূর্য্য! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি শ্রবণ কর। তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তদ্দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।"

"হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর।"

নূতন সংবাদ।

১। মোগল সরাই হইতে গয়া পর্য্যন্ত ৭৯ মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে।

২। পুঁটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণার্থ ১৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসিক ২০৲ টাকা, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲ টাকা এবং প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১০৲ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৫। স্বনাম-প্রসিদ্ধ গঙ্গাধর তিলক

কেশরী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। পূর্ব্ব বঙ্গের জাফ্‌নায় জন্মমৃত্যু রেজেষ্টারীর জন্য মিস্ ডেভিডসন নাম্নী এক রমণী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদের জন্য কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে প্রসারিত হইতেছে।

৭। ফিলাডেলফিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধের কাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

৮। পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীর দশমাংশ কৃষ্ণবর্ণ।

৯। কোনও সংবাদপত্র লিখিয়াছেন ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দংশনে পৃথিবীতে যত লোক মরে, হুইস্কী নামক মদ্য পানে তদপেক্ষা দশ হাজার গুণ অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

১০। এ বৎসর উত্তর ভারতবর্ষে যেরূপ অতিবৃষ্টি, দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে।

১১। এবার রথোপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে ওলাউঠায় অনেক লোক মরিয়াছে। যাত্রীদিগের অনেকে আবার কালীঘাটে আসিয়া এই রোগ সংক্রামিত করিয়াছে।

সন ১২৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

সমালোচনা।

ফুলের বাগান—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ও সম্পাদিত। ইহা বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য সুলভ সংস্করণ ১৲ টাকা। রাজসংস্করণ ১॥ টাকা। কলিকাতা ১৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

সকলেই জানেন, হারাণ বাবু বঙ্গের একজন প্রতিভাবান্ কবি ও ঔপন্যাসিক; কিন্তু প্রবন্ধ রচনায় যে তাঁহার এমন অসাধারণ শক্তি আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে জানিবেন না। এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থ "ফুলের বাগানে" হারাণ বাবুর সে শক্তি সর্ব্বাঙ্গীনরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। "ফুলের বাগানে" তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। "ফুলের বাগানে" একাধারে উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সমালোচন আছে। বাঙ্গলার এ শ্রেণীর বৈচিত্রপূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন। "ফুলের বাগান" তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে উপন্যাস ও গল্প; দ্বিতীয় ভাগে প্রবন্ধমালা; তৃতীয় ভাগে কাব্য-সমালোচন। হারাণ বাবুর উপন্যাস ও গল্পের মনোহারিত্ব সর্ব্বজন-উদিত; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না। কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর মৌলিক প্রবন্ধগুলি,—বাঙ্গলা সাহিত্যের

অলঙ্কার। এমন চিন্তাশীলতা, ভাবের গাঢ়তা, ভাষার রমণীয়তা, এবং লিপি-কুশলতা,—অতি অল্প গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। হারাণ বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর,—শ্রীযুক্তবিপিন বিহারী রক্ষিতের কয়েকটি রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিপিন বিহারীও যে একজন সুদক্ষ চিত্রকর এবং বঙ্গের একজন সুদক্ষ ভাবুক সমালোচক, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাঁহার "মহাশ্বেতা" এবং সংস্কৃত উত্তরচরিত নাটকের সেই "চিত্রদর্শন" ও "ছায়ার সীতা" ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এ কয়টি কাব্য সমালোচনায়,—বিপিন বাবুর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিপিন বিহারীর ভাষাও তাঁহার অগ্রজের ন্যায়,—সরল প্রাঞ্জল, মধুর ও মনোজ্ঞ। ফলতঃ দুই ভাইয়ের অমৃতময়ী রচনায় "ফুলের বাগানের" পত্রে পত্রে মণি-মাণিক্য জ্বলিতেছে। ফুলের সৌরভে প্রাণ বিমোহিত হয়; বাগানের শোভায় চক্ষু জুড়ায়। হারাণ বাবুর মাতৃভক্তি, ভালবাসা, সৌন্দর্য্য ও প্রেম, সাপ ও সয়তান প্রভৃতি দার্শনিক প্রবন্ধে এবং বিপিন বাবুর মলিনা, প্রেমের পরীক্ষা, উদ্বোধন, প্রতিমা, সংসার প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পে,—"ফুলের বাগান" সুশোভিত। ইহার সৌরভ ও শোভা অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে। আশা করি, বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা এই অভিনব গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন।

বামারচনা।

মিত্রবিয়োগ।

অহো! একি শুনি কানে,
বিষম বাজিল প্রাণে,
রমেশ বিচারপতি নাহি এ ধরায়!
জীবকুল নিসূদন,
নিঠুর পামর যম,
অকালে সে বঙ্গরত্নে হরিয়াছে হায়।
রমেশ বিহনে আজ,
অন্ধকার বঙ্গ মাঝ,
বঙ্গের গৌরব-রবি তিমিরে ডুবিল;
হায়! কাল, কি করিলি?
কাহারে হরিয়া নিলি?
বঙ্গভূমি আজি ঘোর বিষাদে ঘেরিল?
আহা মাগো বঙ্গভূমি,
চির হতভাগ্য তুমি,
এই কি জননী! তব ললাট লিখন?
যত তব সুসন্তান,
গর্ব্বে দিয়েছিলে স্থান,
একে একে সকলেই করে পলায়ন?
তব দুঃখনিশা মাতঃ,
আর কি হ'বে প্রভাত,

যে রতন হারাইয়া হয়েছ হতাশ,
সে রতন পুনরায়
ফিরে কি আসিয়া হায়—
উজলিবে তব শূন্য হৃদয়-আকাশ?
ছিলে রত্ন-প্রসবিনী,
এখন যে কাঙ্গালিনী,
কাহারে লইয়া গর্ব্ব করিবে ধরায়?
যে সব অমূল্য নিধি
বিতরিয়া ছিলা বিধি,
লইলেন একে একে হরি পুনরায়!
ওহে সর্ব্ব-গুণাকর মিত্র মহাশয়!
এতদিন পরে আজ,
ফুরাল মর্ত্ত্যের কাজ,
তাই কি চলিয়া গেলে ত্রিদিব আলয়?
ধরাধাম পরিহরি
লভিবারে সে শ্রীহরি,
তুমিত চলিলে দেব! অমরভবন;
দেখ চেয়ে একবার,
তব প্রিয় পরিবার,
আকুল পরাণে কত করিছে রোদন।
জজের রমণী হায়!
আজি অনাথিনী প্রায়
সহিছেন মর্ম্মভেদী অসীম যাতনা;
তব পুত্র কন্যা যত,
কাঁদিতেছে অবিরত,
কে করিবে বল দেব! তাদের সান্ত্বনা?
তোমার গুণের তরে
সকলেরি আঁখি ঝরে,
হাহাকারময় আজি সমগ্র ভারত,
বিহঙ্গ ছেড়েছে গান,
নাহি আর মিষ্ট তান,
প্রকৃতি বৃষ্টির ছলে কাঁদে অবিরত।
এ নহে বরষা ধারা,
প্রকৃতি কাঁদিয়া সারা—
তোমা হেন রত্ন আজি দিয়া বিসর্জ্জন।
মোরা অতি মন্দমতি,
তাইতে হে মহামতি!
অসময়ে হারাইনু এ হেন রতন!

স্বর্গারোহণ।

যে কার্য্য সাধিতে ওহে মিত্রবর!
এসেছিলে মর দেশ,
প্রাণপণ করে করিলে সাধন,
আজি তার হ'ল শেষ।
হেথাকার কার্য্য করিয়া সাধন
যাইতেছ অমরায়,
সাদরে তোমায় ডাকেন ঈশ্বর
'আয়রে রমেশ আয়!'
সংসারের লীলা সাঙ্গ হ'ল তব
এসরে ত্রিদিবালয়ে,
তোমার কারণ সুরবাসিগণ
আছে আশা পথ চেয়ে।'
দেবদূত তোমা লইবার তরে,
স্বরগ-তোরণ দ্বারে
পুষ্পরথ লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে,
উঠহে আনন্দভরে।
তব আগমনে সুরপুরে আজি
উঠেছে আনন্দ হাসি,
মন্দারের ফুল ফুটিয়া উঠেছে
শত শোভা পরকাশি।

কুলুকুলু করি ছুটে মন্দাকিনী,
দুকূল উছলি উঠে,
কুসুম সুবাস লইয়া সুধীরে
মলয় সমীর ছুটে।
দীপ লয়ে হাতে দিগঙ্গনা দল,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে,
সকলের হাতে পারিজাত মালা,
চন্দন কাহারো কাছে।
সুরবৃন্দ যত আছেন দাঁড়ায়ে,
হাতে পারিজাত মালা,
সাজাতে তোমার উৎসুক সকলে
যতেক অপ্সরা-বালা—

গাহিছে তোমার আবাহন গীতি
ধরিয়া পুরবী তান,
দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিছে সে ধ্বনি,
কিবা সুমধুর গান।
যাও যাও দেব, দেবগণ সনে,
বস গিয়ে সিংহাসনে,
চিরকাল তথা বাস কর সুখে
দেব দেবীগণ সনে।
হেথায় ঈশ্বর তব দারা সুতে
করিবেন শান্তিদান,
কালেতে সবার শোক তাপ যত
ক্রমে হবে অবসান।

শ্রীমতী—নী।

শিশুর চুম্বন।

কি মোহ-মাখানো ওই শিশুর অধরে,
হাসির কুহকময় মায়া জাল দিয়া,
যেন শত পুষ্পদল ফুটে থরে থরে,
রঙিন আভায় যার মুগ্ধ হয় হিয়া।
কি হিল্লোল প্রাণে বয় শিশুর চুম্বনে—
কি মদির হর্ষ স্রোত চঞ্চল হৃদয়ে।
ধরা যেন ডুবে যায় মধুর স্বপনে,
সুরভি কোরকে দেয় কে যেন ফুটায়ে।
যেন ইন্দ্রধনু খেলা আকাশের গায়,
জোছনার দীপ্ত আলো সরসীর বুকে।
তেমনি গো জননীর অধরের ছায়,
শিশুর চুম্বনরাশি জেগে উঠে সুখে।
যে অমিয় উঠেছিল মথি সিন্ধুনীরে,
বুঝি তা মাখানো আছে শিশুর অধরে!

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

উচ্ছ্বাস।

আমি আসি নাই ভবে শুনাতে কাহারে
(মোর) এ তুচ্ছ কবিতা গান,
সবে ক্ষমা কর মোরে দিওনাক ব্যথা
এ আমার ভাঙ্গা প্রাণ।
আমি তরুণ অরুণ নবীন কিরণে
আসিনি প্রমোদে ভাসি,
আমি শারদ পূর্ণিমা বিমল জ্যোৎস্নাতে
দেখিনি অমৃতরাশি।
আমি বাসন্তী উষার মধুর মাধুরী
হেরিতে পাইনি বনে,
আমি পারিনি মিলাতে ভাঙ্গা বীণা ধ্বনি
তোদের মধুর তানে।

আমি কবির সুকণ্ঠ কবিতা-কাকলী
শুনাতে পারিনি কারে,
আমি যশের সুরভি আশায় কখন
পশ্চাতে চাহিনি ফিরে।
(মম) এ দগ্ধ জীবন—এ দগ্ধ হৃদয়
আঁধারে সদা মগন,
হেথা এ অশ্রু মুছাতে এ জ্বালা ঘুচাতে
নাহিক একটী জন।
সবে ছাড়ি দাও মোরে শুনাতে কাহারে
আসিনি, এ তুচ্ছ গান,
আর দিওনাক ব্যথা এ দগ্ধ হৃদয়ে
বড় ব্যথা পাবে প্রাণ।
হায়! দলিত হৃদয়ে দলিত পরাণে
বহে সদা শোকোচ্ছ্বাস,
আমি এই সংসারের সুখশান্তি প্রীতি
চাহিনা—করিনা আশ।
দেখ সুখের তটিনী বাসনা লহরী
বহেনা এ হৃদি তলে,
শুধু শোকের আগুন ব্যাপিয়া হৃদয়
মরমে সদাই জ্বলে।
আছে একমাত্র আশা প্রাণের ভরসা
সে আশা বাঁধিয়া বুকে,
তাঁরে সঁপিতে আমার হৃদয় পরাণ
যাইব তাঁহারি পথে।
আর নাহি কোন আশা বাসনা কামনা
নাহি আর কোন তৃষা।
তবে বৃথা কেন আর ডাক বার বার
শুনাও সুখের ভাষা।
আমি চলেছি আঁধারে বিলাপ গাহিয়া
পরাণে বেদনা সয়ে;
তোরা শোক-তাপ-পূর্ণ অবলা নারীর
হৃদি কি করিবি লয়ে?

শ্রীমতী রেবা রায়।

কেন পাঠাইলে।

দেব—
ডাকিয়া লইবে যদি কেন তবে পাঠাইলে,
খেলা না ফুরাতে মোর আগেতেই ডেকে নিলে।
পিয়াসা সে না মিটিতে দারুণ অতৃপ্তি হেন,
আমাকে ধরার মাঝে তবেগো পাঠালে কেন?
এই সবে জেগে উঠে চাহিনু সংসার পানে,
ঘুম না ভাঙ্গিতে মোর কি কুহেলি এ নয়নে?
মঙ্গল আনন্দময় তোমার এ পুণ্যপুরে,
আমারে পাঠালে কেন অমঙ্গলময়ী ক'রে।
ফুটন্ত গোলাপ বেলা আমার পরশে হায়,
দারুণ ঘৃণার ভরে ম্লান হয়ে ঝরে যায়।
তোমারি মঙ্গল নামে সকলি রহিব সয়ে,
দাও শক্তি দয়াময় দুর্বল এ হৃদয়ে।
এ ধরার মাঝে মোর আপনার লোক যারা,
আমারে দেখিলে পরে ঘৃণাতেই হয় সারা।
'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না' মোরে সরে যাও কাছ হ'তে,
কি দোষ করিয়া আমি অপরাধী এ জগতে?
কি যাতনা দিবানিশি আছি এ হৃদয়ে সয়ে,
তুমিত বুঝিছ নাথ কিবা জ্বালা এ হৃদয়ে।

এ রজনী মোর নহে মোর খেলা ফুরায়েছে,
সুখ, সাধ, আশা, তৃষা, সবি মোর মিটিয়াছে।
ক্ষীণ প্রদীপের মত শেষ জ্ব'লে নিভে যাই,
বেঁধেছি এ ক্ষুদ্র হিয়া, তব দয়া ভিক্ষা চাই।

৺পঙ্কজ কুমারী দেবী।

খোকার বিদায়।

খোকা গেল কোন্ খানে?
আমি আছি শূন্য প্রাণে;
এখন (ও) সে ফিরিল না ঘরে,
আঁখি মোর ঝরে তার তরে। ১।

এতখানি বেলা হল,
খোকা মোর কোথা গেল?
দুধ পিয়াবারু হয়েছে সময়;
না হেরিয়া তায় বিদরে হৃদয়। ২।

ক্ষুধা পেলে কচি ছেলে,
সময়ে না খেতে পেলে,
কেঁদে কেঁদে তার গলা শুকাইবে,
তারে কে আমার কাছে এনে দিবে? ৩

ক্রমে যে রজনী এল,
ধরণী আঁধার হ'ল,
ঘুমাবার তার সময় হয়েছে;
এসময়ে খোকা কোথায় রয়েছে? ৪।

শূন্য শয্যা পড়ে আছে,
কোথা কি সে ঘুমাতেছে?
মোর কাছে খোকা আসিয়া কখন
শূন্য বিছানায় করিবে শয়ন? ৫।

শূন্য কোলে আছি বসে,
কখন সে কাছে এসে,
শূন্য কোল মোর করিবে পূরণ?
কোলে লয়ে তার চুমিব বদন। ৬।

খোকার বিহনে হায়!
হৃদয় শতধা হয়;
কখন তাহারে দেখিতে পাইব?
কোলে লয়ে দগ্ধ হৃদয় জুড়াব? ৭।

আসিছে আসিছে ফিরে,
রহিয়াছি আশা করে,
আট মাস হ'ল আজ (ও) এলনা?
তবে কি সে ফিরে আর আসিবে না? ৮

যে যায় সে চির তরে—
যায় কি? আসে না ফিরে?
তবে মোর আশা পূরিবে কেমনে?
দেখিতে পাব না তারে এ জীবনে? ৯।

দিন যায় দিন আসে,
মাস যায় মাস আসে,
বৎসর ফিরিয়া আসে পুনরায়;
তবে কেন খোকা না আসিবে হায়! ১০

সূর্য্য ডুবে পুনঃ আসে,
পুনঃ শশী নভে ভাসে,
হৃদয়ের পূর্ণ শশী সে আমার,
তবে কেন নাহি আসিছে আবার? ১১

শরৎ আসে বর্ষাশেষে,
পুনঃ ফিরে শীত আসে,
শীত অন্তে পুনঃ বসন্ত হাসিল,
কিন্তু হায় মোর খোকা না আসিল! ১২

হায়রে অবোধ মন,
কেন আশা অকারণ?
সে যে গেছে চলি অনন্ত সদন,
সেথা হতে কেহ ফিরে কি কখন? ১৩

No. 416-17 Septembur, October, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪১৬-১৭ সংখ্যা। ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০৬। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর সপ্তত্রিংশ জন্মোৎসব।

জয় জয় বল জগদীশ-জয়,
বামাবোধিনীর নব বর্ষোদয়!
সর্ব্বদেশ কালে যাঁহার মহিমা—
যাঁহার করুণা অনন্ত অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী তিনি সাক্ষ্য দিতে তাঁর
দিয়াছেন সবে সম অধিকার।
সূর্য্য যথা মহা জ্যোতি পরকাশে,
তৃণগুচ্ছ মাঝে ফুলবালা হাসে;
কলকণ্ঠে যথা কোকিল কুহরে,
ক্ষুদ্র অলি গায় গুণ গুণ স্বরে;
নিনাদে ভীষণ সমুদ্র যথায়,
কুল কুল রবে নদী-স্রোত গায়।
বড় ছোট তাঁর সাক্ষী সমুদয়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়!

বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র হীন প্রাণ
করুণাময়ের করুণার দান।
তাই বিশ্ব সহ হয়ে একতান
চায় গাহিবারে মহিমার গান—
চায় সাক্ষ্য দিতে, যথাশক্তি তার,
করুণাময়ের করুণা অপার!
বরষে বরষে কালের তরঙ্গে
ভেসে ভেসে প্রাণ ভীষণ আতঙ্গে
কত বিঘ্ন বাধা ঘাত প্রতিঘাতে,
দেখে মৃত্যুদ্বার সম্মুখে পশ্চাতে।
তবু বর্ষে বর্ষে জীবন বাঁচিল,
যুগ যুগান্তর অতীত হইল,
তবু প্রাণে নব আশার উদয়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

পুরুষ-প্রধান মানবসমাজে
রমণী অবলা সঙ্কুচিত লাজে।
পুরুষের বল বিক্রম গৌরব
বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সম্পদ বৈভব
স্তাবকের কণ্ঠে কবির সঙ্গীতে
ইতিহাসপৃষ্ঠে রাষ্ট্র অবনীতে।

এ হেন সমাজে নারীর শাসন
দেশে কালে সুবিস্তৃত অতুলন,
"ভিক্টোরিয়া-যুগ" চিরস্মরণীয়
বিকাশে সভ্যতা কীর্ত্তি বরণীয়
শোভন উজ্জ্বল চিরদীপ্তিময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

গৃহের সাম্রাজ্ঞী পূজনীয়া নারী,
সংসার-সাহারা প্রান্তরের বারি,
অন্নপূর্ণারূপা রন্ধনশালায়,
ভাণ্ডারের লক্ষ্মী—অভাব কোথায় ?
দেব-সেবাব্রতে সতত কুশল,
পূর্ণ গৃহধর্ম্ম পালনে অটল।
সেই নারী আজি দেখায় জগতে
বুদ্ধি জ্ঞানে হীন নহে কোন মতে,
পুরুষের সহ প্রতিযোগিতায়
উচ্চস্থানে নারী আসিয়া দাঁড়ায়।
নারী রাঙ্গলার, নারী ব্যারিষ্টার,
নারী বি এ, এম এ, পণ্ডিত ডাক্তার,
নারী কবি, বাগ্মী, ধর্ম্ম-প্রচারক,
ব্যবহারাজীব, কেরাণী শিক্ষক—
এব কার্য্যে দক্ষা নারী যায় যথা,
পরীক্ষিত সত্য—কে করে অন্যথা ?
অনুকূল আরও হইবে সময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

একাকী পুরুষ ! হবে সর্ব্বে সর্ব্ব,
শাসিবে সমাজ ত্যজ বৃথা গর্ব্ব।
রমণীকে নীচে ফেলে উঠিবার
চেষ্টা কর তায় পতন নির্দ্ধার।
রমণীকে লও করিয়া সঙ্গিনী,
যে সহ-ধর্ম্মিণী সে সহ-কর্ম্মিণী।
রমণী সহায় হইবে যখন,
পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়িবে তখন।
পুরুষের বল—রমণীর প্রেম,
মণিতে জড়িত বি-কষিত হেম,
তায় হবে ধরা পূর্ণ শোভাময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন শতাব্দীর নূতনত্ব—কোন কোন পণ্ডিত ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে ইংরাজী ২০ শতাব্দীতে রমণী জাতি সমাজে প্রাধান্য লাভ করিবে। বাহুবল ও বুদ্ধিবল অপেক্ষা প্রেম ও চরিত্রের বল যে পরিণামে জয়যুক্ত হইবে, তাহা ধ্রুব সত্য।

রাজপ্রতিনিধির গতিবিধি—লর্ড কুর্জন ২৩এ অক্টোবর সিমলা শৈল ছাড়িয়া ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিবেন। পথে দিল্লী, বিকেনীর, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, আজমীড় বুন্দী, কোটা, ভূপাল ও আগ্রা পরিদর্শন করিবেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভ্রমণের সাথী হইবেন।

লেডী কুর্জনের আদব কায়দা—লেডী কুর্জন আত্মপদমর্য্যাদা রক্ষার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি সামাজিক সমিতি প্রভৃতি যখন করিবেন, তিনি দাঁড়াইলে

গৃহস্থ সকলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং তিনি না বসিলে কেহ বসিতে পারিবে না।

অবিবাহিতদিগের শাস্তি—জর্ম্মণির হেসীর রাজসভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন রাজ্য মধ্যে বিবাহিত ব্যক্তিরা যত কর দিবে, অবিবাহিত ব্যক্তিদিগকে তদপেক্ষা শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী কর দিতে হইবে।

স্ত্রীপুরুষের সাম্য—আইসলণ্ড দ্বীপে স্ত্রীগণ পুরুষদিগের সহিত রাজনৈতিক স্বত্বের তুল্যাধিকারী। তথায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণী হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া রাজ্যশাসন হইয়া থাকে।

স্ত্রী ব্যবহার-জীবিনী—ফরাসী মহাসভা আইন পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীদিগকে ওকালতীর লাইসেন্স দিবার আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—(১) ডিনামাইট যন্ত্রের উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেল ৫টী সদনুষ্ঠানের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুই কোটী টাকা দিয়াছেন—(১) রসায়ন, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৩) শারীর বিধান, (৪) সাহিত্য, (৫) জাতি-মৈত্র ভাব প্রচার। প্রত্যেক অনুষ্ঠান তাঁহার নামে আখ্যাত হইবে।

(২) জীবন্ত জন্তুর শরীরচ্ছেদ প্রথা রহিত করিবার জন্য বিলাতে যে সভা আছে, তাহার প্রতিষ্ঠাতা জি আর জেসি ইহার ফণ্ডে ১০ হাজার পাউণ্ড বা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

জাপানে ভারত ছাত্রের সুবিধা—জাপানে যাইবার ২য় শ্রেণীর জাহাজ ভাড়া ২৪০ স্থানে ১৯৪ এবং ৩য় শ্রেণীর ১২০ স্থানে আহারাদি সহিত ৯৫ টাকা মাত্র হইয়াছে। টোকিও নগরে থাকিতে বাসাখরচাদির ব্যয় মাসিক ২০৲ এবং ছাত্র বেতন ৪৲ টাকা মাত্র। নানা প্রকার যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার পক্ষে জাপান প্রশস্ত।

ভারত ছাত্রের জয়—বোম্বাইয়ের পরঞ্জপে যেমন গণিত পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন, ক্রাইষ্ট কলেজে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা পরীক্ষায় বঙ্গের হরিনাথ দেব সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ২য় স্থানীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ইনি ২০০ নম্বর অধিক পাইয়াছেন।

দুর্ঘটনা—(১) আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে ভীষণ ঝটিকায় প্রলয় কাণ্ড হইয়াছে—শত শত লোক মরিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। পোর্টো রিকো নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। (২) রোম ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ডাকের চিঠি পত্র—গত বর্ষে ভারতবর্ষে চিটি পত্র পুলিন্দাদি যাহা ডাকে বিলী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৪৭ কোটী, ৭৩ লক্ষ, ৩৬২৫৮ ; প্রতি দিন প্রায় ১৩ লক্ষ বিলী হইয়াছে ! !

বৈদ্যুতিক ট্রাম—ইহা মান্দ্রাজে চলিতেছে, বোম্বাই ও কলিকাতায় চলিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

দেবলরাজ।

অস্মদ্দেশীয় রমণী সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—"ননদেরও ননদ আছে।" ননন্দৃগণ নববধূদিগকে বড়ই জ্বালা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আবার স্বামি-গৃহে গমন করিয়া ননন্দা কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হন। এক গৃহে যিনি ননন্দা, অন্য গৃহে তিনিই নববধূ হইয়া ঐ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য দেবলকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী ও কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিলেন। এই ঘটনায় উপরি উক্ত প্রবাদের অভিনয় দেখা যাইতেছে। মানসিংহ দেবলকে কারামুক্ত করিয়া যথোচিত সম্মানে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতাপের দ্বারা দেবলের পূর্ব্ব রাজ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়াছিল, মানসিংহের কৃপায় ক্রমশঃ সে সকলের পরিহার হইল। প্রতাপের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবলরাজ তৎকৃত প্রতিহিংসাকে মনেও স্থান দিলেন না। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া পূর্ব্ব রাজ্যের অন্তর্গত দুইটি চাক্‌লার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রদান পূর্ব্বক মহা সমাদরে বিদায় করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন, এবং দেবল রাজ্যকে চিরকালের জন্য নিষ্কণ্টক বোধ করিলেন। কিন্তু ক্ষাত্র-হৃদয়ের প্রতিহিংসানল আশ্রয়কে ভস্মীভূত না করিয়া নির্ব্বাণ হয় না। দেবলরাজের ব্যবহারে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাহে এত সন্তোষ ও নিস্পৃহতা প্রকাশ করিলেন যে, দেবল সহজেই আপনাকে নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক মনে করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কিরূপে দেবলকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাজপুরীকে নিষ্প্রদীপ করিবেন, মনে মনে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্যের উদয় বড়ই রমণীয় ও আনন্দজনক। আজ দেবলরাজ সেই আনন্দের স্রোতে ভাসমান। দেবল রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অবধি একদিনও এমন আনন্দ অনুভব করেন নাই, কেননা এমন দুঃখ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। এখন বুঝিলেন, দুঃখের দ্বারাই সুখের আস্বাদন হইয়া থাকে। সংসারে সুখের ন্যায় দুঃখেরও প্রয়োজন আছে। উৎকট চিন্তা, দস্যু ও প্রত্যাসন্ন রাজন্যবর্গের ভয়াদি কারণে যে রাজপদে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, এখন সেই রাজপদকে স্পৃহণীয় ও সুখজনক বোধ হইতে লাগিল। যেমন আয়োজনে সমৃদ্ধি সহ রাজধানী হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এখন তেমনি আয়োজন ও সমৃদ্ধির সহিত চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যবর্ত্তী হইয়া দেবগ্রাম অভিমুখে শুভ যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে যুদ্ধযাত্রাকালে দেবলরাজের হৃদয়ে কিরূপ ভীষণ ভাবের

সমাবেশ হইয়াছিল, তল্লিখিত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তে আনন্দ ও উৎসাহে গদ্‌গদ হইয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মীর শোভনীয় বদনশ্রী দেখিতে দেখিতে গৃহে চলিলেন। মাতা, মহিষীগণ ও পরিজনগণকে অকারণ অন্তিম আদেশ প্রদান করিয়া যার পর নাই দুঃখ দিয়াছেন, তজ্জন্য গৃহে গমনপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যেককে অভিনন্দিত করিবেন, হৃদয় সমুদ্রে এইরূপ কতই রমণীয় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। দেবলরাজের এই সময়ের মনের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, সংসারের সকল ঘটনাই মানুষকে বঞ্চনা করে,—ঘটনাবলী দেখায় একরূপ, ফল ধরে অন্যরূপ। দৈব চক্রের গতিকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তখনও দেবলের পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৃহ যাত্রা করিলেন।

দেবলরাজ পূর্ব্ব রাজ্য হইতে রাজধানী দেবগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া পরমানন্দে সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিলেন। যে দিন অপরাহ্নে গৃহে উপস্থিত হইবেন অনুমিত হইয়াছিল, সেই দিন মধ্যাহ্নকালে সংবাদ পাইলেন তাঁহার সংবাদবাহক ঘুঘু দুইটী পিঞ্জরে নাই। কি সর্ব্বনাশ! ঘুঘু কোথায় গেল, কে এমন সর্ব্বনাশ করিল, দেবলরাজ এ সকল কিছুই সন্ধান করিবার অবসর পাইলেন না। অশ্ব পশ্চাতে অতি বেগে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্বরাজ প্রাণপণে বায়ুবেগ অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে দেবলরাজ অনুযাত্রিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

উপসংহার।

যুদ্ধযাত্রাকালে দেবলরাজ জননীর হস্তে যে পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্র লিখিবার সময় তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কি সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করা হইল। পত্রার্থ অন্তঃপুর হইতে রাজপুরী, রাজপুরী হইতে রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দুর্দ্দৈবের দুলক্ষ্যসূত্রে সেই সংবাদ সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। দেবালয়-লাঞ্ছিত দেবল পুরীকে দগ্ধ শ্মশান করিবার জন্য সন্ন্যাসী হৃদয়ে যে কালানল পোষণ করিতেছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া সেই অনল গর্জ্জিয়া উঠিল। শৈব সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বপালের বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক অতি গোপনে দেবলরাজের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন। সর্ব্বপ্রকার পশু পক্ষী বশীভূত করিবার কলাবিদ্যা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা ছিল। সৈন্যাবাসের ভৃত্যবর্গ মধ্যে ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৈবচক্রে এই সময়ে সংবাদবাহক পক্ষিগণের ও অন্যান্য পশু পক্ষীর পালনকারী ভৃত্যবর্গের মধ্যে একজনের মৃত্যু

হয়। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী সেই পদে নিযুক্ত হন। তিনিই যথাকালে পিঞ্জর হইতে সংবাদবাহক নির্দ্দিষ্ট ঘুঘু দুইটীকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা মুক্ত হইয়াই উর্দ্ধ গগনে উড্ডীন হইল, এবং বদ্ধ সংস্কারবশে সরল রেখাক্রমে উভয়ে পাশাপাশি হইয়া দেবগ্রামাভিমুখে ছুটিল। অচিরকাল মধ্যেই দেবল দুর্গের বুরুজের উপর উপবেশন পূর্ব্বক "ঘুঘু,—ঘু;—ঘুঘু,—ঘু" এই অব্যক্ত ধ্বনিতে মনের আনন্দ বা ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

দেবলরাজ ঠিক্ গোধূলি সময়ে নগরতোরণে উপস্থিত হইয়াই মহা হাহাকার ও কাতর ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইলেন। ধূধূ শব্দে রাজপ্রাসাদ জ্বলিতেছে, দূর হইতে তাহাও দেখিতে পাইলেন। উচ্চ প্রাসাদে অভ্রস্পর্শী অগ্নিশিখা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান হইয়া দিগ্‌দাহ করিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তঃপুরস্থ অগাধ-জল দীর্ঘিকা তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তিম আদেশ যথার্থ প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্তঃপুরস্থ যাবতীয় মহাপ্রাণীর মৃতদেহ দীঘির জলে ভাসিতেছে। অগণ্য সৈন্য ও নগরবাসী চতুঃপার্শ্বে হাহাকার করিতেছে। অগণ্য ব্যক্তি রাজপুরীর অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। সে কালানল নির্ব্বাণ করে কাহার সাধ্য? যাহারা চৌবেড়ের বুড়োশিবের মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াছিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, মহাকাল বুঝি কালানল জ্বালিয়া স্বকীয় দেহদাহের প্রতিশোধ লইতেছেন! অশ্বারোহী দেবলরাজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ক্ষণকাল এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই অশ্ব সহ পরিজনগণের মধ্যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দেবলরাজের "সপুরী এক গড়" হইয়া গেল।

যথাকালে ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী আসিয়া এই প্রলয় কাণ্ড দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত হৃদয় সুশীতল হইল। "উৎকট পাপের পরিণাম এইরূপ ভীষণ", স্পর্শমণির আখ্যায়িকা সবিস্তার বর্ণনপূর্ব্বক সকলকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তব্য ভার।

কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর ভার। কর্ত্তব্য পথ অতি কঠোর পথ। দায়িত্বের গুরুতর চাপ যিনি জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাহার গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কর্ত্তব্য বোধ একবার প্রাণে উপস্থিত হইলে সে কর্ত্তব্য পালন

না করা পর্য্যন্ত আর কেহ স্থির থাকিতে পারেন না, দায়িত্ব জ্ঞান সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার প্রাণের সমস্ত শান্তি হরণ করিয়া লয়। আবার সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে কত বিঘ্ন, কত বিপদ, কত সংগ্রাম! এ পথে যেন কেবলই দুঃখ, কেবলই কষ্ট! অথচ এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার আছে বলিয়াই মানব মানব-পদবী বাচ্য হইয়াছে। অপর পক্ষে ইহাতেই জীবনের প্রধান সুখ। যদি এ জীবনের কোন কর্ত্তব্য না থাকিত তবে বহু পবিত্র সুখে বঞ্চিত হইতে হইত, তবে জীবন বাস্তবিকই ভারবহ হইত।

মানব জীবনের কর্ত্তব্য অনেক এবং অতি গুরুতর। কিন্তু বহু বিভাগে বিভক্ত হইলেও এক কর্ত্তব্যই অপর সকল কর্ত্তব্যের মূল। যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি, যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা ও অদ্বিতীয় প্রভু, তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবন নিয়মিত করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের জীবনকে যে ভাবে গঠিত ও চালিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমাদের দ্বারা জগতের যে কিছু কার্য্য করাইতে চাহেন, তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য—ইহাই অপর সকল কর্ত্তব্যের মূল। পরম প্রভু পরমেশ্বর আমাদের জীবনের নিয়ন্তা, তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছা আমাদের সকল কর্ত্তব্যের মূল ভিত্তি, ইহা ব্যতীত কর্ত্তব্য অর্থহীন শূন্যগর্ভ বাক্য মাত্র। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকল কার্য্যের উৎস। তাহা অবগত না হইলে পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, আমরা অজ্ঞান পশুর অধম হইয়া পড়ি। পাপ ও ক্ষুদ্রতার দাস অপূর্ণ মানবের পক্ষে পূর্ণ প্রেম ও পবিত্রতার আকর পরম দেবতার ইচ্ছাধীন হইয়া চলা, সমস্ত স্বার্থ মোহ, ছাড়িয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করা যে নিতান্ত কঠিন তাহা আর বলিতে হইবে না। অপর পক্ষে সকল সুখ শান্তির আকর আনন্দময় দেবতার অধীনতাই যে সর্ব্ব প্রকার আনন্দ ও কল্যাণের মূল, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্বামী স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, ইত্যাদি কত কর্ত্তব্যই না আছে। ইহাদের কোনটীই সহজ নহে, প্রত্যেকটীই অত্যন্ত কঠিন অথচ তাহাদের মধ্যে আবার কত সুখই না রহিয়াছে। পিতা মাতা সন্তানের জন্য কত ব্যস্ত! কিসে সন্তানের শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, কিসে সন্তানের হৃদয়ে সুকুমার শিক্ষাকৌশলে ভাবী সম্মানের বীজ ফুটিয়া উঠিবে, কিসে সে জ্ঞানী, মানী, ধনী হইয়া সংসারে সুখী হইতে পারিবে সে জন্য তাঁহাদের শরীর মন প্রাণ কত ব্যস্ত, সেজন্য তাঁহারা কতই না পরিশ্রম করিতেছেন, কতই না কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, নিজেদের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেছেন!

তাঁহাদের প্রাণের গভীর স্থল হইতে সর্ব্বদা সন্তানের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য কি করুণ প্রার্থনাই না উত্থিত হইতেছে! তাঁহারা সে কর্ত্তব্যের চাপে যেন পেষিত হইয়া যাইতেছেন। এই কর্ত্তব্যের সহিত তাঁহারা যেন এক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যেন সন্তান ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞান এমনই জিনিস ইহা সমস্ত জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে, নিজ জীবন অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা যায় না। জীবন হইতে কর্ত্তব্য কম নহে বরং গুরুতর, কর্ত্তব্যের বন্ধন মায়ার বন্ধন হইতেও কঠোরতর।

দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত সন্তান সেণ্ট আগষ্টাইনের পরিবর্ত্তনের জন্য মাতা মণিকাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত কষ্টে কত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, আর অশ্রুজলে ভাসিয়া আকুলপ্রাণে কত প্রার্থনা করিয়াছেন! তাঁহার জীবনে যেন দুঃখের সীমা নাই। আবার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য সীতাদেবীকে কত কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্যময় জীবনে আর দুঃখের শেষ ছিল না। অথচ দুঃখ কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্যে তাঁহারা যে অতুল সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আয়াসহীন আরামপূর্ণ জীবনে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। সত্যই তাঁহাদের সে সুখে আর কাহারও অধিকার নাই। তাঁহাদের সে অনুপম আনন্দ ও শান্তির তুলনা মিলে না। তাহা আর কাহাকেও বুঝানও যায় না। সে শান্তির কল্পনাতেও প্রাণে যে শান্তির ছায়া পতিত হয়, তাহাই প্রকাশ করা যায় না। একদিন নয় দুই দিন নয় সমস্ত জীবন প্রফুল্লচিত্তে পক্ষাঘাত রোগ-গ্রস্তা সহধর্ম্মিণীর শুশ্রূষা করিয়া—নিজ হস্তে তাঁহাকে আহার করাইয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় তাঁহাকে লালন পালন করিয়া দাম্পত্য-জীবনের এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহনে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক যে আনন্দ ও সুখ পাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোথায় মিলে? পৃথিবীর ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে, ভোগবিলাসে কিছুতেই এ সুখ মিলে না। পৃথিবীর যাবতীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণ জীবন এ সুখের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধন মান ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব অক্লেশে প্রফুল্লচিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালনে যে সুখ—যে আনন্দ পাইয়াছেন কোন্ ধনী কোন্ মানী তাহা পাইয়াছে বা পাইবে? কখনও না। বাস্তবিক কর্ত্তব্য পালন ভিন্ন জীবনধারণ ভূতের বোঝা বহন মাত্র। যে জীবন এই কর্ত্তব্য পালনে বঞ্চিত, তাহাতে সুখ ও শান্তির আস্বাদ কখনও মিলিবে না; কারণ কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের যন্ত্রণার ন্যায় আর যন্ত্রণা নাই, আর কর্ত্তব্য পালনের সুখের তুল্য সুখও আর নাই। তাই বলিতেছি কর্ত্তব্যই সুখ, কর্ত্তব্যই শান্তি, কর্ত্তব্যই সব। কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যই লক্ষ্য, কর্ত্তব্যই

মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্যই স্থায়ী পবিত্র সুখ শান্তির একমাত্র অক্ষয় উৎস। কর্ত্তব্য জীবনের স্পর্শমণি, ইহার স্পর্শে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়, আনন্দে উন্মত্ত হয়, সকল অবস্থার অতীত হয়।

আমরা ত সংসারে কত কর্ত্তব্য করিতেছি। কিন্তু কয় জনে এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখী হইতে পারিতেছি? ইহার কারণ কি? আমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রথমতঃ কর্ত্তব্য ভারের,—কর্ত্তব্য বোধের ভীষণ চাপ, পরে কর্ত্তব্য পালনের অপার সুখ। কর্ত্তব্য পালনের সুখ পাইতে হইলে তাহার দুঃখটীও পাইতে হইবে। আমরা দুঃখ পাই না, তাই সুখও পাই না। আমরা যে সুখ পাইতেছি না, তাহা সকলেই বলিবেন, কিন্তু আমরা যে কর্ত্তব্য পালনের দুঃখও ভোগ করিতেছি না, ইহা হয় ত অনেকেই স্বীকার করিবেন না; তথাপি ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের কয়জনের জীবনে সে দায়িত্ব বোধ আছে? আমাদের কয় জনের জীবন দায়িত্বজ্ঞানের গুরুভারে প্রপীড়িত? একটী কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিলে কি আমাদের প্রাণ অস্থির হয়? প্রকৃত পক্ষে আমাদের কি কোনও দায়িত্ব বোধ আছে? আমাদের কি যথার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞানই আছে? কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে দায়িত্ব বোধও থাকিত। দায়িত্ব বোধ কর্ত্তব্য জ্ঞানের ঔৎকর্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান যত উজ্জ্বল, তাহার দায়িত্ব বোধ তত প্রবল। এই দায়িত্ব বোধই কর্ত্তব্য পালনের নেতা। আমাদের দায়িত্ব বোধ না থাকাতে কর্ত্তব্য পালনও নাই। তাই কর্ত্তব্য পালনের সুখও নাই। আবার আমরা জ্ঞানের অভাব বশতঃ প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা বহু কর্ত্তব্য সাধন হইতে বঞ্চিত হই এবং বহু অকর্ত্তব্যও সাধন করিয়া থাকি। মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যে কয় জনের আছে? আমাদের মধ্যে কয় জন এমন আছি যে সন্তানকে উপযুক্ত-রূপে গঠিত করিতে পারি? সন্তানের অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান অপেক্ষা তাহার আত্মার উন্নতির জন্য অধিক ব্যাকুল এরূপ মাতা কয়টী আছেন? "হে প্রভু আমার সন্তান পথের কাঙ্গালী হউক, সংসারের ঘোরতর বিপদের মধ্যে পতিত হউক, কিন্তু তোমার পথে থাকিয়া তোমার কার্য্য সাধন করুক, ঝড় প্রবাহিত হউক কিন্তু তোমার পথে অটলভাবে অবস্থিতি করুক", আমরা কয় জন সন্তানের জন্য এরূপ প্রার্থনা করিতে পারি? এইরূপ মা হইতে পারিলেই সন্তানের প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিয়া দায়িত্ব-ভার-মুক্ত হইতে এবং অতুল আনন্দ ও অপার সুখ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই এই একই কথা। সকলের মূলে জ্ঞান ও প্রেম। এই জ্ঞান ও প্রেম কর্ত্তব্যের মূল। আর এই কর্ত্তব্য জীবনের চালক হইলে প্রাণ এরূপ দ্রাঢ়িষ্ঠ হয় যে সংসারের সর্ব্ব

প্রকার ঝড়ে তাহা অচল অটল থাকে, কথনও পথভ্রষ্ট হয় না, ইহা জীবনকে ঠিক্ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং শান্তির সেই অনন্ত উৎস খুলিয়া দেয় যাহার আর বিরাম নাই, শেষ নাই, ক্ষীণতা নাই।

আত্মসংযম।

(৪১৩ সংখ্যা—৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

৬। আনুরক্তি—সুন্দর বস্তু বা রমণীয় বিষয়ের প্রতি মানবের স্বাভাবিক যে অনুরাগ, তাহাকেই আমরা "আনুরক্তি" প্রবৃত্তির কার্য্য বলিতেছি। এই প্রবৃত্তির জন্যই মানব-হৃদয় প্রভাতের সূর্য্য, বিকশিত কুসুম, মধুর চন্দ্রালোক, সুন্দর মুথ হইতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, দয়ার মাধুর্য্য, বিদ্যার মহত্ত্ব প্রভৃতি সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণে অনুরক্ত হইয়া থাকে। কুরুবংশীয় ধনঞ্জয় কবে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শূরত্বের কথায় আমাদের প্রাণ কেমন উল্লসিত হয়! রাণী অহল্যা বাই কোন্ কালে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার মহত্ত্বের কথায় এখনও তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতে হয়! মহারাষ্ট্রীয় ছেলে পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে সে দিন বিলাতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার কথায় আমাদের প্রাণ পুলকিত হইতেছে! ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সুকবি, সুশিল্পী প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণের প্রতি এই যে অনুরাগ, ইহাই আমাদের আনুরক্তি প্রবৃত্তির কার্য্য। এই আনুরক্তি হইতে মানবের মহোপকার সাধিত হয়। যিনি যে গুণের প্রতি অনুরক্ত, তিনি সেই গুণ নিজ চরিত্রে গ্রহণ করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে মানব, আদর্শের সমতুল্য উন্নত না হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই আনুরক্তি লইয়া মানব যদি স্বার্থপরতার বশে গর্ব্বান্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের সেই অমৃত কালকূটের আকার ধারণ করে, তাহার আনুরক্তি প্রবৃত্তি হিংসা রিপুরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে পিশাচবৎ অধম করিয়া ফেলে।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, কোনও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় ক্ষমতা নিজের আয়ত্তাধীন করিতে না পারিয়াই মানব হিংসুক হইয়া পড়ে। তোমাকে কোনও সদ্‌গুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জানিয়া আমি তোমার সেই গুণের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরক্ত হইলাম, যাহাতে তোমার মত হইতে পারি, তোমার আদর্শে তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহাত আনুরক্তির কার্য্য। তার পরে যথন নিজের অযোগ্যতা নিজে বুঝিতে পারিলাম—যথন বুঝিলাম, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র, তুমি কৃতী, আমি অকৃতী, যথন বুঝিলাম আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, তোমার সূর্য্য কিরণের কাছে আমার জোনাকীর আলো কথনই ফুটিবে না, যথন সব বুঝিয়া নিরাশ হইলাম, তথনই তোমার মহত্ত্ব—তোমার সুখ্যাতি আমার নীচ হৃদয়ে অসহ্য বোধ হইল, আমি ছিলাম তোমার অনুরক্ত—হইলাম হিংসুক! তাই তোমার তুলনায় আমিও যে "একটা সামান্য লোক নই" এ কথা প্রথমতঃ নিজের মনের কাছে, পরে জগতের কাছে বিধিমত সপ্রমাণ করিতে বসিলাম। ক্রমশঃ তোমাকে ক্ষুদ্র করিয়া, আমার মহত্ত্ব দেথাইতে শত সহস্র "ফিকির, ফন্দি" থাটাইতে লাগিলাম। তার পরে যথন আমার নীচতা "ষোল কলায়" পূর্ণ হইল, তথন কেবল তুমি কেন? এ জগতে আমা ভিন্ন অন্য ধনী, মানী, জ্ঞানী, সাধু, যশস্বী প্রভৃতি সৌভাগ্যবান্ আছে কেন? ভাবিয়া দারুণ হিংসার আগুনে পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম!—হিংসার কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে।

ছয় রিপুর সকল কয়টীই মানবের সর্ব্বনাশক হইলেও হিংসাই মানবকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণচেতা করিয়া ফেলে। ইহার প্রধান কারণ এই যে হিংসার কার্য্য পরশ্রী-কাতরতা। পরের হিতসাধন মানব-জন্মের এক প্রধান কর্ত্তব্য; ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের সার এবং সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মেরই সার। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মবেত্তারাই পরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু হিংসুক স্বতন্ত্র জীব; সে পরের মঙ্গল চাহিবে কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে পর ব্যথিত হয়, নিন্দিত হয়, দরিদ্র হয়, মূর্খ, নীচ এবং সর্ব্বাংশে হেয় হয়, হিংসুকের চিত্ত তাহাতেই লাগিয়া আছে। সে পরের মঙ্গল চাহিবে কি? পরের অমঙ্গল জন্য যদি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতেও হয়, সে তাহাতেও সম্মত হইবে। গল্প আছে, এক হিংসুক প্রাণপণে ভগবানের সাধনা করিল; তাহার পরিশ্রমে দয়াময় দয়া করিয়া বর দিতে আসিলেন। সে প্রার্থনা করিল "ঠাকুর! আমি যথন যাহা চাহিব, তথন যেন তাহাই পাই।" ঠাকুর বলিলেন "তাহাই হইবে; কিন্তু তুমি যাহা পাইবে, তোমা কর্ত্তৃক হিংসিত প্রতিবাসিগণ তাহার দ্বিগুণ পাইবে।" ইহার পরে সে ভগবানের নিকটে একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব চাহিল, অমনি তাহার একটী এবং তাহার প্রতিবাসিদিগের দুইটী করিয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব আসিল। এইরূপে সে সম্পদ যশঃ যাহা কিছু চাহিতে লাগিল, তাহার এক গুণ এবং তাহার প্রতিবাসীদিগের দ্বিগুণ লাভ হইতে লাগিল। হিংসুকের প্রাণে পরের এত শ্রীবৃদ্ধি আর সহ্য হইল না, তথন সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিল "দেব! আমার এক চক্ষু কাণা হউক।" ইহাতে তাহার এক চক্ষু কাণা হইল বটে, কিন্তু প্রতিবাসীদিগের দুই চক্ষু অন্ধ দেথিয়া সে

যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইল। তখন হিংসুক মনের আনন্দে ঘুরিতে ঘুরিতে দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা জন্য এক কূপে পতিত হইল। সে উদ্ধারের জন্য বহু আর্ত্তনাদ করিলেও অন্ধতা-নিবন্ধন তাহার প্রতি-বাসিগণ তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। তখন সে নিজের দোষ বুঝিল, এবং ভয়ানক ক্লেশে মরিয়া গেল! এ ঘটনা উপকথা হইলেও প্রকৃত পক্ষে হিংসুকের প্রকৃতি এইরূপ। হিংসা মানবকে সত্য সত্যই নর-পিশাচ করে। সে রকম হতভাগ্যদিগের জীবন ধারণ যে বিড়ম্বনা, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

(ক্রমশঃ)

অন্তঃসলিলা।

১

চাহিয়া দেখিনি তারে
পাছে সে শুকিয়া যায়,
নিকটে বসিনি, যদি
মোর বায়ু লাগে গায়।

২

বলিনি মনের কথা
সে শুনি অবাক্ হবে,
সুধিনি তাহারে কিছু,
কেমনে খুলিয়া ক'বে?

৩

সাধিনি—ডাকিনি তারে,
না দেখিলে "মরে যাই,"
আপনি আসিত যদি,
আমি যেন সেথা নাই!

৪

দিইনি স্নেহের ভাষা,
অথবা একটু হাসি,
ভুলেও বলিনি কভু
কতখানি ভালবাসি।

৫

একটু আদর দিতে
বড় সাধ হ'ত চিতে,
বিলায়েছি পথে পথে,
তারেই পারিনি দিতে!

৬

আজি
প্রীতি, স্নেহ দিতে নিতে
কত কা'রা যায় আসে,
তারেই গুটায়ে হাত
বসেছিনু এক পাশে!

৭

স্বরগ-দেবতা সে যে,
হৃদয় স্বরগ তারি,
এ জগতে কিবা আছে
তাই তারে দিতে পারি?

৮

আজি তারে খোঁজে সবে
সে এখন কোন্ খানে?
(পরে জানে "বহুদূর",
আমি জানি, মোর প্রাণে)

৯

দু'পারে দু'জন আছি,
"বৈতরণী" আছে মাঝে,
আমি যেন তারে ভুলে,
রয়েছি আমারি কাজে!

১০

আমি যে প্রতিমা গড়ি
মনের নিরালা ঠাঁই
রেখেছি, জনমভরে
সেবিব—পূজিব তাই;

১১

দেছি তাহে সুখ-সাধ
দেছি তাহে সুখ-আশা,
যতখানি আছে বুকে,
দেছি তত ভালবাসা।

১২

বরষা-উচ্ছ্বাস দেছি,
বাসন্ত:ফুলের হাসি,
শারদ-চন্দ্রমা দেছি,
উষার সোহিনী বাঁশী।

১৩

স্বরগ-মন্দার দেছি
অঞ্জলি ভরিয়া আনি,
তপ্ত নয়নের জলে
ভিজায়েছি পা' দুখানি।

১৪

সদ্য-ছিন্ন হৃদি রক্তে
নিত্য করাইয়া স্নান,
প্রাণের সর্ব্বস্ব তারে
নীরবেই করি দান।

১৫

আমার সাধের যত,
সকলি সঁপিয়া তা'য়
একেলা রয়েছি আজি
শত বর্ষ দূরে হায়!

১৬

বাহিরে খুঁজিয়া কেহ
ছায়াটী পাবে না তার,
জলভরা ফল্গু নদী,
বাহিরে বালুকা সার!

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সন ১২৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত

চন্দনতলার চা[illegible]।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

চন্দনতলার ঘাটে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা সেই চন্দনতলার জলে শত শত বালবৃদ্ধ যুবকের জলক্রীড়া। বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শত শত মনুষ্য মহানন্দে জলখেলা করিয়া সন্তরণ-জনিত শ্রান্তি দূর করণোপ-যোগী এক একটী পাটথড়ীর (পাকাটীর) বোঝা সকলেই হস্তে করিয়া রাখে। মদন-মোহনের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ-পটু বালকগণ ঘুরিয়া বেড়ায়। চন্দনতলা

জলের মন্দির ঊর্দ্ধে ২৫।৩০ হাত হইবে, বালকগণ তাহার শিরোভাগ হইতে জলে লাফাইয়া পড়ে। মুহূর্ত্তের জন্য জলে নিমগ্ন হয়, আবার ভাসিয়া উঠে। এইরূপ অনবরত উঠিতেছে-পড়িতেছে, উঠিতেছে-পড়িতেছে। চন্দনতলা পুকুরের অনতিদূরে ক্ষুদ্র তেলের দোকান আছে, যে আসিতেছে সেই আপাদ মস্তক তৈল মাখিয়া জলে লাফাইয়া পড়িতেছে। এত বড় পুকুর লোকে লোকারণ্য—ছিদ্রশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিদিকে কেবল মানুষের মাথা, পাট খড়ির বোঝা আর ঝপাঝপ শব্দ।

চন্দনতলা পুকুরে অনেক কুম্ভীর অবস্থিতি করে, বালকদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ভাসিয়া বেড়ায়। কথিত আছে যে চন্দনতলা চাপের ২১ দিবস তাহারা কাহাকেও হিংসা করে না, অথচ শেষ দিন একটী না একটী উদরসাৎ করে, এ কথা সময় সময় সত্য হইতেও দেখা যায়। ফলকথা এখানকার মানুষেরা কুম্ভীরকে অতি কম ভয় করে। কুম্ভীর ভাসিয়া উঠিলে বালকগণ ইষ্টক খণ্ড লইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক তাহার অতি নিকটে যায় এবং এইরূপ কহে "কোটি গলা (কোথায় গেল), মারি পকারে, মারি পকা (মার মার), বিধাপকা বিধাপকা (কীল দে কীল দে)।"

জলক্রীড়ার পর মদনমোহন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে সেই জনস্রোত কথঞ্চিৎ নির্জ্জনতায় পর্য্যবসিত হয়। চারিদিকে শান্তি শোভার সীমা পরিসীমা থাকে না। নক্ষত্র-খচিত সুন্দর প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া চন্দনতলার জলরাশি নৃত্য করিতে থাকে, মৃদু মৃদু বায়ুহিল্লোলে মন্দিরের মধ্য হইতে ফুল চন্দনের সুগন্ধ ছড়াইতে থাকে, লহরীমালা ফুল বিল্বপত্র নাচাইতে নাচাইতে এ কূল হইতে ও কূলে যায়, ও কূল হইতে এ কূলে আসে।

এ সময় ভক্তবৃন্দের মনে আর আনন্দ ধরে না, কেহ মন্দিরের মধ্যে উপবেশন করিয়া ভাবে বিভোর, কেহ মদনমোহনকে দেখিতে দেখিতে তন্ময়চিত্ত, কেহ হরিচিন্তায় অনন্যমনা, কেহ কৃষ্ণ রাধিকার জলখেলার কথা উপকথার ন্যায় অন্যকে শুনাইতেছে, কেহ নিবিষ্ট মনে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছে, কেহ গাইতেছে—

"চাঁদবদনে একবার হরি বল ভাই,
লুচী মোণ্ডা ফুলবাতাসা হরির নামে লুটা ধনাই।"

কেহ গাইতেছে—

"হরি বলরে ভাই,
গৌর নিতাই।"

কেহবা দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে গাইতেছে—

"পতিতপাবন, এ পাতকীজন,
ভ্রমে কি কখন পাবে তোমারে।"

সঙ্গীতের তালে তালে বায়ু নাচিতেছে, লহরী কাঁপিতেছে, নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, প্রেমভরে জগতীতল ভাসিয়া যাইতেছে, মরি মরি কি স্বর্গের

শোভারে! কি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যরে! এখানে আসিলে জানি না কোন্ এক অদৃশ্য অননুভূত অপরিজ্ঞাত শান্তির প্রভাবে প্রাণ আত্মহারা হয়, জীবনে এক অমৃত যোগের উদয় হয়! তখন ইচ্ছা হয় সেই মৃদু পবনের স্বন্ স্বন্ শব্দের সঙ্গে, সেই চন্দনতলার কুল্ কুল্ ধ্বনির সঙ্গে আর সেই গায়ক—কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া গাই—

"একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি—
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ, লহ তুমি কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।"

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

ইংরাজ রাজত্বের সুফল।

ইংরাজ-রাজের রাজত্বকালে, বিশেষতঃ ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সুশাসন-সময়ে আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক সময় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখ শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত সাম্রাজ্ঞীর রাজত্বে ধন-জন-জীবন লইয়া ভারতের প্রজাবৃন্দের কোনও বিপৎপাত কি বিভ্রাটের ভয় নাই। দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বকালের জনসমূহ যেমন সতত সশঙ্কিত থাকিতেন, বর্ত্তমানে কেহই সেরূপ সশঙ্কিত নহেন। অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষবিশিষ্ট বাটী নির্ম্মাণকরতঃ তন্মধ্যে ফাঁপা কুলঙ্গী ও চোর কুঠরি ইত্যাদি রক্ষা করা আর কেহই প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রত্যয় করেন না। ধনাঢ্য কি ভূম্যধিকারীরা আর কেহই লাঠিয়াল পাইক ধনজন প্রাণ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞান করেন না। বর্ত্তমানে পর্য্যটকেরা ধন সম্পত্তি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে দূর দূরান্তরে অহরহঃ ভ্রমণ করিতেও ভীত নহেন। প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ রাজত্বে সাধারণের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা ধন-জন-প্রাণ নিরাপদ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ইংরাজ-রাজের রাজত্বে যে সকল সুফল লাভ করিতেছি, তন্মধ্যে ডাক ও তাড়িত বার্ত্তার বন্দোবস্ত, রেলওয়ে ও ষ্টীমার এবং পুলিশ ও আদালতের সুব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রকৃষ্ট বলিতে হইবে। আমরা বিজিত জাতি। রাজা বিদেশী অথবা স্বদেশীই হউন না কেন, তাঁহাকে শাসক ও পালক জ্ঞানে জনকের ন্যায় ভক্তি ও সম্মাননা করা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা যখন প্রায় ৮০০ শত বর্ষকাল অনেক অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত আফগান, তুর্কী, মোগল প্রভৃতি যবনরাজের অধীনে সদা সশঙ্কিত অবস্থায় অশান্তিতে অবস্থিতি করিয়াও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হই নাই, তখন সুসভ্য ও সদাশয় ইংরাজ রাজত্বে অতুল শান্তিতে অবস্থিতি করিয়া কেন অকৃতজ্ঞচিত্তে রাজাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিব? প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ রাজা প্রজার পালক ব্যতীত পীড়ক নহেন। প্রজার বিলাপ ক্রন্দন ও সরল আবেদনে দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া প্রজার অহিত সাধন ব্রতে ব্রতী হইতে পারেন কি? সত্য বটে বর্ত্তমানে রাজনীতি পর্য্যালোচনার উপযুক্ত পূর্ণ অধিকার আমাদের হস্তে ন্যস্ত নহে। তত্রাপি প্রজা-রঞ্জক ইংরাজরাজ কেবল উচ্চ শাসন ও সৈনিক বিভাগ ভিন্ন অন্যত্র, বড় লাট ও ছোট লাটের মন্ত্রি-সভাতে এবং বিচারালয়ে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কি ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরী সভায় কি বড় লাটের সভায় যখন যেরূপ প্রকৃতির মন্ত্রিসংখ্যার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তদ্রূপ আইন কানুন বিধিবদ্ধ হয়। ফলতঃ তজ্জন্য ভারত-সাম্রাজ্ঞীর উপর কোনও দোষারোপ করা সভত সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। প্রকৃত পক্ষে ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভারতের প্রজাপুঞ্জকে অপত্যস্নেহে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। বিগত জুবিলী অভিনন্দনের উত্তরগুলি পাঠ করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। মন্ত্রিসমাজের কোন ভ্রান্তসিদ্ধান্ত নিরসন উদ্দেশে সরল ও বিনীতভাবে অভাব অভিযোগ ইংরাজ রাজসমীপে প্রার্থনা দ্বারা বিদিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই বটে, তথাপি সকল দুঃখ স্পষ্টাক্ষরে জানান যায় এবং তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করা যায়। বর্ত্তমানে ইংরাজরাজত্বে যেমন কংগ্রেস মঞ্চ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অনেকেই যশস্বী ও দেশহিতৈষী হইতে প্রয়াস পান, মুসলমান রাজত্বে তদ্রূপ করিবার কল্পনা করিলেও শিরশ্ছেদ পুরস্কার হইত। উপসংহারে সঙ্গীতামৃত লহরীর একটী গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা গেল।

"ধন্য বৃটিষ" অশেষ গুণ তোমার।
করি কোটী কোটী নমস্কার।

দেখি সব বাড়ি বাড়ি বিজ্ঞানের ছড়া-ছড়ি, সভ্যতার বাড়াবাড়ি, অতি চমৎকার। বৈদ্যুতিক গ্যাসের জ্যোতি নাশে আন্ধার দিয়া দীপ্তি, টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনে বহে বার্ত্তা নিরন্তর। বাষ্পযান চলে জলে, বাষ্পরথ রেলে চলে, দূরবীণ অণুবীক্ষণ বলে লভি কত উপকার। বিবিধ কারখানা কলে, করে কার্য্য কল কৌশলে, ডাকঘর আদি অবহেলে করে হিতসাধন অপার॥

ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

—০—০—

চিনির বলদ।

কলিকাতার অনতিদূরে কাশীপুর বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে গঙ্গারাম চৌধুরী নামক একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন। গঙ্গারামের বয়ঃক্রম এইক্ষণে সত্তর বৎসর হইবে। বাল্যকালে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় কষামাজার কাজ উত্তম-রূপে শিখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি একটী সওদাগরী আফিসে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে একটী চাকরি পাইলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে করিতে সাহেবদিগের নজরে পড়িলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বেতন ৫০ টাকা হইল। 'উপরিও' কিছু লাভ হইতে লাগিল।

গঙ্গারাম এতাবৎকাল 'মেসে' (ছাত্র-বাসায়) থাকিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মধ্যে মধ্যে মাসে ২।১ বার বাটী যাইতেন। বাটীতে এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক ভাই ও এক বিধবা ভগ্নী ছিলেন। বেতন বৃদ্ধি শুনিয়া স্ত্রী কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। গঙ্গারামের ইচ্ছা নয় যে স্ত্রী কলিকাতায় আইসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে টাকা জমাইতে হইবে। স্ত্রীর উপর্য্যুপরি আক্ষেপ-সূচক পত্র বর্ষণে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া কলিকাতায় স্ত্রী পুত্র আনিলেন।

গঙ্গারামের পত্নী রূপে ভগবতী ও গৃহকার্য্যে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার পদার্পণে গঙ্গারামের বেশ দশ টাকা হাতে আসিতে লাগিল। স্বামীর ব্যয়বাহুল্য ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একজন ঝি রাখিলেন। দিন দিন গঙ্গারামের সংসারের উন্নতি হইতে লাগিল—তিনি মাটি মুঠা ধরিলে সোণা মুঠা হয়। গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা যে একটী পাকা ইমারত করা হয়। গঙ্গারাম অত্যন্ত চাপা ও সাবধান। তিনি কোন মতে সম্মত হয়েন না। পত্নীর পীড়াপীড়িতে কহেন, "ক্ষেপি! বুঝ্‌তে পারিস্ না, এখন কোটা করিলে লোকের চোক টাটাইবে।" এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন অন্ধকার রাত্রে গঙ্গারামের ঘরে সিঁদ কাটিয়া চোরে কিছু টাকা চুরি করিল। গঙ্গারামের আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইল—ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। রাত্রে নিদ্রা নাই—হুঁকা মুখে দিয়া বসিয়া অর্থ চৌকি দিতে লাগিলেন। স্ত্রী কোটা করিবার জন্য যত অনুরোধ করেন, গঙ্গারাম তাহা কিছুই কাণে স্থান দেন না। আর রাত্রি জাগিতে না পারিয়া, ক্লান্ত হইলে গঙ্গারাম

পরিশেষে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কেমন, এখন হয়েছে ত, কাঙ্গালের কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগে।"

রাজমিস্ত্রি আসা যাওয়া করিতে লাগিল। কলিকাতায় বাদুড়বাগানে মায় পুষ্করিণী ও বাগান একটী জমি খরিদ করা হইল। ঐ জমিতে ইট সুর্কি মালমসলা সব আসিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ২।১ বৎসরের মধ্যে গঙ্গারামের সুন্দর একটী চক্‌মিলান বাটী প্রস্তুত হইল। গঙ্গারাম-গৃহিণী অন্নপূর্ণার একান্ত বাসনা যে গৃহ-প্রবেশের দিন দশ জন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভোজন করান; কিন্তু স্বামীর মত-বিরোধিনী হইবার আশঙ্কায় তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে কেবল মাত্র দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুভ দিনে আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্নপূর্ণার আবির্ভাবে গৃহে অন্নের অভাব রহিল না। দীন দুঃখী কেহ বাটীতে আসিলে তিনি পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করান এবং কাহার ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে ভাল বস্ত্র দিয়া পরিধেয়ের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে অন্নপূর্ণা দেবী-স্বরূপা হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গারাম বাবুর পুত্রের নাম সুধীর। সুধীর বিদ্যালয়ে পড়ে। বয়ঃক্রম ১৩।১৪ বৎসর হইবে। সুধীর ধীর ও শান্তস্বভাব, অনেকটা মায়ের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গরীব কাঙ্গাল দেখিলে মায়ের অন্তঃকরণ যেমন আর্দ্র হয়, পুত্রেরও তেমনি। পুত্রও মায়ের সঙ্গে এক যোগে দরিদ্র-দিগকে ভরণপোষণ করিতে আনন্দিত হয়। সে রাস্তায় ক্ষুধার্ত্ত, অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তি দেখিলে বাটীতে ডাকিয়া আনে, এবং তাহাকে মনের সাধে ভোজন করাইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করে। স্ত্রী ও পুত্রের এইরূপ করুণ ব্যবহারে গঙ্গারাম বাবু মনে মনে যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেন। স্ত্রী স্বামীকে বিরক্ত করিতে অনিচ্ছু হইয়া তাঁহার অগোচরে সুধীরের সহিত এক পরামর্শে পূর্ব্ববৎ দরিদ্র-সেবা করিতে লাগিলেন।

গঙ্গারামের কনিষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্র দেশের বাটীতে থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র, ও একটী কন্যা আছে। দেশের বাগানের ফলপাকড় বিক্রয় করিয়া তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—বড়ই কষ্ট!! তিনি দুঃখ জানাইয়া মাসে ২।৪ খানি করিয়া চিঠি দাদামহাশয়কে লিখেন। দাদা মহাশয় তাঁহার দুর্দ্দশার প্রতি একবারে বধির ও অন্ধ—কিছুই শুনিতে বা দেখিতে চাহেন না। অন্নপূর্ণা সুধীরকে দিয়া যাহা পারেন লুকাইয়া পাঠাইয়া দেন, তদ্দ্বারা শম্ভুচন্দ্রের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইয়া থাকে।

গঙ্গারামের বাটীতে ২।১টী আইরণচেষ্ট—আইরণচেষ্টে টাকায় ছেঁতলা ধরিতে লাগিল। আফিসের উপার্জ্জন ছাড়া সুদি

কারবারে গঙ্গারামের বেশ দশ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি সুদ লইবার সময় কাহাকে এক কপর্দ্দকও ছাড়িয়া দিতেন না—এমন কি পিতাঠাকুর উঠিয়া আসিলেও তাঁহার সম্মুখে সুদ লইবার সময় চক্ষু মুদিতে লজ্জিত হইতেন না। আইরণ চেষ্টের চাবি পরিবারের নিকট বিশ্বাস করিয়া রাখিতেন না। তাঁহার একটী হাত বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিতেন, সুধীর তাহার সন্ধান রাখিত। কর্ত্তার গতিক দেখিয়া কর্ত্তা বাহিরে যাইলে সুধীর মায়ের খরচের জন্য আইরণচেষ্ট খুলিয়া মধ্যে মধ্যে টাকা বাহির করিয়া দিত। কর্ত্তার সংসার খরচের যাহা বরাদ্দ, তাহাতে অতি ক্লেশে এক প্রকার জীবন ধারণ ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না! সুধীর বা অন্নপূর্ণা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিলে, বাটীতে কোন দিন উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইলে, কাহাকে এক পয়সা দান করিলে, কর্ত্তা রোষ-কষায়িত-লোচনে পুত্র ও পরিবারের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেন। অন্নপূর্ণা রাগিবার লোক নহেন—তিনি সর্ব্বদা হাস্যমুখী। কর্ত্তার তীব্র উক্তি সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

গঙ্গারাম বাবু অর্থের মায়ায় এত মুগ্ধ যে, শরীর ও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সামান্য ব্যয়েও কাতর হইতেন। আফিস হইতে আসিবার সময় প্রাণান্তে গাড়ীর ভিতর উঠিতেন না। কখন কখন কোচ বাক্সে বসিয়া আসিতেন। ধোপা নাপিতে সহজে তাঁহার কাছে কিছু আদায় করিতে পারিত না। বাটীতে দুটীর বেশী তিনটী প্রদীপ জ্বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বৈকালে জলখাবারের আশা রাখিতেন না—এমন কি কখন কখন দুইখানি বাতাসা মুখে ফেলিয়া দিয়া একটু জল খাইয়া রাত্রি কাটাইতেন। ভাত খাইবার সময় অন্নপূর্ণা স্বামীর পাতে ঘি দিলে তিনি রাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে কহিতেন "এই পয়সা থাকিলে আমার কত সুদ আসিত!" খাকিবার মধ্যে মুহুর্মুহু তামাক খাইবার অভ্যাসটা ছিল, তাও অনেক সময় ফুরাইলে গুল সাজিয়া খাইতেন।

অন্নপূর্ণা ও সুধীরের তত্ত্বাবধানে বাটীর পুষ্করিণীতে যথেষ্ট মৎস্য হইয়াছে, বাগানে যে কালের যা তরি তরকারি সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত মালীর পরিশ্রমে ও যত্নে ভাল ভাল আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি বৃক্ষ সকল ফলকর হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তার অসাক্ষাতে অন্নপূর্ণা পাড়া প্রতিবাসীদিগের বাটীতে ঐ সকল ফল, তরিতরকারি ও পুষ্করিণীর মৎস্য সময়ে সময়ে বিলাইয়া থাকেন। বাটীতে পাঁচ-খানি ভাল ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গিন্নী কর্ত্তাকে দিতে ভয় পাইতেন, যেহেতু কর্ত্তা তাহা হইলে গিন্নীর নিকট কৈফিয়ত চাহিবেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিবেন। বাটীর ঝি চাকরকে একখানির উপর দুইখানি ব্যঞ্জন দিতে

দেখিলে কর্ত্তা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেন এবং গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেন,—এমন কি ২।১ দিন উপবাসও করিতেন, বাহির বাটীতে থাকিতেন, ভিতরে আসিতেন না। একদিন ভাল অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, কর্ত্তা ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং গিন্নীর পিতৃকুলের সমস্ত ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা তখন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ-মনে ও বিষণ্ণবদনে কহিলেন—

"কপালে না থাকলে সুখ কি কভু মিলে।
থাকতে ঘরে এত সুখ—তবু বঞ্চিত হলে॥"

সেই অবধি অন্নপূর্ণা স্বামীকে আর কখন ভাল দ্রব্য খাইতে দিতে সাহস করিতেন না এবং তৎসঙ্গে আপনিও ভাল দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহে সুধীরের জন্য ভাল মন্দ দ্রব্য প্রস্তুত হইত। আত্মীয় স্বজন যাহারা উপস্থিত হইতেন, খাইতেন,—ঝি চাকরে খাইত—কিন্তু হা অদৃষ্ট! কর্ত্তার ভাগ্যে একটু ঘটিত না। অর্থ সংগ্রহ যাহাদিগের ব্যাধি বা ব্যামোহ, তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শ্রীভুঃ।—

কৃষক-বালা।

বর্ষার প্রারম্ভে প্রশস্ত জনার ক্ষেত্রের উচ্চ মঞ্চোপরি বসিয়া জনৈক কৃষক-কন্যা শস্য রক্ষণ করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে পক্ষিগণ কৃষককুমারীর সতর্কতা সত্ত্বেও অলক্ষিতভাবে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট দ্বারা মুক্তাদাম সদৃশ গ্রথিত জনারগুলি কাটিয়া ফেলিতেছে। আকাশে আর মেঘ নাই, নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ তুল্য, রজতস্তর সদৃশ মেঘরাশি একটি আর একটির গাত্রে ঢলিয়া ঢলিয়া সোহাগে গড়াইয়া পড়িতেছে। কৃষকবালা প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে মল্লার রাগিণীতে গাহিয়া গাহিয়া নবীন তরুলতা দলকে মুগ্ধ করিতেছে। বর্ষার স্নিগ্ধ সমীরণে সে মধুর তানের কল্লোল ছুটিয়া ছুটিয়া দূর-অতিদূরে বিস্তৃত হইতেছে। মহারাজ অরিসিংহ সেই অবসরে কতিপয় সর্দ্দার সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। এমন বর্ষা বাদলের মাঝে একটি বন্যবরাহ লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কতিপয় অশ্বারোহী সেনা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। মহারাজ বনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একটি বরাহ তাঁহার নয়নগোচর হইল। অরিসিংহ সোৎসুকচিত্তে শিকারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বরাহটি কৃষকবালার মঞ্চের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। রাজাকে নিকটস্থ দেখিয়া কৃষককন্যা ব্যস্তভাবে মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত

হউন আপনি, আমি বরাহ ধরিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া কৃষককুমারী একগাছি জনারের চারা গাছ লইয়া তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া বর্ষার মত ধারাল করিল। তাহা দ্বারা বরাহটাকে আক্রমণ করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিকারটি লইয়া মহারাজ অরিসিংহের সম্মুখীন হইল। অরিসিংহ রমণীর এতাদৃশ সাহস ও বলের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সামান্য কৃষকতনয়াতে কি এরূপ গুণ সম্ভবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় সৈন্য সামন্তগণ সহিত তটিনীর নির্ম্মল তটপ্রান্তে সুবিশাল বৃক্ষ-চ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। অশ্বগুলি বৃক্ষশাখায় বদ্ধ রহিয়াছে। সকলেই একবাক্যে সেই ক্ষেত্র-পাল-কন্যার গুণ আলোচনায় মুগ্ধ, ইত্যবসরে হঠাৎ একটি মৃৎপিণ্ড ক্ষিপ্রগতিতে মহারাজের অশ্বের গায়ে পড়িল। অশ্ব সেই দারুণ আঘাতে ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও কিয়ৎক্ষণের মধ্যে তাহার চরম দশা উপস্থিত হইল। সকলে মৃৎপিণ্ডের গতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই কৃষকবালা মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। সর্দ্দারগণ উহার বলবত্তার পরিচয়ে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু নীরব। স্বয়ং মহারাজ অবাক্ হইয়া আছেন, তখন অপরে কি বলিতে পারে? অরিসিংহ অশ্বের মৃত্যুতে তাদৃশ দুঃখিত না হইয়া সেই রমণীর অসীম সাহসিকতার বিষয় ভাবিতেছিলেন। এ কিরূপ স্ত্রী-বাহুবল!! কৃষকবালা অশ্বের পতন ও মৃত্যু অবলোকন করিয়া অতি ভয়ার্ত্তচিত্তে গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে কহিল "মহারাজ আমিই অপরাধিনী, মহারাজ এই অশ্বের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ আমি, অতএব অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধান করুন্।" অরিসিংহ বালার ভয়ার্ত্ত কম্পিত মুখমণ্ডল ও ছল ছল নয়ন-যুগল দেখিয়া, একদৃষ্টে বিস্ময়করুণ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ নিজেই আত্মস্থ নহেন, যেন ভাবিলেন একি, বরাহ বধ করিতে আসিয়া কি করিয়া যাইতেছি? অবশেষে আপনার আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "কুমারী, তুমি নিরুদ্বেগ হও, তোমার দোষ কি? কে কাহাকে মারিতে পারে? কেই বা কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? জন্ম মৃত্যু মানবীয় শক্তির অতীত। অশ্বের পরমায়ু শূন্য হইয়াছিল, তাই সে গতাসু হইয়াছে।" কৃষক-কন্যা অরিসিংহের আশ্বস্ত বাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল, ভাবিল আজ ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, কি বিপদ নিজেই ঘটাইয়াছিলাম! যাহাহউক এখন নিরাপদে ঘরে গিয়া পিতা মাতাকে নিজের হঠকারিতা ও অসাবধানতার কথা বলি গিয়া।

বালিকা মঞ্চের নিকট দুটি মহিষী-শাবক বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া লইল। তাহাদের রজ্জু দুইটি দুই হস্তে ধরিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ড মস্তকে লইয়া

বেগভরে চলিয়া যাইতেছে এবং মনে মনে রাজার ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠা স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়া পড়িতেছে। সে আপনার কথায় এতদূর মগ্ন যে অন্য কোন দিকে চাহিবার আর তাহার অবসর নাই। এদিকে অরিসিংহ নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। বেলাও অবসানপ্রায়, দিবসের আলো এখন সূর্য্যের অবসানে বিদায় মাগিতেছে, সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধরণীর কোমল গাত্র আবরিত। তরু, লতা, পশু, পক্ষী সকলেই স্থির। কিয়ৎক্ষণের জন্য আবার পরিবর্ত্তন। এই সৃষ্টির আদি অন্ত সকলই পরিবর্ত্তনময়, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আলো আঁধার—একের পর আসে আর যায়; কিন্তু যে যায়, সেই আবার আসে কিনা ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? দেহান্তর, লোকান্তর, রূপান্তর, সকলি ঘটে, তথাপি সেই স্বরূপ আর চক্ষে চক্ষে প্রতিভাসিত হয় না, তাই সংসারে এত অভাব, এত হাহাকার!!

অরিসিংহ সৈন্যসামন্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে পুনরায় সেই কৃষক-বালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাঁহার জনৈক অশ্বারোহী কৌতূহল-পরবশ হইয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল এবং ইচ্ছা-মত বল্গা সংরক্ষণ না করাতে একেবারে অশ্ব বালিকার গাত্রে প্রতিহত হইয়া পড়িল। কৃষক-বালিকা পূর্ব্ববৎ অচল অটল ভাবেই নীরবে রহিল, কেবল মস্তকের দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই সোৎসুক হইয়া উহার পানে চাহিয়া কষ্ট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষক-বালা কাহারও মিষ্ট বচনে কর্ণপাত না করিয়া সেই দীর্ঘ আয়তলোচন দুটি ফিরাইয়া দেখে রাজা অরিসিংহের সৈনিকের এই ধৃষ্টতা। বালিকা নীরবে রহিল, কিন্তু প্রতিফল লইতে ছাড়িল না—তৎক্ষণাৎ সেই মহিষী-শাবক দুটির রজ্জু শ্লথ করিয়া অশ্বের পদদ্বয় এমত জড়াইয়া দিল যে সৈনিক সহিত ঘোড়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হইল না।

ক্রমে ক্রমে তিনবার কৃষক-বালার বলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অরিসিংহের চিত্ত আরও চঞ্চল হইয়া পড়িল। এরূপ অসাধারণ কৌশলময়ী বালিকা যে সামান্য কৃষিজীবিনী রমণীর গর্ভে জন্মে, ইহা যেন আর কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহাই হউক ঐ কৃষক-বালাই আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, ইহাতে আর কোন বাধাই গ্রাহ্য নহে। রাজ্যে পৌঁছিয়াও তাঁহার সে উদ্বিগ্নতা দূর হইল না। অবশেষে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই ক্ষেত্রপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি রাজাজ্ঞা পাইয়া জনার-ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত কুটীরে উপনীত। ক্ষেত্রপাল রাজসৈন্য সমাগত দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। কৃষক-পত্নী দর দর ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল ও কন্যাকে কহিল "মা! তুই সেই দিনে শস্য রক্ষা

করিতে গিয়া কি বিবাদ ঘটাইলি, আজ সপরিবারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হই বুঝি।" কিন্তু বালিকা পিতা মাতার ঈদৃশ আশঙ্কা দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং পিতার নিকটে গিয়া কহিল, "বাবা! তুমি কেন এরূপ ভীতচিত্ত হইয়াছ, আজ কেন বালকের মত রোদন করিতেছ? মহারাজের কাছে যাও, তিনি পরম দয়ালু, তাঁহার দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্টের শঙ্কা নাই।" সৈনিক পুরুষ কৃষক পরিবারের অমঙ্গল আশঙ্কা ও উদ্বেগময় ভাব দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্বাস প্রদান করিল না, বরং মনে মনে কৃষক-বালার লাবণ্য-পূর্ণ নব-প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমবৎ বদন খানির উজ্জ্বলতা দেখিয়া কহিল, "তুমিই ধন্য, তোমার এই একাধারে রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া আজ বীর অরিসিংহ মুগ্ধ। মা! তুমিই এই সকল ইষ্টানিষ্টের মূলস্বরূপিণী"।

বৃদ্ধ ক্ষেত্রপাল পত্নীর নিকট বিষণ্ণ-বদনে বিদায় লইয়া চিতোরে রাজা অরিসিংহের নিকট সৈনিক সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। নগরে মহা আন্দোলন। সকলেই একবাক্যে কৃষক-বালার ক্ষমতার প্রশংসায় প্রবৃত্ত, বিশেষতঃ মহারাজ নিজে বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, না জানি সে কিরূপ ভাগ্যবতী! যদি এই বিবাহ রাজ-বংশে ঘটিত, তাহা হইলে কোনও বিস্ময়ের কথা থাকিত না। বৃদ্ধ কৃষক রাজসদনে উপস্থিত হইয়া অবনতশিরে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজের জয় হউক! আপনি সাক্ষাৎ দয়াধর্ম্মের অবতার, আমরা দরিদ্র নিরীহ কৃষক জাতি, সকল অপরাধ ক্ষমা হউক, এই ভিক্ষা করি।" সভাস্থ সকলেই নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ, সকলেই সোৎসুকচিত্তে মহারাজের আদেশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। অরিসিংহ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং হস্তধারণপূর্ব্বক বৃদ্ধ কৃষককে উচ্চাসনে বসাইলেন ও বলিলেন "রাজপুত জাতি ধন অপেক্ষা মান ও রূপ অপেক্ষা বলবীর্য্যের সমধিক অনুরাগী। তোমার তনয়ার অলৌকিক বলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে আনিয়া এই চিতোর নগরীর অধিষ্ঠাত্রী করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি।" রাজার এই বাক্যে বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তখন আপন পূর্ব্ব বিবরণ সকল রাজসন্নিধানে নিবেদন করিল, এবং বলিল মহারাজ! এই কৃষকবালা চন্দানেয়ত কুলোদ্ভবা রাজপূতকন্যা, ভগবান্ উহার অনুরূপ পাত্রেই উহাকে অর্পণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ কৃষক রাজাজ্ঞা অনুসারে কন্যাকে আনিয়া যথাবিধানে সমারোহে শুভ বিবাহ কার্য্য সমাধা করিল। এই কৃষকবালা পরে বীরপুত্র হামিরের মাতা হইয়াছিলেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

উপদেশমালা।

১। এক সময়ে জনৈক উদাসীন কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপনীত হন। উদাসীনের পরিধান ছিন্ন বস্ত্র, মাথার কেশগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ, তাহাও আবার ভস্মাচ্ছাদিত। হস্তে ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্র দেখিয়াই বোধ হয় সংসারবিরাগী ত্যাগী পুরুষ। গৃহস্থ উদাসীনকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং আগন্তুক সাধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। উদাসীন উপবেশন করিলে পর উভয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল। নানা বিষয়ক প্রসঙ্গ হইতেছে এমন সময় গৃহস্থ বলিলেন "আপনারা ত্যাগী পুরুষ, তাই আপনারা ভোগী গৃহস্থদিগের নমস্য, আপনারা সংসারের নিকট ত্যাগের দৃষ্টান্ত কহিয়া সংসারকে ধন্য করিতেছেন।" উদাসীন বলিলেন "তুমি মিছামিছি আমাকে ত্যাগী বলিতেছ! উদাসীনগণ ত্যাগী নহেন, ঈশ্বর-বিরাগী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী। ত্যাগী কাহাকে বলি? কোন ব্যক্তির নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা ও পাঁচ শত রৌপ্য মুদ্রার দুইটি ব্যাগ ধরিয়া যদি বলা যায় তোমার এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যাগটি লইতে ইচ্ছা হয় লও। তখন যদি সে স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাগটি পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য মুদ্রার ব্যাগটি লয়, তাহা হইলে তাহাকেই ত্যাগী বলিব; কারণ সে বহুমূল্য জিনিশকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যদি ত্যাগীর ইহাই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্ণ ফেলিয়া রৌপ্য লইতেছেন কিনা এবং তাহারা প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী শব্দের বাচ্য কিনা? ঈশ্বর সকল ধনাপেক্ষা মূল্যবান্, গোলকুণ্ডার হীরকমণিও তাঁহার সমতুল্য নহে। পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটের ঐশ্বর্য্য একত্রিত করিলেও তাঁহার সমীপে যৎকিঞ্চিৎ, অথচ তোমরা এই ধনকে উপেক্ষা করিয়া সামান্য ধনের জন্য লালায়িত হইতেছ। তোমরা ত্যাগী না হইলে কাহাকে ত্যাগী বলিব?" ধনী দেখিলেন সাধু ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনিও সেই অমূল্যনিধি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উদাসীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কে কি মহামূল্য নিধি ত্যাগ করিয়া উপল খণ্ড কুড়াইয়া বেড়াইতেছে।

২। একদা কোন ফকির বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক বাদশাহ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। দূর হইতে ফকিরকে

দেখিয়া মাহুতকে হস্তীর গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী থামিলে পর বাদশাহ অবতরণ করিয়া ফকিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকির সাহেব! আপনার কি অভাব আছে বলুন, এখনই তাহা পূর্ণ করিব।" ফকির বলিলেন, "আমিত ফকির নই, ফকির তুমি। আমি ত ভিখারী নই, ভিখারী তুমি। আমার কিসের অভাব? তোমার অভাবের অন্ত নাই।" বাদশাহ এই উত্তর শুনিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন "আমি ভিখারী কিসে? আমার অভাবই বা কি? যাহা চাই তাহা পাই—এমন কি, ইচ্ছা হইলে বাঘের চোক মিলাইতে পারি।" ফকির সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বটে! তুমি যাহা চাও, তাহা পাও! তোমার কি অর্থপিপাসা ও রাজ্যকামনা মিটিয়া গিয়াছে? সমস্ত সংসারের অর্থ আনিয়া তোমার ভাণ্ডারে পূরিলেও তোমার তৃষ্ণা থামিবে না, মন আরও অর্থ চাহিবে। সমস্ত মহাদেশ তোমার রাজ্যভুক্ত হইলেও তোমার রাজ্যবৃদ্ধির কামনা পূর্ণ হইবে না, মন আরও রাজ্য চাহিবে। তবে তুমি যাহা চাও, তাহা পাইলে কোথায়? প্রকৃত পক্ষে চাওয়া না থামিলে লোককে অভাবগ্রস্তই বলিব। সে ক্রোরপতি হউক না কেন, সে সমস্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হউক না কেন, সে যখন আকাঙ্ক্ষার লয় করিতে পারিতেছে না, তখন ভিখারী হইয়া জগতের দ্বারে ফিরিবেই ফিরিবে। অথচ চীরজটাধারী বৃক্ষতলবাসী ফকির যদি বাসনা বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সকল ধনীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অভাবশূন্য নিরুদ্বেগচিত্ত ব্যক্তিই সুখী পুরুষ। তুমি সর্ব্বাগ্রে নিজের অভাব পূর্ণ করিয়া এস, তৎপরে আমায় ভিক্ষা দিবে।" ফকিরের এই কথায় তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল।

৩। দুই সাধক কোন এক পর্ব্বতোপরি বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। বহুদিন চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহারা গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। সময় সময় নিরাশা আসিয়া তাঁহাদিগকে তপোভ্রষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে। এই ভাবে দিন চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন একদিন এক জীবন্মুক্ত ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ঐ পথ দিয়া যাইতেছেন। সাধকদ্বয় তাঁহাকে জানিতেন, এবং তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে সক্ষম, ইহা বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহাকে দেখিয়া উভয়েই তাঁহাদের নিষ্ফল সাধনার বিষয় জানাইলেন এবং কত দিনে তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য ভক্ত মহাজনকে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাদের প্রার্থনা মত ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন "আমি তোমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা জানিয়াছি,

কিন্তু আমি তাহা তোমাদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহা বড়ই নিরাশাজনক।" তাহা শুনিয়া উভয়ের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা বলিল "মহাশয়! আপনার কথা যত নিরাশাজনক হউক না কেন, আপনি বলুন, উহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যুত না বলিলে অনিষ্ট হইতে পারে।" তাহাদের মুখ হইতে এতাদৃশ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া ভক্ত বলিলেন, "কোটি জন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার সাধন হইবে। একাল পর্য্যন্ত যদি তোমরা ধৈর্য্য সহকারে সাধন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে।" এ কথা শুনিয়া সত্য সত্য একজন সাধকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে ভাবিল কোটি জন্মত বহুদূরে, এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা অসম্ভব।" তাই সে বিমর্ষান্তঃকরণে উপবেশন করিয়া রহিল। অপর সাধক এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, এবং বলিল "আর কি? আমার মুক্তিত ধ্রুবনিশ্চয়। ঈশ্বর যখন জানাইয়াছেন যে, আমার মুক্তি হইবে, তাহাই যথেষ্ট। এখন কোটি জন্মই বা কি? আর শত কোটি জন্মই বা কি? যত দিন ফল অনিশ্চিত ছিল, ততদিন কখন আশার জ্যোতিঃ, কখন নিরাশার অন্ধকার আসিয়া মনকে আন্দোলিত করিত। এখন ফল সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছি, ফল নিশ্চয় পাইব, কেবল তাহা কাল-সাপেক্ষ। ধৈর্য্যের সহিত সাধন আরম্ভ করি, কোটি জন্মত চোখের নিমেষে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।" কথিত আছে এই শেষোক্ত বিশ্বাসীর অচিরে মুক্তিলাভ হইল। প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য্যই সাধন-পথে অগ্রসর করিয়া থাকে। অধীর চঞ্চলমতি লোকেরা নিষ্ঠার সহিত কোনও বিষয়ে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আবার ফল সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না জন্মিলে ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। কোনও ক্রিয়ার ফল পাইবই পাইব, এতাদৃশ বুদ্ধি যাহার, তাহার ধৈর্য্য জন্মিবে। যাহার তাহা নাই, তাহার মন চিরদিন চঞ্চল ও সংশয়াকুল থাকিবে।

রসায়ন।

অম্লজান (অক্সিজেন)।

[সাঙ্কেতিক চিহ্ন O; পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬; ঘনতা ১৬; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·১০৫৬৩।]

ইতিহাস—১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে পৃষ্টলী সাহেব রেড অক্সাইড অফ মার্করি (লোহিত রসভস্ম বা রসকর্পূর) উত্তপ্ত

করিয়া সর্ব্বপ্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার ল্যাবোসিয়র অক্সিজেন ভিন্ন কোন অম্ল উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহার নাম অম্লজান দেন। এক্ষণে এমন অনেক অম্ল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে অক্সিজেনের লেশমাত্র নাই; যথা হাইড্রক্লোরিক এসিড। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জনসমাজের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, পৃষ্টলী সাহেবের O (অক্সিজেন) বাষ্প আবিষ্কার দ্বারা তদপেক্ষা অধিক উপকার সাধিত হইতেছে। সুইডেনে সীল সাহেবও এই সময়ে অক্সিজেনের বিষয় আবিষ্কার করেন। যে দিন পৃষ্টলী সাহেব অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কার করেন, সেই দিনকে পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

O শতাংশিক উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১,১৯ লিটর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ভার যথাক্রমে ১৬ ও ১ গ্রাম। অতএব অক্সিজেন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় আয়তনে বায়ু রাশির একপঞ্চমাংশ; সংযুক্ত অবস্থায় জলের গুরুত্বের ৯ ভাগের ৮ ভাগ; ভূভাগের প্রায় অর্দ্ধেক, এবং জীব ও উদ্ভিদ শরীরের অর্দ্ধেকেরও অধিক ভাগ অক্সিজেন। অক্সিজেন সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্ম—অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ। ইহা সমআয়তন বায়ু অপেক্ষা ১·১০৫৭ গুণ ভারী অর্থাৎ বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১·১০৫৭ ধরা যাইতে পারে। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনা যাইতে পারে না। কিন্তু ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত চাপ ও শৈত্য সহযোগে অম্লজানকে তরল আকারে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা দাহক, ইহার মধ্যে জ্বলন্ত দীপশলাকার অগ্রভাগ লাল থাকিতে থাকিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা ১০০ ভাগ জলে প্রায় ৩ ভাগ দ্রব হয়।

ব্যবহার—বায়ুরাশিতে যে এক-পঞ্চম অংশ অক্সিজেন আছে, তাহা অসংযুক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান আছে। প্রাণিগণ নিশ্বাস সহকারে উহা গ্রহণ করিলে অক্সিজেন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করতঃ প্রশ্বাস সহকারে বহির্গত হয়, তাহাতেই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা ও রক্ত সংস্কার হয়। O (অক্সিজেন) বাষ্প অভাবে যেমন কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহার আধিক্য হইলেও অনিষ্ট হইয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে উহার অল্পতা বা আধিক্য নিবন্ধন কোন অনিষ্ট হয় না।

জলরাশিতে কিয়ৎ পরিমাণে O বাষ্প দ্রবীভূত থাকে, জলচর জীবগণ উহা

গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। এ বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে খানিক জল অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহার উপর তৈল ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে আর ইহাতে অক্সিজেন দ্রব হইতে পারিবে না। পরে ঐ জল শীতল হইলে উহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দাও, তখনি মৎস্য মরিয়া যাইবে।

জ্বলন ও অক্সাইড—ফ্লুরাইন ব্যতীত প্রায় তাবৎ রূঢ় পদার্থের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে; এইরূপ সংযোগকালে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, উহাকে জ্বলন বলে। অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থকে অক্সাইড বলে। অক্সাইড তিন প্রকার, যথা এসিড অক্সাইড, বেসিক অক্সাইড ও নিউট্রাল অক্সাইড।

এসিড অক্সাইড-নাইট্রজেন পেণ্টক্সাইড
বেসিক „ সোডিয়ম অক্সাইড।
নিউট্রাল „ জল।

প্রস্তুত প্রণালী—(১) রেড্ অক্সাইড অব মার্করি (লোহিতবর্ণ মার্করি অক্সাইড বা রসকর্পূর) লোহিতোত্তপ্ত করিলে প্রবল তাপে মার্করি অক্সাইড ব্যাকৃত হইয়া সমুদায় অক্সিজেন বহির্গত হয়; পারদ থাকিয়া যায়, যথা—$2HgO = Hg_2 + O_2$.

(২) সচরাচর পটাশিয়ম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু যতখানি পটাশিয়ম ক্লোরেট, তাহার এক-পঞ্চমাংশ মেঙ্গেনিস্ মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে শীঘ্র শীঘ্র নিরাপদে সংগৃহীত হয়; কিন্তু ম্যাঙ্গেনিক ডায়ক্সাইডের (MNO_2) কোন রূপান্তর হয় না।

(৩) অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হইলে লৌহ পাত্রে করিয়া মেঙ্গেনিস ডায়ক্সাইড উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বহির্গত হয়, যথা—$3MNO_2 = MN_3O_4 + O_2$.

(৪) জলে বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে দস্তা-সংলগ্ন তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রজেন বহির্গত হয়, প্লাটীনম-সংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্দ্ধেক O বাষ্প বহির্গত হয়।

(৫) সলফিউরিক এসিড ও ম্যাঙ্গেনিক ডায়ক্সাইড একত্র উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়।

পরীক্ষা—(১) অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে জ্বলিত দীপ-শলাকার অগ্রভাগ লাল থাকিতে থাকিতে প্রবিষ্ট করিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এইরূপ পুনর্ব্বার বাহির করিয়া নিবাইয়া ফেল, এবং লাল থাকিতে থাকিতে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া দাও, জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপে যতক্ষণ উহাতে অক্সিজেন থাকিবে, ততক্ষণ উহা জ্বলিবে; অক্সিজেন নিঃশেষিত হইয়া গেলে জ্বলনও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, এবং বোতলমধ্যে কার্ব্বণিক ডায়ক্সাইড্ উৎপন্ন হইবে।

(২) এক খণ্ড লোহিতোত্তপ্ত অঙ্গার উক্ত বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, এবং বোতলমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ অর্থাৎ CO_2 কার্ব্বণিক আসিড বাষ্প উৎপন্ন হইবে।

(৩) হীরক লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হীরকের কোন চিহ্ন থাকে না এবং বোতলমধ্যে কার্ব্বণিক এসিড (দ্বাম্ল অঙ্গারক) উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গারের রূপান্তরমাত্র।

উক্ত বোতল কয়েকটীর মধ্যে CO_2 কার্ব্বণিক এসিড উৎপন্ন হয়, উহাতে চূণের জল দিলে দুধ ঘোলা হইবে এবং নীল কাগজ (লিডমস্) দিলে লাল হইবে।

(৪) জ্বলন্ত লৌহ তার তরল গন্ধকে নিমগ্ন করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে নিমগ্ন করিলে তুবড়ি বাজীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত হইবে। উক্ত বোতলমধ্যে ফেরিক অক্সাইড বা ম্যাগনেটিক অক্সাইড অব আয়রন উৎপন্ন হইবে।

(৫) দুই আয়তন হাইড্রজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন একত্র করিয়া দীপস্পর্শ করিলে প্রবল শব্দ সহকারে জল উৎপন্ন হইবে।

(৬) গন্ধক বায়ুমধ্যে অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ শিখায় জ্বলিয়া থাকে। কিন্তু জ্বলন্ত গন্ধক অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সুন্দররূপে জ্বলিতে থাকে এবং উহার মধ্যে সলফর ডায়ক্সাইড (SO_2) উৎপন্ন হয়।

(৭) একখণ্ড ফস্ফরস জ্বালিয়া অকসিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে নিমগ্ন করিলে অতি দৃষ্টি-সন্তাপক আলোক হয় এবং উক্ত বোতলমধ্যে ফস্ফরিক পেণ্টক্সাইড P_2O_5 উৎপন্ন হইবে।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।
প্রতিষ্ঠিত
কাতা

একটি শুভ প্রস্তাব।

১২ বৎসর হইল বামাবোধিনী জুবিলী উৎসবের সময় যে সকল পারিতোষিক রচনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই—"ভারতের দুঃখিনী ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।" এ সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি প্রবন্ধ পাই, তন্মধ্যে পারিতোষিকপ্রাপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধে স্ত্রীলোকদিগের জীবিকার জন্য কতকগুলি শিল্পকার্য্যের উল্লেখ ছিল, এবং একটি কার্যালয় স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের সহায়তা বিধানেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি কলিকাতা অনাথ-বন্ধু-সমিতি এই শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঈশ্বরের নিকট এ শুভকার্য্যের সিদ্ধি প্রার্থনা করি। সমিতির অনুষ্ঠানপত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল, আশা করি

সহৃদয়া মহিলাগণ এ কার্য্যে সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিয়া গরিব স্ত্রীলোকদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিবেন।

শ্রমজীবিনী-সাহায্য-ফণ্ড।

অনাথবন্ধু-সমিতি হইতে দুঃখিনী শ্রমজীবিনী নারীদিগের সাহায্য বিধানার্থ একটী নূতন বিভাগ খুলিতেছে। অন্নবস্ত্রাভাবে এই বঙ্গদেশের ভদ্র পরিবারের কত অনাথা, অসহায়া, নিঃস্ব রমণী কত ক্লেশে দিনাপাত করিতেছেন, অনাথবন্ধু-সমিতি কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। ৩.৪ বৎসর মধ্যে এরূপ প্রায় ৫০টী পরিবারে ইহার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, আরও দেখিতে দেখিতে প্রার্থি সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিতেছে যে, ইহার সামান্য আয়ে তাহাদিগের অভাব পূরণের সাময়িক সাহায্য করাও অসম্ভব। এইজন্য সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, "শ্রমজীবিনী-সাহায্য ফণ্ড" নামে একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার আয়ে যাহাতে তাহার ব্যয় সংকুলান হয় এরূপ উপায় বিধান করিবেন, অর্থাৎ কার্য্যক্ষম অনাথা দরিদ্রা রমণীদিগকে ফণ্ড হইতে মাল মসলা কিনিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিবেন, ফণ্ডের খরচ বাদে তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এইরূপ উপায়ে ফণ্ডের টাকা ফণ্ডে থাকিবে, অথচ তাহার উদ্বৃত্ত অর্থে দরিদ্রা রমণীদিগের ভরণপোষণের সাহায্য হইবে। ভদ্র গৃহের দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ও ইতর জাতীয় সচ্চরিত্র নারীদিগকেও এই ফণ্ড হইতে কার্য্য করান যাইতে পারে, এবং তাহাদিগের শ্রমলব্ধ অর্থে তাহাদিগের ও ফণ্ডের উভয়ের সাহায্য হইতে পারে।

সেলাইয়ের কাজ, রেশম ও পশমের কাজ, জরীর কাজ, পাট কাটা, পৈতা তৈয়ার করা, কাগজের ঠোঙা, খেজুর পাতা বা বাখারীর চেটিতে ঝুড়া, চুপড়ী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা, ইত্যাদি কার্য্য সকল স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে। দরিদ্রা ভদ্র মহিলারা গৃহে বসিয়া কাজ করিবেন, ইতর স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী কার্য্যালয় থাকিবে। ফণ্ড হইতে কাজ সংগ্রহের ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপায় হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের যথাযোগ্য বিতরণেরও ব্যবস্থা করা যাইবে।

আপাততঃ ৪০০ টাকায় এই ফণ্ডের কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। আশা করি দরিদ্র-হিতৈষী মহোদয়গণের সাহায্যে এ অর্থ সহজে সংগৃহীত হইবে। এই শুভানুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

বিজ্ঞান-রহস্য।

১। গতি।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৯৬,০০০ এক লক্ষ ছেয়ানব্বুই হাজার মাইল পথ গমন করিয়া থাকে; তাড়িতের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২,৮৮০০০ দুই লক্ষ অষ্টাশী হাজার মাইল। ভূমিকম্পের সময়ে ভূস্তরের গতি প্রতি সেকেণ্ডে দুই মাইল অর্থাৎ সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ। শব্দ প্রতি সেকণ্ডে জলে ৪৯০০ পাদ এবং স্থলে ১০৯০ পাদ গমন করে। কামানের গোলার গতি ৩৩০০ পাদ, চটক ও বাজপক্ষী ঘণ্টায় ১৫০ মাইল গমন করিতে সমর্থ। কোন কোন অতি দ্রুতগামী পক্ষী (ফ্রিগেট) ঘণ্টায় ২০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে; কপোত ঘণ্টায় ৪৫ মাইল গমন করে, শিক্ষার গুণে আরও অধিক যাইতে পারে; কাক ঘণ্টায় ২৫ মাইল গিয়া থাকে। রেলওয়ে শকট প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া থাকে, কখন কখন কার্য্যোপলক্ষে ১১২ মাইল পথও ঘণ্টায় ধাবিত হইয়াছে। তাড়িত-রেলওয়ে ঘণ্টায় ৫৯ মাইল গমন করে। টরপেডো ঘণ্টায় ৩৪ মাইল এবং টান্‌ডাম বাইসিকেল সরল সুপথে ঘণ্টায় ৩০ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। লৌহদণ্ড বা তার যোগে শব্দ প্রতি সেকণ্ডে ১১,০৪০ পাদ গমন করিয়া থাকে।

২। মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড।

দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চ ও ব্যাস চারি ইঞ্চ পরিমিত নলে যত বেগ ও শক্তি আরোপিত হইতে পারে, মনুষ্যের হৃৎ-নালী সেইরূপ প্রবলবেগে প্রতিনিয়ত রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। ইহা প্রতি মিনিটে ৭০ বার আঘাত করে; অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয় মিনিটে ৭০ বার নড়ে; প্রতি ঘণ্টায় ৪২০০ চারি হাজার দুই শত বার, প্রতি দিবসে ১,০০,৮০০ এক লক্ষ আট হাজার বার এবং প্রতি বৎসরে ৩,৬৭,৯২০০০ তিন কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার বার আঘাত করে। মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ গড়ে সপ্ততি বর্ষ ধরিলে এই কাল মধ্যে হৃদয় প্রায় ২৫৭,৫৪,৪০,০০০ দুই অর্ব্বুদ সাতান্ন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার বার আঘাত করে। যখন হৃদয় এইরূপ একবার নড়ে বা বুক ধুক্ ধুক্ করে, তখন প্রায় আড়াই

আউন্স (এক ছটাকের অধিক) রুধির সমস্ত শরীরে বেগে সঞ্চারিত হয়। এই গণনানুসারে প্রত্যেক মিনিটে ১৭৫ আউন্স, প্রতি ঘণ্টায় ৬৫৬১ পাউণ্ড এবং প্রতিদিন ৭·০৩ টন অর্থাৎ প্রায় ১৯৭ মণ রুধির হৃৎ-নালীর দ্বারা বেগে সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।পাঠিকারা মনে করিবেন না যে, আমাদিগের শরীরে এত রুধির আছে, কিন্তু যদি এত রুধির থাকিত, তাহা হইলে হৃৎ-নালীর দ্বারা প্রতিদিন সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হইতে পারিত। মানব-দেহের রক্তের পরিমাণ প্রায় ৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ পনর সের, এই রক্ত প্রত্যেক তিন মিনিটে হৃৎপিণ্ড হইয়া হৃৎ-নালীর দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইতেছে। এই শোণিতপ্রবাহ বেগে প্রধাবিত করিবার জন্য যত শক্তির আবশ্যক, তদ্দ্বারা ১২২ টন অর্থাৎ প্রায় ৩৪১৬ মণ ওজনের ভারী দ্রব্য ১ পাদ উর্দ্ধে উত্তোলন করা যাইতে পারে, অথবা ২৮ মণ ভারী দ্রব্য ১২২ পাদ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে। এই প্রকারে সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ১৭৮৮৫০ টন অর্থাৎ ৫০,০৭৮০০ পঞ্চাশ লক্ষ সাত হাজার আট শত মণ মানব-রক্ত শরীর-ময় প্রবাহিত হইতেছে!

৩। দীর্ঘ জীবনের লক্ষণ।

করকোষ্ঠী, পদ-রেখা, ললাট-রেখা প্রভৃতি দর্শন ও গণনা দ্বারা মনুষ্যের আয়ু নির্ণয় করিবার প্রথা আছে, কিন্তু তাহা সামুদ্রিক ও ফলিত জ্যোতিষ-সাপেক্ষ। শারীরিক অবয়ব সকলের লক্ষণ দৃষ্টে দীর্ঘ জীবন নির্ণয় করা বহুদর্শনের কার্য্য। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অল্লায়াসেই ইহার পরীক্ষা হইতে পারে। যাহাদিগের যকৃৎ, ফুস্‌ফুস, পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক আয়ত বা বৃহৎ, দেহ দীর্ঘ কিন্তু দৈহিক উচ্চতা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব অর্থাৎ যাহাদিগকে বসিলে দীর্ঘাকৃতি বোধ হয় কিন্তু দণ্ডায়মান হইলে খর্ব্ব দেখায়; যাহাদিগের হস্ত দীর্ঘ কিন্তু হস্ততল গুরু অর্থাৎ ভারী এবং অঙ্গুলি সকল স্থূল, তাহারা প্রায় দীর্ঘজিবী হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক গভীরভাবে নিমগ্ন, কর্ণকূহর নিম্ন, নেত্র নীলবর্ণ, কটা বা ঈষৎ কটাবর্ণ এই সকলও দীর্ঘ জীবনের লক্ষণ। নাসারন্ধ্র বৃহৎ বা আয়ত হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সৌকর্য্য হেতু ফুস্‌ফুস বা হৃৎ-নালীও আয়ত হইয়া থাকে এবং রন্ধ্র সঙ্কুচিত ও কুঞ্চিত হইলে হৃৎ-নালীও ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল হয়। অতএব হৃৎ-স্থলী বৃহৎ ও আয়ত হইলে মনুষ্যও প্রায় দীর্ঘজবী হয়। প্রত্যুতঃ উল্লিখিত লক্ষণসকলের এক একটী লক্ষণ দীর্ঘজীবন-জ্ঞাপক নহে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণের সমষ্টিই দীর্ঘজীবন পরিজ্ঞাপক।

লজ্জাবতীর ভালবাসা।

লজ্জাবতী সখের উদ্যানের সৌরভময়ী মনোমুগ্ধকরী কুসুমিকা নহে। লজ্জাবতী ক্ষুদ্র বন-ফুল। ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে কেহ বিলাস-প্রিয় ধনীর ন্যায় প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবলের উপর শোভাবর্দ্ধন করিতে যত্ন করে না। সে বনফুল, বনেই থাকে! দেবপূজার জন্য যত্ন করিয়া কেহ ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে বড় একটা আহরণ করে না, সে বনরাশির শোভাবর্দ্ধন করিয়া আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া যায়। সে বুঝি নিষ্ঠুর জগৎকে ভালবাসে না, তাই নিরালায় নিজ শোভা বিকিরণ করিয়া আপনি খেলিয়া আপনি নিরস্ত হয়। আবার সে বড় অভিমানিনী, দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করিলে তখনি কোমল কলেবর পরিত্যাগ করে!

গোলাপ মল্লিকা কমল প্রভৃতি চিত্তো-ন্মাদক কুসুমে মধুপান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভপূর্ব্বক ষট্‌পদ দলও বড় একটা ক্ষুদ্র লজ্জাবতীর খবর রাখে না।

সরলা বালিকা লজ্জাবতীর কেহ প্রাণের সঙ্গী নাই। তাহাকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইতে জগতে কেহই নাই। জগতে তাহার প্রাণের ব্যথা কেহই বুঝিল না। ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে, এমন প্রাণ এখানে কয় জনের আছে?

একদা এক মধুপায়ী ভ্রমর আসিয়া লজ্জাবতীর সন্ধান লইল। তাহাকে কত সমব্যথিতা ও স্নেহ প্রণয় দেখাইল, "গুন্ গুন্ গুন্" রবে কত প্রেমের কথা শুনাইল —"তুমি আমার জীবনাধিক জীবনসর্ব্বস্ব, আমাকে দয়া কর, দীনের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, আমি তোমার চিরদাস। আমাকে এক বিন্দু কৃপা দান করিয়া এ মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত কর, ভয় নাই প্রবঞ্চিত হইবে না"। তাহার সেই আশাপূর্ণ বাণী শ্রবণে ক্ষুদ্র লজ্জাবতী আত্মহারা হইল—ডুবিল—মরিল। লজ্জাবতীর ন্যায় সংসারের তীব্র ছলনায় কত নারী ডুবি-তেছে—মরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়!!

ভ্রমরের মধুর কাহিনী ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে স্বর্গে উঠাইল। সরলা বালিকা লজ্জাবতী হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত হইয়া শঠ ভ্রমরকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সরলা বালিকা যথাবিহিতরূপে ভ্রমরের আতিথ্য পালন করিল। লুব্ধ ভ্রমর আশাতীত ফল লাভ করিল। লজ্জাবতী ভাবিতেছে আমার কি সুখের দিন! জগতে এমন করুণা মমতা স্নেহ আছে জানিলে এতদিন বনে বাস করিতাম না। হায়! বালিকা এখনও সংসারের কুটিল চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভালবাসার পরিণামে কি আছে, বালিকা তাহা এখনও বুঝে নাই।

ভ্রমর যথাবিহিত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া

"কালি আসিব" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ক্ষুদ্র লজ্জাবতী ভ্রমরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া আকুলহৃদয়ে কালিকার প্রত্যাশায় রহিল। দিন আর ফুরায় না, কালি আর আসে না, বিরহীদিগের নিকট দিনের যে কত দৈর্ঘ্য, তাহা বিরহিণী ব্যতীত অন্যে কি বুঝিবে?

বহু কষ্টে দিন কাটিল। প্রায় সন্ধ্যা সমাগত, এমন সময় মৃদু সমীরণ আসিয়া শন্ শন্ রবে ডাকিল "লজ্জাবতী"। লজ্জাবতী ভাবিল বুঝি বা তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভ্রমর আসিল। তাই সচকিত প্রাণে উত্তর দিল "কে গা"—!

সমীর। আমি ভ্রমরের দূত।

"ভ্রমরের দূত" কথাটি মধুর হইতে মধুর, লজ্জাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। আজ লজ্জাবতীর নিকট "ভ্রমর" নামটি সুমধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতেও অতি সুমধুর"। বুঝি এমন মিষ্ট নাম জগতে আর কিছু নাই। যদি শত প্রাণ বলি দিলে লজ্জাবতী আজ একবার ভ্রমরের নাম শুনিতে পায়, তবে তাহাও দিতে পারে। নবানুরাগিণী বালার নিকট তাহার প্রাণকান্তের নামটি যেমন মধুর, এমন আর কিছুই নহে!!

আজ সমীরণ ভ্রমরের দূত হইয়া আসিয়াছে, তাই আজ তাহাকে দেখিয়া লজ্জাবতীর প্রাণে আনন্দ ধরিতেছে না! নবানুরাগিণী বালা তাহার প্রাণকান্তের পত্র পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, লজ্জাবতীও ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছে। কান্তের পত্র আনিয়া দেয় বলিয়া আধুনিক প্রেমময়ীদিগের নিকট ডাক পিয়ন যেমন প্রিয় বস্তু—আজ লজ্জাবতীর নিকট সমীরণ সেইরূপ।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় হৃদয়কে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া লাজময়ী লজ্জাবতী লজ্জায় জড়সড় হইয়া ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু খবর আছে কি?" সমীরণ কিছু না বলিয়া ভ্রমরের লিখিত একখানি পত্র প্রদান করিল। লজ্জাবতী বন্য বালিকা, সে কখনও লেখা পড়া শিখে নাই, সুতরাং পত্র খানি লইয়া মহা বিভ্রাটে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সমীরণকেই তাহা পাঠ করিবার আদেশ করিল। সমীরণ পড়িতেছে;—

"প্রাণময়ী!

তোমাকে না দেখিয়া আর তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, এক তিল এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে যে ইচ্ছামত তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ দুর্দ্দৈব। নানা কর্ত্তব্য শৃঙ্খল আমাকে পাকে পাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, এখনি ছুটিয়া গিয়া একবার ঐ মুখখানি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিতাম। হে জীবনাধিক জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার অভাবে প্রাণে যে কি যন্ত্রণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তোমাকে কি বলিয়া জানাইব! ভাষায় যে সে ভাষা নাই! ইতি তোমার ভ্রমর।"

লজ্জাবতী পত্র শ্রবণে বিহ্বল হইল।

তাহার চক্ষে জগৎ ভ্রমরময় হইয়া উঠিল। ভ্রমরের প্রেমামৃত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। অনন্তর সমীরণকে বিদায় দিয়া প্রেম-পাগলিনী লজ্জাবতী পত্রখানি কতবার মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিল, কতবার চুম্বন করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার অভাবে তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভ্রমর কতই ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জাবতী বেদনায় মরমে মরিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভ্রমর আসিয়া লজ্জাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে গমন করিল। সরলা লজ্জাবতী দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর ভ্রমরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান্ জানেন এ অনুরাগের পরিণাম কি!!

২

ভ্রমর স্বীয় কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে থাকিয়া প্রত্যহ সমীরণ দ্বারা লজ্জাবতীকে পত্র দিত। লজ্জাবতী ভ্রমরকে সংবাদ দিবে বলিয়া ভ্রমরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। দুই তিন দিন অন্তর সেও এখন সমীরণের দ্বারা প্রত্যুত্তর পাঠায়। কিন্তু তাহাতে ভ্রমরের মন উঠে না, সে চায় প্রত্যহ পত্র পাইতে। তাই এক দিন ভ্রমর রাগ করিয়া পত্র লিখিল,—

পাষাণি!

তোমার হৃদয় কি স্নেহশূন্য!! প্রত্যহ এক এক খানি পত্র লিখিতে তোমার কি হয়? যদি এত নিষ্ঠুরতা করিবে এই তোমার মনে ছিল, তবে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাইতে কে তোমাকে সাধিয়াছিল! পথিক পিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া পিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, পিপাসা প্রায় আপনা আপনি শান্তি হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় শীতল পানীয় লইয়া তাহার মুখে ধরিলে কেন? ধরিলে ত তাহার আশ মিটিতে না মিটিতে সে পাত্র কাড়িয়া লইলে কেন? না বৃথা হাহাকার, তোমাকে আর প্রাণের কথা বলিয়া কি করিব! তুমি তাহা বুঝিবে না।

"ভ্রমর।"

ভ্রমরের ক্রোধ দর্শনে লজ্জাবতী রাগ করিল না, বরং ব্যথিত হইল। সেই দিন হইতে সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ ভ্রমরকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

লজ্জাবতীর বাসস্থানের অনতিদূরে একটি সরোবর ছিল। সেই সরোবরে অগণ্য নলিনীদল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। সেই সময় একদা ভ্রমর লজ্জাবতীর নিকট আসিতেছিল। নলিনীকূল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ইঙ্গিতে ভ্রমরকে কতই ডাকিল, কিন্তু ভ্রমর দৃক্পাত করিল না—সে তাহার প্রাণময়ী লজ্জাবতীর নিকট গমন করিয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করিল। আর সেই দিন হইতে লজ্জাবতী নিজকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিল—ভাবিল ভ্রমর তাহারই নিজস্ব ধন, আর ভাবিল ভ্রমরের ন্যায় ভালবাসিতে এ জগতে কেহই জানে না। আনন্দে লজ্জাবতীর হৃদয় উথলিয়া উঠিল!

কিন্তু হায়! এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জগৎ স্বতঃই পরীবর্ত্তনশীল। সংসার কেবল ভাঙা গড়ায় পূর্ণ। লজ্জাবতীর ভ্রমর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তাহার মোহ ভাঙিল, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদয় হইল, সুতরাং আমরা বলিতে পারি লজ্জাবতীর কপাল ভাঙিল। ভালবাসা এ জগতে নাই; ভালবাসার ন্যায় এ জগতে যাহা আছে, তাহা মোহ মাত্র। জগৎ সেই মোহকে ভালবাসা জ্ঞানে পূজা করিতেছে, সুতরাং সেই মোহ ফুরাইলেই সাধারণের ধারণায় ভালবাসা ফুরায়। ভালবাসার নির্দ্দয়তা হৃদয়-বিদারক, ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং লজ্জাবতীর কপাল ভাঙিল বই আর কি বলিব?

তখন এক দিন পত্র না পাইলে ভ্রমর আকুল হইত, কিন্তু এখন লজ্জাবতী দশখান পত্র লিখিয়া একখানারও উত্তর পায় না। আবার দুই একখান যাহা পায়, তাহা সেরূপ প্রণয়-সূচক নহে, কেবল ধর্ম্মোপদেশে ভরা। এই অবস্থার একখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি। তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি কতদূর অধঃপতিত হইতেছ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! একমাত্র ভগবান্‌কে ভালবাসাই সকলের কর্ত্তব্য, ভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্যত্র যে ভালবাসা তাহাই মোহ। মোহে বদ্ধ থাকিও না। বিল্বমঙ্গল প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম যদি চিন্তামণিকে ছাড়াইয়া শ্রীভগবানে অর্পিত না হইত, তবে কি আজ বিল্বমঙ্গল জগতে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তুমি আর আমাকে এরূপ পত্র দিও না, দিলেও আর উত্তর পাইবে না।"

ভ্রমর যে ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু লজ্জাবতীর কাণে এ ধর্ম্মকাহিনী সহিল না। যে এক দিন লিখিয়াছিল চিত্ত খুলিয়া দাও, ফল্গুর মত বহিয়া যাক্, প্রবঞ্চিত হইবার ভয় নাই নিশ্চয়। তার আজ এ কি আচরণ? ইহা ভ্রমরময় লজ্জাবতীর প্রাণ সহিবে কেন? হোক্ ভ্রমরের ধর্ম্মপ্রাণতা, মুগ্ধা লজ্জাবতীর প্রাণে একেবারে এত কাঠিন্য সহিবে কেন? ইহা যে প্রবঞ্চনারই রূপান্তর। নিষ্ঠুর ভ্রমর! যদি তোমার মোহ ভাঙিয়াছে, তুমি যদি বাস্তবিকই লজ্জাবতীকে ধর্ম্মরাজ্যের পথিক করিতে চাও, সে বেশ কথা। মোহ সকলেরই ঘটে, কিন্তু যে মোহ ভাঙিয়া কর্ত্তব্যপথে গমন করিতে পারে, সেই মহৎ; সুতরাং তোমার চিত্তকে প্রশংসা করি। কিন্তু ভ্রমর! নিশ্চয় জানিও লজ্জাবতীর প্রতি তোমার এ কাঠিন্য ভাল হয় নাই। তুমি তাহার হৃদয় বুঝিলে না—তাহার ব্যথা বুঝিলে না। তুমি তাহার মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া সে একটু শান্ত হইতে না হইতেই তাহাকে জগতের রীতি নীতি বুঝাইয়া একেবারে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে বসিয়াছ। এ গুরু-গিরিতে তোমার শ্রমের বৃথা অপব্যয় হইতেছে মাত্র। সকল

কার্য্যেরই একটা সময় অসময় আছে। লজ্জাবতী এখন তোমাময়, এখনও তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় আসে নাই। ইহাতে তোমার আচরণে সে কেবল প্রতারিত হইল মাত্র।

ঐ পত্রখানি দৃষ্টে লজ্জাবতী ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইল—অভিমানে হৃদয় জ্বলিতে লাগিল—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিল "ওঃ—কি প্রবঞ্চনা!! না বুঝিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। জগৎ অনেক শিখাইলে, অনেক দেখাইলে, আর এ বঞ্চনা করিও না। তোমার মোহপাশ খুলিয়া লও, দূর হইতে তোমার চরণে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাই।" অনন্তর প্রেমবিধুরা লজ্জাবতী জগতের নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "সকলে সাবধান হইও, জগৎ বড় ভীষণ ঠাঁই, কাহারও কথায় ভুলিও না, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। জগতে ভালবাসা নাই। জগতে কেহ ভালবাসিতে জানে না। যদি কাহারও দেবপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া ফেল, তিনি যতই উন্নতহৃদয় হউন না কেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি নিশ্চয় প্রবঞ্চিত হইবে। তাই বলি কাহাকেও ভালবাসিও না, জগৎকে ভালবাসিতে নাই। এ জগতের ভালবাসা বিষাক্ত, প্রতি চুমুকে হৃদয় জ্বলিয়া যায়।" লজ্জাবতীর কথায় আমরাও বলি জগৎ সাবধান! ভালবাসার ছলনায় পড়িয়া জগতে প্রতিনিয়ত কত নরনারীর হৃদয় জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, কে তাহার খবর রাখে? তাই আবার বলি জগৎ সাবধান!!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত।

বামাবোধিনীর জন্মমাসে আমরা বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার আদিম ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এ দেশ খৃষ্টীয় মিসনরীদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। ইহাঁরাই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা মুদ্রা-যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, এবং সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার করেন; ইহাঁরাই আবার বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক। শ্রীরামপুরের বিবী হানা মার্সম্যান এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁরই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের বিবী লসন ও পিয়ার্স কলিকাতা মহানগরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৯ সালে এই মহিলাদ্বয়ের উৎসাহ ও সাহায্যে কতকগুলি যুবক দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা বিধান জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বৎসরে তাহার অধীনে

৮টী মাত্র ছাত্রী হয়। তাহাতে ইহাঁরা নিরুৎসাহিত না হইয়া অধিকতর উদ্যমের সহিত কার্য্য করেন। তাহারই ফলে ২য় বর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ৩২টী হয় এবং ৩ বৎসর পরে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৬০টী হইয়া উঠে। ইহা ৮০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা।

১৮২১ সাল স্ত্রীশিক্ষার একটী নবযুগ বলিয়া চিরস্মরণীয়। পূর্ব্বে যে সভার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার অধ্যক্ষগণ "London British and Foreign School Society" নামক বিলাতী সভার নিকট লিখিয়া পাঠান যে "বঙ্গদেশে হিন্দু-নারীর সংখ্যা ৪ কোটিরও অধিক, কিন্তু লক্ষের মধ্যে একজনও লিখিতে পড়িতে জানে না। বঙ্গদেশে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনার্থ বিলাত হইতে একজন উপযুক্ত মহিলাকে প্রেরণ করা আবশ্যক।" শ্রীরামপুরের মিশনরী ওয়ার্ড সাহেব তৎকালে বিলাতে ছিলেন, তিনিও উপরি-উক্ত প্রার্থনার সহকারিতা করেন। এই আন্দোলনের ফলে কুমারী কুক্ ইংলণ্ডীয় সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বঙ্গদেশবাসিনীদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচার জন্য শুভাগমন করেন।

স্কুল সোসাইটী দেশীয়দিগের সহায়তায় বিদ্যালয়স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। এ সময় কলিকাতায় ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের মধ্যে ১২০টী মাত্র পাঠশালা ছিল, এবং তাহাতে ৪৫০টী মাত্র বালক অধ্যয়ন করিত। তাঁহারা বালিকা-দিগের জন্যও পাঠশালা স্থাপনের মানস করিলেন। বিবী কুক আপনাকে কার্য্যের উপযুক্ত করিবার জন্য প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮২২ সালের ২৫এ জানুয়ারী তিনি স্কুল সোসাইটীর এক বালক-বিদ্যালয় দেখিতে যান। বিবীর স্কুল দেখিতে আসা, তখন-কার সময়ের নূতন ব্যাপার। তাঁহাকে দেখিতে অনেক লোক জমে, একটী সুন্দর ছোট বালিকাও আকৃষ্ট হইয়া আইসে। মেয়ে ছেলে সেখানে কেন? এই বলিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হন। মিস কুক তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে ডাকিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি লেখা পড়া শিখিতে চাও?" তদুত্তরে শুনিলেন বালিকাটী তিন মাস ধরিয়া লেখাপড়া করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ভরতি হইতে পারে নাই। সে ভরতি হইলে আরও ২০টী বালিকা আসিতে পারে। কুমারী কুক পরদিন আসিবেন বলিয়া যান। পরদিন বাঙ্গলা-ভাল-জানা একটী স্ত্রীবন্ধুর সহিত সেখানে উপনীত হইয়া দেখিলেন ১৩টী বালিকা মিলিত হইয়াছে। স্কুলের পার্শ্বস্থ স্থান চিক্ দিয়া ঘেরা, তাহার মধ্যে বালিকাদের মাতারা ঘোমটা দিয়া বসিয়াছেন। কুকের সঙ্গিনী বিবী মহিলাদিগকে বলিলেন "আপনাদের মেয়েরা লেখা পড়া শিখিলে বোধ হয় আপনারা সুখী হইবেন। এই মেম এ দেশের মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন।" একটী মা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বিবী কি আমাদের

ভাষায় কথা কহিতে পারেন? ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে, না হইবে?" উত্তরে বলা হইল "মেম বাঙ্গালা শিখিতেছেন. শীঘ্র বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারিবেন। ইনি বিলাতে পিতা মাতা ভাই বন্ধুদের মধ্যে বেশ সুখে ছিলেন, কিন্তু এ দেশের স্ত্রীলোকদের অজ্ঞানতার কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র হইয়া সব ছাড়িয়া এদেশে আসিয়া-ছেন। ইনি এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে বড়ই ভালবাসেন, এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া রমণীগণ আনন্দে বুক চাপড়াইয়া এক-বাক্যে বলিলেন "কি রমণীরত্ন, কি রমণীরত্ন!"

কুকের বন্ধু আরও বলিলেন "ইনি স্বদেশে থাকিলে অনেক সুখভোগ করি-তেন। কিন্তু সব আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া আপনাদের কন্যাদের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছেন, এবং এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি এ পৃথিবীর কোনও ধনসম্পদ চান না।" তখন কয়েকটী মাতা বলিলেন "আমাদের কন্যারা আপ-নার কন্যা। ইহাদিগকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিলাম।" আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৮এ জানুয়ারি কুমারী কুক বন্ধুর সহিত পুনরায় আসিয়া দেখিলেন, ৭টী বালিকা জুটিয়াছে, তন্মধ্যে ২টী নূতন। মাতারা পূর্ব্ববৎ চিকের মধ্যে উপবিষ্ট। একজন জিজ্ঞাসিলেন "আমাদের মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া কি করিবে?" উত্তরে বলা হইল "তাহারা পরিবারের অধিক উপকারে আসিবে, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, এবং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হইবে।" আর এক মাতা বলিলেন "সত্য, আমরা লেখা পড়া জানি না, তাই আমাদের স্বামীরা আমাদিগকে পশুর মত ভাবেন। কিন্তু এ কাজ করিয়া তোমার কি লাভ?" কুক বলিলেন "আপনাদের সুখ ও মঙ্গল-বর্দ্ধনেই আমার লাভ।" স্ত্রীলোকটী বলিলেন "তবে এ কাজটাকে বোধ হয় ধর্ম্মের কাজ মনে কর, এবং ইহাতে তোমাদের দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন?" মেম বলিলেন "আমাদের বিশ্বাস মানবের সেবা করিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।"

কুমারী কুকের এই প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়। ইহা স্কুল সোসাইটীর স্কুলের সংস্রবে স্থাপিত হয়। এক মাসের মধ্যে নগরের আর দুই স্থানে দুইটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের প্রচার-গৃহেও একটী বালিকা-বিদ্যালয় বসিল। বালিকা-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০।৬০টী হইল।

লর্ড হেষ্টিংস এ সময় গবর্ণর-জেনারল। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। চাঁদার বই বাহির হইল, তাহাতে তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান স্বাক্ষর করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ৪০০০ টাকা সংগৃহীত হইল। এক বৎসর যাইতে না যাইতে দুইটী বিদ্যা-লয়ের স্থানে ১০টী বিদ্যালয় হইল, এবং ছাত্রীসংখ্যা ২০০ হইল। বালিকাদিগকে

শিক্ষাদান বিষয়ে লোকের যে ঘোর কুসংস্কার ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। বালিকাদিগের এক প্রকাশ্য পরীক্ষা গৃহীত হইল, তাহাতে দেখা গেল তাহারা সহজ সহজ বই পড়িতে পারে ও সেলাইয়ের কাজ করিতে পারে। তখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ১৮২৪ সালে ২২টী বিদ্যালয় ও তাহাতে তিন চারি শত ছাত্রী হইল। তখন ইউরোপীয় মহিলাগণকে লইয়া "Ladies, Society for Female Education in Calcutta & its Vicinity" অর্থাৎ কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলা-সভা নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহারই যত্নে ১৮২৫ সালে ৩০টী বালিকা-বিদ্যালয় ও ৫০০ ছাত্রী হইল, এবং তাহাদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষাদিরও ব্যবস্থা হইল।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় একজন স্ত্রীশিক্ষার বন্ধু ছিলেন। তিনি সহরের মধ্যস্থলে একটী বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। গৃহনির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৮২৬ সালের ২৬এ মে তারিখে লেডী আমহার্ষ্ট বহু গণ্য মান্য লোকের সমক্ষে এই বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই সময় কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের দৃষ্টান্তে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খৃষ্টীয় মিসনের রমণীরা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাইয়ে বিবী ষ্টিবেন্‌সন ও বিবী মার্গারেট উইলসন স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

সক্রেটিসের গল্প।

গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত বিখ্যাত সক্রেটিসের নাম অনেকেরই শ্রবণবিবর তৃপ্ত করিয়াছে। তিনি কেবল নিজেই জ্ঞান ধন অর্জন করিয়া জগতের সমক্ষে পূজ্য হইয়াছেন এমন নহে, অপরকেও সেই ধনে ধনী করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স নগরে পণ্ডিতবর সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভাস্কর-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং পুত্রকেও প্রথমে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মাতা ধাত্রীর ব্যবসায় করিতেন। সক্রেটিস অতি সুস্থদেহ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য এথিনিয়নগণের ন্যায় তিনিও প্রয়োজনমত যুদ্ধ করিতেন। একদা কোন সংগ্রামে বীরত্বের পুরস্কার তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্তু তিনি নিজের গৌরবের জন্য তত প্রয়াসী ছিলেন না, ভাবিলেন এ সম্মান অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিলে আরও গৌরবের হইত। এলকিবিডিস নামক একজন সাহসী যুবককে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় বীরত্বলব্ধ পুরস্কার পরম সন্তোষ সহকারে

তাহাকে দিলেন। কেবল যে নিজের সম্মান ত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা শিখাইলেন তাহা নহে, এক যুদ্ধে উক্ত যুবকের প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

সক্রেটিস প্রৌঢ়াবস্থায় পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা প্রচার করিবার মানস করিলেন। তৎকালের শিক্ষকগণকে "সোফিষ্ট" বলিত। তাঁহারা কেবল যুবকগণকে সুবক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্কের উপযোগী শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কোনরূপ জ্ঞানলাভ হইত না, সক্রেটিস এই অভাব দূরীকরণার্থ চেষ্টিত হইলেন। তিনি কোন প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত করেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং ধনী দরিদ্র আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইচ্ছামত সমভাবে তাঁহার নিকট সেই সুন্দর উপদেশ বাক্য শুনিতে পাইত। স্বল্প কালের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই তাঁহার শিক্ষানীতি অবলম্বন করিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কৌশলে প্রায় অনেক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। একাল পর্য্যন্ত উক্তরূপ হেতু জিজ্ঞাস্য শিক্ষা প্রণালীকে সক্রেটিসের শিক্ষা প্রণালী বলা যায়।

ডেলফি নগরে এক ব্যক্তি সক্রেটিসের জ্ঞানবত্তায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন ব্যক্তি ইহার তুল্য জ্ঞানী আছে কি না?" পণ্ডিতপ্রবর উত্তর পাইলেন "না, সক্রেটিসই জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ।" সক্রেটিস এই কথায় মহা বিরক্ত হইলেন, এবং উক্ত কথার ভিতর কোনও সত্য আছে কিনা জানিতে ব্যস্ত হইলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা যাহা বুঝেন না, তাহা বুঝি বলিয়া মনে করেন। সকলেই বৃথা জ্ঞানাভিমানী। সক্রেটিস আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝেন এবং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করেন। তিনি লোকের প্রশংসায় স্ফীত না হইয়া অবশেষে এই স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন যে "আমি জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ নহি, অজ্ঞানতায় শ্রেষ্ঠ। যে আপনাকে বড় অজ্ঞান বলিয়া জানে, সেই তবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।"

শ্রী নিঃ দেবী।

স্বাবলম্বন।

স্বাবলম্বন বহু দিনের বহু পুরাতন কথা। ইহার শুভ ফল মানুষে অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বাবলম্বনের উপকারিতা অধিক সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিতেছে। ইহা মানব-জীবনের উন্নতির প্রশস্ত সোপান, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাবলম্বন ছাড়িয়া কোনও জাতি বা কোনও ব্যক্তি কোনও কালেই উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই।

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর যত কিছু কাজ রহিয়াছে, সমস্তটার মধ্যেই স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কি শিল্প সাহিত্য, কি ব্যবসা বাণিজ্য, যে বিষয়েই আমরা উচ্চতা লাভ করিতে চাই, স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে সফলকাম হওয়া অসম্ভব,—এমন কি সুখে দুঃখে সম্পদে, বিপদে, সংশয়ে, নৈরাশ্যে মানবজীবনের সকল অবস্থাতেই স্বাবলম্বন শুভফল-প্রসূ।

প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন চিন্তা, উদ্যমশীলতা, এবং আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির মূল; ইহার মধ্যে আত্মনির্ভর মনুষ্যত্বলাভের এক প্রধান উপকরণ। প্রত্যেক নরনারী যদি আত্মনির্ভরশীল হন, যত্নের সহিত অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করেন, তবে জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ ব্যক্তি সকল লইয়াই জাতি সংগঠিত। মহোপকারী স্বানুবর্ত্তিতার অভাবই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের দরিদ্রতা ও হীনতার এক প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ আছে "যিনি নিজে নিজকে সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যের সহায় হয়েন।" বিধাতা প্রতেক মানুষকেই অল্পাধিক পরিমাণে শক্তি দিয়াছেন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত শক্তিকে যদি আমরা নিয়মিতরূপে পরিচালিত করি, তাহা হইলে সেই সেই শক্তিগুলি ক্রমেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তখন মনে হয় আমাদের কার্য্যগুলির সফলতা লাভের নিমিত্ত স্বয়ং বিধাতাই যেন বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতেছেন। অনেক সময় এমন হয়, আমরা শক্তির পরিমাণ করিতে না পারিয়া উৎসাহে বিভোর হইয়া এক অতীব কঠিন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেই। প্রথমতঃ হয় ত পাঁচ জনে মিলিয়া সেই কাজটী আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যের কঠোরতা ও শক্তির ক্ষুদ্রতা দর্শনে নিরাশ হইয়া, পরে অনেকেই হতোদ্যম হইয়া যাই। কিন্তু তখন সেই অবশিষ্ট নিঃসহায় ব্যক্তিদের নিকটেই এক স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হয়, এবং কোন্ এক অভয় হস্তের ইঙ্গিতে তাহারা অটল সাহস পাইয়া স্বাবলম্বন প্রভাবে কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। বহু পরিবারে দেখা গিয়া থাকে স্বাবলম্বন অভাবে কত লোক ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া আজীবন কাটাইতেছেন। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যে পিতার অতুল সম্পত্তির ভরসায়—ভ্রাতার উচ্চ পদের আশায় কত যুবক অলস হইয়া সংসারপ্রান্তে জড় পদার্থের মত বসিয়া থাকে; তাহাদের কিছুরই অভাব বা আবশ্যকতা আছে,

এমন বোধ হয় না। ক্রমে তাহাদের জীবন অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া হতাদরে অতিবাহিত হইয়া যায়। মানবের দুর্জ্জয় শক্তির এমন: অপব্যবহার—এমন ঘৃণিত জীবন যাপন কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশ্ব বীণা হইতে নিরন্তর যে মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত উত্থিত হইয়া মানবকুলকে আকুল করিতেছে—

"হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান,
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।"

সে গভীর স্বর তাঁহাদের কর্ণদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে না। ইংরেজ সমাজে এই পরনির্ভরের ভাব নাই বলিয়া, ছেলে বেলা হইতে তাহাদের স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিটী বলবতী হইয়া উঠে। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব শক্তি অনুশীলন দ্বারা নিজকে নিজে বড় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়, এবং কালে যথাসম্ভব বড় হইয়া দাঁড়ায়।

এই সকল বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের গৃহ কোণের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম কার্য্যাবলী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, স্বাবলম্বন অভাবে গৃহস্থালী খানি কোন মতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে না। এমন অনেক মহিলা আছেন, আলস্যই তাঁহাদের জীবনের চির-সঙ্গী, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা—আকিঞ্চন—উচ্চাভিলাষ আজন্ম যেন ইহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন। কত ক্ষুদ্র কার্য্য আছে যাহা কটাক্ষে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য চাকর ঝিকে ডাকিয়া ডাকিয়া, তাহাতে যতটুকু সময় লাগিবার কথা ছিল, তাহার চতুর্গুণ সময় অতিবাহিত করিয়া বসেন। আবার তাহাতে কাজটীরও তেমন শৃঙ্খলা হয় না, আপনার অক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। তাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা সংসারে খাটিবার জন্য আসেন নাই। সুধু খাটাইবার জন্য—দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যায় গা ঢালিয়া, সুধু হাসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। ইহাঁরা কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি গৃহকর্ম্ম কোনও কার্য্যেই প্রাণ দিয়া খাটিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ লাভ হয়, তাহার আস্বাদন করিতে পারেন না।

এতদ্দেশে অনেক উচ্চপদস্থ লোক ও জমীদার-বংশধরদিগকে দেখা যায়, ভৃত্যগণ তাহাদের গায়ে তেল মাখাইয়া দিবে—জুতা পরাইবে—মাথায় ছাতা ধরিবে—বাতাস করিবে—তাম্রকুট সেবনের পরে রজতনির্ম্মিত হুঁকাটী হাত হইতে লইয়া নামাইয়া রাখিবে—মূলকথা অপরের সহায়তা ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও তাঁহাদের চলে না। নিজেদের কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে দেখিলে এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাঁরা সতত জড়পদার্থবৎ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, ইহাঁদের ঈশ্বর-দত্ত শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হইতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারা আপনার কাছে আপনি পরাধীন, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কে না স্বীকার করিবেন?

যেখানে প্রকৃত স্বাবলম্বনের অভাব

সেখান হইতে লক্ষ্মীশ্রী অন্তর্হিত হইয়া যায়। প্রত্যেকে অপরের উপরে নিরন্তর একটা নির্ভরের ভাব স্থাপন করাতে, আপন আপন প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে কাহারও আগ্রহ থাকে না। চেষ্টাহীন ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে প্রচ্ছন্ন ভাবে চরিত্রের মধ্যে একটা অলস উদাসীন ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে। সংসারের মধুরতা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই আত্মনির্ভর-শীলতার অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পৌরুষ, স্ত্রীলোকের জীবনের সৌন্দর্য্য সমস্তই ম্লান হইয়া যায়।

আমরা চারি দিক্ হইতে যত খানি উপদেশ পাইতেছি, যে সমস্ত পুস্তক পড়িতেছি, আমাদের প্রতিদিনের এই কার্য্যাবলীর মধ্যে যত কিছু জানিবার বিষয় আছে, সবটাই যদি আমরা শুনিবা-মাত্র ঠিক্ বলিয়া ধরিয়া বসি, নিজে কিছু না বুঝিয়া কেবল অন্ধের মত পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া, ছুটিয়া চলি, তাহা হইলে জীবনী শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। যাহা শুনিব, যাহা পড়িব, নিজের জ্ঞান ও বিচার শক্তির সহিত তাহা ঐক্য করিয়া লওয়া চাই। যত দিন না আমরা তাহার প্রকৃত মঙ্গলভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তত-দিন তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ফলতঃ যাঁহারা বড় লোক, তাঁহারা বাহিরের শিক্ষা, উপদেশ, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন শক্তির বিকাশ করে সহায়তা করেন। কিন্তু আত্মচিন্তা বিসর্জন করেন না।

রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি যে যে মহাত্মাগণ আমাদের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল ও আপনা-দের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কত বিঘ্ন বিপত্তি পদে দলিত করিয়া, কেমন আত্মনির্ভর ও আত্ম-গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে, বোধ হয় যেন তাঁহাদের এমন অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভর না থাকিলে, তাঁহারা কখনই সংসারে এত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন না।

কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক যাহাতেই উন্নতি বা খ্যাতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না কেন, সুদৃঢ় আত্ম-নির্ভর অভ্যাস করিতে হইবে। কেবল অপরের দিকে চাহিয়া থাকিলে কিছুই হইবার নয়। যাহা কিছু মানুষের পাইবার এবং করিবার আছে, এই আত্ম-নির্ভর ছাড়িয়া তাহাতে সফলকাম হওয়া অসম্ভব। ইহার অলৌকিক মহিমা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহার অ-তুলনীয় প্রভাব কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন না। নিতান্ত অপদার্থ লোকও প্রতিজ্ঞা ও স্বাবলম্বনের প্রভাবে কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

যখন ক্লাইবের পিতা মাতা পুত্রের

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিতে রুষ্ট ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর রঙ্গভূমিস্বরূপ ভারতবর্ষে পাঠাইয়া-ছিলেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহের পথ খুঁজিতে হইয়া-ছিল। সেই সময়ে আপনার হীনাবস্থা সহসা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলেন। যখন তাঁহার গ্লানি অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইয়াছিল, তখন তিনি আত্ম-হত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সেই উদ্যম বিফল হয়, তখন কি জানি কেন তাঁহার মনে হইয়া-ছিল "আমার দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে যখন ক্লাইব অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আরকটের দুর্গ অধিকার করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন এত অল্প সৈন্য লইয়া কেমন করিয়া অগণিত শত্রুবাহিনী ক্ষয় করিবেন, এই চিন্তাভারে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—এই চিন্তার বিরাম বা মীমাংসা হইয়া উঠিতেছিল না। তখন না জানি কোন্ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি কেবল স্বীয় সাহস, উদ্যম ও বীরত্বের উপরে দৃঢ়নির্ভর করিয়া চলিয়াছিলেন। তখন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদ এবং অজস্র শিলাবৃষ্টি হইতেছিল, ওদিকে দুর্গবাসী সৈন্যগণ ক্লাইবের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া এবং এই দুর্য্যোগ অমঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ মনে করিয়া, বিজয়-লক্ষ্মী নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ অঙ্কে স্থাপিত হইবে ভাবিয়া, আপনাদের সাহস ও স্বাবলম্বন ছাড়িয়া পলায়নপর হইয়াছিল। তখন ক্লাইব নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে এবং পলাশী-প্রাঙ্গণে যে অসাধারণ তেজ, সাহস ও বিক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, সে কেবল তাঁহার অদম্য আত্ম-নির্ভরের ফল। সেই প্রথম উদ্যমেই যদি তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন, কে বলিতে পারে, তবে আজ ব্রিটিশ পতাকা ভারত-সাম্রাজ্যে উড্ডীন হইত?

জাপানের অধিবাসিগণ বিশ বৎসরের মধ্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়া-ছেন, অন্য কোন জাতি শত বৎসরেও উন্নতির এত ঊর্দ্ধতন শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে এমন জানা যায় নাই। ইহাঁরা এখন চীনের সহিতও প্রতি-যোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং নানা দেশীয় কারুকার্য্য, নূতন আবিষ্কৃত কল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, আপনাদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতেছেন। ইহাও তাঁহাদের অসাধারণ আত্মনির্ভরের ফল সন্দেহ নাই।

যখন সংসারে অগণিত কার্য্য-ব্যস্ততায় দেহ মন শ্রান্ত হইয়া পড়ে, শিশুগুলির অসহ্য উৎপাত, রোগীর দীর্ঘ সেবা, অভ্যাগতের অভ্যর্থনা এক সাথে উপস্থিত হয়, সহিষ্ণুতার সীমা শেষ হইয়া পড়ে—অকস্মাৎ সংসারটা বড় তিক্ত বোধ হয়, তখনই আমাদের প্রকৃত আত্মনির্ভরের সঞ্জীবনী শক্তি চাই, নহিলে সে ধাক্কাটা

বুঝিবা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। হয়ত বা কর্ত্তব্যগুলি অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

যখন কোন প্রিয় জনের অভাবে আমাদের জীবন শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়, যখন প্রাণ সংসারের যাবতীয় পদার্থ নিষ্ফল ও শোভাহীন মনে করে, জীবনভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, প্রাণখানি অসহ্য উত্তাপে গলিয়া যাইতে চায়, তখন কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি লোপ হইয়া আসে—তখনই আমাদের আত্ম-নির্ভরের দুর্জ্জয় শক্তি অবলম্বন আবশ্যক। নহিলে দেখিয়াছি বাহিরের সহস্র সান্ত্বনায় প্রাণে শান্তি আসে না, প্রবোধ মিলে না, ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়।

যখন মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে নির্নিমেষে বসিয়া থাকি, রজনী গভীরা হইয়া উঠে—শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া খসিয়া পড়ে, বাতাসে কখন বা দুয়ারের লৌহ শিকলখানি নড়িয়া উঠে, রজনীর গভীরতায় ক্ষুদ্র শব্দটী পর্য্যন্ত কাণে আসিয়া পৌঁছে, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ ঝিম ঝিম করিতে থাকে, বিনিদ্রনয়ন দুটী আলস্যে মুদিত হইয়া আইসে, তখন ধৈর্য্য প্রেমের সীমা ছাড়িয়া যাইতে চায়! তখনো সেই পীড়িত আত্মীয় জনের প্রাণপণে সেবার জন্য ঐকান্তিক আত্মনির্ভর চাই।

মহাত্মা বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, কবির, হরিদাস প্রভৃতির ঈশ্বরলাভের জন্য ঐকান্তিক স্বানুবর্ত্তিতা, মাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডী প্রভৃতির আত্মোন্নতির জন্য সুদৃঢ় স্বাবলম্বন, কলম্বসের সুদৃঢ় ভয়াবহ সমুদ্রের পর পার আবিষ্কার-স্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ আত্মনির্ভর—কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতির অবিচলিত পরসেবা—নেপোলিয়ানের অদ্ভুত কার্য্যশক্তি—ডারউইনের বিজ্ঞান আবিষ্কার এই সকলের মধ্যে আত্ম-নির্ভরের অতুল মাহাত্ম্য জাজ্বল্যমান দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ আপন ইচ্ছা, আপন শক্তি বিসর্জ্জন করিয়া পরপ্রত্যাশী হইয়া যত দিন থাকা যায়, একটু লক্ষ্য করিলেই অনুভব করা যায়, তত দিন অবসাদের এক ভীষণ ছায়া জীবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে! স্বীয় প্রবৃত্তির চালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিলে, মানব-হৃদয়ের নির্জীব অসাড় ভাবই সুধু প্রতিপন্ন হয়—তখন মনে হয় জীবন ও মৃত্যুতে বড় বেশী প্রভেদ নাই।

যখন সুন্দর প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই, পূর্ব্ব আকাশে নিরুপমা রাঙ্গা ঊষা ধীরে ধীরে দেখা দেয়; বহু দূর পর্য্যন্ত শিশির-স্নাত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী দণ্ডায়মান দেখা যায়, ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া শস্য সংগ্রহ করিতে থাকে,—তখন সেই মনোরম প্রাতঃসৌন্দর্য্যে সমস্ত খানি প্রাণ সিক্ত হইয়া যায়, আর সহসা মনে পড়ে "জীবনপথে এত খানি অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু হায়! শিক্ষা কত টুকু করিয়াছি? সংসারের সার প্রকৃত ঐশ্বর্য্য কতটুকু লুঠিয়া লইতে পারিয়াছি?" হায়! অনুধাবন করিলে জানা

যায়, আজও ভাণ্ডারগৃহ সম্পূর্ণই শূন্য! এতগুলি দিন বিফলে গিয়াছে। তখন কি জানি কেমন এক দুঃসহ তৃষ্ণা—অগণ্য আকাঙ্ক্ষারাশি সুপ্তোত্থিতের মত প্রাণে জাগিয়া উঠে, ইচ্ছা হয় এই জগতের অগণ্য কর্ম্ম-সাগরে ঝম্প দিয়া আত্মবিসর্জন করি।

জীবনলীলার মধ্যে এই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, স্নেহের বন্ধন—এই বিরাগ, বিসম্বাদ—হাসি অশ্রু,—সমস্ত ভেদ করিয়া অকস্মাৎ মনে পড়ে "জীবনে কিছুই তো কাজ করিতে পারি নাই; যত কিছু ভাবিয়াছি, হায়! কল্পনাতেই তাহা অবসান হইয়াছে।" সেই গ্লানির তীব্র অনুশোচনা ভেদ করিয়া, বীণা-ঝঙ্কারের মত প্রাণের মধ্যে কে বলিয়া উঠে, "আপনার জন্য আপনি কতটুকু শক্তি উৎসর্গ করিয়াছ"? সেই ম্লান অথচ সত্য, কঠোর অথচ বাৎসল্যপূর্ণ করুণ স্বর মর্ম্মভেদ করিয়া থাকে। তখন সমস্ত আত্মাভিমান একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়, ক্ষোভে লজ্জায় হৃদয় বিনম্র হইয়া আইসে।

পরিমাণ করিয়া বলা কঠিন, গত জীবনের কার্য্যাবলীর মধ্যে কত খানি সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রম ও ত্রুটি কত অলঙ্ঘনীয়! তখন অতীত জীবন ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করে—কিন্তু অতীত কাল-সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে মানুষের ক্ষমতা কোথায়?

ক্রমে অবসাদের মেঘ সরিয়া যায়, আবার আশায় বাসনায় উদ্যমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, নব বল সঞ্জাত হয়—আবার সংকল্প করি আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া সংসারক্ষেত্রে দাঁড়াইব—আপনার জন্য অপরের জন্য খাটিব, আবার তখন উল্লসিত হৃদয় গাহিতে থাকে—

"ক্ষুদ্র শান্তি করিয়া তুচ্ছ
পড়িয়া নিম্নে চড়িব উচ্চ
ধরিব ধূমকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট
কখনো ইষ্ট কভু অনিষ্ট
কখনো তিক্ত কখনো মিষ্ট
যখন যা দেয় তুলিয়া।
হাতে তুলে লব বিজয় বাদ্য
আমি অশান্ত আমি অবাধ্য
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।
নব নব ক্ষুধা নূতন তৃষ্ণা
নিত্য নূতন কর্ম্মনিষ্ঠা
জীবন গ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উল্টিয়া যাব ত্বরিতে।"

আমরা যদি কিছু কাজ করিতে চাই—শিক্ষা, জ্ঞানশক্তি ও সামর্থ্য লাভের প্রত্যাশায় প্রাণপণ পরিশ্রম—অক্লান্ত অধ্যবসায় আগ্রহ যত্ন ও সর্ব্বোপরি একান্ত আত্মনির্ভর শিক্ষা করা চাই। কেবলি পরপ্রত্যাশা, কেবলি অন্যের কৃপার দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়িতে চেষ্টা করিব। এস ভগিনী আজি আমরা সংকল্প করি "আপনার পায়ের উপরে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব।" আমরা মনে

করিয়া রাখিব, আমাদের সংসার রূপ খেলাঘরের এই প্রতি নিমেষের কার্য্য—খুঁটী নাটী যত কিছু আছে, সমস্তটার মধ্যে চাই আত্মাবলম্বন, চাই আত্মবৃত্তির সম্মোহন গৌরব—তাহা না হইলে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে ঘরকন্নার প্রাচীরের আড়াল হইতে ঠিক্ তেমনি মাধুর্য্য তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবে না।

এস আজ আমরা এই শুভ দিনে শুভ সুযোগে একবার সেই দেবদেব মহাদেবের নিকটে প্রার্থনা করি। শুধু তাঁহারই কৃপায় মানবের দুঃসাধ্য কার্য্য সহজ, সরল ও সুসাধ্য হইয়া উঠে। করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার অসীম দয়ায় আমাদের অলসতা চলিয়া যাউক, তাঁহারই করুণার আশ্বাসে আমরা আশা করি আংশিক পরিমাণেও আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। এ জগতে তাঁহারই ইচ্ছার জয় হউক—তাঁহারি মহিমা ধন্য হউক, মানব-জীবন কৃতার্থ হউক।*

* ১৩০৬ সালের ২রা আষাঢ় শিলঙ্ ভগিনী-সমিতির অধিবেশনে শ্রীমতীসুরধুনী সেন কর্ত্তৃক পঠিত।

ইলিয়ড় ১ম সর্গ।

(৩৯৮ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

শুনি আকিলিস-বাণী নৃপতি তখন
এইরূপে ক্রোধভরে করিলা উত্তর ঃ—
"যাও বীর বলগর্ব্বী, যাও হেথা হতে,
তব সহায়তা জেনো ট্রোজান সমরে
নাহি প্রয়োজন আর। তুচ্ছ মানি আমি
ভয় প্রদর্শন তব, ন্যায় যুদ্ধে হেন
যুঝিতে বীরের হেথা হবে না অভাব।
দেবরাজ নিজে রক্ষিবে নৃপতি-পক্ষ
রাজকুলপতিগণ নহে হীনবল,
বিশেষতঃ দেবগণ রক্ষক তাঁদের।
এ অবজ্ঞা মূঢ় তব কে সহিতে পারে?
অশান্ত হৃদয় লয়ে তব হও রত
বিসম্বাদ বিবাদের স্থান পাও যথা।
রে পাষণ্ড, শুধু ঘোর সমর-বিপ্লব
ঘটাইতে চিরসুখ উল্লাস তোমার।
যদ্যপি বীরত্ব কিছু থাকয়ে তোমার
জেনো তাহা দেবদত্ত। ত্যজি ট্রয়ভূমি,
উজানি জলধি ত্বরা, যাও হেথা হতে,
শাসগে স্বরাজ্য তব স্বেচ্ছাচারমতে।
হে দুর্বৃত্ত জানিও তোমারে তুচ্ছ গণি।
কিন্তু এ অস্থায়ী খল-মিত্রতার তব
আর অকারণ এই ঘৃণা অবজ্ঞার
দিব পুরস্কার সমুচিত যথাকালে।
এবে যাও দেখাওগে ভয় তব ভীরু,
নিজ প্রজাগণে; কিন্তু হেথা জেনো শুধু
মোর অধিকার—করিতে তোমারে মূঢ়
ভয় প্রদর্শন, তব অধিকার মাত্র
হইতে শঙ্কিত। দেব-আজ্ঞামতে

লয়ে যাবে ক্রুসিসারে,* উজানি জলধি
তরণী হে মম, কিন্তু অবিলম্বে তুমি
হে গর্ব্বিত অর্পিবারে বন্দিনীরে তব
হও হে প্রস্তুত, নচেৎ বিলম্বে তব
শিবিরে প্রবেশি বলে অধিকার আমি
করিব নিশ্চিত, তব প্রিয় দীপ্তনেত্রা
বৃসিসা † বালারে। ইহা হ'তে মূঢ় তুমি
পাইবে প্রমাণ রাজক্ষমতার মম,
খেদে শত ধিক্ দিবে সে অশুভ ক্ষণে,
যে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইলে গর্ব্বে হয়ে স্ফীত
সম্রাটের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে।
আর ইথে সমবেত গ্রীক যোদ্ধৃগণ
জানিবে নিশ্চয় রাজগণ নহে কারো,
চিরদিন হন তাঁরা, দেবের অধীন।"
ক্ষোভে রোষে আকিলিস হয়ে সন্তাপিত
শুনিলেন নৃপতির মহা স্পর্দ্ধাকর
বাক্যাবলী—শেলসম সুতীব্র শাণিত।
আলোড়িত সিন্ধুসম হৃদয় তাঁহার
হইতে লাগিল নানা ভাবে আন্দোলিত।
প্রচণ্ড দারুণ ক্রোধে কভু বীরবর
অগ্নিসম রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলা ভীষণ।
কভু জ্ঞানবলে বলী দমিলা সে ক্রোধ।
নৃপতিরে সমুচিত দিতে প্রতিশোধ
কভু বীর হইলা উদ্যত, কাল সম
ভীম অসি দৃঢ়-মুষ্টে করি নিষ্কোষিত
ভেদি গ্রীক বীরদলে হানিতে নরেশে।
কভু মৃদু স্বর্গীয় অস্পষ্ট বাণী শুনি
প্রশমিলা তার সেই প্রতিহিংসানল।
এইরূপ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া
হ'তেছিল আন্দোলিত রথীন্দ্র-মানস,
তেজোময় ভীম অসি হয়েছিল যবে
অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত; নির্ব্বাপিতে তার সেই
দীপ্ত রোষানল দেবরাজ যোভ-পত্নী
জুনোর আদেশে তথা মিনার্ভা * সুন্দরী
ত্রিদিব হইতে ত্বরা উত্তরিলা আসি।
আকিলিস আট্রিডিস উভয়ে সতত
সমান স্নেহের পাত্র আছিল তাঁদের।
দাঁড়ায়ে পশ্চাৎদেশে আকর্ষিয়ে ধীরে
উজ্জ্বল কনককান্তি কেশজাল তার,
একা আকিলিস্ কাছে আত্ম-পরিচয়
করিলা প্রকাশ; ঘন কৃষ্ণ মেঘজালে
আবরি চৌদিক্ অদৃশ্য রাখিল তারে
সবার নিকটে। হেরি নয়নাগ্নি বীর
চিনিলা দেবীরে। মহা অভিমানে শূর
সহসা তখন এইরূপে সম্বোধিয়া
বলিলা তাঁহারে—"আট্রিয়াস পুত্র হতে
যেই অবিচার সহিতেছি আমি দেবী
সাক্ষী হও তার। যেই আঁখি তব এবে
হেরিতেছে তার এই নিদারুণ স্পর্দ্ধাকর
নীচ ব্যবহার, দেখুক আবার তবে
মোর হস্তে সমুচিত প্রতিফল তার।
বলিয়া এতেক বীর হইলা উদ্যত
মহা রোষ ভরে হায়! কাঁপি থর থরি
হানিতে সুতীক্ষ্ণ অসি নৃপতির শিরে।
সুধীর কোমল বাক্যে এরূপে তখন
উত্তরিলা যোভ-কন্যা মিনার্ভা সুন্দরী ঃ—
সম্বরহ বীরবর! ত্রিদিব ত্যজিয়া
নির্ব্বাপিতে ক্রোধ তব এসেছি হেথায়।

* সম্রাট্ আগামেমননের বন্দিনী।
† আকিলিসের বন্দিনী।

* মিনার্ভা—বিদ্যা ও রণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেবরাজের ললাট হইতে সম্ভূতা।

জ্ঞানবলে ক্রোধ তব করহ দমন,
হে বীরেন্দ্র! জেনো ইহা জুনোর আদেশ।
জানিও তোমরা বীর দেবাশ্রিত দোঁহে,
ভর্ৎসহ নৃপে তার কঠোর ভর্ৎসনে।
পালিতে দেবতাদেশ শান্ত মনে এবে
কোষবদ্ধ কর বলী কৃতান্ত সদৃশ
জিঘাংসা-সাধনোদ্যত তীক্ষ্ণ অসি তব,
কারণ হে বীর আমি বলিতেছি স্থির
দেববাণী সত্য বলি করিও প্রত্যয়—
আজি হতমান তুমি, শীঘ্র পুনরায়
অগণিত ধনদানে নৃপতি আপনি
প্রার্থিয়া সাহায্য আর মিত্রতা তোমার
করিবে দ্বিগুণরূপে সম্মানিত তোমা।
পালিতে দেবতাদেশ হে বীরেন্দ্র! তবে
দম দীপ্ত ক্রোধ আর প্রতিহিংসানল।
শুনি মিনার্ভার বাণী পিলিডাস তবে
ধরি মৃদু শান্ত ভাব করিলা উত্তর,
"হে দেবী! বচন তব সত্য বলে মানি।
তব উপদেশ-বাণী পালিব সতত,
যদিও কঠিন ইহা তথাপি হে দেবী!
করিব দমন মোর প্রতিহিংসা-তৃষা।
জানি আমি নম্রমনে যেই জন সদা
পালে দেব-আজ্ঞা, আশীষ করেন দেবী
দেবগণ তারে।" বলিয়া এতেক বীর
তেজোময় ভীম অসি স্থাপিল পিধানে,
এদিকে মিনার্ভা দেবী সত্বর গমনে
মহোচ্চ অলিম্পি শৈলে হয়ে উপনীত
মিলিত হইলা পুনঃ দেবগণ সাথে।
কিন্তু তথাপিও আকিলিস-চিত্ত হতে
হইল না বিদূরিত ক্রোধের অনল।
আট্রিডিস পরে ভীম বজ্রস্বরে তবে
গর্জ্জিয়া দ্বিগুণ ক্রোধ করিলা বর্ষণ।

(ক্রমশঃ)

রথ বা মহাবোধি মহোৎসব।

(৪১৩ সংখ্যা—৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

জনশ্রুতি আছে, জরা শবর (অঙ্গদ) কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইলে পাণ্ডবেরা ঐ চিতা-ভস্মাবশেষ অস্থি নীলাচলে লইয়া গিয়া তাঁহার শব দাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে। যথা,—

"ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতিরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকং।"

ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ৫, ৬, শ্লোক।

যোগাগ্নি দ্বারা কৃষ্ণের শব দাহ হইয়াছিল, এ কথা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার অস্থি নীলাচলে ব্যাধ কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই হেতু অনুমান হইতেছে যে কৃষ্ণদাস নারদ-সংবাদে বুদ্ধের অস্থিকে কৃষ্ণের অস্থি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। চীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, দেসৌতি রাসৈ লিখিয়াছেন যোগাগ্নিতেই বুদ্ধের শব দাহ হইয়াছিল, সামান্য অনলে তাহা দগ্ধ হয় নাই।

লঙ্কার পালী গ্রন্থে ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

ফা-হোর তীর্থযাত্রা পুস্তকের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ত্রিলোকের অগ্নি বুদ্ধ শবদেহকে দাহন করিতে সমর্থ নয়। তাঁহার বক্ষ হইতে যোগাগ্নি সমুত্থিত হইয়া চিতা প্রজ্বলিত করিল এবং সেই অগ্নি সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত জ্বলিয়া দেহ ভস্মাবশেষ করিল।

শ্রীকৃষ্ণের উৎকলে রথযাত্রার কোনও প্রমাণ আছে কি? উৎকল খণ্ডেতে নাই, মাদল পঞ্জিতে তাহা নাই। তবে রথ যে ভগবান্ বুদ্ধেরই শরীর, ইহার কোনও সন্দেহ নাই। বহু পূর্ব্বে উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, ধৌলি অনুশাসন লিপি দৃষ্টে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যে যে স্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেবের শরীর নীত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে বৌদ্ধেরা উক্ত শরীরের সম্মানার্থ এক একটী উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেই উৎসব অদ্যাপি হইয়া থাকে। *

তাতার দেশের ও শিশিলি দ্বীপের রথের বৃত্তান্ত অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সিংহলে বুদ্ধের অস্থির উপলক্ষে রথযাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুপণ্ডিত হণ্টার সাহেবও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। †

এ দেশে রথযাত্রা যেরূপ, লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত বা শরীরোৎসব অবিকল তাহাই। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। এ দেশে দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা আরম্ভ হয়, লঙ্কাতেও দ্বিতীয়া হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। বঙ্গের ও উড়িষ্যার রথে জগন্নাথকে স্থাপিত করা হয়, লঙ্কায় জগন্নাথের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত করা হয়। লঙ্কার অধিবাসিগণ ঐ দন্তকে "দালাদাবহংসি" বলিয়া অভিহিত করেন। আমরা এদেশে রথযাত্রা বলি, লঙ্কার লোকেরা এই উৎসবকে 'দালাদাপেঙ্কামা' অর্থাৎ দন্তোৎসব বা শরীরোৎসব বলে। প্রায় সর্ব্ব দেশের রথযাত্রার প্রকৃত অর্থ শরীরোৎসব, রথের অর্থ শরীর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রথের বিবরণ পাঠ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। হণ্টার সাহেবও এই কথা বলেন। ‡

কোন্ সময়ে বুদ্ধের শরীর লঙ্কায় নীত হইয়াছিল, পুরাতত্ত্বে তাহা প্রকাশিত

---

* "Matsyendra's car festivai is as celebrated in Nepal as that of Jagannath."
Journal of Royal Asiatic Society. Vol., XVIII. 394.

† "The Chinese traveller Fa Heau gives a curious account of the yearly procession of the sacred tooth from his regular chapel to a shrine some way off and of its return after a stay there : this was in the fifth century A. D. But the account applies so exactly to the car festival of the present day that one of the most accurate of Indian observers pronounces the latter to be merely a copy. Certain it is that in its leading doctrines the worship of Jagannath bears the impress of the ancient Buddhistic faith.
Hunter's Orissa. I., 132.

‡ "We have seen how Vaisnavism at Puri is but the successor of the older Buddhistic creed."

আছে। লঙ্কা দ্বীপের দন্তবংশ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। দন্তবংশ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে পুরাকালে কলিঙ্গ দেশের নৃপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তৎকালে উৎকল দেশ কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে বুদ্ধ দেবের দেহাবশেষ সিংহলে আনীত হইয়াছিল। লঙ্কায় দন্তোৎসবের পুরাবৃত্ত অতি বিস্তীর্ণ। তাহার এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। রথের প্রকৃত পুরাবৃত্ত কি, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। রথটা চক্রবিশিষ্ট বৃহৎ কাষ্ঠময় মন্দির। ইহা কি শকট? শকটের আবার উৎসব কি? ইহার আবার উত্তর ও দক্ষিণে টানিবার মতভেদ কেন? অবশ্যই ইহার কি কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই? তাহা কি? হয় ত আমরা জ্ঞাত নহি। বাহ্য আড়ম্বরে আসল মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি। কালে প্রকৃত ঘটনার উপর উপপ্রসঙ্গ আসিয়া জমিয়াছে—সত্যের উপর দৃঢ় আবরণ নিপতিত হইয়াছে। সেই হেতু আসল কথার মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারি না। কিন্তু সূর্য্য মেঘাবৃত হইলেও দীপ্তিহীন হন না। এ দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম অপসারিত হইলেও প্রাচীনবিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। *

* "The corpse is carried on a wheel cart drawn by an animal either a cow or a kid of one colour or a black kid is led behind by a rope tied to its left leg."
Royal As. S. Journal Vol. XVI. 207.

আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে, শববহনার্থ শ্বেত বলিবর্দ্দ-সংযোজিত রথের প্রয়োজন। ঐ রথে শব তুলিয়া সমারোহে দাহস্থানে লইয়া যাইবেক। ঐ রীতি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল। তাঁহার শব রথে তুলিয়া মহা সমারোহে মুকুটবন্ধন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঐ স্থানে শবদাহ হইয়াছিল।

পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে রথযাত্রা শববহন ব্যাপার। রথে করিয়া শব লইয়া যাওয়া এ দেশের অতি প্রাচীন প্রথা ছিল। বেদেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে, এবং পুরাকালে রথোপরি শব লইয়া যাইবার জন্য মহা সমারোহ হইত। সূত্রপেটকের দীর্ঘ নিকায়ান্তর্গত মহাবর্গ পরিনির্ব্বাণ সূত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের বিষয় প্রকীর্ত্তিত আছে। তাহাতে জানা যায়, কুশিনগরের উত্তরে সুবর্ণবতী নদীর তীরে উপবর্ত্তন নামে এক শালবন ছিল। তথায় ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। মল্ল ভূপতিগণ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের সৎকার কিরূপ হইবে? আনন্দ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায়। সেই দণ্ডেই তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। প্রথম দিনে কুসিনগরবাসিগণ নৃত্য গীত ও বাদ্যভাণ্ড সহ সুগন্ধি পুষ্প সকল বর্ষণ করিতে করিতে ভগবানের শবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে শবের

উপর সুন্দর চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া ও তাহার জন্য পটমণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করিয়া উৎসব করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন এইরূপে গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনও এইরূপে অতিবাহিত হইল।

সপ্তম দিনে ৮ জন মল্ল ভূপতি উত্তমরূপে স্নাত ও নূতন বস্ত্র পরিহিত হইয়া মহোল্লাসে ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম সহ শব রথে তুলিবার সময় দেখিলেন, শব রথে তোলা অসাধ্য। দুর্ব্বলতা জন্য সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া মহামান্য অনিরুদ্ধকে কহিলেন "প্রভো! আমরা দুর্ব্বল নহি। আমাদের দেহে প্রচুর বল আছে, তথাপি ভগবানের শব উত্থিত করিতে পারিলাম না, ইহার কারণ কি?" সুবিজ্ঞ অনিরুদ্ধ বলিলেন, "তোমাদের সঙ্কল্প একরূপ, দেবগণের অন্যরূপ। দক্ষিণ দ্বারে শব নিষ্ক্রমণ তোমাদের ইচ্ছা, উত্তর তোরণ দিয়া নিষ্ক্রমণ দেবগণের ইচ্ছা।" নৃপতিগণ কহিলেন, "দেবের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ইহা বলিয়া উত্তর দ্বার দিয়া মল্ল ভূপতিগণ মুকুটবন্ধন গৃহে শব লইয়া চলিলেন। উৎকলে রথযাত্রা উত্তরমুখে এবং অন্যান্য স্থানে দক্ষিণাভিমুখে হয়, ইহাই বৈচিত্র্যের মুখ্য কারণ। আর এক কথা, রথে জগন্নাথকে তুলিবার সময় পাণ্ডারা এরূপ ভাণ করেন, যেন জগন্নাথদেব রথে উঠিবার সময় দুষ্টতা করিয়া রথে উঠিতে চাহেন না। পূজকগণ কুপিত হইয়া যথেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে প্রহার ও তাঁহার প্রতি গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, পরে জগন্নাথ রথে চড়েন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লৌকিক ব্যবহারে বুদ্ধদেবের শবদাহ হইলে অষ্টজন ক্ষত্রিয় নৃপতি ভগবানের ভস্মাবশেষ বিভাগ করিয়া লইয়া স্ব স্ব রাজ্যে স্তূপের উৎসব স্থাপিত করেন।

এইরূপে দশটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়, এবং তদুপলক্ষে দশটী মহোৎসব করা হইয়াছিল। অধুনা আমরা দেখিতেছি বঙ্গদেশ, নেপাল, তিব্বত, উড়িষ্যা এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধের ঐ শরীরোৎসব অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তাহা রথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই রথযাত্রা অথবা শরীরোৎসবের সমস্ত লক্ষণ মহরমে প্রকাশিত আছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মহরমের কাণ্ড রথেরই ব্যাপার মনে হয়। মহরমের সময় ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ একটা দরগা নির্ম্মাণ করেন, উহা ধাতুগর্ভ অর্থাৎ বৌদ্ধ স্তূপ সদৃশ। ইহাও শববহন ব্যাপার। অধিক আশ্চর্য্য যে, রথ দ্বিতীয়া হইতে সর্ব্বত্র আরব্ধ হইয়া দশমীতে শেষ হয়, মহরমে অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। রথের পরিবর্ত্তে তাজিয়া ব্যবহৃত হয়। হিন্দু পর্ব্বের সহিত মহরমের এইরূপ সাদৃশ্য ঘটিবার কারণ কি? চিন্তাশীল লোকের চিন্তনীয়। তাজিয়া যখন রাস্তায় বাহির হয়, তখন বোধ হয় কোন চক্রবর্ত্তী রাজার বিলাস-যান বাহির হইয়াছে। বস্তুতঃ রথও চক্রবর্ত্তী রাজার সর্ব্বলক্ষণে সুভূষিত হয়। আধুনিক লোকে তাহার অর্থ জানে না, তামসিক ব্যাপার মনে করে।

"চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাত্তু শীরিণম্।"

উৎকলখণ্ড, ৩০ অধ্যায়।

রথের সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছি, মহাবেদির কথা বলা হয় নাই। ইহা রথেরই নামান্তর। বেদির অর্থ মঞ্চ, অথবা খাট। রথে যে বেদির উপর জগন্নাথদেবকে স্থাপিত করা হয়, ইহাই মহাবেদি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"মধ্যে-বেদি সমুচ্ছায়ি চারুমণ্ডপরাজিতম্।"
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্দ্বারং সুশোভিতম্।
নানা বিচিত্রবহুলং হেমপট্টবিরাজিতম্।"

ইত্যাদি।

বৌদ্ধেরা মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, তাহার আকৃতি জগন্নাথের ন্যায়। শরীরের প্রধান চারি উপাদান জল, মৃত্তিকা, তেজ ও বায়ু। ইহাদের প্রতিরূপ উল্লিখিত স্তম্ভে সূচিত হয়। *

ভগবান্ বুদ্ধদেবের শব মহাসমারোহে মুকুট-বন্ধন মণ্ডপে লইয়া গিয়া দাহকার্য্য সমাপ্ত করা হইলে চিতা ভস্মাবশেষ মহাসমারোহে সমাজগৃহে আনয়ন করা হইয়াছিল। ইহাই পুনযাত্রা সন্দেহ নাই।

* Pilgrimage of Fa Heau P. 91.

আত্মার সতীত্ব।

জগতে আদর্শসতী রমণীর যে চিত্র আছে, তাহাতে ৩টী ভাব দেখা যায়—(১) পতিকে একমাত্র আপনার বলিয়া জানা, (২) পতির সহিত প্রেমে এক হওয়া, (৩) পতিকে সুখী করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা। বিশ্বাস, প্রেম ও সেবা এই তিনটীর সাধন পতিব্রতার জীবনে সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে পবিত্র ও স্বর্গীয়ভাবে বিভূষিত করে। সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্রে ইহার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখা যায়। ঈশ্বর-প্রেমিকেরও লক্ষণ তাহাই। (১) ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া জানা, (২) প্রেমে তদ্গত ও তন্ময় হওয়া, (৩) তাঁহার সেবাতে জীবন উৎসর্গ করা।

১। সতীর বিশ্বাস পবিত্র—তিনি স্বামীকে যে চক্ষে দেখেন, আর কাহাকেও সে চক্ষে দেখিতে পারেন না। সতী কোন প্রলোভনে বা ভয়প্রদর্শনে অবিশ্বাসিনী হইতে পারেন না। অশোকবনে সীতা কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষাতেই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এক পলকের জন্যও কি তাঁহার মন রাম হইতে টলিয়াছিল? ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মন সেইরূপ ঈশ্বর হইতে টলিতে পারে না। তিনি যে চক্ষে ঈশ্বরকে দেখেন সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রভু বলিয়া, সে চক্ষে সংসারকে কখনও দেখিতে পারেন না। সতীর এই বিশ্বাসেরই বল, ইহাতে তাঁহার জীবন এত গৌরবান্বিত!

২। সতীর প্রেম—সতী পবিত্র-হৃদয়ের ষোল আনা প্রেম স্বামীতে অর্পণ করেন। পতিজ্ঞান, পতিধ্যান, পতিতেই আনন্দ। সীতা রামময়, সাবিত্রী সত্যবান্ময় এবং দাক্ষায়ণী সতী শিবময় হইয়াছিলেন। শিবের নিন্দাতে সতীর প্রাণত্যাগ কি সম্ভব হইত, যদি শিব তাঁহার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া না থাকিতেন? শিবনিন্দায় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ঈশা আপনার নিন্দা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্রাত্মার নিন্দা অমার্জনীয় বলিয়াছেন। পতিনিন্দা যেরূপ অসহ্য, পতির প্রশংসা সেইরূপ উপাদেয়। ঈশ্বরের গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তের চির আনন্দ। ভক্তের নিকট তাঁর নাম প্রাণের প্রিয়তম পদার্থ; নামে ও তাঁতে অভিন্ন; তাঁর সম্পর্কীয় যে কেহ, সকলেই পরমাত্মীয়।

৩। পতির সেবাও পবিত্র সেবা—সামান্য কার্য্য যেরূপ হেলায় শ্রদ্ধায় করা যায়, এ কার্য্য সেরূপ নহে। সতী নারী প্রেমের আগুনে আপনার প্রাণ গলাইয়া পতির চরণে অর্পণ করিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রেমিকও আপনার প্রাণ গলাইয়া তাঁর চরণে মাখাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁর নিজস্ব কিছু নাই, তিনি আপনাকে হারাইয়া পতির সুখের জন্যই ব্যস্ত। আপনার সুখ কি?—পতির সুখ সাধন। দুঃখ কি?—পতির সুখের হানি। তিনি আপনার এমন কিছু রাখেন না, যাহাতে পতির কিছুমাত্র ক্লেশ হইতে পারে। পতির প্রতি এই যে দরদ, ইহাই প্রেমিকের-হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার প্রধান প্রবর্ত্তক। পতিকে সুখী করিবার জন্য তিনি আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দেন এবং দুঃখের গুরুভার মস্তকে আনন্দে বহন করেন। সে ভারে নিষ্পেষিত হইয়া যদি তাঁহার প্রাণ যায়, তাহাতেই তাঁহার পরমানন্দ। পতিকে সুখী করিবার জন্য সাধ্বী সতী কি না করেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাস, প্রেম এবং সেবার পূর্ণতা সাধনেই সতীত্ব ধর্ম্ম পালন হয়, ইহাতেই ব্রহ্মসাধনাব্রতেরও উদ্‌যাপন হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪১৩ সংখ্যা—৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আ—আকর, আকারহীন বা আকৃতিহীন, আকাঙ্ক্ষাবিহীন, আকাশ, আকাশাতীত, আকিঞ্চনধন, আকুল-প্রাণ-সান্ত্বন, আগম-নিগমাতীত, আচণ্ডাল-বন্ধু, আচার্য্য-প্রবর, আচ্ছাদক, আঢ্য, আতুরশরণ, আত্মজ্ঞ, আত্মভূ, আত্মস্থ, আত্মা, আত্মারাম, আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়, আর্ত্ত-বন্ধু, আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক, আদরের ধন, আদি, আদিকারণ,

আদর্শ, আদিত্যবর্ণ, আদিনাথ, আদিগুরু, আদিপিতা, আদিপ্রভু, আদিমাতা, আদ্যেশ্বরী, আদ্যমহেশ, আদেষ্টা, আধার-আধেয়, আধ্যাত্মিক-যোগলভ্য, আনন্দ, আনন্দঘন, আনন্দজ্যোতিঃ, আনন্দ-নিকেতন, আনন্দময়, আনন্দময়ী মা, আনন্দরূপ, আনন্দসাগর, আনন্দার্ণব, আনন্দপ্রস্রবণ, আনন্দনন্দনন্দ, আপতুদ্ধারণ, আপৎখণ্ডন, আপন্নশরণ, আপূরণ, আপ্ত, আপ্তকাম, আবা, আবরণ, আভরণ, আব্রহ্মস্তম্বাবলম্বন, আমরণবন্ধু, আমিত্ব-নাশন, আমার আপনার, আয়ুঃ, আয়ুষ্কর, আয়ুষ্মান্, আয়ুর্দ্দাতা, আয়াসলভ্য, আরম্ভ, আরম্ভক, আরাধ্য, আরাধ্যত্তম, আরাধিতপদ, আর্য্য, আরামস্থান, আলোকময়, আল্লা, আশাপূরণ, আশুতোষ, আশীর্ব্বাদক, আশ্চর্য্যরূপ, আশ্চর্য্য-কীর্ত্তি, আশ্চর্য্যশক্তি, আশ্রমসখা, আশ্রয়, আশ্রয়দাতা, আশ্রিতপালক, আশ্রিতবৎসল, আশ্বাসদাতা, আসন্নকালৈকশরণ, আসেচনক, আহ্লাদন।

ই—ইচ্ছাময়, ইতি, ইতরেতরজননিস্তারণ, ইন্দ্রপতি, ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য, ইষ্ট, ইষ্টদেব, ইহপরলোকগতি, ইহামুত্রফলবিধাতা।

ঈ—ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈশ্বরদিগের পরমমহেশ্বর, ঈশ্বরী, ঈপ্সিতধন, ঈর্ষ্যাদ্বেষবিহীন।

উ—উচ্চতম, উজ্জীবক, উৎকণ্ঠাহারী, উৎপাতনাশন, উৎসবেশ, উত্তরসাধক, উত্তাপহরণ, উদগ্র, উদার, উদ্দেশ্য, উদ্দীপক, উদ্বোধক, উদ্ভাবক, উদ্ধারক, উদ্ধারকর্ত্তা, উদ্দাম-রিপুকুলদলন, উত্তম, উত্তমতম, উৎকৃষ্টতম, উপায়, উপাদেয়, উন্মাদক, উপজীব্য, উপদেষ্টা, উপকারী, উপাধিহীন, উপভোগ্য, উপমারহিত, উপাস্য, উন্নতিসোপান, উরশ্ছদ, উল্লাসক।

ঊ—ঊর্দ্ধতম, ঊর্দ্ধদেব।

ঋ—ঋজুতম, ঋতধামা, ঋদ্ধ, ঋদ্ধিদাতা, ঋত্বিগ্‌বর, ঋতুপতি, ঋষিবন্দন।

এ—এক, একতম, একসত্য, একমেবাদ্বিতীয়ং, একশক্তি, একগুরু, একদৃক্, একাগ্রসাধনলভ্য, একায়ন, একাধিপ, একযন্ত্রী, একনিয়ন্তৃ, একযোগ-বন্ধন।

ঐ—ঐকান্তিকীভক্তিলভ্য, ঐক্যবন্ধন, ঐশ্বর্য্যদাতা, ঐশ্বর্য্যবান্, ঐহিকপারত্রিক শুভবিধাতা।

ও—ওঁ, ওঙ্কারসাধনধন, ওঙ্কার প্রতিপাদ্য, ওজস্বী, ওষধীশাধীশ।

ঔ—ঔপনিষদ, ঔদার্য্যময়, ঔপম্যহীন, ঔষধোত্তম, ঔৎসুক্যকারণ।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মিউনিসিপাল বিল লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট কমিসনারদিগের উপর দোষারোপ করাতে ২৮ জন মনোনীত কমিসনর এককালে পদত্যাগ করিয়াছেন।

২। ২৪ পরগণার জেলা বোর্ড মগরা হাট হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় ট্রাম গাড়ী চালান মঞ্জুর করিয়াছেন। বরণ কোম্পানী কার্য্য ভার লইতেছেন।

৩। ফিলিভিন নামক সাহেব এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিনা কালীতে ছাপার কাজ চলিবে।

৪। পাণ্ডুয়া নগরের ভগ্নাবশেষ সংরক্ষণ জন্য ছোট লাট ৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। ভারতের অন্যতম সু-সন্তান বাবু রাজনারায়ণ বসু গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বৈদ্যনাথে ৭৩ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দেশের ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যা ও সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির পরম সহায় ছিলেন। এরূপ ব্যক্তির বিয়োগে ভারত যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

৬। পৃথিবীতে য়িহুদী সংখ্যা ১ কোটী ১০ লক্ষ, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক রুসিয়াবাসী।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরীর সর্ব্বপ্রাচীন সামরিক কর্ম্মচারী সার আর্থার কট্ ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোক-গত হইয়াছেন। তিনি ভারতে প্রায় ৪৫ বৎসর ছিলেন, ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে গমন করেন।

৮। লণ্ডনে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধ হইতে বোতাম প্রস্তুত হইতেছে, ইহা সাদা হাড়ের বোতামের মত, কখনও বিবর্ণ হয় না; দর সস্তা।

৯। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তুরুস্কের সুলতান গাঢ় লাল, জর্ম্মণ সম্রাট্ নীল ও লাল, অষ্ট্রীয় সম্রাট ধূসর বর্ণ, রুস সম্রাট্ গাঢ় হরিৎ বর্ণ এবং ইটালীর রাজা কৃষ্ণবর্ণ ভাল বাসেন। গ্রীসের রাজা কোনওরূপ গাঢ় বর্ণ দেখিতে পারেন না।

১০। জাপানে ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী দেশালাই প্রস্তুত হইত না। ১৭৭৮ সালে ৫ হাজার টাকার দেশালাই প্রস্তুত হয়। গত বর্ষে ৫৫ হাজার টাকার দেশালাই প্রস্তুত হইয়াছে। এজন্য এখন ২০০টী কলে ৬ হাজার লোক খাটিতেছে।

১১। ইংরাজগণ নৌ-সমরের জন্য প্রায় এক সহস্র সংবাদবাহী কপোত শিক্ষিত করিয়াছেন। ইহারা প্রায় ৫০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দৌত্যকার্য্য করিতে সমর্থ।

১২। গত ৩১এ শ্রাবণ ডাক্তার কানাইলাল দে রায়বাহাদুর পরলোক-গত হইয়াছেন। ইনি রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য দেশবিদেশে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন।

১৩। কাশীর স্বর্গগত ভাস্করানন্দ স্বামীর গদীতে প্রকাশানন্দ স্বামী এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর গদীতে গঙ্গারাম স্বামী অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১৪। ডায়মণ্ড হারবরে "রেজোলিউট" ও "সিন্ধিয়া" নামক দুই জাহাজের পরস্পর সংঘর্ষণে প্রথমোক্ত জাহাজের অনেকগুলি লোক জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে।

১৫। বাবু রজনীনাথ রায় কিছুকালের জন্য কণ্ট্রোলার জেনারল্ পদে উন্নত

হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এ ক্ষেত্রে এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৬। কুচবিহারের মহারাজা বাবু প্রশান্তকুমার সেন এম এ কে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ৮ হাজার টাকার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭। লক্ষ্ণৌ নগরে কংগ্রেসের আয়োজন উৎসাহ-সহকারে হইতেছে। সরকারী এক বৃহৎ ভূমিখণ্ডে ২৫০ ফিট দীর্ঘ ও ১২৫ ফিট প্রশস্ত পাণ্ডাল নির্ম্মিত হইবে। বেরেলীতে ২ হাজার চেয়ার ও লক্ষ্ণৌয়ে ১২০০ খাট প্রস্তুত হইতেছে।

১৮। বনগাঁর টিকেট কলেক্টর কোনও রমণীর প্রতি অত্যাচার করণ অভিযোগে দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে ৩ মাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯। আসামের রাজধানী শিলং শৈলে কোন লেডী ডাক্তার বা শিক্ষিত ধাত্রী নাই। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি সেখানে দেশীয় মহিলাগণের একটী সভা হইয়াছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা তত্রত্য চিফ কমিশনরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। সহৃদয় কটন সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২০। কটকের লবণ বিভাগের আসিষ্টেণ্ট কমিশনরের পত্নী এককালে তিন সন্তান প্রসব করিয়াছেন, ২টী পুত্র ও ১টী কন্যা; তিনটীই জীবিত আছে।

২১। কম্বারল্যাণ্ডনিবাসী জোসেফ ওয়েবের সন্তান সন্ততি ১৯টী, পৌত্র ও দৌহিত্র ১৭৫ এবং প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্র প্রায় ১০০ একশত। এরূপ পরিবার দুর্লভ।

২২। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল-বাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের এক মহা যুদ্ধ অবশম্ভাবী হইতেছে। কুচবেহারের মহারাজা এই যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

২৩। কলিকাতা তালতলাবাসী ডাক্তার শীতল চন্দ্র পাল যক্ষ্মাদি রোগের এক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ৫।৬ টাকা মূল্যের এক বোতল ঔষধ ঘ্রাণ দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, অনেক কৃতবিদ্য লোক এরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তার, ২৫ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

২৪। আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের মৎস্যে সূতার ন্যায় এক প্রকার পোকা পাওয়া গিয়াছে। ডিব্রুগড়ের ডাক্তার সাহেব মৎস্যে ঐ পোকা দেখিয়া উহা বিড়ালকে খাওয়ান, তাহাতে বিড়ালটী রোগাক্রান্ত হয়। মানুষের পেটে যে ক্রিমি হয়, ঐ পোকা সেই জাতীয়। অপক্ক অবস্থায় ঐ সমস্ত মৎস্য খাইলে পেটে ক্রিমি হয়। আসামের অধিকাংশ লোকের পেটে ক্রিমি আছে, তাহাতে তাহাদিগকে সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে দেখা যায়। জীব-হিংসায় অনেক কুফল।

প্রার্থনা।

কি আর চাহিব নাথ
সকলি দিয়াছ তুমি,
দিয়াছ এ ধরাধামে
নামায়ে স্বরগ ভূমি।
যে দিকে নেহারি আমি,
তব প্রেম দেয় দেখা,
অণুতে অণুতে জাগে,
তোমারি হস্তের লেখা।
প্রাণময় প্রাণরূপে
জীবিত করিছ কায়া,
তব প্রেমে পাই হেথা
জনক জননী জায়া।
আকাশের গায়ে দেখি
উজ্জ্বল কাঞ্চন রবি,
নয়ন সার্থক করি
নেহারিয়া বিশ্ব ছবি।
ঢেলেছ সৌন্দর্য্য তব,
ফুটন্ত কুসুম পরে,
সুধা ঘ্রাণ দিয়া তায়,
রেখেছ অমিয়া ভরে।
ঢেলেছ বিহগ কণ্ঠে,
মধুর ললিত তান,
গাহিছে বসিয়া শাখে
তোমারি সুযশ গান।
অভ্রভেদী হিমালয়
তুষারে আবৃত থাকি,
৩
প্রকাশে মহিমা তব,
আপনা জাগায়ে রাখি।
সুনীল সাগর ওই,
অনন্তে প্রসারি কায়,
অবিরত ওহে নাথ,
তোমারি মহিমা গায়।
কুপুত্র সুপুত্র যত,
লও তব স্নেহ কোলে;
অধম পতিতে তার,
তুমি দয়াময় বলে।
দীন হীন ক্ষুদ্র আমি,
কি আছে শকতি মম,
গাহিতে মহিমা তব,
সুকণ্ঠে, সুকবি সম।
সকলি পেয়েছি নাথ
তোমার করুণা ব'লে,
অধমে রাখিও সদা
পবিত্র চরণ তলে।
সুখ দুঃখ সম্পদেতে
যখন যে ভাবে থাকি,
নিয়ত তোমারে যেন,
হৃদয় মাঝারে রাখি।
মূহুর্ত্তের তরে প্রভো
তোমায় না ভুলে যাই;
জীবন ভরিয়া যেন
তোমার মহিমা গাই।

"রমেশ বিয়োগে।"

আজি যে তমসাচ্ছন্ন ভারত আনন,
মায়ের অঞ্চল ছাড়ি,
ভব মায়া পরিহরি
চলি গেলা স্বর্গ-ধামে রমেশ রতন!

(হায়!) আজি যে আঁধারে মাথা
ভারত-আনন।
জিনিয়া জীবন রণে
মহাপ্রাণ নিজগুণে
পাইলা স্বদেশ মাঝে স্বর্ণ সিংহাসন।
(হায়!) আজি যে তমসাচ্ছন্ন ভারত
আনন।
নিজগুণে সুবিচারি
গৌরব মুকুট পরি
ন্যায় তুলাদণ্ড যবে করেছ ধারণ—
রাজারে চাহিয়া প্রজা দলনি কথন!
একে একে একে হায়!
সব ধন চলে যায়,
কি সুখে মা জন্মভূমি ধরিবে জীবন?
কে আর ঢালিবে দীপ্তি আননে এমন?
কত লোক আসে যায়,
কেহত না ফিরে চায়
কে আছে পরার্থপর তোমার মতন?
অযুত ধূলির মাঝে কৌস্তভ রতন।
হিংসা দ্বেষে পরস্পরে
খণ্ড খণ্ড যবে করে,
অভেদ অপক্ষপাত বিচারে তখন
করিয়াছ অলঙ্কৃত বিচার আসন!
কাম ক্রোধ মোহ লোভ
মুক্ত সর্ব্ব বিধ ক্ষোভ
শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ যেন ন্যায় মূর্ত্তিমান্!
ভারতে নাহিক কেহ তোমার সমান!
জলধির তল চির আঁধারে মগন,
বৈজ্ঞানিক দীপ যথা
আলোকিত করি তথা
অত্যল্প আয়াসে নিম্নে করিছে গমন,
অদ্ভুত প্রতিভা তব তাহারি মতন!
অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান লয়ে
জটিল সমস্যা চয়ে,
নিঃশঙ্কে হেলায় করিয়াছ উদ্‌ঘাটন।
কে পাইবে জ্ঞানপূর্ণ মস্তিষ্ক এমন?
ধবল গিরির মত
শুভ্র যশে বিমণ্ডিত
হিমালয় সম উচ্চ প্রশস্ত জীবন!
হায়! সে গিরির চূড়া ভাঙ্গিল শমন।
(তাই,) আজি যে আঁধার মাথা ভারত
আনন!
সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ
চলিছেন মহাভাগ
যথায় অমরাবতী নন্দন কানন,
জুড়াইতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ প্রাণ মন!
কাঁদ তোরা বঙ্গবাসী
কি কাজ বলনা হাসি,
কি সাধে হইবি আর হরষে মগন?
ডুবিল তোদের চির গৌরব তপন!

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।

বৈতরণী-নদী।

বৈতরণী তব নাম শুনেছি মা কত!
আজি তব রূপ হেরি,
চক্ষু পালটিতে নারি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে নেহারি সতত।

বৈতরণী বৈতরণী! মহাতীর্থ তুমি,
তোমারে যে হয় পার,
যম ভয় নাহি তার,
গঙ্গা-মৃত্তিকার সম পূত তট-ভূমি!
মৃদু স্রোত ভরে কর মৃদু কুল্ কুল্,
ম্লান-সন্ন্যাসিনী বেশে
ফিরিতেছ দেশে দেশে,
স্বর্গের অপ্সরা তুমি মরতেতে ভুল্।
বৈতরণী মা আমার মহা-পুণ্যবতী,
শরীরে সামান্য সাজ,
সর্ব্বদা মহৎ কাজ,
ধীরা স্থিরা সুগম্ভীরা শুদ্ধশান্তমতি!
তব তীরে যেই জন ধান্য দান করে,
গোদান প্রভৃতি দান,
করে যেই ভাগ্যবান্,
অনায়াসে স্বর্গধামে পশে সে অচিরে।
বৈতরণী * তীরে আর যাইতে না হয়,
না থাকে তাহারে আর
শমনের অধিকার,
ভুগিতে না হয় আর দুস্তর নিরয়।
পরহিতে বৈতরণী দিয়েছ শরীর,
তব নীরে করি স্নান,
হয় সবে পুণ্যবান্,
আগ্রহে সকলে তাই স্পর্শে তব নীর।
ধবল-বরণা নদী ধীরে প্রবাহিত
হও তুমি নিশি দিন,
তরঙ্গ ভ্রূকুটিহীন,
বুকভরা বীচিমালা করিছে সজ্জিত!
ধীর-সমীরণ যেন সম্ভ্রমে সম্ভ্রমে,
রাকা-শশী হাসি হাসি,
সারা নিশি যায় ভাসি,
জ্বলন্ত নক্ষত্র জ্যোতি জ্বলয় সরমে।
কে গো দেবী বৈতরণী জননী সমান
শ্রান্তিহীন অহরহ,
যাচিয়া দিতেছ স্নেহ,
করিছ দুর্ব্বল-প্রাণে মহা-শক্তি দান?

শ্রীঅম্বুজা।

* কথিত আছে যমরাজ জীবাত্মাকে পৃথিবী হইতে আপন ভবনে লইয়া যাইবার সময় বৈতরণী নদী পার করাইয়া লইয়া যান। উড়িষ্যার বৈতরণী পার হইলে আর সে বৈতরণী পার হইতে হয় না।

"রাখিবন্ধন"।

(মাননীয়া ভগিনী শ্রীমতী নিকুঞ্জকামিনী দেবী মহাশয়াকে প্রীতি উপহার)।

বরষার ধোয়া চাঁদ উঠেছে গগনে,
ডুবেছে ধরণীতল ও শুভ্র কিরণে;
ফুটেছে চামেলী বেলী, কেতকী চাঁপার কলি,
সেফালি মালতী কত, ফুটিতেছে অবিরত,
টগর রজনীগন্ধা শুভ্রবেশ ধরি,
আরো-কত-শত-ফুল ফুটেছে আ মরি!
বহিছে দখিনা বায় ফুলরেণু মাখি,
ছড়াতেছে দিগন্তেতে সুবাস তাহারি;
নাচাতেছে ফুলদলে, মৃদু মন্দ তালে তালে,
পড়িতেছে ঢলে ঢলে ফুলদল শাখা'পরে,

সোহাগ-আবেশে হাসে গালভরা হাসি,
গগনে দেখিয়ে তারা পূর্ণকলা শশী।
কানায় কানায় নদী উঠেছে ভরিয়া
(যেন) ধরিবারে শশধরে যেতেছে ছুটিয়া;
খাল বিল যে যেথানে, ছিল সবে শুষ্ক প্রাণে,
ছুটেছে এখন তারা, হইয়া আপন হারা,
পাইয়া নূতন জল নূতন জীবন,
নবীন উৎসাহে ধায় নীরব পরাণ।

ফুটিয়াছে সরোজিনী হ্রদ আলো করি,
কুমুদ কহ্লার কত ফুটে চারি ধারে;
কত মধুকর এসে, ধাইছে মধুর আশে,
গুন্ গুন্ গুন্ রবে, ঘোষিছে জগতে সবে,
পবিত্র মঙ্গল আজি "রাখি-বন্ধন্"
পাপিয়াও কুহু স্বরে করিছে ঘোষণ।

"রাখি পূরণিমা" আজ তাই কি এ ঘটা?
প্রকৃতি-ভাণ্ডারে এত সৌন্দর্য্যের ছটা?
তাই কি কুসুমদল, হাসিতেছে ঢল্ ঢল্,
কোকিল পাপিয়া তারা ঢালিছে সুধার ধারা,
কুল্ কুল্ তানে নদী ধায় অবিরত,
প্রকৃতি-উৎসবময়ী তাই কিগো এত?

প্রকৃতির আজি এই মহোৎসব সনে,
বাঁধিতে এসেছি "রাখি" সুদৃঢ় বন্ধনে,
আয় বোন্ প্রাণে প্রাণে, মিশে যাই একসনে,
কঠিন সংসারাঘাতে, ভাঙ্গেনা কখন যা'তে
করিব এমন পণ জীবনে মরণে,
মরণেরও পরপারে রব প্রাণে প্রাণে।
ভক্তি প্রীতি স্নেহ ডোরে বাঁধিব যতনে,
কি ছার পার্থিব বস্তু নশ্বর ভুবনে।
ভক্তি প্রীতি, প্রেম দিলে, স্নেহ ভালবাসা মিলে,
এ মন্ত্র সাধন করে, যেন যেতে পারি চলে,
(যেন) পার্থিব দেহের সনে ভুলি না কখন,
আয় বোন্ প্রাণে প্রাণে করিব বন্ধন।
চির দিন বেঁধে রেখো তব স্নেহ পাশে,
ভুল না কখন, দিদি জীবনেরও শেষে;
ছোট এ বোনের পরে, দিও দিদি স্নেহ ঢেলে,
সবার উপরে যিনি, আছেন অন্তরযামী,
শুভাশীষ আজ তিনি করুন্ বিধান,
চির-স্নেহে বাঁধা থাক্ আমাদের প্রাণ।

৫ই ভাদ্র ১৩০৬ } আপনার স্নেহের ভগিনী
বিরাজমোহিনী বসু।
মেদিনীপুর।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

শারদীয় পূজা সমাগত। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এ সময় স্মরণপূর্ব্বক বামাবোধিনীর দেয় মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা নিতান্ত উপকৃত হইব বলা বাহুল্য। বামাবোধিনীর জীবন রক্ষা ও উন্নতির জন্য ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী সকল মহোদয় ও মহোদয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ১৩০৬, ১লা আশ্বিন। } শ্রীপ্রিয়নাথ সরকার, প্রঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 418-19. November, December, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪১৮-১৯ সংখ্যা। } কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। { ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে ৬৬ সাংবৎসরিক স্মরণার্থ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। রেবরেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়ম্‌স সভাপতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেন এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু আনন্দমোহন বসু, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, মৌলবী কাসিম ও বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সভার আরম্ভে ও শেষে রাজার রচিত দুইটী সংগীত গীত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং বিলাতেও এই উপলক্ষে উপাসনা বক্তৃতাদি হইয়াছে।

বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—জজ্ কে, এন্ রায়ের ২য় পুত্র যতীন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কয়েকটী বাঙ্গালী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধ্যভারতে নূতন আয়োপায়—এ প্রদেশে অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে, এতকাল তাহা হইতে তাড়ী প্রস্তুত হইত। বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম এর উদ্যোগে এই সকল খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে উত্তম গুড় প্রস্তুত হইতেছে। ৫০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া এই গুড়ের একটী কারবার খুলিবার সূচনা হইয়াছে।

শান্তি সমাচার—ইউরোপের শান্তি-সমিতির ম্যাডাম সেলেঙ্কা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তার জন্য ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত যোগদানার্থ ভারত-

মহিলাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। বঙ্গ রমণীরা আর কিছু না পারুন, ভগবানের নিকট এই মহৎ উদ্দেশে প্রার্থনা করুন্‌।

ট্রান্সভাল যুদ্ধ—ইংরাজদিগের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদিগের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ জন্য অকালে পার্লেমেণ্টের বোধন হইয়াছে।

খণ্ডপ্রলয়—(১) গত ২৪এ সেপ্টেম্বর দার্জিলিঙে অতিবৃষ্টি হেতু পাহাড়ের কতক অংশ ধসিয়া যায়, তাহাতে প্রায় ৫০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। (২) এই সময়ে জলস্রোতে ভাগলপুর অঞ্চলের ৩০টীর অধিক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় দুই হাজার মনুষ্য ও অসংখ্য গো মহিষাদি বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) প্রশান্ত মহাসাগরে ভূমিকম্পে এক দ্বীপ জলমগ্ন হওয়াতে প্রায় ৪০০০ লোক মারা গিয়াছে।

মৃত্যু—মহারাজা সার্‌ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গুণবতী ভার্য্যা পরলোকগতা হইয়াছেন। ইনি রাজপ্রাসাদের রাজলক্ষ্মী ছিলেন।

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন—নগরবাসীদিগের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন ইংরাজরাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতবাসীদিগকে যে আত্মশাসনের অধিকার দিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাহার বিলোপ হইল।

ড্রেফোঁর মুক্তি—ফরাসীদিগের বিচারে কাপ্তেন ড্রেফোঁ কারারুদ্ধ হওয়াতে সভ্য জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল এবং পারিসে বিংশ শতাব্দীর সমাগম স্মরণার্থ যে মহোদ্যোগ হইতেছিল, তাহা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ড্রেফোঁর মুক্তিতে সে আশঙ্কা ঘুচিয়াছে।

অনাথাশ্রমের উন্নতি—কলিকাতা অনাথাশ্রম সার্কুলার রোডের পার্শ্বে গৃহনির্ম্মাণার্থ ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়াছেন, এ সংবাদে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

পারসিক দাতব্য—১৪ই সেপ্টেম্বর পারসিদিগের বর্ষশেষ দিনে তাঁহারা দাতব্য কার্য্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সমাজের জে, এন, টাটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একাই ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

রাজহত্যা—সেণ্ট ডোমিঙ্গ দ্বীপের প্রেসিডেণ্ট হেনরোজ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন।

অদ্ভুত বৃষ—মিহির ও সুধাকর লিখিয়াছেন—ত্রিপুরার এক কৈবর্ত্তের বাটীতে একটী বৃষ আছে, তাহার চক্ষু তিনটী, তিনটী চক্ষুতেই দৃষ্টি আছে। বৃষটীর গঠন বেশ সুন্দর।

ভূমিকম্প—গত ৯ই আশ্বিন মসুরি পাহাড়ে ভূমিকম্প হয়। কম্পন প্রায় দশ সেকেণ্ড ছিল।

লেডি উড্‌বরণের সদাশয়তা—দার্জ্জিলিং দুর্ঘটনায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় ভগ্ন হওয়াতে তাহার ৬০টী ছাত্রীকে তিনি আপনার রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়াছেন।

লোকসংখ্যা গণনা—আগামী ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে নূতন লোকসংখ্যা গণনা হইবে।

নিগ্রোশিশুর বর্ণ পরিবর্ত্তন—নিগ্রো শিশু জন্মের সময় ঈষৎ শুভ্রবর্ণ হয়, ১ মাস পরে পীতবর্ণ, এক বৎসর পরে ধূসরবর্ণ এবং ৬ বৎসর পরে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

প্রাচীন বৃক্ষ—ব্রহ্মদেশের "ভূ" নামক বৃক্ষটীর বয়ঃক্রম ২০০০ বৎসর। ইহার অপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ দেখা যায় না।

ফল সংরক্ষণ—কাঁটাল ঘিয়ে ভাজিয়া রাখিলে এক বৎসর কাল অবিকৃত থাকে, ইহার স্বাভাবিক সুস্বাদেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। কাঁচা আম্র খাঁটি সরিষার তৈলে ডুবাইয়া রাখিলেও অনেক দিন অবিকৃত থাকে।

বালক অপরাধীর বিচার—আমেরিকার নিউইয়র্ক ব্যবস্থা সমাজ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের অপরাধের বিচার করিবার জন্য একটী ভিন্ন আদালত হইবে। তাহাতে রমণীগণ বিচারকের পদে নিযুক্তা হইবেন। তদর্থে বিবাহিতা ও সন্তানবতী রমণীদিগেরই আবেদন গৃহীত হইবে। ছেলের মাঁর মত আর কেহ ছোট ছোট ছেলেদিগের দোষগুণ বিচার ও শাসন করিতে পারে না।

সাবানের খনি—ব্রিটিস্‌ কলম্বিয়ার অন্তর্গত য়্যাসক্রেপ্টে একটী সাবানের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় একটী প্রাকৃত হ্রদ আছে, সোরা ও সোডায় (ক্ষারে) তাহার জল মিশ্রিত ও ঘনীভূত হইয়া হ্রদের তলদেশে ও পার্শ্বে জমাট বান্ধিয়া আছে। তাহা করাতের দ্বারা বরফের মত থান থান করিয়া চিরিয়া লওয়া হয় এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা স্বাভাবিক সাবান।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়।

পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক একখানি গাথাপুস্তক আছে, তাহার নাম "থারিগাথা"। ইহাতে ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রচয়িত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর হইলেও রাজবংশীয় ও সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেক মহিলারও নাম দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই বুদ্ধদেবের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহারাই ভারতের প্রথম সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুকিণী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। পুরাণে বেদবতী, জটিলা, শবরী প্রভৃতি তপস্বিনীদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎকালে যে দলবদ্ধ

সন্ন্যাসিনী বা সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় বলিয়া একটী স্বতন্ত্র সাধ্বী ও ধার্ম্মিকা সমাজ ছিল, এরূপ বোধ হয় না। মহাত্মা বুদ্ধদেবই প্রথম এরূপ ধার্ম্মিকাসমাজের প্রবর্ত্তক। যখন রাজা, রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐহিকের সুখ ও সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের পত্নী ও কন্যাগণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে কেন না বিচরণ করিবেন? শাক্যবংশীয়া রাজকন্যা প্রজাবতী স্বয়ং উদ্‌যুক্ত হইয়া প্রথম আপনার মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং পীত বসন পরিধান করিয়া বুদ্ধদেবের চরণতলে উপবিষ্টা হইয়া ভিক্ষুকিণী (বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী) সম্প্রদায় সৃজনের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনিই ভিক্ষুকিণী সম্প্রদায়ের অগ্রণী। তাঁহার দৃষ্টান্তে শীঘ্রই অনেক ধার্ম্মিকা রমণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, তদ্দ্বারা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয়। বলা বাহুল্য যে প্রস্তাবিত গাথা পুস্তকখানি এই সকল ধার্ম্মিকা রমণী কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের কয়েকটীর নাম গাথায় ভণিত আছে। যথা, পূর্ণা, তিশ্যা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, ধর্ম্মদীনা, বিশাখা, সুমনা, জয়ন্তী, অর্দ্ধকাশী, চিত্রা, অভয়মাতা, পদ্মাবতী, শ্যামা, সমা, কপিতানী, নন্দা, মিত্রকালী, শকুলা, স্বর্ণ, চন্দ্রা, সুজাতা, ঈশীদাসী, সুন্দরী ও রোহিণী। ধর্ম্মদীনা সমা, ঈশীদাসী বা ঐশীদাসী নামগুলি দীক্ষা-নাম বলিয়া বোধ হয়।

কাশ্মীরি সাল।

পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই কাশ্মীরি সাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহার ইতিহাস ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছেন। কথিত আছে যে কাশ্মীরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা মনালাল উদ্দিন ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক হইতে বয়নকারীদিগকে আনিয়া প্রথম সাল প্রস্তুত করান। কাহারও মতে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে উত্তরদেশস্থ হেয়ার কুণ্ড জনপদ হইতে বয়নকারীরা আনীত হয়। বাস্তবিক মোগলদিগের অধীনেই সালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। একদা ১৬০০০ ষোড়শ সহস্র তাঁত কেবল সাল বয়ন করিত, এক্ষণে ২০০০ সহস্রেরও ন্যূন দৃষ্ট হয়। দিন দিন সংখ্যা হ্রাসই হইতেছে, বিশেষতঃ অমৃতসরে অল্প মূল্যের সাল প্রস্তুত হওয়াতে কাশ্মীর সালের আদরও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অমৃতসরের সাল কাশ্মীরের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী। আবার পারিসে ও পেইজ্‌লিতে নকল সাল প্রস্তুত হওয়াতে প্রকৃত সাল ব্যবসায়িগণের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস কাশ্মীরের ছাগলের লম্বা লম্বা লোমে কাশ্মীরি সাল প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। তীব্বতদেশীয় ছাগল হইতেই সাল প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় ছাগলের শরীর লম্বা ও খর্ব্ব দুই প্রকার লোমে আবৃত। বিশ্বপিতা ইহাদিগকে তত্রত্য অতিশয় শীত ও তুষার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিগুণ ঘন পরিচ্ছদ দিয়াছেন। লম্বা লম্বা লোমের নিম্নেই সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্রের ন্যায় পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সূক্ষ্ম ও কোমল পশমেই সাল প্রস্তুত হয়। একটা প্রমাণ ছাগল হইতে বর্ষে বর্ষে অনধিক দেড়ছটাক পরিমিত এইরূপ পশম পাওয়া যায়। তীব্বতের প্রধান প্রদেশ ল্যাডাক হইতে এই পশম আনীত হয় এবং তাহা কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত ও নানা রঙে রঞ্জিত করা হয়। শুভ্র পশম কাশ্মীরে ৪৫ টাকায় সের বিক্রয় হইয়া থাকে, রঞ্জিত পশমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। পশম কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহা স্রোতের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, তদ্দ্বারা সূত্র দৃঢ় হয়, তাহাতে অনায়াসে বয়ন করা যায়। বয়নের পরও সালকে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিতে হয়। স্রোতের যে অংশ উলার হ্রদ ও দ্রাগুণক্লড গেটের মধ্যে প্রবাহিত, তাহার জল অতি নির্ম্মল, সুতরাং তাহাতেই সাল ধৌত হইয়া থাকে। ধুইয়া হাওয়ায় শুষ্ক করা হয়, নতুবা রৌদ্রে বিবর্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বার ধৌত করিয়াও এই প্রকারে শুষ্ক করিতে হয়। তৃতীয় বা শেষ বারে কাচিয়া তাহার উপর মুদ্রাঙ্কন চিহ্ন দিয়া তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। সাল সচরাচর তিন প্রকারের হয়। ১ম বিধ অত্যন্ত লঘু ও কোমল অরঞ্জিত পশমে বয়ন করে। ২য় বিধ সাদা ও কাল স্বাভাবিক বর্ণের পশমে বয়ন করা হয় এবং তৃতীয় বিধ দীর্ঘাকারে কার্পেটের ন্যায় বৈঠকখানায় পাতিবার জন্য নির্ম্মিত প্রায় যোড়া যোড়া প্রস্তুত হয়। একটু একটু করিয়া বুনিয়া শেষে যোড় দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা এমন কৌশলে প্রস্তুত হয় যে যোড় অনুভূত হয় না। কাষ্ঠের মাকুতে বয়ন হয় এবং প্রত্যেক রঙের পৃথক্ পৃথক্ মাকু প্রস্তুত থাকে। এক যোড়া উৎকৃষ্ট প্রমাণ সাল প্রস্তুত করিতে প্রায় এক বৎসর লাগে এবং তিন চারি জন তাঁতির সাহায্য আবশ্যক করে। এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করা আবশ্যক, কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আরও দুইমাস কাল বিলম্ব হয়। শেষে রাজা বা রাজপুরুষদিগকে পরিদর্শনের জন্য অর্পিত হয়। সাল প্রস্তুত রাজার কর্ত্তৃত্বাধীন, প্রত্যেক যোড়ার উপর উপযুক্ত কর অবধারিত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্যও বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

পুণ্যাশ্রম।

"শান্তি সুখ চাহ যদি সেই আনন্দ
ধামে চল"।

১

প্রিয়ঙ্গুলতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। বালিকার গায়ের রঙ উজ্জল শ্যাম, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত ও করুণ। বালিকার অবেণীবদ্ধ আলুলায়িত চুলের মধ্যে গোলাপ কলিকা সদৃশ মুখখানির সৌন্দর্য্য অতি মধুর। সে মুখথানি শৈশবের প্রফুল্লভাবশূন্য, তাহা কেমন যেন একটু বিমর্ষ ভাবে ম্লান। বালিকার চেহারাটি যেমন সুন্দর, চরিত্রটি আবার ততোধিক সুন্দর; কিন্তু অদৃষ্টটি বড় মন্দ। সে দেড় বৎসরের সময় মাতৃহীনা হয়। পঞ্চম বৎসরের সময় তার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতা তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন, সে তখন তাহা ভাল বুঝিত না। কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারে পিতা মরিয়াছেন, যে মরে সে আর ফিরে আসে না। একটি খুল্লতাত ব্যতীত সংসারের মধ্যে অভাগিনীকে ভাল বাসিবার আর কেহ নাই।

২

প্রিয়ঙ্গুলতার পিতা হরগোপাল কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। প্রিয়ঙ্গুলতার খুল্লতাত হরিগোপাল সামান্য বেতনের একটি চাকরী করিতেন, তাহাতেই পরিবার প্রতিপালন হইত।

কদম্বকালী হরিগোপালের পত্নী। সে হরগোপালের স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পারিত না। হরগোপাল সপরিবারে হরিগোপালের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিত, এই কদম্বকালীর ক্রোধের প্রধান কারণ।

পিতা মাতা বর্ত্তমানেই প্রিয়ঙ্গুলতাকে কদম্বকালী ভাল বাসিত না, পিতা মাতার অভাবে সে তাহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। যখন কদম্বকালীর অনাদর উপেক্ষায় সরলা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িত, বিষাদময়ী সন্ধ্যাদেবীর শিশির বর্ষণের ন্যায় বালিকার নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িত, তখন হরিগোপালের অকৃত্রিম স্নেহই তাহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল হইত।

পক্ষী যেমন রৌদ্র বৃষ্টি হইতে পাখার ভিতর লুকাইয়া শাবকটিকে রক্ষা করে, হরি গোপাল সেইরূপেই নির্দ্দয়হৃদয়া স্ত্রীর গর্জন প্রহার হইতে সেই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হায়! "অভাগীর চিরদুঃখ লিখেছে বিধাতা"! দেখিতে দেখিতে হরি গোপালেরও কাল পূর্ণ হইল, এক অজানা রাজ্য হইতে তলপের উপর তলপ আসিতে লাগিল, তিনি সংসারের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। প্রিয়ঙ্গুলতার সব ফুরাইল। খুড়ো মহাশয়ের অভাবে তাঁহার সংসারটা যেন বসন্তান্তে কুসুমোদ্যানের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৩

হরিগোপালের মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার বিধবা পত্নী কদম্বকালী ঘড়াটা, ঘটিটা, বাটীটা সব নিয়ে থুয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করিল। একটা আপদ আছে বটে, কিন্তু কিছুতেই সে সেটাকে সঙ্গে নিবে না, পরের জন্য অত টাকা ব্যয় করা কি তার মত গরিব লোকের কাজ? এক দিন সে কণ্ঠ পঞ্চমে তুলিয়া হাঁকিল, "পিরি, ও পিরি"!

প্রিয়ঙ্গুলতা বেগুন ভাতে ভাত রাঁধিতেছিল। বজ্রনিনাদ তুল্য স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বালিকা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কাকীমার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। জজের নিকট খুনি আসামী যেমন ভাবে দাঁড়ায়, প্রিয়ঙ্গুলতা তেমনি ভাবে ভয়ে ভয়ে আসিয়া কাকীমার নিকট দাঁড়াইল।

কদম্বকালী কহিল "তোর খুড়ো মরে গেছেন, এখন তোকে কে খেতে দিবে?"

প্রিয়। কেন তুমি।

কদম্বকালী। তোরে আমি চিরদিন কোথা থেকে খেতে দিব?

প্রিয়ঙ্গুলতা। কেন ঐ ঘর থেকে। (সে প্রবালোপম হস্ত উত্তোলন করিয়া পাকশালা দেখাইয়া দিল)।

কদম্বকালী। নেকী আর কি, আমি কাল বাপের বাড়ী চলে যাব, তুই পড়ে থাকিস্।

প্রিয়ঙ্গুলতা। কাকী মা, আমি একা কেমন করিয়া থাকিব?

কদম্বকালী। কে[illegible], পারিবি না কেন?

প্রিয়ঙ্গুলতা। আ[illegible] ভয় করবে যে।

কদম্বকালী। যার খেতে দিতে দুনিয়ায় কেউ নেই, তার আবার একা থাকৃতে ভয় কি লা?

প্রিয়ঙ্গুলতা। কেন তুমি বলেছ ঐ তাল গাছটাতে ভূত আছে, তা আমার কি ভয় হয় না?

কদম্বকালী দেখিলেন যে, সে হাবা মেয়েটাকে মনোগত অভিপ্রায় বুঝান অসাধ্য। তখন সে সংহারকালীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল "যা অধঃপাতে যা, চুলোয় যা। আমি কাল এখানে কিছুতেই থাক্‌ছি না, তোর এই বাড়ীর শুনো ভিটের উপর পড়ে মর্‌তে হবে।"

দুই তিন দিন পরে কদম্বকালী বাপের বাড়ী রওনা হইল। ঘরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সব আত্মসাৎ করিল। ঘর দুখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। প্রিয়ঙ্গুলতাকে সঙ্গে না লওয়ারই তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদিগের কোঁদলে এবং অনুরোধে এ যাত্রা প্রিয়ঙ্গুলতাকে সঙ্গে লইতেই হইল। বলা বাহুল্য যে প্রিয়ঙ্গুলতা কদম্বকালীর পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয় লইল।

শ্রীমঙ্গলপুর গ্রামে কদম্বকালীর বাপের বাড়ী। দুঃখের বিষয় কদম্বকালীর সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার ও তাহার লোল-রসনা-নির্গত মধুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য তাহার পিতামাতা কেহই জীবিত ছিলেন না। কদম্বকালীর

দুই ভ্রাতা আছে, তাহাদের নাম ধড়াচূড়া ও ননীচোরা। সুনন্দা ও পদ্মগন্ধা নামে দুজনার দুটি বধূ রত্ন ঘর অগ্নিময়, সুতরাং আলোময় করিত। শুধু ঘর আলো করিয়াই তাহারা ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে আবার গ্রাম শুদ্ধ আলোময় করিয়া তুলিত। ফল কথা তাহারা যে উপযুক্ত ননদিনীর উপযুক্ত ভ্রাতৃবধূ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত কদম্বকালীর একটি বালিকা ভগ্নী আছে, তাহার নাম কৃষ্ণকালী। প্রদীপ নামে একটি বালক সে গৃহে অবস্থান করে, সম্বন্ধে সে কদম্বকালীর বোনপোয়া। প্রিয়ঙ্গুলতা এ গৃহে আসিয়া আর কিছু পাউক আর না পাউক, পাইল এই দুটি সমবয়সী, কিন্তু কৃষ্ণকালীর স্বভাবে সে সময় সময় বড় জ্বালাতন হইত।

প্রিয়ঙ্গুলতা রাত্রে প্রদীপের কাছে লেখা পড়া করে, প্রদীপের স্থির চরিত্রে সে বড় সন্তুষ্ট। প্রিয়ঙ্গুলতা ভাবিয়াছিল এ জগতে তাহাকে ভাল বাসিবার আর কেহ নাই, কিন্তু প্রদীপকে পাইয়া তাহার সে বিশ্বাস কিছু দূর হইল। সে বুঝিল প্রদীপ তাহাকে ভাল বাসে। যদিও প্রদীপ তাহার আপনার পড়া শুনা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রিয়ঙ্গুলতার সঙ্গে খেলিতে বা মিলিতে বড় একটা আসে না, তথাপি প্রিয়ঙ্গুলতা বুঝিতে পারিল প্রদীপ তাহাকে বড় স্নেহ করে।

কৃষ্ণকালী শৈশব হইতেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অপার গুণাবলীতে ভূষিত হইতেছে। বাল্যকাল হইতেই নানারূপ কলঙ্ক-কালিমায় তাহার চরিত্রটি কুৎসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অতি সরল ভাবে প্রিয়ঙ্গুলতার সঙ্গে আসিয়া মেশে, পরে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে। চুল বাঁধিবার ফিতেটি, পরিধেয় ধুতি খানা চুরি করিয়া লয়। কদম্বকালী প্রিয়ঙ্গুলতাকে অসাবধান মনে করিয়া অযথা তিরস্কার করিয়া থাকে ও আর ফিতে বা ধুতি তাকে কিনিয়া দেয় না। কৃষ্ণকালী অন্য কোনও কাজ বড় করে না, কিন্তু দিদির কাছে নির্দ্দোষ প্রিয়ঙ্গুলতার নিন্দা করিতে সে বড় তৎপর। সত্যেতে মিথ্যাতে মিশাইয়া তিলকে তালে পরিণত করিয়া সে প্রিয়ঙ্গুলতার নামে দিদির কাছে লাগায়। আর দিদিরত কথাই নাই; সেত তাহাই চায়—বৌদিগকে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সে প্রিয়ঙ্গুলতার উপর সকল রাগ ঝাড়িয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচে। যখন কদম্বকালী "চুলোমুখী, পোড়ামুখী, ছারকপালী" ইত্যাদি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, তখন প্রিয়ঙ্গুলতা কোন কথাই বলে না—অশ্রু-ভারাক্রান্ত নেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র।

দুই এক বৎসরের মধ্যে প্রিয়ঙ্গুলতা বেশ বুঝিল যে কৃষ্ণকালী তাহাকে ভাল বাসে না, বরং সে তাহার প্রধান শত্রু। প্রিয়ঙ্গুলতা অতি সরলস্বভাবা ও ধীর চরিত্রের বালিকা, সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করে। প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা কহে না। ময়লা কাপড় খানি সাবান দিয়া পরিষ্কার

করিয়া লয়। তাহার গুণে সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিল। কৃষ্ণকালীর এ সব গুণ কিছুই ছিল না, বরঞ্চ সে সুযোগ পাইলে সকলেরই দ্রব্য চুরি করিত। মিথ্যা কথা বলিতে তাহার মুখে বাধিত না। গুরুজনের অবাধ্যাচরণ তাহার স্বভাব, অকারণে সকলের সঙ্গে কলহ এবং দাস দাসীকে তিরস্কার করা তাহার চির অভ্যাস। এই সব কারণে গ্রামের লোক কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। সকলেই পিরিকে ভালবাসে, ভাল বলে, আর কৃষ্ণকালীকে নিন্দা করে, কি আপদ! কদম্বকালীর দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না! কেন সে অমন দুষমনটাকে ঘরে আনিয়াছিল, তখন সেই চিন্তা তার পরিতাপের কারণ হইল। পূর্ব্বেই প্রিয়ঙ্গুলতা কদ[illegible]লীর দুই চক্ষের বিষ ছিল, এই সব কারণে বিষটা আবার ভাল রকম পাকিয়া উঠিল। ইহারই প্রভাবে প্রিয়ঙ্গুলতার যে কত দূর কষ্ট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত—ভোজনে অর্দ্ধপেট, পিধনে শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন, শয়নে ভূমিশয্যা, তৈল বিহনে ঘন[illegible]কেশ জটাবদ্ধ, অল্পাহারে কোমলাঙ্গ কৃশ হইতে লাগিল। কিন্তু প্রিয়ঙ্গুলতার তাহাতে কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। সে ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষ থাকিয়া মনের শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। প্রদীপ তাহাকে গান শিখাইয়াছিল, মনের কষ্ট নিবারণের জন্য সে সময় সময় গুণ গুণ করিয়া গাইত।

(ক্রমশঃ)

নর-দেবতা।

(ঋষিপ্রতিম পুণ্যাত্মা, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে লিখিত)

১

আমি দেখিয়াছি এক মানব-দেবতা,
বিশুভ্র ঋষির মূর্ত্তি,
হৃদয়ে যুবার স্ফূর্ত্তি,
ঢেকেছে উদ্যম কর্ম্মে স্থবির-জড়তা!
আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা।

২

আমি দেখিয়াছি এক মানব-দেবতা,
দেখিয়াছি নিরজনে
শান্তিময় তপোবনে,
যোগে নিমগন তিনি, যোগেশ্বর যথা!
আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা!

৩

দেখিয়াছি দেবপুরে, সে নর-দেবতা—
অপরূপ দেবপুর
শান্তি রসে ভর পূর,
প্রকৃতিরো প্রাণভরা ভক্তি-মধুরতা!
দেখিয়াছি সেথা এক মানব-দেবতা।

৪

দেখিয়াছি দেবপুরে সে নর-দেবতা—
জগতের মাটী ধূলা,
আপদ জঞ্জাল গুলা,

ছ, তা
নাহি সেথা, আ... শুধু শান্তি পবিত্রতা।
পুনঃ
দেখিয়াছি সেই খানে সে নর-দেবতা।

৫

শুনেছি সে ইতিহাস—স্বর্গীয় বারতা,
দ্বাপর কলির কাল,
হয়ে গেছে অন্তরাল,
পুনঃ পুণ্য সত্যযুগ বিরাজিছে তথা,
(মানবত্ব ঘুচি তাই হয়েছে দেবতা)!

৬

আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা,
মূর্ত্তিমান জ্ঞান ধর্ম্ম,
দিবা নিশা "দশকর্ম্ম"
অথচ মাখানো মুখে শিশু-সরলতা!
দেখিয়াছি সত্যব্রত, মানব-দেবতা!

৭

আমি দেখিয়াছি তিনি মানব-দেবতা,
ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয়,
জিত-আত্মা, সত্য-প্রিয়,
মর্ম্মতল পরিপূর্ণ পরার্থ-পরতা!
মহাসাধনায় সিদ্ধ, লভি অমরতা!

৮

দেখিয়াছি দেবপুরে সে নর-দেবতা—
স্বরগ-বাতাস তাঁর
পরশিলে একবার
মানব ভুলিয়া যায় হীনতা নীচতা!
দেখিয়াছি পুণ্যময় সে নর-দেবতা।

৯

দেখিয়াছি একদিন—আজো আছে মনে,
(দেখিলে সে পুণ্যময়,
থাকে না সঙ্কোচ ভয়,
ক্ষুদ্রতা থাকে না লুকি মরমের কোণে)
সে স্নেহ, আদর আহা!—
মানুষে কি পারে তাহা
অনা'সে বিলায়ে দিতে পান্থজনগণে?
দেখিয়াছি সেই ঋষি রাজনারায়ণে!

১০

আজি শুনিলাম, তিনি ত্যজি ধরাতল—
আঁধারি সে দেবপুর
সবে করি শোকাতুর,
বঙ্গের সে রত্নমণি সতত উজ্জ্বল,
পরিহরি দেবঘর,
উন্নতির শেষ স্তর
গেছেন বৈকুণ্ঠধামে, দেব-লীলা-স্থল!
পবিত্র পদাঙ্ক তাঁর
বক্ষে আছে বসুধার,
আর আছে যশঃ কীর্ত্তি পূত নিরমল।
দেবতা স্বরগে যাবে
নরে কেন শোক পাবে,
ভিজাবে নয়ন জলে কেন ধরাতল?
তিনি যা গেছেন রেখে,
সেই সব দেখে দেখে
আপনা গড়িবে বঙ্গ, বুকে করে বল!
তাঁহারি আদর্শে সবে
উন্নত মহত হবে,
তা হলে আশীষ তাঁর হইবে সফল!
আজিকার শোক রাশি,
আনন্দে মিশিবে ভাসি,
জগত পূজিবে তাঁর চরণ কমল!—
আমরা শিখিব—বিশ্বে সকলি মঙ্গল!

লেখিকা শ্রী মা—

শ্বাস প্রশ্বাস।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর। বায়ুমণ্ডলে যথোপযুক্ত প্রাণবায়ুর * (Oxygen) ভাগ থাকিলে তাহাতেই নিদ্রা যাইবে ও সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। বায়ুমণ্ডল ভারী ও অবিশুদ্ধ হইলে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু শুদ্ধ করিয়া লইবে। সচরাচর শ্বাস গ্রাণের সময় ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রতি মিনিটে চৌদ্দ পাইণ্ট বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহার মধ্যে তিন পাইণ্ট পরিমাণে প্রাণবায়ু থাকে। কিন্তু সাতসহস্র পদ উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে তথায় এই চৌদ্দ পাইণ্ট বায়ুর মধ্যে কেবল দেড় পাইণ্ট প্রাণবায়ু থাকে। তিন পাইণ্ট প্রাণবায়ু না থাকিলে শরীরস্থ রক্ত বিশোধিত হয় না; প্রত্যুত্তঃ শীঘ্র শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে, বুক ধড়ফড় করে, এবং জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইয়া আইসে। সেই জন্য এখানে শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ আবশ্যক। নিম্ন দেশে যে সময়ে একবার শ্বাস গ্রহণ করিলে চলে, এইরূপ উচ্চ দেশে সেই সময়ের জন্য দুইবার শ্বাস লইতে হয়। তাহা হইলেই তিন পাইণ্ট প্রাণবায়ু সঞ্চয় হয়। বাড়ীতে বসিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে পরিমিত ব্যায়ামেরও আবশ্যক হয় না। এই কারণেই আমরা কখন কখন ক্রমাগত দ্বাদশ ঘণ্টার অধিক কালও মানসিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষণকাল বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করিলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি—অধিক পরিশ্রম-জনিত অবসাদও অনুভব করি না।

শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ দ্বারা সর্দ্দী, কাশী, গলায় ঘা, শিরঃপীড়া, দন্তশূল প্রভৃতি অনেক পীড়া আরোগ্য হয়। রাত্রিতে অনিদ্রা হইলে এবং শয্যাকণ্টকের ন্যায় অস্থিরতা ও যন্ত্রণা হইলে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিবে, গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিবে, এবং শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ করিবে। দুই তিন মিনিট কাল এইরূপ শ্বাস গ্রহণ দ্বারা শীঘ্র নিদ্রা আসিয়া থাকে, এবং সমস্ত গ্লানি দূর হয়।

* বায়ুর মধ্যে প্রায় সিকি ভাগ প্রাণবায়ু বা অম্লজান, অবশিষ্ট প্রায় বারো আনা নাইট্রোজন বা যবক্ষারজান, আবার অঙ্গারজান সামান্য পরিমাণে থাকে, তাহা যত অধিক হয়, বায়ু তত অস্বাস্থ্যকর ও প্রাণনাশক হয়।

পৃথিবীর ক্ষয়।

'কলি অবসানে এককালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবে অথবা কোটি কোটি প্রস্রবণ উন্মুক্ত মুখে ভূভাগ কবলিত করিবে' আমরা এরূপ শুনিয়া

সূচনা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে চাহি না। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহারা হয় ত গত দুই বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আশু ধ্বংসের কথা বা প্রলয়োপপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণের কথা অনেক বার পাঠ করিয়াছেন। আজি একজন মহা পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিলেন যে পৃথিবী ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটতর হইতেছে, তজ্জন্যই এত উত্তাপ, পৃথিবীর নিজের আকর্ষণী শক্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে, সুতরাং শীঘ্রই সৌরাকর্ষণে উদ্ধৃত হইয়া প্রজ্বলিত সূর্য্যকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইবে। কল্য আবার একজন মহা-মহোপাধ্যায় বলিলেন যে পৃথিবী ক্রমশঃই মগ্ন হইতেছে। যে সকল স্থল পূর্ব্বে জল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল, এখন তাহা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমরা শেষোক্ত মতের সপক্ষে অনেক প্রমাণও দেখিতে পাই; কিন্তু স্থল কমিতেছে ও জল বাড়িতেছে, ইহাতে পৃথিবী কিরূপে হ্রাস হইতেছে তাহাত বুঝিতে পারি না। পৃথিবী কি জলস্থলময়ী নহে? এক স্থানে জলবৃদ্ধি হইয়া ভূমি জলমগ্ন হইলে অপর স্থানে ভূমি বৃদ্ধি হইয়া কি জল হ্রাস হয় না? ইউরোপীয় ভূবেত্তারা বলেন যে বল্‌টিক ও নিকটস্থ সমুদ্র ও তাহাদের উপকূলস্থ স্থান সকল এককালে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অংশ বা গর্ভস্থিত ছিল, কিন্তু এখন তাহা ভূ-ভাগে পরিণত হইয়াছে; এবং অতলান্তিক নামে একটী মহাদেশও ছিল; তাহা সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। আরিস্‌টটল, প্লিনি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মগ্ন ভূ-খণ্ডের শেষ অংশ দর্শন করিয়াছেন লিখিয়া গিয়াছেন। অধুনা অনেকে অনুমান করেন যে ইউরোপ খণ্ড ক্রমশঃ মগ্ন হইতেছে। বিখ্যাত নাবিকেরা সমুদ্র পথে ভূ-বেষ্টন করিয়া গণিতের সহায়তায় প্রকাশ করিতেছেন যে গত ৪০০ চারিশত বর্ষের মধ্যে পৃথিবী প্রায় একবিংশতি গুণ সঙ্কুচিত হইয়াছে অর্থাৎ ভূভাগের বিস্তৃতি এখন যত আছে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তাহার একুশ গুণ অধিক ছিল। সিংহলের প্রাচীন ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে, যে রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কার অর্দ্ধভাগ জলমগ্ন হয়। বঙ্গের রাজপুত্র বিজয় যখন সিংহল অধিকার করেন, তখনও লঙ্কার বিস্তার ৫৮ যোজন ছিল; সে আজি চতুর্ব্বিংশতি শতাবর্ষের কথা। আজি সিংহল কত ক্ষুদ্র! কিন্তু মহাসাগরের গর্ভে কোথাও কি বৃহৎ অজ্ঞাত ভূখণ্ড নাই? একজন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রে বরফরাশি জমাট হইয়া এত উচ্চ হইয়াছে যে তাহা গলিলে আর একটী জলপ্লাবন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বরফ না গলিয়া কোন অলক্ষিত নিয়মে কি ভূমিভাগে পরিণত হইতে পারে না? আমরা ভূতত্ত্ব ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকট ইহার সদুত্তর প্রার্থনা করি।

সুন্দরীর মেলা।

উন্নতি সভ্যতার পরিচায়ক। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতি তত সভ্য। কিন্তু মানব ভ্রম-প্রবণ, সে বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে যত কেন উন্নত হউক না, তাহার যে সকল কার্য্যই অভ্রান্ত বা সুনীতি-অনুমোদিত হইবে এমন আশা করা যায় না। অধুনা আমেরিকা ও ইউরোপ নব সভ্যতার বিশালক্ষেত্র। তত্রত্য উন্নতচেতা জনগণ শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যেরূপ যত্নবান্, সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে ও সংস্কারকার্য্যেও সেইরূপ উদ্যমশীল। মনুষ্য স্বাধীন, ইহা সর্ব্বজনীন সভ্যতানুমোদিত একটী পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত। স্ত্রীলোকেরাও মনুষ্য, ইহা উত্তরপক্ষ। সুতরাং স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন সহজেই এই মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যে দুইটী পৃথক্ বস্তু, ইহা সর্ব্বদা অনুভূত হয় না। স্বাধীন অর্থে আপনার অধীন। জগতের কয়জন লোক আপনাকে অধীনে রাখিতে সমর্থ? নীচ প্রবৃত্তি, ইতর কামনা ও ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিয়া স্বীয় অধীনে আনয়নপূর্ব্বক স্বাধীন হওয়া সহজ কথা নহে। যখন মহা মহা মহর্ষি, তত্ত্বদর্শী, পরমহংস ও যোগীদিগেরও পদস্খলন হইয়া থাকে, তখন অন্য পরের কথা কি? সুতরাং "স্বাধীনতা" কথাটী শাব্দিক মাত্র; এক্ষণে ইহা স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারিতা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রকৃতির বেগে ও স্বেচ্ছাচারের তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া যদি স্বাধীন শব্দে অভিহিত হইতে চাও, তাহা হইলে তুমি স্বাধীন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতাও অনেকটা এই প্রকার। প্রাচীন ভারতললনাগণ স্বাধীন কি অস্বাধীন ছিলেন, পুরাণে তাহার ভূরি বিবরণ বিবৃত আছে। কিন্তু তাঁহারা যে কখনও স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ছিলেন না, ইহা এক প্রকার প্রবচন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীরত্ন সকল সতীত্ববলে দস্যু ও পাষণ্ডগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও সাধারণের কুটিল কটাক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক তাঁহাদিগের এমনি চরিত্র-তেজ ছিল যে অসৎলোকের কুদৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের পবিত্র মুখজ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে পাপাচারীরও সাহস হইত না। তাঁহারা সতীত্ববলে ও চরিত্র তেজে অসঙ্কুচিত মনে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা "স্বাধীন" ছিলেন। কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের অবস্থা কিরূপ? সংবাদ পত্রের পাঠক ও পাঠিকা অবগত আছেন যে সভ্য লোকদিগের মধ্যে বিবাহচ্ছেদের বিবরণ যত দৃষ্ট হয়, বিবাহ সম্বন্ধ বা ঘটনার বিবরণ তত দৃষ্ট হয় না। রমণীরা সংবাদ পত্রে

বিজ্ঞাপন দিয়া বর মনোনয়ন করেন, ইহাও এক প্রকার স্বয়ংবর। কিন্তু যে সংবাদ পত্রে এইরূপ বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সেই সংবাদ পত্রে সেই মনোনীত বরের সহিত বিবাহ ভঙ্গের অভিযোগের বিষয় কি প্রকাশিত হয় না? স্বীকার করি, স্বয়ংবরে অনেক স্থলে বাহ্য সৌন্দর্য্য বিচার করিয়াই বর মনোনীত হইত। কিন্তু যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা হইত, ভারতললনা আজীবন তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী ও সহচরী হইয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতেও অনুমৃতা বা সহমৃতা হইতেন। ভারতের বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে জগৎ আশ্চর্য্য। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ ও আমেরিকা কি তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝেন? মহারাণী ভিক্টোরিয়া পত্যন্তর গ্রহণ না করাতে প্রশংসার্হ হইয়াছেন (বিশেষতঃ ভারতবাসীদিগের নিকটে) সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার মাতা পত্যন্তর গ্রহণ করাতে (ডিউক অব কেণ্টকে বিবাহ করাতে) কি নিন্দনীয় হইয়াছিলেন? সম্রাট্ নেপোলিয়নের পত্নী, অষ্ট্রিয়া রাজপুত্রী ও "অর্দ্ধ জগতের" সাম্রাজ্ঞী হইয়াও ইন্দ্র-তুল্য পতির মৃত্যুর পর একজন সামান্য ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশ ভেদে আচারভেদ বলিয়া আমরা এরূপ আচরণকে উপেক্ষা করিতে পারি; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য ও পবিত্র দাম্পত্য ভাব, তাহা স্বর্গীয় ও পরম পবিত্র বলিয়া আমরা চিরদিন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিব।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব মোগল সম্রাটেরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদিগের আচরিত রীতির প্রতিরোধক নয়, সুতরাং তাঁহারা যে পঞ্চদশ শত বা দুই সহস্র পত্নী ও উপপত্নী পোষণ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু তাঁহারা যে ক্রীতদাসী ও ইতর রমণী-দিগকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া "সুন্দরীর বাজার" বসাইয়া সুন্দরী নারী মনোনীত করিবেন, তাহাও বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাভিমানী উদারচেতা ও উন্নতমনা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (যাঁহারা আপনাদিগকে জগতের সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন) যে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া "সুন্দরীর হাট" বসাইয়া থাকেন, ইহা সামান্য কৌতুকাবহ নহে। কেবল কৌতুকাবহ কেন? ইহা বাস্তবিক ক্ষোভজনক। প্রাচীন গ্রীসেতিহাসে এইরূপ সুন্দরীর মেলার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা বীরপুরুষদিগের উৎসাহ দানের জন্য—দেশের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইত। অবিবাহিতা সুন্দরীদিগের মধ্য হইতে সুন্দরী ও বীর্য্যবতী রমণী-রত্ন মনোনীত করিয়া বীরত্বের পুরস্কার প্রদান করা হইত। কিন্তু এখনকার এই সুন্দরীর মেলার উদ্দেশ্য কি?

পাঠিকারা হয়তো অবগত আছেন ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে বর্ষে বর্ষে এক একটী সুন্দরীর মেলা হইয়া থাকে। স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কেবল ইউরোপের সকল

প্রদেশ হইতে নহে—দূরস্থ সাগর পার আমেরিকা হইতেও প্রসিদ্ধ সুন্দরী ললনা-গণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন। বিচার করিবার জন্য কয়েকজন সুদক্ষ পুরুষ ও বিচক্ষণা রমণীও নিযুক্ত হন। এতদর্থে কয়েকটী পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বিচারকেরা যাহাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পশু প্রদর্শনীতে অশ্ব ও গো প্রভৃতি পশু সকল মেলা স্থলে আনীত হইলে তাহাদিগের পুষ্টি ও সামর্থ্য দৃষ্টে তৎতৎ স্বামীদিগকে উৎসাহ দানার্থ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, এবং কোন কোন পশুকে উচিত মূল্যে ক্রয় করাও হয়। সুন্দরীর প্রদর্শনও কি তদনুরূপ নহে? স্বীয় স্বীয় রূপলাবণ্যের প্রতি বিশেষ যত্নের নিমিত্ত অধিকারিণীকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক কোন কোন সুন্দরী তাহার পত্নীত্বেও গৃহীত হইয়া থাকে। এ বৎসরের মেলায় ইতালি, স্পেন, বেল্‌জিয়ম্ প্রভৃতি ইউরোপের অনেক প্রদেশ হইতে প্রসিদ্ধ সুন্দরীগণ আগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্ত্রী-সমিতিরও অনেকগুলি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী-দিগের মধ্যে ধনী মানী ও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীও ছিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহাঁরা সকলেই বিচারক ও দর্শকদিগের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিয়াছিলেন। পারিসের একটী নাট্যালয়ের অভিনেত্রী উপস্থিত সুন্দরীদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ-সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সুতরাং সেই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জানি না মেলায় অবিবাহিতা কি বিবাহিতা কিম্বা উভয়বিধ স্ত্রীলোকের প্রদর্শন হইয়া থাকে! ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা!!

আমাদিগের বামা-রচনা স্তম্ভ।

বামারচনাস্তম্ভ প্রায়ই পদ্য প্রবন্ধ সকলে শোভিত থাকে। ইহার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে সকল কবিতা আমাদের হস্তগত হয়, তাহার অনেকগুলি এরূপ অসাবধানতা ও অযত্ন পূর্ব্বক লিখিত হয়, যে আমরা কেবল রচয়িত্রীদিগের উৎসাহ প্রবর্দ্ধনার্থই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। আবার অনেক রচনা বাধ্য হইয়া উপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তজ্জন্য আমরা সময়ে সময়ে লেখিকাদের বিরক্তিভাজনও হইয়া থাকি।

কবিতারচনা অতি দুরূহ ব্যাপার। স্বাভাবিক কাব্য শক্তি না থাকিলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। ভাষা জ্ঞান, অলঙ্কার শাস্ত্র বোধ এবং ছন্দ জ্ঞান কাব্য শক্তির পরিবর্দ্ধক ও সংমার্জ্জক। ইহা-দিগের অভাবে কাব্যরচনা অপ্রযত্ন-

স্থলভ স্বাভাবিক কাননের অনুরূপ। স্থানে স্থানে স্থগন্ধি পুষ্পলতার প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই অকর্ম্মণ্য কণ্টকী বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু গুণালঙ্কার-সমন্বিত কবিতা প্রযত্নসেবিত পরিপাটী উদ্যান স্বরূপ। যথা স্থানে সৌন্দর্য্য সকল সজ্জীভূত থাকাতে বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়া থাকে— এমন কি শৃঙ্খলাবিশিষ্ট বলিয়া কণ্টকীবৃক্ষ ও অকর্ম্মণ্য গুল্ম সকলও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভাষার অনেক পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিলে এক প্রকার ভাষা জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র-বোধ সহজে হয় না। বঙ্গ-ভাষায় ব্যাকরণ আছে বটে. কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র নাই বলিলেই হয়, যা দু একখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ, তথাপি তাহার দ্বারা কতকটা কার্য্য চলিতে পারে। আমরা এই অভাব মোচনার্থ বিশেষতঃ আমাদিগের কাব্যরচয়িত্রীদিগের সাহায্যার্থ একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, আশা করি পাঠিকারা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না।

ছন্দ অলঙ্কারের অন্তর্গত। প্রকৃত ছন্দ জ্ঞানাভাবে যে সকল লেখিকা মনঃকল্পিত ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ ছন্দ প্রকরণও প্রকটিত হইল। আশা করি রচয়িত্রীগণ ইহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বীয় স্বীয় রচনার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন।

ছন্দ প্রকরণ।

ছন্দই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। ছন্দ না থাকিলে কবিতা হয় না। ইহার ভাষাও স্বতন্ত্র। নিয়মিত বর্ণনিবদ্ধ ভাষার নাম ছন্দ। ছন্দ নানা স্বরে (সুরে) প্রবন্ধিত। কবিগণই ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা। রস, গুণ অলঙ্কার-সমন্বিত উদাত্ত ও অনুদাত্তাদি স্বর দেশ, কাল ও পাত্রবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া চমৎকারজনক হইয়া থাকে। যে কবি যে উপায় দ্বারা সেই স্বর ও ভাব সহজে প্রকাশ করিতে পারেন, সেই উপায়ই তাঁহার প্রিয় ছন্দ। কাব্য রসের সহিত স্বর জ্ঞান না থাকিলে রচনার বৈচিত্র হয় না। কিন্তু কোন রচনা-বৈচিত্রই কবির লক্ষ্য নহে। স্বভাবতঃ কবি শুদ্ধ স্বর দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। আদি কবিগণের প্রণীত মহা কাব্য সকল তাহার প্রমাণ। বিশুদ্ধ তানলয় ও স্বর যোগে মহাকাব্য সকল উদ্গীত হইত। বাল্মীকির রামায়ণ, হোমরের ইলিয়দ এইরূপ মহাগীতি—মহাকাব্য।

প্রত্যেক মহা কবির স্বতন্ত্র স্বর আছে। এমন কি একজাতীয় ছন্দেও ভিন্ন স্বর * স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে এক পয়ার ছন্দ কত প্রকার স্বরে গঠিত বা গীত হইয়া থাকে। স্বর

* স্বর তিন প্রকার—উদাত্ত বা উচ্চ স্বর, অনুদাত্ত বা নীচৈঃস্বর এবং সরিত বা মধ্যম স্বর।

ও রচনার সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি বিশুদ্ধ নিয়মানুসারে কবিতা রচনা করিতে পারেন, তিনিই উচ্চ শ্রেণীর কবি। ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ভূয়িষ্ঠ পাণ্ডিত্য দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। তিনি অনেক প্রকার নূতন ছন্দও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানু-সারেও কবিতা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত "জাতি" অর্থাৎ অত্রেয় প্রণালী ক্রমে বাঙ্গলা রচনা অতীব দুরূহ ব্যাপার; "বৃত্তছন্দ"ও সহজ নহে। ভারতচন্দ্র ব্যতীত কেহই এ পর্য্যন্ত ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহারও প্রবন্ধিত ছন্দেরও দুই এক স্থলে নিয়মের ব্যতিরেক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে প্রকাশকদিগের অনবধানতা ভিন্ন তাঁহার শক্তির ত্রুটি বলিতে সাহস হয় না।

সংস্কৃত ছন্দ নির্ণয় এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েকটী ছন্দ প্রচলিত আছে বা হইতে পারে, ইহাতে তাহারই বিষয় বিবৃত হইবে।

বাঙ্গালা ছন্দ সমস্তই "বৃত্ত" অর্থাৎ অক্ষর গণনা ক্রমে প্রবন্ধিত। ছন্দ অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষরভেদে দুই প্রকার।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অমিলন। * এই ছন্দের পদান্তে পরস্পর মিল নাই। যথা

নাহি জানি ভজন, পূজন, ধ্যান, জ্ঞান।
কিরূপে যাইব আমি ভবনদী পারে॥
যদি নিজগুণে দীনে তরান তারিণী।
দীন দয়াময়ী নাম, তবে জানি সত্য॥"

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-কৌমুদী হইতে এই উদাহরণটী গৃহীত হইল। ইহাতে যতি ভঙ্গ দোষ না থাকিলেও ইহা তাদৃশ সুশ্রাব্য হয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বে এইরূপ অমিত্রাক্ষর-রচনার আদর ছিল না। কাজে কাজে ইহার ব্যবহারও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পূর্ব্ব প্রচলিত যতির পরিবর্ত্তে রোমীয় (যতি) চিহ্ন ব্যবহার করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। যথা,—

"নবলতিকায় সতি! দিতাম বিবাহ
তরুসনে, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরী বৃন্দে আনন্দ সম্ভাষে
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।"

পূর্ব্বতন যতি সংযোগে পাঠ করিলে এই কবিতার কোন অর্থই অনুভূত হয় না এবং সৌন্দর্য্যও উপলব্ধি হয় না। উল্লিখিত উদাহরণ দুইটিই অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দ প্রবন্ধিত। অন্যান্য ছন্দেও অমিত্রাক্ষর রচনা হইয়া থাকে ও হইতে পারে।

যতি।

যতি—পাঠ বিচ্ছেদ বা জিহ্বার ইষ্ট বিচ্ছেদ স্থান। কবিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ছন্দানুরোধে যথায় পদান্ত করিয়া থাকেন, সেই খানেই যতি হইয়া থাকে। ছন্দের ন্যায় যতি ব্যবহারও স্বাভাবিক কবির আয়ত্তাধীন। তজ্জন্য পদান্তে যতি "(,)" ও অর্দ্ধ শ্লোকান্তে অর্দ্ধচ্ছেদ বা বিরাম "(।)" এবং শ্লোকান্তে পূর্ণচ্ছেদ "(॥)"

প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গদ্য রচনায় পদ্যের অর্দ্ধচ্ছেদ "(।)" পূর্ণচ্ছেদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাব্য প্রচলিত যতি বা চিহ্ন। যথা—

যতি	(,)
অর্দ্ধচ্ছেদ বা বিরাম	(।)
পূর্ণচ্ছেদ	(॥)

অধুনা পাশ্চাত্য সাহিত্যানুকরণে রোমীয় চিহ্ন সকল ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—

কমা বা যতি (,) বিরাম সময়ের বিশেষ নিয়ম নাই। সচরাচর 'এক' শব্দ উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু বিরাম করিতে হয়। ইহা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

সেমিকোলন (;) কমাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া বিরাম। ইহাই পূর্ণচ্ছেদের অর্দ্ধ অঙ্গ।

কোলন (:) পূর্ণচ্ছেদের অঙ্গ। পূর্ব্বপদান্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিরিয়ড পূর্ণচ্ছেদ (.) বঙ্গ ভাষায় (।) সম্পূর্ণ পদান্তে ব্যবহৃত হয়।

হাইপেন বা ছেদ (-)—ইহা উভয় বাক্যের বা পদের সন্ধিস্থলে বা সমাসযুক্ত হইলে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন — ড্যাস আকারে পদের অর্থ ব্যাখ্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

নোট-অব-ইণ্টারোগেসন (?) প্রশ্ন চিহ্ন। প্রশ্নস্থলে ব্যবহৃত হয়।

নোট-অব-এক্সক্লামেসন (!) বিস্ময় চিহ্ন। আশ্চর্য্য, ভয় বিস্ময় ও আহ্লাদসূচক বা অবজ্ঞাব্যঞ্জক পদান্তে ব্যবহৃত হয়।

ইহা ব্যতীত হ্রস্ব স্বর ব্যঞ্জক চিহ্ন (ּ) কিম্বা দীর্ঘ স্বর ব্যঞ্জক (́) (—) ঊহ্য (,)।

পেরেন্থিসিস্ কটিবন্ধ ( ) অর্থ-ব্যঞ্জক বা মন্তব্য প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোটেসন (উদ্ধৃত চিহ্ন) (") বক্তার বাক্য ও অন্যস্থল হইতে উদ্ধৃত পদ প্রকাশক, টীকায় ষ্টার বা নক্ষত্র চিহ্ন (*), ওবিলিস্ক বা স্তম্ভ (†), ডবল ড্যাগার (‡) প্যারালাল বা সমচিহ্ন (॥) ও ক, খ, প্রভৃতি বর্ণ বা ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঊহ্য স্থলে দুই তিন বা চারি নক্ষত্র চিহ্নও ব্যবহার হয়, যথা (* * * *)

প্রাচীন কাব্যে পদাংশে বা পদান্তে যতি (,), শব্দ শ্লোকান্তে (।) বিরাম ও শ্লোকান্তে (॥) পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হইত। ইহার অন্যথা হইলেই যতিভঙ্গ ইত্যাদি দোষে কবিতা দুষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে রোমীয় চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা সে অসুবিধা অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে। এখন দুই পদের স্থলে চারি বা তদধিক পদে কবিতা সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ণচ্ছেদ করিলেও কোন দোষ হয় না, বরঞ্চ আরও চমৎকার হইয়া থাকে। যথা,

"সংসারে যতেক নারী, মোর অংশ তারা।
শিব অংশ সংসারে, পুরুষ আছে যারা ॥১।
প্রকৃতি পুরুষ মোরা, তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড়, তবে সে বুঝিবি ॥২।"

এই দুই শ্লোক পদাংশে যতি (,)

ও শ্লোকার্দ্ধে বিরাম (।) এবং শ্লোকান্তে পূর্ণচ্ছেদ (॥) দ্বারা সমাপ্তি হইয়াছে। ইহা পয়ার ছন্দে প্রবন্ধিত দ্বিপদবিশিষ্ট নির্দ্দোষ কবিতা, প্রাচীন যতি নিয়মে সংরচিত।

আধুনিক রোমীয় চিহ্ন দ্বারা প্রবন্ধিত পয়ার ছন্দের উদাহরণ। যথা—

"নীরবিলা সুবদনী, বীণাধ্বনি যথা
নীরব ছিঁড়িলে তন্ত্রী; স্ফুরিল না কথা
শোকাবেগে মুখে আর! চির কুহুরিয়া
থামিল বিশ্রাম হেতু কলকণ্ঠপ্রিয়া ॥১।
মৃদুঃমন্দ ওষ্ঠাধর কাঁপিল চঞ্চল,—
কাঁপে যথা গোলাপের সুকোমল দল
সুমন্দ বাসন্তানিলে; অথবা কাঁপিয়া
নাচি নাচি বীচি মাঝে হেলিয়া দুলিয়া
চমকে চারু * *! সজল নয়ন
প্রকাশিলা মনোভাব করি বরিষণ ॥২ ॥

প্রাচীন কাব্যে পয়ার দুই চরণে শ্লোক সম্পূর্ণ করিতে হইত, নতুবা যতিভঙ্গ আদি দোষে কবিতা দুষ্ট হইত; কিন্তু অধুনা চারি চরণে ও তদধিক চরণে এক একটী শ্লোক সম্পূর্ণ হইলেও সুশ্রাব্যতা ও সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হয় না। উদাহৃত শ্লোক দুইটীর একটী চারি চরণে ও অপরটী ছয় চরণে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

'কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।'

প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণ সমীপে নিবেদন,

বামাবোধিনী পাঠিকা ভগিনীগণ, আজ একটী নিতান্তই দুঃখজনক বিষয় লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি, জানিনা গুছাইয়া বলিতে পারিব কি না, এবং হৃদয়ের ভাব ভাষায় ব্যক্ত হইবে কিনা! যাহা হউক, আশা করি আপনাদের কোমল হৃদয়ের সহানুভূতি দ্বারা আমার আশা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

আপনাদের মধ্যে সকলেই নিশ্চয় বঙ্গের অমর কবি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছেন ও তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় অবগত আছেন! তাঁহার সুমধুর বীণাঝঙ্কারে কাহার প্রাণ না সুধারসে আপ্লুত হইয়াছে, কেই বা সেই শ্রেষ্ঠ কবিকে হৃদয়ের উচ্চাসন প্রদান না করিয়াছেন?

আমাদের সেই প্রিয় কবি আজ অন্ধ, শুধু অন্ধ নন, পুত্র-শোকাতুর ও জীবিকা-ভ্রষ্ট! যিনি একদিন গবর্ণমেণ্ট উকীলরূপে সকলের বরণীয় ছিলেন, যাঁহার এক একটী বাক্‌চাতুর্য্যে কত শত বিপন্ন পরিবার সহায় সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বলোকপূজ্য এবং সকলের প্রিয় ছিলেন, আজ বিধির বিপাকে তাঁহার এই দশা!!

শুধু উপরোক্ত গুণের জন্যও নয়, এ

গুণ ত কত লোকেই থাকে, কিন্তু মানব-হৃদয়ের উপর কয়জন এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন?

যাঁহার স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বজাতি-বৎসলতা সর্ব্বজনবিদিত, যাঁহার ভারত-সঙ্গীত ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে শিরা উপশিরায় স্বদেশ-হিতৈষণা, অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগরিত করিয়াছে, আজ সেই কবিবরের এই দশা! যাঁহার কবিতাবলী মানব-জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ও যিনি বৃত্র সংহারে অদ্ভুত কল্পনাবলে অমর কিন্নর-সেবিত সুখৈশ্বর্য্যময় ত্রিদিবাধিপতি বৃত্রের অভাবিত পরিণাম মানবচক্ষের সম্মুখে মানবের ভাগ্য-চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল দেখাইয়াছেন, সেই অতুল্য কবিশ্রেষ্ঠের ভাগ্যেরও আজ সেইরূপ পরিবর্ত্তন!

যিনি আমাদের মাতৃভাষার কণ্ঠ মহামূল্য রত্ন হারে বিভূষিত করিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এবং এই অত্যধিক স্বদেশপ্রিয়তার জন্য যুবরাজের ভারতাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া স্বদেশের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে কাঁদিয়া, যুবরাজের নিকট অনাদৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরে তাঁহার নিকট স্তোক বাক্য প্রকাশে পুরস্কৃত হইয়াছে! সেই অনাদৃত কবিই আমাদের শিরোভূষণ চির-আদরণীয়! আমরা কি তাঁহাকে এরূপ ভাবে জীবনের অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিতে দিব? কখনই না!

যিনি প্রতি বৎসর গড়ে ৪৪,০০০।৫০,০০০, টাকা উপার্জ্জন করিয়াও অত্যধিক দীনে দয়া, বিপন্নে সহায়তা, আর্ত্তে অজস্র অর্থ দান করিয়া আজি এই দশায় উপনীত, যিনি জীবনে কখন স্বীয় অমূল্য গ্রন্থনিচয়ের উপস্বত্ব নিজে গ্রহণ করেন নাই, পুস্তক-প্রকাশকেরা যাঁহার গ্রন্থ বিক্রয়ে এই সুদীর্ঘ ৩০।৩৫ বৎসর কাল প্রচুর অর্থ লাভ করিতেছেন! সেই গ্রন্থরাশি-প্রণেতার আজি এই দশা!

সর্ব্বশেষে বলি যিনি ভারত রমণীর চিরবন্ধু, বালবিধবা ও কুলীন কুমারীদিগের দুঃখে যাঁর চক্ষুর শতধারা কবিতা-লহরীতে প্রবাহিত হইয়াছে, নারী-বৈরীদিগের উপর যাঁহার ওজস্বিনী ভাষা বজ্রনাদে অভিসম্পাৎ করিয়াছে, সেই কবির আজি এই দুর্দ্দশা ভারত নারীগণ কি উদাসীন নেত্রে দর্শন করিবেন?

এই অন্ধ কবি পুত্র-শোকাতুরা, আজীবন সুখৈশ্বর্য্য-সেবিতা, উন্মাদিনী সহধর্ম্মিণীকে লইয়া এই অসহায় নিঃস্ব অবস্থাতেও হতভাগ্য দেশের বিষয় ভাবিতেছেন ও দেশের দশা দেখিয়া আকুল হৃদয়ে দেশের জন্য হৃদয়-মুগ্ধকারী কবিতামৃত দানে বিপথগামীকে সুপথ দেখাইতেছেন, বিশেষতঃ নিজের দুরদৃষ্টের জন্য দয়াময় ভগবান্‌কে দোষ না দিয়া, যাহাতে সর্ব্ববিধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হইয়া তাঁহার পদে মতি স্থির থাকে, তাহার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন যে সুমহান্ উদারচেতা আমাদের চিরপ্রিয় কবি, আমরা কি শুধু বাক্যে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ

করিয়াই নীরব থাকিব? কার্য্যে কিছুই কি করিতে পারিব না?

যে দেশে অমর কবি মধুসূদন এতগুলি ধনী বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়াও বিনা শুশ্রূষায় সাধারণ হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়া আমাদিগকে চিরকলঙ্কে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের কবি হেমচন্দ্রকেও কি সেই ভাবে বিদায় দিয়া আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ করিব? না প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সেই অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব?

পাঠিকা ভগিনীগণ! দুইটী পথ আমাদের সম্মুখে আছে; কোন্ পথে আমরা যাইব? সহৃদয় গুণগ্রাহী অর্থশালী কোন কোন মহাত্মা কবির জন্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া আপনাদের অর্থের সার্থকতা করিতেছেন। উদার-স্বভাব দেবপ্রকৃতি কেহ কেহ কবিবরের জন্য খাটিতেছেন। আমরা বঙ্গ রমণীগণ—আমরা কি কিছুই করিব না? আপনাদের দয়া দাক্ষিণ্য জগৎবিখ্যাত। ভগিনীগণ আপনাদের সেই কোমল করুণ হৃদয়ের একবিন্দু স্নেহবারি হতভাগ্য কবির জন্য কি বর্ষণ করিবেন না? আপনাদের এক কণিকা দয়াও কি সেই বিশ্বপূজ্য অমর কবি পাইবেন না? যিনি কেবল পরকে দিতেই জানিতেন, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আজ ভিখারী হইয়াছেন, নিজের জন্য কপর্দ্দকও সঞ্চয় করেন নাই, আজ এই দারুণ অবস্থার পেষণে পড়িয়াও মানিশ্রেষ্ঠ কাহারও করুণার ভিখারী হন নাই, সেই জীবন প্রান্তে সমাসীন কবিকে অবশ্যই আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আনুকূল্য দান করিবেন। আশা করি আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বৃথা যাইবে না।

বামাবোধিনীর অসংখ্য গ্রাহিকাগণের মধ্যে প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞতার ঋণ কি কিয়ৎ পরিমাণেও শোধ হইবে না? যে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও পাঠিকাদের মধ্যে মানকুমারী, গিরীন্দ্র-মোহিনী, সরোজকুমারী, রাণী মৃণালিনী-প্রমুখ মহিলাগণ আছেন, তাঁহারা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তিতে এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে যদি আপনাদের কোমল করুণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্রও উচ্ছ্বাস তুলিয়া আমার চিরারাধ্য কবির প্রতি কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক করিতে পারিয়া থাকি, তবে এ জীবন সার্থক মনে করিব।

প্রিয় ভগিনীগণ, আমি কি ভাবে কি লিখিলাম জানি না। হৃদয়ের প্রবল আবেগ ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি যাহা নিবেদন করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি কিঞ্চিন্মাত্রায়ও আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তবেই আমার সহস্র লাভ। বিনীত প্রার্থনা এই, দোষ গ্রহণ না করিয়া ভগিনীর করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া কৃতার্থ করিবেন। কর্ণপাত করিলেন কিনা দয়া করিয়া জানাইবেন কি? অদ্যকার মত ইতি।

আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনী
কুসুম কুমারী রায়।

পোঃ নবগ্রাম পূর্ব্বভাগ মানিক গঞ্জ,
ঢাকা।

গ্রার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যে কি মধুর তাহা বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদ্‌গত করিয়া দেওয়া অসম্ভব। ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর স্নেহ সহকৃত প্রেম যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, পরম শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র জনক জননী যে প্রকার সুখ লাভ করেন, অসদ্ব্যবহার করিলে তদ্রূপ অসন্তোষে কালযাপন করেন। সুতরাং ভাই ভগিনীর প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার না করিলে, জনক জননীর প্রতিও সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। যাহাদের সঙ্গে শৈশবাবধি একত্র বাস হেতু পরস্পরের আনন্দে আনন্দিত, দুঃখে দুঃখিত এবং বিপদে বিপন্ন বোধ করিয়া আসিতেছি, তাহাদিগেয় প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। ভাই ভগিনীগণের পরস্পর স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ পূর্ব্বক সতত মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অধুনা প্রায় সকল পরিবারেই ভ্রাতৃবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কিরূপ আক্ষেপের বিষয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধরূপ মহাবিষ প্রবিষ্ট হইলে, পরিবারস্থ সকলকে দুঃখে ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত করে। এক্ষণকার মনুষ্যগণ যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহাতে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বনপূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ করাই বিধেয়। পরন্তু এ কথা স্বীকার্য্য বটে যে, যদি সহোদরবর্গ পরস্পর প্রণয় ও সদ্ভাবে বদ্ধ হইয়া, সপরিবারে একান্নে সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ন্যায় ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ অতিশয় প্রার্থনীয় সুখামৃত সঞ্চারিত হইবার অতি অল্পকাল পরেই বিদ্বেষ বিষ বাহির হইতে থাকে। ভ্রাতৃগণের প্রত্যেকেরই কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, পরস্পরকে স্নেহ যত্ন সহকারে পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা বিধেয়। পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেক আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া, সকলকে সুখী করিতে পারিলেই গৃহ শান্তিধামে পরিণত হয়।

প্রভু ও ভৃত্যের যে পবিত্র সম্পর্ক, তাহাও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

ভৃত্যদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট সেবা প্রাপ্ত হইতে হইলে, তাহাদিগকে পরুষ বচন না বলিয়া, সদয় ভাবে সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার দ্বারা নিজের স্বভাবও কলঙ্কিত হয়। যদি দেখা যায় ভৃত্যের স্বভাব অতিশয় দূষিত ও শাসনের বহির্ভূত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যকে অন্যত্র যাইতে বলাই বিধেয়। কারণ, দুষ্ট লোককে পরিবারে আশ্রয় দিলে, বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। যদি তাহার দোষ ত্রুটি সামান্য হয়, তাহার প্রতি কোমল শাসন বা ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

অতিথি এবং গৃহপালিত জীবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করাও পারিবারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। অতএব এ দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধন হইল না জানিতে হইবে।

সাংসারিক সর্ব্ব কার্য্যে নিপুণতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পুরুষ গৃহকার্য্য সম্পাদনোপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া দিবেন ও স্ত্রী সেই সকল দ্রব্য গুছাইয়া লইয়া পরিপাটীরূপে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সুগৃহস্থ হইতে হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে অতি বৃহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা প্রয়োজন। পরিবারের সকলে যাহাতে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়, স্ত্রীলোকের সে বিষয়ে গভীর মনোযোগ দান প্রয়োজন। এ জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করা ও নিয়মমত পরিশ্রমের বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ দেশবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছেন, কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিলেই আমরা দূর করিতে পারি। ইংরেজ জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ৫০।৬০ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিরাও রীতিমত ভ্রমণ, কূর্দ্দন প্রভৃতি অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্যে সতত রত থাকেন। দীর্ঘজীবী মহাত্মাদিগের জীবনেও পরিদৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই রীতিমত অতি প্রত্যূষে, চারি কি সাড়ে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পক্ষীদিগের কলকণ্ঠের সহিত স্বীয় কণ্ঠস্বর ও বিধাতার গুণগান মিলিত করিতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহারা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা খাদ্য বিষয়েও অতিশয় পরিমিতাচারী ছিলেন। বস্তুতঃ, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেই কার্য্যপটুতা লাভ সহজ। আমরা অনেক সময়ে অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই। আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিলে, সেগুলি সমূলে বিনষ্ট হয়; অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করি। আবার

আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়া যাই। ঈশ্বরদত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সমুদায়ের সুব্যবহার, মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, ব্যায়াম, দেহ সম্মার্জ্জন প্রভৃতি দীর্ঘায়ু লাভের অব্যর্থ উপায়। বস্ত্র এবং শয্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া নিতান্ত উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক যুবতী পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথানুসারে কার্য্য করা, অজ্ঞানতা মনে করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে কতিপয় সুপ্রথা পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সেগুলি অবজ্ঞা করিলে পীড়িত হইতে হয় সন্দেহ নাই। প্রাতঃকালে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, গোময় প্রক্ষেপ ও সন্ধ্যাকালে পুনরায় চারিদিকের সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, ধূনা দেওয়া অতি আবশ্যক। এতদ্দ্বারা বাড়ীর বাতাস পরিষ্কার হয়, এবং স্বাস্থ্য উত্তম থাকে।

সেফালী।

আজ অদূরে কি মোহন গীতি শুনিতেছি! এই শান্তিরূপিণী গম্ভীরা মনোহারিণী প্রকৃতিদেবীর কণ্ঠ ফুটিয়া যে মঙ্গল-গাথা উত্থিত হইতেছে, তাহা কর্ণে প্রবেশ মাত্র নীরব হৃদয় জাগিয়া উঠিল, নিভৃত অন্তরতম প্রদেশে যে বীণাটী ছিন্নাবস্থায় এতকাল পতিত ছিল, আজি সেও এই মহান্ স্বভাবপূর্ণ সঙ্গীতের তান লয় বিশুদ্ধ স্বরে, সুর মিলিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। চক্ষুর সম্মুখে সুর নরের, মানব ও দানবের বিসদৃশ ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইতেছি। ভূতলেই যে অমরার শোভা রীতি নীতি বিরাজ করিতেছে! প্রকৃতির এমন বিচিত্র ক্রীড়া-ভূমিতে বসিয়াও কি মন তুমি বলিবে সংসার কেবলি দুঃখের আগার? সখি সেফালি! তোমার শান্তিপূর্ণ ছায়াতে আশ্রয় লাভ করিয়া কতবার বিষম সংসার তাপ ভুলিয়া গিয়াছি। আজিও তোমার কোমল শাখা বাহুর অন্তরালে উপবেশন করিয়া স্বভাবের এত মহা গীতির মধ্যে বালুকণার ন্যায় এ ক্ষুদ্র হৃদয়টী মিশাইয়া দিতেছি। "গাহে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি, একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।" গগন চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া অনেক দিন স্বভাব সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি, কিন্তু এমন মোহন গীতি কোথাও কি শুনিয়াছি? হীনবুদ্ধি মানব হইয়া এই

মাধুর্য্যমাখা সঙ্গীতের মর্ম্ম কি বুঝিব? তবে এইটুকু বুঝিলাম একতা ভিন্ন বাহ্য ও অন্তর জগতের কোন কাজ সমাধা হয় না। একতাই ঐশিক নিয়ম। যেমন পাষাণ-দেহ হইতে এক একটা ক্ষীণ-নির্ঝর-ধারা কুলু কুলু ধ্বনিতে নীরব গিরিরাজ্য আন্দোলনপূর্ব্বক বেগবতী স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়া সাগরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, তেমনি সুকণ্ঠ বিহগের মধুর কাকলি-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সুষুপ্ত জগৎ জাগিয়া উঠিতেছে। হীন ঝিল্লীও তাহার কর্কশ স্বর তাহাতে না মিশাইয়া নীরব থাকিতে পারিতেছে না। যে মহান্ গায়কের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে এই ঘুমন্ত বিশাল জগৎ একতানে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কি আমাদেরও হৃদয়-বীণা সমস্বরে মঙ্গলগাথা গাহিবে না? জড়তার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া চমকিয়া উঠিবে না? আমরা গুটীপোকার ন্যায় সংসারজালে অনন্ত উন্নতিশীল আত্মাকে জড়িত করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, প্রজাপতির ন্যায় কবে মুক্তপক্ষে অনন্ত আকাশপথে ধাবিত হইব? সংসার-মায়া মোহ ধূলিরাশির ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত থাকিবে, কিন্তু অমর আত্মা তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া সেই অনন্ত গায়কের সিংহাসনসমীপে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া কৃতার্থ হইবে?

এমন শ্যামলা প্রকৃতির শত শত মোহিনী ছবি জীবনের ভুল ভ্রান্তি ঘুচাইতেছে। শোভাময়ী প্রকৃতির গায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে যে মহানাম অঙ্কিত রহিয়াছে, বিষয়জালে আবদ্ধ অন্ধ মানবনেত্র তাহা পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছে না। হীনবুদ্ধি জীব যত দুর্গতিতে ডুবুক না কেন, হৃদয়-বীণা সেই মহান্ গায়কের নির্দ্দিষ্ট তানের সহিত সুর না মিলাইয়া-সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। যে শৃঙ্খলা শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া এ বিশাল জড় জগৎ এক অমোঘ নিয়মে চলিতেছে, মানবের দুর্দ্দমনীয় হৃদয় তৎসহ মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই চলিতেছে। ইহাই যে সেই অনন্ত শিল্পীর অকাট্য নিয়ম সখি সেফালি! আজি ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রীর আবেগ উপলব্ধি করিয়া তাহা বুঝিলাম। নীলাকাশ, গম্ভীরমূর্ত্তি গিরিমালা, তুষারের অমল শুভ্র ছবি, এই মর জগতেই স্বর্গের দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়া হীন হৃদয় বিমুগ্ধ করিল।

মানবহৃদয় অতলস্পর্শ বারিধির ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গপূর্ণ। এমন মনোহর স্বভাব-সঙ্গীতধ্বনির সহিত সুভাবের বীচিমালা এ হৃদয়সমুদ্রে তালে তালে নৃত্য করুক, এবং প্রার্থনা করিতে থাকুক, যে মহাস্রোত হইতে এ ক্ষীণ ধারা বাহির হইয়াছে, আবিলতাময় পঙ্কিল ভূমি বিধৌত করিতে করিতে শ্রান্ত জীবনস্রোত পুনঃ সেই পবিত্র প্রেম-সিন্ধুতে মিশিয়া কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হউক। বোন শেফালি! আজি তোমার ছায়াতে বসিয়া এই কামনা করিতেছি।

শ্রীস্ব—

আর্য্যজাতি।

গোচারণ।

পঞ্চনদ প্রদেশের সরস ও উর্ব্বর ভূমি আর্য্যদিগের কৃষি ও গোচারণ কার্য্যের বড় অনুকূল হইয়াছিল। গো আর্য্যজাতির প্রধান সম্পত্তি ছিল। কোন ক্রিয়া উপলক্ষে পুরোহিতদিগকে গো দান করার প্রথা পৌরাণিক সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জনক রাজা একবার বহুদক্ষিণা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গো দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঐ দক্ষিণার সময় জনক রাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ঐ সহস্র গোর অধিকারী হইবেন। এক একটী গোর শৃঙ্গে শত শত পাদ স্বর্ণ সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জনক রাজার বাক্য শ্রবণে কুরু পঞ্চাল দেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই ঐ দক্ষিণাগ্রহণে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার শিষ্যকে বলিলেন "এই সকল গো লইয়া যাও, আমিই ইহাদের অধিকারী দেখিতেছি, কারণ অন্য কেহ লইতে সাহসী হইতেছেন না।" এতদ্দর্শনে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন একে একে পরাস্ত হইলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সহস্র গো লইয়া গৃহে গমন করিলেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, ঋষিরা শিষ্যদিগকে তাঁহাদের গো-রক্ষণ ও ক্ষেত্র-কর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

অশ্ব দ্বারাও আর্য্যগণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন। বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল প্রদেশে নদ নদী ছিল না, তথায় কূপ খনন করিয়া তাহার জলে কৃষিকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য তাঁহারা এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত একখানি চক্রের নেমিদেশে কতকগুলি কলস শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাঁধা হইত। গো অথবা অশ্বকর্ত্তৃক চক্র যেমন ঘূর্ণিত হইত, ঐ কলসগুলি একে একে কূপমধ্যে পতিত ও উত্থিত হইত। উত্থিত হইবার সময় কলস গুলির মুখ উর্দ্ধদিকে থাকিত এবং পতিত হইবার সময় যেমন অধোমুখ হইত, অমনি জল ভূমিতে পতিত হইয়া ক্ষেত্রাভিমুখে প্রবাহিত হইত।

গোচারণ ও গোপালন ঋষিদিগের একটী পবিত্র কার্য্য ছিল। গো তাঁহাদের এরূপ প্রিয় হইয়াছিল এবং গো-সম্পত্তি এরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি হইয়াছিল যে, "গোপ", "গোত্র" শব্দ বহু সম্মানাস্পদ হইয়াছে। এখন যাহাকে আমরা "গোপ" বা গোয়ালা বলি, আর্য্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে—

লোকের রক্ষাকর্ত্তাদিগকে সেই "গোপ" নাম দিতেন। যে যে "গোত্র" এখন ঋষিবংশের পরিচায়ক, সেই সেই গোত্র আর্য্যদিগের গো-গৃহের নাম ছিল। আর্য্য ঋষিকন্যারা গাভী দোহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সেই জন্য কন্যার নাম দুহিতৃ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গৃহ-চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথী)

হুপিং কফ—হুপ শব্দ যুক্ত কাশি।

(Whooping Cough).

নিদান—শ্বাসনালীতে সর্দ্দি লাগিয়া এক প্রকার প্রদাহ হইয়া, এই রোগের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ কেহ বলেন ভেগস্ স্নায়ুর কোনপ্রকার পীড়া হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। হুপিং কাশি অতিশয় কঠিন এবং একটী আক্ষেপজনক (Spasmodic) পীড়া।

এই পীড়া সংক্রামক (Contagious), অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। হুপিং কফ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে ; যাহারা একবার আক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করে, পুনরায় তাহাদিগের আর আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। এই পীড়ার স্থায়িত্বের স্থিরতা নাই। চারি হইতে আট সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই রোগের ভোগ হইতে পারে, ক্রমশঃ রোগের উপসর্গ বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যুও হইতে পারে।

কারণ।

এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রোগীর নিঃশ্বাস হইতে এই বিষ নির্গত হইয়া বায়ু সহযোগে বহু ব্যাপকরূপে অনেক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। রোগীর শ্লেষ্মা হইতে ও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হইতে পারে। শৈত্য সেবন এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দন্তোদ্গম, দরিদ্রতা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণেও পীড়া হইতে পারে, হামের পরেও এই পীড়া হইতে পারে।

লক্ষণ।

এই পীড়ার লক্ষণ তিন অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছে :—

প্রথম—সর্দ্দির অবস্থা।

দ্বিতীয়—আক্ষেপিক অবস্থা।

তৃতীয়—হ্রাসাবস্থা।

(১) সর্দ্দির অবস্থা—হুপিং কাশির বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ২।৪ দিবস গুপ্ত ভাবে থাকিয়া রোগ প্রকাশিত হয়। জ্বর,

মুখ ভার, নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, চক্ষু লাল ও সজল। প্রথমে কাশি শুষ্ক, পরে ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মাথা ভার, শরীর অস্থির। এক হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিয়া আক্ষেপিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(২) আক্ষেপিক অবস্থা—কাশির বৃদ্ধি হয়, হঠাৎ আক্ষেপজনক কাশি হয়, কাশির পূর্ব্বে গলার মধ্যে সুড় সুড় ও কুট কুট করে, ক্রমে ক্রমে অতিশয় ভয়ানক কষ্টদায়ক কাশি হয়, কাশি শীঘ্র শীঘ্র হয়, জোরে শ্বাস টানিতে গেলে হুপ্ শব্দ যুক্ত কাশি হয়, কাশি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, শ্লেষ্মা পরিমাণে অধিক ঘন চটচটে এবং পরিষ্কার, মুখ ও নাসিকা হইতে নির্গত হয়। বারম্বার আক্ষেপিক কাশি, কাশির আক্রমণ ২।৩ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। কাশিতে কাশিতে বমন হয়, কাশির সময় মুখমণ্ডল স্ফীত ও নীলবর্ণ, শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত, রোগী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়। বক্ষঃস্থলের পেশীতে বেদনা; ক্রমে ক্রমে কাশি অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ ও আক্ষেপ হয়। পীড়া কঠিন হইলে দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর এবং কোন বিষয় ভাল লাগে না ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই সময়ে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ফুসফুসে (Lungs) অল্প পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করায় শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ স্বাভাবিক শব্দ অপেক্ষা মৃদু এবং ঐ শব্দ যেন দূর হইতে আসিতেছে, এইরূপ অনুভব হয়। সচরাচর এই পীড়া ৩ হইতে ৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক হইয়া ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। ডাঃ মর্টন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার নীচে অতি অল্প পরিমাণে ক্ষত হইয়া থাকে।

হ্রাসাবস্থা—উপরি-উক্ত লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, কাশি ও আক্ষেপ ইত্যাদি কম হইয়া যায়। সহজে সাদা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়, বমন নিবারণ হয়, শরীরে বল পাওয়া যায়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত লক্ষণ হ্রাস হইয়া ৪।৫ সপ্তাহ পরে আরোগ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় যখন সামান্য সর্দ্দি ও কাশি প্রকাশ পায়, তখন একোনাইট, বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার হয়। ডাক্তার লিলিয়েন্থেল বলেন, পীড়ার প্রথম অবস্থায় জ্বর ও রক্তাধিক্য থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। কাশির সহিত জ্বর থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমে যদি কাশি নরম থাকে, তবে পলসেটিলায় উপকার হয়। এককালে অনেকে এই রোগগ্রস্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার করা যায়। ডাঃ গরেন্সি বলেন মুহুর্মুহু কাশি, নিশ্বাস লইতে ভয়ানক কষ্ট থাকিলে ইপিকাক ব্যবহারে আরোগ্য হয়। যে সকল শিশুর ক্রিমি আছে, তাহারা এই রোগগ্রস্ত হইলে সিনা প্রয়োগে উপকার

হয়। কাশি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে ইপিকাক, ভিরাট, ড্রসিরা, কুপ্রম, কার্ব্বভেজ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিবে। কাশির সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইপিকাকুয়ানা, ড্রসিরা দ্বারা উপকার হয়। ডাঃ হানিমান বলেন, তিনি ৩০ ক্রমের ড্রসিরা ব্যবহারে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। শ্লেষ্মা বমন করিলে টার্ট এমি, ভেরাট, ইপিকা, ড্রসিরা দ্বারা উপকার হয়। ডাঃ বেয়ার বলেন অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে কুপ্রম মেট ব্যবহার করিবে, অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৩ ক্রমের গুঁড়া ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। কিন্তু ডাঃ বেয়ার বলেন, দিবসে ২ বার করিয়া ২।৩ সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়। অন্ত্রে বেদনা থাকিলে নক্স ভমিকা; বক্ষে বেদনা থাকিলে ভিরাট্রাম, কুপ্রম; অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে আর্স, ভিরাট। ডাঃ হার্টম্যান (Dr. Hartmann) যদি বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকে, তবে কুপ্রম-এসি, ও এন্টি-টার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চার হইলে বেল ও ব্রাই দিবে; সন্ধ্যার ও রাত্রে কাশির বৃদ্ধি হইলে ড্রসিরা ক্যাল-কার্ব্ব ব্যবহার করিবে। প্রাতে ও বৈকালে অধিক কাশি হইলে নক্স; আহারান্তে রোগবৃদ্ধি হইলে ইপিকা, নক্স; আহারকালে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে ক্যালকেরিয়া। ডাঃ হিউজ (Dr. Hugh) বলেন, বালকেরা কাশিবার পূর্ব্বে ক্রন্দন করিলে আর্ণিকা ব্যবস্থা করা যায়। যখন পীড়ার উপশম হইতেছে দেখিবে, তখন লক্ষণানুসারে পলস্, ইপিকা, ডলকা, সলফ ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

একোনাইট—রোগের প্রথমাবস্থায়, সাঁই সাঁই শব্দ, জ্বর থাকে, ১।৩ ক্রম ব্যবহার্য্য।

আর্ণিকা—বৈকালে জল পান করিলে কাশির বৃদ্ধি, কাশি হইবার পূর্ব্বে শিশু ক্রন্দন করে, বুকে বেদনা, রক্ত মিশ্রিত কাশি, ৩।৬ ক্রম।

এন্টিমোনিয়ম-টার্টারিকম — ক্রমে রোগী দুর্ব্বল, ভুক্ত দ্রব্য বমন, শ্লেষ্মা বমন, আক্ষেপজনক কাশি, গলার মধ্যে সুড় সুড় করে, ৬।১২ ক্রম।

কোনায়ম—আরক্ত জ্বর, হাম অন্তে পীড়া। রাত্রে প্রচণ্ড কাশির বৃদ্ধি, রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা অতি কষ্টে নির্গত, গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে, ৬।১২ ক্রম।

বেলেডোনা—রাত্রে ১৫ মিনিট অন্তর আক্ষেপিক কাশি; শ্লেষ্মার সহিত চাপ চাপ রক্ত উঠে, কথা কহিলে ও শ্বাস গ্রহণকালে কাশির বৃদ্ধি, খিট খিটে, পেটে বেদনা, আলো অসহ্য, অতিশয় শিরঃপীড়া, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ, দুই প্রহর রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, প্রথমে ভুক্ত দ্রব্য পরে পিত্ত বমন, রোগের আরম্ভে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ৩।৬।৩০ ক্রম।

ব্রাইওনিয়া—সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে আহার অন্তে কাশির বৃদ্ধি, কাশিতে

কাশিতে বমন, কটাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত, বুকে বেদনা, মল কঠিন, রোগী খিট খিটে, যকৃতে বেদনা, ৩।৬ ক্রম।

আর্সেনিক—নানা প্রকার শব্দ বিশিষ্ট কাশি, ফেনাযুক্ত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার উদ্গম, গলার মধ্যে জ্বালা ও সুড় সুড় করিয়া কাশি আরম্ভ হয়, নিদ্রাবস্থায় চম্‌কে উঠা, কাশির সময় মুখ স্ফীত ও নীলবর্ণ, বিবমিষা, পেটে বেদনা, ভয়, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা, উদ্বেগ, নৈরাশ্য, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ, কাশির পর ঘর্ম্ম, অতিশয় পিপাসা কিন্তু রোগী এককালে অধিক জল পান করিতে পারে না, গরমে ভাল বোধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, কাশির পূর্ব্বে মুখ শীতল ও মলিন, ভুক্ত দ্রব্য বমন, ৬।১২।৩০ ক্রম।

নক্স ভমিকা—কাশির সময় পেটে বেদনা, শুষ্ক কাশি, প্রাতে কাশির বৃদ্ধি, শিশুরা কাশির সময় হস্ত দ্বারা মাথা ধরিয়া থাকে, হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা, কোষ্ঠ বদ্ধ, সর্দ্দি থাকে, ৬।১২।৩০ ক্রম।

ইপিকাকুয়েনা—ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে শ্লেষ্মার সহিত রক্ত উঠে, পাকাশয়ে অসুস্থতা, বমন, সর্দ্দি-জনিত কাশি, আহারকালে ও নিশ্বাস টানিতে গেলে কাশির বৃদ্ধি, ১।৩।৬ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ড্রসিরা—অতিশয় প্রবল আক্ষেপিক কাশি, জ্বর, শীত, রাত্রি দুই প্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি, শ্লেষ্মা বমন, নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব, পুনঃ পুনঃ কাশি, কণ্ঠ শুষ্ক, রক্ত আমাশয়, উদরাময়, হাত পায়ে বেদনা, হাসিলে কাঁদিলে কাশির বৃদ্ধি, ৩।৩০ ক্রম।

পলসেটিলা—হুপিং কাশির প্রথম অবস্থায়, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, প্রত্যেক বার কাশির পর শ্লেষ্মা বমন, উদরাময়, অস্থিরতা, অনিদ্রা, হাত পা ঠাণ্ডা, ৩।৬ ক্রম।

কুপ্রম-মেট—রোগী কাশিতে কাশিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাশি, রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ, চক্ষু বসিয়া যায়, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, পিত্ত বমন, সাঁই সাঁই রবে শ্বাস প্রশ্বাস, মুখে ফেনা, শীতল জল পানে আরাম বোধ, সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ, দেহ শক্ত, শিরঃপীড়া, শ্বাসকষ্ট, নিদ্রাবস্থায় চমকে উঠা, ৬।৩০ ক্রম।

কার্ব্বভেজিটেবিলিস—খুস খুসে কাশি, প্রাতে হরিদ্রা বা সবুজ পূযবৎ চটচটে শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ, স্বরভঙ্গ, বাগ্‌রোধ, কম্প, তৃষ্ণা, শরীর শীতল, ঘর্ম্ম, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যামোমিলা—রাত্রে ও ঠাণ্ডা লাগায় রোগের বৃদ্ধি, শিশু সর্ব্বদা খিটখিটে ও কোলে থাকিতে ভালবাসে, গরম বিছানায় শান্তি বোধ, পচা ডিম্বের মত তরল ভেদ, ৬।১২ ক্রম।

সিনা—নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্ষেপিক কাশি, চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে, শিশুর চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং অত্যন্ত রাগ, কাশি হইবার পূর্ব্বে ক্ষুধা, পেট-জ্বালা, উদরাময়, অনিদ্রা, ক্রন্দন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, যাহাদিগের ক্রিমি আছে, তাহা-

দিগের এই ঔষধ উপকারী, ৬।৩০।২০০ ক্রম।

স্কুইলা—কাশিবার সময় হাঁচি হয়। প্রাতে অধিক পরিমাণে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট রক্তবর্ণ শ্লেষ্মা অতি কষ্টে নির্গত হয়। ঠাণ্ডাজল পানে কাশির বৃদ্ধি, ১।৩ ক্রম ব্যবস্থা।

ফস্‌ফরাস—পীড়ার শেষাবস্থায়, কঠিন উপসর্গ, আক্ষেপিক কাশি, ক্লান্তি, স্বরভঙ্গ, বুকে জ্বালা, বেদনা ও কণ্ডূয়ন, রাত্রে ঘর্ম্ম।

রিউমেক্স—শুষ্ক ক্লান্তিজনক কাশি, স্বরভঙ্গ, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, বক্ষের বাম দিকে খিল ধরা।

হাইওসিয়ামস—মাথা ধরে, ঠাণ্ডা বাতাসে শয়নে, আহারে আক্ষেপিক কাশির বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও গরম, অতিশয় পিপাসা।

জিঙ্ক-মেট—যৌবনাবস্থায় কাশি, দিবসে পূঁয রক্তমিশ্রিত কাশি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—রোগীর পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আহার দ্রব্যাদি অত্যন্ত লঘু হওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে সাগু, এরারুট দিলে যথেষ্ট হইবে। যদি জ্বর না থাকে, তবে পুষ্টিকর খাদ্য দিবে। আহার অন্তে রোগীকে স্থির-ভাবে রাখিবে, রোগীকে ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না, রোগীর সন্তুষ্টচিত্তে থাকা আব-শ্যক। স্থান পরিবর্ত্তন মন্দ নহে। জ্বর না থাকিলে অল্প গরম জলে রোগীকে স্নান করাইবে। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে বক্ষে ও পৃষ্ঠে স্বেদ দিলে উপকার হইতে পারে।

ঔষধ ব্যবস্থা—এই রোগে নিম্ন ক্রম (Dilution) প্রায় ব্যবহৃত হয়। ভাল-রূপে লক্ষণাদি স্থির করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইবে না, এবং শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রতি দিন ৩।৪ বার, আক্ষেপিক অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর, এবং শ্বাসাবস্থায় প্রতিদিন ১।২।৩ বার ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ডাঃ উ, মু।

জন্তুদিগের ভোজনপ্রণালী।

১। ষ্টার্জিয়ন্ মৎস্যের দন্ত নাই, ইহা শোষণ করিয়া আহার করে।

২। মাকড়সাদের অস্থিময় চোয়াল, তাহা দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

৩। জেলী মৎস্য যে খাদ্য খায়, তাহার চারি দিকে জড়াইয়া তাহার কতক অংশ পোষণ ও শোষণ করিয়া আত্মসাৎ করে।

৪। ক্রমীকীটদের মুখও নাই, পাক-স্থলীও নাই। ইহারা জন্তুদিগের উদরের

জীর্ণ খাদ্যের উপরে শয়ন করিয়া চর্ম্ম দ্বারা তাহার রস শুষিয়া খায়।

৫। প্রজাপতি নলের মত একটী শুণ্ড দ্বারা ফুলের মধু শুষিয়া লয়।

৬। মাছি ও মৌমাছিরা শুঁড় বা জিহ্বা দ্বারা তাহাদের খাদ্য শোষণ করে।

৭। কাটঠোকরার জিহ্বা ত্রিফলা অস্ত্রের ন্যায়,গাছ ঠোকরাইতে ঠোকরাইতে যে কীট বাহির হয়, তাহা ঐ জিবের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া টানিয়া লয় ও ভক্ষণ করে।

৮। তারা মৎস্য যে বস্তু আহার করে, তাহা সে আপনার শরীরসংলগ্ন করে, এবং পাকস্থলীর ভিতর দিক্ দিয়া উল্টাইয়া বাহির করিয়া তাহা দ্বারা শিকার জড়াইয়া আহার করে।

৯। মোচা চিংড়ীরা অস্থিময় চোয়াল দ্বারা খাদ্য কতকটা চর্ব্বণ করে, কিন্তু তাহাদের পাকস্থলীতে কয়েক পাটী দন্ত আছে, তাহা দ্বারা চর্ব্বণক্রিয়া সমাধা করে।

১০। তূঁতপোকার দুইটী চোয়াল করাতের ন্যায় আড়াআড়ি ভাবে কার্য্য করে, এবং তাহা দ্বারা আপনার শরীরের ওজনের ৩।৪ গুণ অধিক আহার প্রতিদিন ইহার উদরসাৎ হয়।

১১। রাজ-কর্কট দাড়া দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ করে। খাদ্য মুখে দিবার পূর্ব্বে জঙ্ঘার ভিতরে রাখিয়া চূর্ণ করিয়া লয়।

১২। কার্প-মৎস্যের দন্ত তাহার কণ্ঠ-নালীতে, সেই স্থানে তাহার ভোজন-ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

১৩। সমুদ্র আর্চিনের পাকস্থলীর চারি দিকে ৫টী করিয়া দন্ত আছে। এক একটী চোয়ালের এক একটী দন্ত কেবল চর্ব্বণের কার্য্য করে না, আহার্য্য বস্তু ভিতর ও নিম্নদিকে টানিয়া হস্তের কার্য্যও করে।

১৪। কিরণ (রে) মৎস্যের মাথার উপর মুখটী আড়াআড়ি প্রসারিত, তাহার মধ্যে চোয়াল চক্রাকারে ঘোরে। চোয়ালে তিন সারি দন্ত। জাঁতিতে যেমন সুপারি কাটে, মোচা চিংড়া প্রভৃতি ঐ চোয়ালে পড়িলে সেইরূপ কর্ত্তিত হইয়া যায়।

কর্ত্তব্যগিরি।

ঘুমায়ে স্বপন দেখি জীবন সুন্দর।
জাগিয়া আশ্চর্য্য হই—সে সুখজীবন কই?
কেবল কর্ত্তব্য গিরি
হেরি স্তরে স্তর। ১॥
শৈশব* প্রথম স্তরে কোন জ্বালা নাই।
সুকাজ কুকাজ করি, ফলাফল নাহি ধরি,

* শৈশব বা কৌমারাবস্থা এক হইতে পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম; বাল্যাবস্থা ছয় হইতে দশ বৎসর; কৈশোরাবস্থা একাদশ হইতে পঞ্চদশ; যৌবনাবস্থা ষোড়শ হইতে ত্রিংশ বৎসর; প্রৌঢ়াবস্থা একত্রিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর এবং বার্দ্ধক্যাবস্থা ছাপ্পান্ন হইতে অশীতি বর্ষ বা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

অনাদরে কেঁদে মরি
স্নেহে গ'লে যাই। ২॥
বাল্যঃস্তরে উঠি ক্রমে বুদ্ধির বিকাশ।
ভাল মন্দ বুঝি যদি তবুও তো নিরবধি,
মন্দ কাজে যত্ন করি
ভাল তে উদাস। ৩॥
কৈশোর কঠিন স্তর বন্ধুর বিশেষ।
যতই বর্দ্ধিত জ্ঞান, ততই অস্থির প্রাণ,
প্রসারিত উপত্যকা
দুঃখ আর ক্লেশ। ৪॥
যৌবন বিষম স্তর, ভীষণদর্শন।
এক পদ অগ্রে চড়ি দুই পদ পিছে পড়ি,
বিশেষ সৌভাগ্য বিনা
উঠে কোন্ জন? । ৫॥
প্রৌঢ় দৃঢ়তর স্তরে উন্নত শিখর!
যতই উপরে যাই ততই দেখিতে পাই,
উঠিছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ
উত্তর—উত্তর। ৬॥
বার্দ্ধক্যের ভগ্ন স্তর ক্ষরিছে নিয়ত।
এক ধার হ'লে পার অপার অপর ধার,
আবার স্বপন কথা
মনে পড়ে কত?

বঙ্গ-মহিলা—মানসিক।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত।)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ-মহিলা মানসিক উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হইলে আমরা কখনই এরূপ উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। স্ত্রীশিক্ষার ভাগীরথী-ধারা অতি দ্রুতগতিতে এই অভিশপ্ত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়াছে; কোনও বারণ বাধা ইহার স্রোতোমুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। ১৮০৭ সনে হানা মার্সমেন সামন এদেশে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি জানিতেন না, স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দ্রুত উন্নতি হইবে। ১৮১৯ সনে ছাত্রীসংখ্যা ৮; ১৮২০ সনে ৩২; ১৮২১ সনে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৬, ছাত্রী-সংখ্যা ১৬০; ১৮২৫ সনে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৩০, ছাত্রী সংখ্যা ৫০০। আজি সমগ্র বঙ্গদেশে বালিকাদের জন্য প্রবেশিকা বিদ্যালয় ৭, মধ্য-বাঙ্গালা ২২, উচ্চ প্রাইমারী ১৭০, নিম্ন প্রাইমারী ২৬১৮, ছাত্রী-সংখ্যা ৫৮,৮০৭। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের সংখ্যা (কুচবিহার, ছোটনাগপুর ও কুমিল্লা ব্যতীত) ৩,৬৭,৩০,৯৪৮। সর্ব্ব নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষার গণনা করিলে বঙ্গদেশে ১,০৪,৮১৫ বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সম্মিলনী অল্প উপকার করিতেছে না। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৮,৬৯,০৫,৪৫৬, তন্মধ্যে বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্টের সংখ্যা ১,২০,৭১,২৪৯, ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা

৫,৪১,৬২৮। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পুরুষশিক্ষার ন্যায় তেমন আয়োজন নাই, অথচ বঙ্গদেশে শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের সংখ্যা ব্যতীত এক লক্ষ বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহা বাঙ্গালার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে পাঁচটী এম, এ, ও আঠারটী বি, এ আছেন; ইহা গর্ব্বের বিষয় মনে করিলে ভরসা করি আমরা অপরাধী হইব না।

স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার উপকারিতায় অন্ধ ছিলেন না। আর্য্য বিদুষীগণের নাম স্মরণ করিলে এরূপ বর্ব্বর কে আছে যে, তাহার সর্ব্ব-শরীর ভক্তি বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত না হয়? এই বিদুষী রমণীসমাজের ক্রোড়ে এক অমিত-তেজা পুরুষপংক্তি প্রতিপালিত হইয়াছিল, ইহাঁরা একদিন স্বদেশসেবক ছিলেন। বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের তদ্রূপ শৌর্য্য-সম্পদ্ প্রদান না করিলে স্ত্রীশিক্ষায় কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না। যাঁহারা মনে করেন, জননী অশিক্ষিতা হইয়াও রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ গর্ভে ধারণ করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। ঈশ্বরচন্দ্র শিশুবোধ পড়িয়া বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন, সুতরাং সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা এইরূপ যুক্তি অস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সহিত তর্কেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার এদেশে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসা কি, বলিয়া যাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রশ্ন শ্রোতব্য ও আলোচনাযোগ্য। মহিলা-সমাজের সুহৃদ্‌গণ এই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষা পরিচালন না করিলে অতর্কিতে অনিষ্টপাত অসম্ভব নহে

আমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসার জন্য আশান্বিত থাকিতে অনুরোধ করি। ইহার সুফল সুস্পষ্টরূপে দেখিবার এখনও সময় হয় নাই। অন্য উপকারের কথা আলোচনা করিতে চাই না; বঙ্গ-মহিলার মানসিক উন্নতিতে বাঙ্গালা সাহিত্য এক ললিত শ্রী ধারণ করিয়াছে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, শ্রীমতী কামিনী, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর লিপিকুশলতা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। ইহাঁদের ভাষার আলঙ্কারিক গুণপনার সমালোচনার এ সময় নহে; ইহাঁরা সাহিত্যের যে শ্লীলতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদের মহিলাধর্ম্মের অনুরূপ—তাহা পুরুষসমাজের সাহিত্য-কর্ণধারগণেরও অনুকরণীয়। পরিতাপের বিষয়, আশ্বিনের ভারতী "তুমি বুঝি মনে ভাব" সঙ্গীতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভাবনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বয়ং ভারতীও এই সঙ্গীত বীণা-বদ্ধ করিতে সঙ্কুচিতা হইতেন।

বঙ্গমহিলার মানসিকতা সময়ের সৃষ্টি। সুশিক্ষিত পুরুষ-সমাজের পার্শ্বে অশিক্ষিতা

বঙ্গমহিলা শোভা পাইত না। আমরা কেবল শোভার কথা বলিতেছি না, বঙ্গমহিলার মানসিকতায় পুরুষসমাজে উন্নতির এক উগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে। মহিলাসমাজের যোগ্য হইবার জন্য পুরুষ-সমাজের চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ। স্ত্রীজাতির গুণপনার প্রসার যত বিস্তৃত, পুরুষজাতির উদ্যমশীলতার প্রখরতাও তত তীক্ষ্ণ। প্রাচীন রোম ও গ্রীক ইতিহাসের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, রাজপুতানার ইতিহাস এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। মহিলাসমাজের মানসিক উৎকর্ষ ইউরোপের হৃদয়ে ভক্তি, বাহুতে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, আত্মায় আরাম। আজি যে বোয়ার জাতি সাহস ও স্বাধীনতা-স্পৃহায় সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, স্ত্রীজাতির মনের উৎকর্ষ তাহার অন্যতম মূল। ইংরেজ মহিলাগণ মদ্যপান নিবারণে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। বেরনেস ভন সাটনারের "অস্ত্র বিসর্জ্জন" গ্রন্থ ইউরোপে শান্তি সংস্থাপনে কি তুমুল আন্দোলনই না উপস্থিত করিয়াছে! সেদিনের মহিলা মহাসমিতির সুশৃঙ্খলাবদ্ধ অধিবেশন এক স্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গমহিলা-গণ যে দিন তাঁহাদের মানসিকতা কার্য্য-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন, সে দিন এক শুভদিন। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেব মুসলমান মহিলা শিক্ষার একটী সদুপায় করিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুই হস্ত। আমরা হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতিতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অন্তঃপুরে বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিতেছেন। অনেকে মহিলা-সমাজে পুরুষানুকারের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। পুরুষসমাজেই হউক, কিম্বা রমণীসমাজেই হউক, বিলাস-বাসনা বিনাশের পথ মুক্ত করে; সর্ব্ব প্রযত্নে বিনাশের সহস্র হস্ত দূরে থাকিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পুরুষানুকারিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, উহা স্বভাবের নিয়মেই লয় পাইবে। শিক্ষায় মহিলাসমাজে যে একটী সৌন্দর্য্য-স্পৃহা ও শৃঙ্খলাপরতা জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহা কখনই নিন্দনীয় নহে। উহার অন্তরালে একটী সুশোভন অঙ্কুর গুপ্ত রহিয়াছে। অনেকে "বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে" বাগ্‌দেবীর অতি উত্তম বন্দনা মনে করিলেও অন্তঃপুরে ঐরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের আশঙ্কা এই, এইরূপ ভারতীর আবির্ভাবে দু'সন্ধ্যা অন্নদাত্রী অন্তর্হিতা হইলে উদরের উপায় কি? সাধ করিয়া কে লক্ষীছাড়া হইতে চায়? ভারতবাসী ভারতী চায়, কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষ্মী বিসর্জ্জন করিতে পারে না। লক্ষ্মী সরস্বতীর সম্মিলনে বর্ত্তমানের উন্নত জাতি সকল গঠিত হইয়াছে। ভারতবাসীকেও সেই শুভ সম্মিলন করিতে হইবে। বিপত্তি ভাবিয়া কেহ যেন বঙ্গ-মহিলার মানসিক উন্নতির বিরোধী না

হন। কোন্ শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিপত্তি নাই? বিপত্তি বারণেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

ভারতবর্ষে জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতি, আশা ও আদর্শানুরূপ হইলে ভারতবাসী শক্তি ও সম্পদের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। মাতৃস্তন্যে শিশুর শরীরে অজ্ঞাতসারে অমিত বল সঞ্চারিত হয়। জননীর নিকট শিক্ষা না পাইলে শিশু মানুষ হইতে পারে না। দেড় শত বৎসর ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা পাইয়াও আমরা কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছি! কেবল জাতীয় মহাসমিতি, কেবল শ্রমশিক্ষা-সমিতি আমাদিগকে কার্য্য শক্তি প্রদান করিবে না। মানসিক শক্তিসম্পন্না মহিলাই মূর্ত্তিমতী সরস্বতী। তাঁহারা মাতৃরূপে এ জাতিকে গঠন করিয়া না তুলিলে এ মৃতজাতি "জাতি" নামের যোগ্য হইবে না। বঙ্গমহিলার শিক্ষার পথে এখনও সকল বাধা বিপত্তি দূর হয় নাই। গত শত বর্ষে যে মানসিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা একটী জাতি গঠনের প্রয়োজন অনুসারে অতি অল্প। বিংশ শতাব্দীতে আমরা নারীজাতির বিশেষ উন্নতি দেখিব বলিয়া ভরসা করতে পারি। যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী, তাঁহাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। যে সকল মগ্ন শৈলে বালক শিক্ষার বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাঁহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষায় অধিক সাবধান ও যত্নবান্ হইলে এ দেশের অদৃষ্ট কখনই অপ্রসন্ন থাকিবে না।

ইলিয়ড।

(১১৬-১১৭ সংখ্যা—১৮৬ পৃষ্ঠার পর)।

মহাক্রোধে আকিলিস বর্ষে বাক্যবাণ
অগ্নিবাণ সম "হে দানব নৃপাধম!
ভীরুতা ঔদ্ধত্যে পূর্ণ হৃদয় তোমার,
সাহস বিক্রম তব সারমেয় সম।
ওরে মূর্খ কাপুরুষ! অজেয় অভেদ্য
গুপ্ত অরিব্যূহসহ করিতে সমর
কবে তুমি সেনানীর হয়েছ অগ্রণী?
কিম্বা হে দাম্ভিক! অতুল বীরত্ব ভরে
নির্ভীক অন্তরে ভীষণ সম্মুখ রণে
পশেছ কি কভু ঘোর শত্রুদল সহ
যুঝি প্রাণপণে লভিতে বিজয় কিম্বা
মরিতে সদলে? তুমি শুধু রণক্ষেত্রে
থাকি দূরে দূরে মরিতে সাহসী জনে
দাও হে আদেশ! হে দুর্ম্মদ পশ্বধম!
কর নিপীড়ন তব অধীন কিঙ্করে।
দাস জাতি পরে প্রচণ্ড ও কোপানল
করহ বর্ষণ—যারা হারায়েছে ভীরু!
অতীত কালের উচ্চ স্বাধীনতা জ্ঞান—
অবাধে সহিবে যারা অত্যাচার তব;
নহিলে জানিও গর্ব্বী এই অত্যাচার

নিশ্চয় প্রেরিত তোমা শমন সদনে।
পরশি এ রাজদণ্ড সুপবিত্র চির,
মম অলঙ্ঘ্য শপথ—নহে খণ্ডিবার
তব পক্ষ হ'তে আমি চিরদিন তরে
লইনু বিদায়। হে দুর্ম্মতি জেনো সার
প্রদীপ্ত লৌহমণ্ডিত ভীম রাজদণ্ড—
শোভে মম করে যথা যোভের অশনি—
রাজক্ষমতার নিদর্শন সুবিদিত।
পরশি সে রাজদণ্ড করিনু শপথ
ভীষণ অলঙ্ঘনীয়—যবে গ্রীস পুনঃ
হয়ে বিমর্দ্দিত ঘোর ট্রোজান আহবে
আহ্বানিবে আকিলিসে রক্ষিতে তাহারে,
জানিও হইবে তার বৃথা সে আহ্বান।
হে দুর্ম্মতি! মদমত্ত বীরেন্দ্র হেক্তর
আসিবে কৃতান্ত সম যুঝিতে যখন,
আচ্ছাদিত শব দেহে শোণিতরঞ্জিত
হবে সিন্ধুকূল, মোর প্রতি এই ঘৃণ্য
অপমান হেতু ঘোর অনুতাপানলে
হবে সন্তাপিত। ভীষণ বিগ্রহে হায়!
হইয়া অক্ষম রক্ষিতে বিপুল চমূ
গ্রীক দলবলে করিবে আক্ষেপ যবে,
তখন বুঝিবে মূঢ়! মহা ক্ষুব্ধ মনে
ঘোর অবিচার তব আকিলিস প্রতি—
বীর অরি তব।" বলিয়া এতেক শূর
সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় নক্ষত্রে খচিত
রাজদণ্ড মহাবেগে নিক্ষেপি ভূতলে
বসিলা নীরবে যবে ঘৃণা রোষ ভরে,
তুল্য ঘৃণা রোষ ভরে নরেন্দ্র অমনি
ভীষণ ভ্রূকুটী ভঙ্গী করিলা সঘনে।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা একটী সুপ্রসিদ্ধ পুণ্য উৎসব। এই রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়—এমন কি কোন কোন বার এত যাত্রী হয় যে ১৯.২০ টা গবর্ণমেণ্ট হাউস পূর্ণ হইয়া যায়; পরিশেষে পথে, ঘাটে, মাঠে, সড়কে ও ট্রেণের ধারে যাত্রীরা গাদা হইতে থাকে। ইহাতেও যখন কুলান হয় না, তখন বালীতে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে যাত্রীরা যাইতে থাকে এবং সেই তরঙ্গ-ধৌত প্রস্তর কঙ্কর বিশিষ্ট বালীর উপরে অল্প ছায়াময় ঝাউ বৃক্ষের তলদেশে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে অথবা ঝমাঝম বৃষ্টিজলে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রথযাত্রার কিছু দিন অগ্রে স্নানযাত্রা হয়। এই স্নানযাত্রার পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীরা শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আরম্ভ করে এবং জগন্নাথ দেব রথারোহণ করিলেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই জন্য একটী কথা আছে "এক পা রথে এক পা পথে" "ঠাকুর রথে, যাত্রী পথে।" অনেক যাত্রী তল্পি মাথায় করিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে

আগমন করে এবং রথে বামন মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হয়। অনেকের পক্ষেই জগন্নাথের উল্টারথ দর্শন ঘটিয়া উঠে না। কেহ ঠাকুর রথে উঠিলেই চলিয়া যায়, কেহ দুই দিন পর, কেহ তিন দিন পর কেহ পাঁচ দিন পরও দেশে ফেরে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও অনেক লোক থাকিয়া যায়। অন্যসব লোক চলিয়া যাওয়ার পরও যে সব লোক থাকে, তাহাও গণনা করা অসাধ্য। যাহারা যায়, তাহারা অল্লায়াস সহ্য করিয়াই বাঁচে। আর যাহারা উল্টারথ দর্শনেচ্ছু হইয়া থাকে, তাহারা জীবিত অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। সে যন্ত্রণা বর্ণনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরিশেষে ইহাদের কষ্ট কর্ত্তৃপক্ষেরও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে শবের উপর শব, মুমূর্ষুর উপর মুমূর্ষু! সড়কের উপর মৃত দেহ, ড্রেণের মধ্যে মৃত দেহ, বৃক্ষতলে ও যেখানে সেখানে মৃত দেহ। মৃত দেহ ব্যতীত সহরে অন্য কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। * এই বিষম মহামারীর জন্য সহরের সমুদয় পুকুর ও কূপের জলই দূষিত হইয়া যায়। এ দিকে আবার বহু লোকের সমাগম জন্য আহারীয় খাদ্য সামগ্রী সকল দারুণ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে। অতএব অল্প মূল্যের অতি খারাপ খাদ্য আহার ও সেই দূষিত জলপান করিয়া লোক সকলের পীড়া দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন অগত্যা কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই সব দূষিত জল ও সেই সব কদর্য্য খাদ্য কেহ স্পর্শ করিতে না পারে এমন বিধি ব্যবস্থা করেন। তখন পানীয় জল ও আহারীয় সামগ্রীর অভাবে সেই হতভাগ্য লোকদিগের 'হা হতোহস্মি' বাড়িয়া উঠে। তখন দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত যাত্রীদল বড় সাধের তীর্থ শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়নের চেষ্টা দেখে। কেহ ভেদ বমনে কাতর হইয়া ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিতে থাকে। কেহ বা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কাত্‌রাইতে কাত্‌রাইতে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হয়। কেহ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যায়। কেহবা পরম আত্মীয়ের নিকট বিদায় লইয়া ঘোর আর্ত্তনাদের সহিত শিরে করাঘাত করিতে করিতে যায়। কিন্তু হায়! তখন আর সহজে শ্রীক্ষেত্র ছাড়ার উপায় থাকে না। সে সময় পুরীর ষ্টেশন যমালয় সদৃশ হইয়া উঠে। (ক্রমশঃ)

* এ বৎসর ওলাউঠার মহামারীতে এই দৃশ্য যার-পর-নাই ভয়ানক হইয়াছিল।

উপদেশমালা।

১। খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য পিটারের সম্বন্ধে একটী অতি সারগর্ভ গল্প কথিত আছে। গল্পটি এই ঃ—একদা ঈশ্বর বায়ু-সেবনার্থ স্বর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পিটার

স্বর্গের দ্বারে দ্বারবান্। ঈশ্বর বহির্গমনকালে পিটারকে আদেশ দিয়া গেলেন "দেখিও আমার অনুপস্থিতিকালে যেন কেহ স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারে।" তাঁহার বহিষ্ক্রমণের কিয়ৎকাল পরে এক ধোপা স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইল। পিটার আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও?" ধোপা বলিল "আমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে চাই।" তখন পিটার বলিলেন "ঈশ্বরের হুকুম নাই, চলিয়া যাও।" ধোপা অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু পিটার ক্রমশঃ উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন, অবশেষে ধোবাকে "নাছাড়বন্দা" দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধান্বিত হইয়া ঈশ্বরের পদ রাখিবার আসন খানি ধোপার গায়ে নিক্ষেপ করিলেন। আসন গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে পতিত হইল। ধোপা বিফল-মনোরথ হইয়া স্বর্গ-দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এ দিকে ঈশ্বর বায়ু সেবনান্তর স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন। উপবেশন করিয়া পদ রাখিবার আসনখানি দেখিতে পাইলেন না। পিটারকে জিজ্ঞাসা করাতে পিটার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। তখন ঈশ্বর বলিলেন "দেখ পিটার, আমি যদি তোমার মত উত্ত্যক্ত হইতাম, তাহা হইলে স্বর্গে একটী জিনিষও দেখিতে পাইতে না, তোমার ন্যায় একখানি দুইখানি করিয়া সকল জিনিশ ছুড়িয়া কাহাকে না কাহাকে মারিতে হইত। লোক সকল অহর্নিশ আমায় এত বিরক্ত করে যে পর্ব্বতপ্রমাণ ক্ষমা না থাকিলে তাহাদের রক্ষা থাকিত না! পিটার ক্ষমা শিক্ষা কর, কেহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে বিরক্ত হইও না। বিরক্তিতে চিত্তে অশান্তি আনয়ন করে, ক্ষমাই শান্তির কারণ।"

এইটী একটী গল্প মাত্র। কারণ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য স্বর্গ বলিয়া কোন স্থান নাই, ঈশ্বরের বায়ু সেবনের প্রয়োজন হয় না, কিম্বা তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরেও যাইতে হয় না। পিটারও স্বর্গের দ্বারবান্ নহেন। কিন্তু গল্পটি এইরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে ইহা হইতে একটী সারগর্ভ উপদেশ লাভ করা যাইতে পারে। কেহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হই, ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অনেক সময় পিটারের ন্যায় বিরক্তি-উৎপাদককে আঘাত করিতেও উদ্যত হই। কেহ বা লগুড় ধারণ করে, কেহ বা বাক্য বাণ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা একবার যদি ঈশ্বরের ক্ষমা এবং ধৈর্য্যের বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে কত না উপকৃত হই! তিনি নাস্তিক ভণ্ড পাষণ্ডদিগকেও আস্তিক বিশ্বাসীর ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। নাস্তিক তাঁহাকে অস্বীকার করিল বলিয়া—পাপাচারী তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। "পরি-

ত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং” এই শ্লোক মানবীয় ভাবে রচিত। ঈশ্বরের শত্রু মিত্র সমান, তিনি দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিলে পৃথিবী একদিনে স্বর্গধাম হইয়া যাইত অর্থাৎ পৃথিবীতে আর পাপ থাকিত না। কিন্তু পৃথিবীতে বরঞ্চ বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাতে ঈশ্বরের অপরিসীম ক্ষমারই পরিচয় দিতেছে। ঈশ্বর যদি মানবের উপাস্য হন এবং উপাস্যের অনুকরণ যদি উপাসকের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক নর-নারীর তাঁহার অসীম ক্ষমার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

২। একদা কোন বৈষ্ণব পথিক সন্ধ্যা-সময়ে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অসময় হইয়াছে আর পথ চলিতে পারেন না, পথিমধ্যে একজনকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মশাই! এই গ্রামে কোনও বৈষ্ণবের বাড়ী আছে কি না, থাকিলে আপনি আমায় দয়া ক’রে দেখিয়ে দিন, আমি রাত্রিকালে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হব।” পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন “এই গ্রামে সকলেই বৈষ্ণব, ইহা বৈষ্ণবেরই গ্রাম, আপনি যাঁর বাড়ী যাবেন, তিনিই আপনাকে সাদরে গ্রহণ কর্ব্বেন, অতিথি সেবার জন্য এই গ্রামের লোক সকল প্রসিদ্ধ।” বৈষ্ণব পথিক এই আশ্বাসবাণী পাইয়া অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমতঃ যে বাড়ী পাইলেন, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্থ আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক বলিলেন “মশাই! অসময় হইয়াছে, আমি এক বৈষ্ণবের বাড়ীতে অতিথি হইতে চাই। পথিমধ্যে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে এই গ্রামে আপনারা সকলেই বৈষ্ণব, তাই আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি।” কথা শুনিয়া গৃহস্থ বলিলেন “মশাই, অমন কথা বলবেন না। আমি নরাধম, আমি কি বৈষ্ণব হ’তে পেরেছি? এই গ্রামে আমা ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব। আপনি অতিথি হইলে আমি কৃতার্থ মনে কোর্ব্ব, কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া যদি আপনি এখানে থাকিতে চান, তা হলে আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি না।” পথিক এই উত্তর শুনিয়া দ্বিতীয় বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তথায়ও ঠিক্ সেই উত্তর শুনিতে পাইলেন। এই-রূপে তিনি বাড়ীর পর বাড়ী ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কেহই আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইল না, পক্ষান্তরে আর সকলকেই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিল। গ্রামবাসীদিগের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া পথিকের আত্মদৃষ্টি খুলিল। এত দিন তাঁহার মনে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব হইতে হইলে যে সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিতে হয় “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” তৃণ হইতে সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানী হইয়া সকলকে যথোপযুক্ত সম্মানদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়, তাঁহার

এই বুদ্ধি ছিল না। বৈষ্ণব গ্রামে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহার আত্মভ্রম ঘুচিয়া গেল। তাঁহার প্রাণে দীনতার আবির্ভাব হইল, তিনি তৎপরে এক গৃহে আতিথ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন। এই বৈষ্ণব গ্রামের বৈষ্ণবদিগের চরিত্র অনুধাবন করিলে দুইটি মহত্ত্ব লক্ষিত হয়। প্রথম প্রত্যেকের অভিমান-রাহিত্য, দ্বিতীয় অন্যের গুণানুবাদ কীর্ত্তন। সংসারের লোকদিগের চরিত্র ইহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অপরের চরিত্রের যাদৃশী সমালোচনা হইয়া থাকে, আত্ম-চরিত্রের তাদৃশী হয় না। কর্ণ পাতিয়া রাখিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়— কিন্তু বৈষ্ণব গ্রামে আত্মনিন্দা ও পর-প্রশংসা হয় বলিয়া উহাকে বৈষ্ণব গ্রাম বলা যাইতে পারে। যদি কেহ জীবন-পথে ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। মনুসংহিতাতে আছে, “ব্রহ্মচারীর উভয় নিন্দা এবং পরিবাদ বর্জ্জনীয়।” ব্রহ্মচারী ধর্ম্মপথের প্রথম সোপানারোহী। প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণ-গণই ধর্ম্মসাধনের অধিকার পাইয়াছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জন্য ঐ উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষগণই ধর্ম্মপথের যাত্রী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাই সকলের সম্বন্ধেই মনুর উপদেশ খাটে। প্রত্যেকের এই উপদেশের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচণ্ডী কিশোর কুশারী।

শিব-রহস্য।

দেবাদিদেব মহাদেব কৈলাসশিখরে বাস করেন। কৈ শব্দে কৈবল্য মুক্তি, লাস শব্দে বিলাস এবং শিখর শব্দে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ যেখানে নির্ব্বাণ-নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি বিরাজমান, তাহাকে কৈলাস বলে। সুতরাং কৈলাসশিখর শব্দে কোন পর্ব্বতের চূড়া নহে। যিনি মহাদেব, আমাদিগের ন্যায় তাঁহার পর্ব্বত-চূড়া প্রভৃতিতে বাসস্থান হইতে পারে না। এই জন্য কৈলাসশিখরকে সাক্ষাৎ শৈব পদ অর্থাৎ শিবলোক বলা যায়।

শিবলোক অত্যন্ত মনোহর। সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থই তথায় বিরাজ-মান। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা সকলে উহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত। বৈষ্ণব, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় তথায় বাস করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ এবং কান্তি (দীপ্তি), পুষ্টি (ধনধান্য, পুত্রকন্যা, যশঃ প্রতিপত্তি, বিদ্যা বুদ্ধি, বলবীর্য্য ইত্যাদি পরম প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয় বিষয় সকলের কোন দিকে কোনরূপ অভাব না থাকা), ক্ষমা,

সত্য ও দয়া এই পঞ্চ সাত্ত্বিক ভাব সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকাতে ঐ শিবলোক যারপর নাই শোভমান। তথায় সকল ঋতুতেই সকল ঋতুর কুসুম সমুদায় বিকশিত হইয়া পুষ্পের আমোদ ও সুষমা বিস্তার করে এবং শীতল সুগন্ধি গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চরণপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বদাই উপবীজিত করিয়া থাকে। অপ্সরাগণের সুমধুর গীতিধ্বনিতে উহার চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত। শিবলোকে ভদ্র নামে সুবিখ্যাত পাদপ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহাদের ছায়া চিরস্থায়িনী এবং তাহারা কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য উহা যেরূপ স্নিগ্ধ, সেইরূপ নয়ন মনের প্রীতিজনক। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমুদায় লোক ও লোকপাল ঐ স্থানে লীন হয়। ঋতুরাজ বসন্ত মধুমত্ত মধুব্রত, কলকণ্ঠ কোকিলকুল প্রভৃতি সহচরগণের সহিত সর্ব্বদাই এই প্রদেশে বিরাজমান আছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ উহাকে আবৃত করিয়া সমধিষ্ঠান করিতেছেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, এই জন্য উহার শোভা সমৃদ্ধি ও গৌরবেরও সীমা নাই।

এই শিবলোকে তেজঃপুঞ্জ-সমুদ্ভাসিত চরাচর-জগৎপিতা দেবাদিদেব মহাদেব মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মসমাধি (একমনে আত্মস্বরূপকে চিন্তা করা) সাধন করিতেছেন। তিনি সদাশিব (সৎ—আ, শিব; সৎ শব্দে নিত্য বর্ত্তমান, আ শব্দে সর্ব্বব্যাপী ও শিব শব্দে সর্ব্বমঙ্গলময়) ও সদানন্দ (সদা—আনন্দ, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বকাল পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি হয়)। তিনি অমৃতের সাগর অর্থাৎ তাঁহাকে ভজনা করিলে অজর ও অমর হওয়া যায়। তিনি কর্পূর (অর্থাৎ সকল লোকের পূর্ণানন্দ বিধান করেন) ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ অমঙ্গল বিনাশ করেন এবং ধবল অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময়। তিনি রাগ দ্বেষ ও অহঙ্কারাদি সকল দোষ ও সকল কলুষ বিনির্ম্মুক্ত। তিনিই একমাত্র প্রকৃত বস্তু; সংসারের যাহা কিছু, তাহার সার তিনি। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিময়। তিনি মায়া ও অবিদ্যার অতীত এবং দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। যাহারা পাপে তাপে জর্জ্জরিত, রোগে শোকে অভিভূত, বিষাদে প্রমাদে বিকৃত এবং মোহে ব্যামোহে অন্ধীভূত হইয়া অতীব ব্যাকুল ও আকুল ভাবে "ভগবান্! আমারে রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করেন। তিনি আত্মধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক ও তাঁহাদের প্রতি পরম প্রীতিমান্। তাঁহার জটামণ্ডল গঙ্গাশীকরে সংসিক্ত থাকাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এখানে গঙ্গা শব্দে প্রকৃতি, শীকর শব্দে অংশ ও সম্পর্ক, সংসিক্ত শব্দে গর্ব্বিত এবং জটামণ্ডল শব্দে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মায়াশক্তি প্রকৃতির অংশে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছে; তন্নিবন্ধন, তিনি নিরতিশয় বৃহৎ। তিনি

অনন্যসাধারণ আত্মশক্তি ও অসাধারণ মহিমা এই উভয়ে অলঙ্কৃত। তিনি রাগ দ্বেষাদি উপদ্রবের বহির্ভূত; এই জন্য সর্ব্বদাই শান্তিময়। তিনি বিভূতি দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ তিনি তমোগুণরূপ স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিতে অলঙ্কৃত। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম। তাঁহার ঠাঁই সর্ব্বত্র অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সিদ্ধিতে অত্যন্ত নিপুণ অর্থাৎ যোগসিদ্ধিতে বিচক্ষণ। তাঁহার মান অপমান জ্ঞান নাই অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিকার ও ভেদজ্ঞানশূন্য। তিনি কোন ধর্ম্ম মানেন না অর্থাৎ ব্রহ্মকে বেদবিহিত কোনও কর্ম্ম স্পর্শ করে না, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা কিন্তু আচরণকর্ত্তা নহেন। ভস্ম চন্দনে তাঁহার সমান জ্ঞান অর্থাৎ তিনি আত্মপর ভেদ রহিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী। তিনি দিগম্বর ও ব্যোমকেশ—অর্থাৎ দিক্ ও আকাশ তাঁহার বস্ত্র ও কেশ—তাঁহার আবরণ ও সীমা নাই। তিনি গরল খাইয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহা মৃত্যুর কারণ, তাহা তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তিনি কপালী অর্থাৎ লোকমাত্রেরই অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনি ত্রিলোচন এবং ত্রিলোকনাথ, অর্থাৎ তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ লোচনসম্পন্ন এবং ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির ঈশ্বর। তাঁহার এক হস্তে ত্রিশূল শোভা পাইতেছে এবং অন্য হস্ত বরপ্রদানে সমুদ্যত রহিয়াছে। এখানে ত্রিশূল শব্দে সৃজন, পালন ও সংহরণ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সর্ব্বদা বিকসিত আছে এবং তাঁহার নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ জ্ঞান-দৃষ্টিতেই তিনি সকলই দেখিতেছেন, তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্ন চক্ষে আইসে না; প্রত্যুত নিম্ন চক্ষুর সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই ঊর্দ্ধ চক্ষেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্ন চক্ষু নিষ্ক্রিয়ের ন্যায় অর্দ্ধ-নিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু করিয়া থাকে। তিনি আশুতোষ, অল্পে সন্তুষ্ট হন; ভোলানাথ—জীবের অপরাধ ভুলিয়া যান; ভূতনাথ—সর্ব্ব ভূতের অধিপতি। তাঁহার সুখদুঃখাদি কোন প্রকার বিকার বা আত্মপরাদি কোন প্রকার ভেদ কল্পনা নাই এবং আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের সম্পর্কজনিত কোনরূপ আশঙ্কা বা ব্যামোহ নাই। তিনি সকল কার্য্যের অতীত, এই জন্য তিনি সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহাতে অবিদ্যা ও অজ্ঞানাদি রূপ কোন প্রকার কলঙ্ক-সম্পর্ক নাই; এই জন্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অবগত নহে। তিনি শিব শঙ্কর, তিনি সকল লোকের সকল মঙ্গলের কর্ত্তা এবং মহাদেব দেবগণেরও দেবতা। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও সকলের অভীষ্টফলবিধাতা।

কুটীরবাসিনী।

(পাশ্চাত্য আখ্যায়িকার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত)।

অবিরাম কল কল নিনাদে পার্ব্বত্য উপকূল প্রতিধ্বনিত করিয়া নীলাম্বুরাশি প্রবাহিত হইতেছে। তটদেশে সহস্র-শীর্ষ নাগরাজের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া এক পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের কঠিন অঙ্গ ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে সাগরবারি কূলে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ একটী সাগর-শাখার তটে, এক ক্ষুদ্র গণ্ডশৈলের উপর একখানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কুটীর বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিক্ বিজন, কচিৎ কোন স্থলে মনুষ্যাবাস দৃষ্ট হয়। অধিবাসীর মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে মেষ চারণ করিতে আসিয়া মেষপালকগণ কখন কখন সেই কুটীরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য উপস্থিত হয়। কখন কোন পথভ্রান্ত পথিক শীত বায়ুতে অবসন্ন হইয়া কুটীরবাসিনী দয়াবতী বিধবার আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্ভিন্ন অপর কেহ কখনও সেই বিজন প্রদেশে পদার্পণ করে না। এক অনাথা বিধবা একাকিনী সেই কুটীরে বাস করেন জরা। তাঁহার মস্তকের কেশ ধবলিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের তেজ খর্ব্ব করিতে পারে নাই। তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা পূর্ব্বেরই ন্যায় বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার মধুর হাস্য দেখিলে কে বলিতে পারিত যে মৃত্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে? এমন এক দিন ছিল যখন বৃদ্ধা ধন জনে পরিবেষ্টিতা হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বুভুক্ষু এক দিন তাঁহার কৃপায় তৃপ্ত হইয়া যাইত, শীতার্ত্ত তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া আরাম অনুভব করিত, অনাথ পীড়িত জন তাঁহার নিকট ঔষধ ও পথ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিত। কিন্তু বহু বর্ষ অতীত হইল সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন বৃদ্ধা নিজেই অন্যের কৃপার ভিখারিণী হইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃদ্ধার কষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট এই ছিল যে, তিনি মানবের মুখ দেখিতে পাইতেন না। সেই নির্জন প্রদেশে কে তাঁহাকে দেখিতে আসিবে? আত্মীয়, স্বজন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। নিকটস্থ নগরে গিয়া বাস করিতে পারিলে বৃদ্ধা মানবের মুখ দেখিতে পাইতেন, এবং হয় ত কোন দয়াবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্যও করিতে পারিতেন, কিন্তু বৃদ্ধা আপনার বহুদিনের প্রাচীন বাসভূমি কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? যেখানে তাঁহার জীবনের সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, যেখানে নিজের পরিবারের রাজ্ঞীরূপে তিনি এক দিন রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন, যেখানে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও প্রিয়তমাগণকে লইয়া তিনি অবনত-জানুতে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন, এবং যেখানে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র কন্যার ও প্রিয়তম স্বামীর সমাধির ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, নিজের সুখের জন্য সে স্থান তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? তাই অতীতের বিষাদময়ী স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত জনশূন্য প্রাচীন বাসভূমির উপর একটী কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৃদ্ধা সেখানে বাস করিতেছিলেন। প্রাচীনা তাঁহার ধর্ম্মপুস্তকে পড়িয়াছিলেন, ক্ষুদ্র বায়সশাবকগণ যখন ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া চীৎকার করে, তখন এক অদৃশ্য হস্ত তাহাদিগের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেন। বৃদ্ধা ভাবিতেন মানব কি বায়স-শিশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়? তবে আমার চিন্তা কি? আমার প্রয়োজন বুঝিলে জগতের প্রতিপালক প্রভুই আমার অভাব মোচন করিবেন।

দুঃখিনী বলিয়া সমাজ তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি সমাজের কথা ভুলিতে পারেন নাই। বৃদ্ধা ভাবিতেন, আমি এখনও সমাজের একজন, পৃথিবীতে এখনও আমার কার্য্য আছে। আমার আহার্য্য আমার নিজের জন্যই প্রচুর নয়, আমার পরিচ্ছদ শীত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারে না, আমার দুর্ব্বল দেহ আমার নিজের ভারই বহন করিতে পারে না, এ সকলই সত্য; তথাপি কি আমার কার্য্য নাই? কার্য্য আছে; আমি কার্য্য করিব। যিনি এখনও আমাকে এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীতে রাখিয়াছেন, যাঁহার প্রদত্ত অন্ন জলে এ শরীর এখনও পুষ্ট হইতেছে, যাঁহার প্রদত্ত বায়ু, আলোক, তেজ এখনও আমার জীবনী শক্তি বিধান করিতেছে, তিনি যখন নিত্য ক্রিয়াশীল, তখন আমি কি নীরব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমিও কার্য্য করিব। যাঁহার মনে এরূপ বাসনা থাকে, তাঁহার কার্য্য করিবার অবসরের অভাব হয় না। গ্রীষ্মাগমে সেই নির্জন পার্ব্বত্য দেশ তরু-লতায় সুশোভিত হইলে বৃদ্ধা স্বহস্তে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে কুটীরের পার্শ্বে রক্ষা করিতেন। তুষারপাতে অবসন্ন পথিক বৃদ্ধার কুটীরে সেই কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি-সেবন করিয়া কত সময় আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইত। পর্ব্বত-দেহে বসন্তাগমে যে শৈবালরাজি উৎপন্ন হইত, বৃদ্ধা তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া রাখিতেন। শীতাগমে যখন বৃক্ষ লতা পত্রশূন্য হইত, তখন কোন দরিদ্র কৃষকের ক্ষুধাতুর গাভী বা মেষকে তাহা প্রদান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। বৃদ্ধা ভাবিতেন আমা দ্বারা একটী জীবেরও যদি উপকার হয়, তবে ত আমার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। হউক দুঃখ, যত দিন বাঁচিয়া আছি, আমার প্রভুর কার্য্য যে করিতে পারিতেছি, ইহা ত সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু বৃদ্ধা বাঁচিতে চাহিলেও কাল তাহা শুনিবে কেন? তাঁহার জরাজীর্ণ শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল। শেষে কঠিন পক্ষাঘাত রোগ বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিল। তিনি প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইলেন। বৃদ্ধা অতি কষ্টে কেবল উপাসনার সময় জানু পাতিয়া বসিতে পারিতেন, কুটীরের বাহিরে আসিবার শক্তির লোপ হইল। নিজের শয্যার পার্শ্বে যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহা দিয়া বৃদ্ধা সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কত অর্ণবপোত কত স্থান হইতে কত দিকে যাতায়াত করিত, তাহা দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। সুস্থশরীরে বৃদ্ধা সেই পার্ব্বত্য দেশের যে সকল ব্যক্তির উপকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই দয়ায় তিনি কোনরূপে অনাহার-জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও বৃদ্ধা ভাবিতেন আমি কাজ করিব, যত দিন পারি আমার প্রভুর কাজ করিয়াই মরিব।

শীতকাল সমাগত। পক্ষিগণ নীরব, বৃক্ষলতা পত্রশূন্য, নদনদীগণ কল্লোলরহিত ও নিশ্চল হইল। বসুমতী অমল ধবল পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, প্রচণ্ড উত্তর বায়ু শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া সেই পার্ব্বত্য দেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বৃদ্ধার রোগ আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় আপনার শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেন, প্রভো! আমার কার্য্য কি শেষ হইল? এইবার কি আমায় যাইতে হইবে? যদি এখনও আমার কোন কার্য্য থাকে দাও, তাহা করিয়া জীবন সার্থক করি। শীতের প্রাবল্যের সঙ্গে সেই নির্জন প্রদেশ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল। যুবক যুবতী, বালক বালিকা, ধনী দরিদ্র কত জন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বৃদ্ধার কুটীরের পার্শ্ব দিয়া মহোৎসাহে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার কুটীরের সমীপস্থ একটী সাগর-শাখা শীতে ঘনীভূত হইয়া প্রস্তরের ন্যায় দারুণ কঠিন হইয়াছিল। তাই নিকটবর্ত্তী নগরের অধিবাসিগণ সেই প্রস্তরীভূত সমুদ্রের উপর ক্রীড়া করিবার জন্য সমাগত হইতেন। তাঁহাদিগের উৎসাহের ও আনন্দের সীমা থাকিত না। স্বামী পত্নীর বাহু ধারণ করিয়া, মাতা পুত্রকে পার্শ্বে লইয়া, ভ্রাতা ভগ্নীর হস্ত গ্রহণ করিয়া সেই তুষাররাশির উপর বিচরণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। কত কূর্দ্দন, কত উল্লম্ফন, কত দ্রুত পদ সঞ্চালনে সেই তুষারস্তূপ স্পন্দিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা এক এক সময় গবাক্ষ দিয়া সেই দৃশ্য দেখিতেন, অতীতের কত মধুময় কথা তাঁহার মনে উদিত। পতি পুত্রের সঙ্গে তিনি নিজেও একদিন সে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন কোথায়? তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। নিজের অবস্থার সহিত সমাগত নরনারীগণের অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি বলিতেন "প্রভো! ইহাদিগকে চিরসুখী কর। যদি আমার দ্বারা ইহাদিগের কোন সেবা সম্ভব হয়, নির্দ্দেশ করিয়া দাও।"

শীত শেষ হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধার কুটীর অগ্নিময় হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। ভগবান্! তুমি ধন্য যে বৃদ্ধা রক্ষা পাইলেন। অগ্নি তাঁহার দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তিনি অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, হুতাশন তাঁহার পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্ ভস্মশেষ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

"এ কি ঘটিল ভগবান্! এই মুমূর্ষু অবস্থায় অনাথা বৃদ্ধাকে হঠাৎ এমন নিরাশ্রয়া হইতে হইল কেন? তুমি ভিন্ন কে আর তাঁহাকে আশ্রয় দিবে?" পর্ব্বতচারী মেষপালকদিগের এই কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার প্রেরিত মৃত্যু আসিয়া বৃদ্ধার সকল ক্লেশ—সকল অভাব দূর করিল। পুণ্যবান্ যেখানে আপনার সুকৃতের এবং পাপী যেখানে আপনার দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে, বৃদ্ধা মৃত্যুর পর সেই স্থানে গমন করিলেন। মানব-লেখনী কি সে দেশের অনির্ব্বচনীয়তা প্রকাশ করিতে পারে? অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বৃদ্ধার কর্ণকুহর এবং মধুর গন্ধে তাঁহার নাসিকা পরিতৃপ্ত হইল। দেবদূতগণ বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দূরে মধুর বীণাধ্বনির সঙ্গে কে যেন তাঁহারই প্রশংসা-গীত গান করিতেছিল। বৃদ্ধা বিস্মিত হইলেন, দিব্যমূর্ত্তি দ্বাররক্ষকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু একি! বৃদ্ধা যাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সেই অতুল প্রতাপবান্ কুবের-তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহার ভূস্বামী দ্বারের এক পার্শ্বে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? কেহ তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করিতেছে না, তিনি দ্বাররক্ষকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য কতই অনুনয় বিনয় করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছে না। বৃদ্ধা দেখিবামাত্র ব্যগ্রতার সহিত দ্বাররক্ষকদিগকে বলিলেন; "আপনারা কি ইহাঁকে চিনেন না? ইনি যে আমাদের রাজাধিরাজ, ইঁহাকে এরূপ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন কেন?" দ্বাররক্ষকগণ বলিলেন "ভদ্রে! কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে তোমরা যেমন কার্য্য করিয়া আসিয়াছ, এখানে তেমনই ফল ভোগ করিবে। এখানে রাজা বা প্রজা বলিয়া তারতম্য নাই।" বৃদ্ধা বলিলেন, "তবে আপনাদিগের ভ্রম হইয়াছে, আমি ত জীবনে এমন কোন কার্য্য করি নাই যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী হইতে পারি। আমার প্রভুকে নিবারণ করিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে দিতেছেন কেন?" দেবদূতগণ বলিলেন, তোমার কার্য্য স্বর্গলাভের উপযুক্ত কি না, জগতের মহিমাময় রাজাই তাহার বিচার করিয়াছেন। তুমি চল; এখানে বিলম্বের প্রয়োজন নাই; যেখানে চিরসুখ, চির-আনন্দ বিরাজিত, চল তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাই।" বৃদ্ধা ধীরে ধীরে

অগ্রসর হইলেন। গর্ব্বিত ভূস্বামী দেবদূতগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে এরূপ সৎকৃতা ও আপনাকে তিরস্কৃত দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন, এক্ষণে অগ্রসর হইয়া একজন দ্বাররক্ষককে বলিলেন ;—"দেবদূত এই দরিদ্র রমণী এমন কি কার্য্য করিয়াছে যে, ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছ, আর আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিতেছ না ? আমি ত জীবনে কত অন্নছত্র, কত অনাথশালা, কত বিদ্যালয়, কত দেবমন্দির, কত পাঠাগার স্থাপিত করিয়াছি, তবে আমি স্বর্গলাভের অধিকারী হইলাম না কেন ?" দ্বাররক্ষক বলিলেন, "মানব, তোমার যাহা পুরস্কার, তাহা তুমি যথেষ্টই পাইয়াছ। সম্মান, পদমর্য্যাদা, উপাধি, লোকের কৃতজ্ঞতা তুমি যাহা কিছু চাহিতে, সকলই পাইয়াছিলে; তবে আবার স্বর্গ চাও কেন ? কিন্তু এই বৃদ্ধা কিছুই চাহেন নাই ; ভগবানের নিকটে কেবল কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি আজ তাঁহার অপ্রাপ্ত পুরস্কার পাইতেছেন। কোন্ কার্য্যের জন্য ইনি স্বর্গ রাজ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহা কি তুমি শুনিতে চাও ? তবে শুন। বৃদ্ধার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বের কথা কি তোমার স্মরণ হয় না ? সেই যে বহুসংখ্যক নরনারী তুষারস্তূপের উপর ক্রীড়া করিবার জন্য একত্র হইয়াছিলেন, এই বৃদ্ধা না থাকিলে তাঁহাদিগের একটী প্রাণীও রক্ষা পাইত না। বৃদ্ধা আপনার গবাক্ষদ্বার দিয়া তাঁহাদিগের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে আকাশের এক প্রান্তে সিন্দূররেখা-মণ্ডিত এক ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড উদিত হইল। সেরূপ মেঘ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে দিন হয়, সেই দিন এমনি উত্তপ্ত বায়ু সহসা উত্থিত হয় যে তাহা স্পর্শমাত্র প্রস্তরের ন্যায় কঠিন তুষারস্তূপও ভগ্ন ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। বৃদ্ধা তাহা জানিতেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় সেই সকল ক্রীড়াশীল নরনারীগণের রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চলৎশক্তিরহিতা ছিলেন, নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। দূর হইতে চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিতে পাইত না। তাই তিনি নিজের গৃহে নিজেই অগ্নিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার গৃহ প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া হতভাগিনী বৃদ্ধা পুড়িয়া মরিতেছে ভাবিয়া তুষারের উপর ক্রীড়াশীল নর-নারীগণ সেই দিকে ধাবমান হইবে, এবং আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। তাঁহার চেষ্টাও সফল হইয়াছিল। তিনি গৃহে অগ্নি দিয়া বাহিরে আসিবামাত্র কাষ্ঠময় গৃহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং দেখিয়া ক্রীড়াশীল নরনারীগণ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় এমন প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল যে, তাহার স্পর্শে সেই বিনাশী তুষারস্তূপ তৎক্ষণাৎ খণ্ডে খণ্ডে ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃদ্ধার কৌশল ব্যতীত ক্রীড়াশীল সেই

নরনারীর মধ্যে প্রত্যেকেই সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার বড়ই সাধ ছিল, অপনার মস্তক রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই আজ জগতের ন্যায়বান্ বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে শ্রীচরণে স্থান দান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিয়াছেন।

দেব-দূত নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত ভূস্বামীকে বাহিরে রাখিয়া, বজ্রনিনাদে স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইল। পুণ্যবতী কুটীরবাসিনী আপনার সুকৃতির পুরস্কার লাভের জন্য চিরানন্দময় স্বর্গপুরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম দর্শন।

গত পূজাবকাশে আমরা কোনও কার্য্যোপলক্ষে বৈদ্যনাথে যাই, তাহাতে কুষ্ঠাশ্রম দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। বৈদ্যনাথ দেব-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৈদ্যনাথের এক প্রান্তে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। চারি দিকে নির্জ্জন ও মনোহর পার্ব্বতীয় দৃশ্য, তন্মধ্যে এক উচ্চ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে কুষ্ঠাশ্রমের স্থান। একটী সুন্দর প্রশস্ত বর্ত্ম দ্বারা আশ্রমটী দেওঘর নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। রোগীদিগের জন্য ৪টী পাকা গৃহ ও রন্ধনশালা প্রভৃতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে ২৫।৩০টী রোগীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। আপাততঃ ১৯টী রোগী আছে, তন্মধ্যে ১৮টী পুরুষ ও ১টী স্ত্রীলোক। আশ্রমের এক প্রান্তে একটী গভীর কূপ খনিত ও ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সকল ঋতুতেই জলের অভাব মোচন হয়। আশ্রমের প্রাঙ্গণে কুষ্ঠিয়ারা নিজে পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি ফুল ও তরকারীর গাছ রোপণ করিয়াছে, তাহাতে স্থানটী সুশোভিত হইয়াছে। প্রত্যেক রোগীকে পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র এবং শয্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহারা অনেকটা স্বচ্ছন্দে আছে বোধ হইল। যাহারা এক সময় নিরাশ্রয় হইয়া অন্ন বস্ত্রাভাবে পথে ঘাটে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিত এবং কতজন সেই অবস্থায় মরিয়া যাইত, তাহাদিগের আজি ইষ্টকালয়ে বাস, যথাসময়ে অন্নবস্ত্র এবং সেবা শুশ্রূষা লাভ পরম ভাগ্য বলিতে হইবে এবং তাহারা তাহা অনুভব করিয়া দয়ালু পরমেশ্বর ও হিতৈষী জনগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা যখন দেখিতে গেলাম, তখন বেলা শেষ হইয়াছে। গিয়াই দেখি, কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে একজন কাশীরামদাসের মহাভারত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, আর অনেকে চারি দিক্ ঘেরিয়া তাহা

শ্রবণ করিতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য! ইহাদের মধ্যে কতক বাঙ্গালী আছে, কিন্তু অন্যে, অন্য দেশবাসী হইয়াও পুথি পড়া শুনিতে ভালবাসে ও তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া সুখী হয়। পাঠক নিজে বাঙ্গালী না হইয়াও বাঙ্গালা বেশ শিখিয়াছে, নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং অপর সকলকে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দেয়। সে ব্যক্তি দুঃখ করিতে লাগিল যে, রোগে তাহার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং সে বোধ হয় কিছুদিন পরে আর পুথি পড়িতে পারিবে না।

আমাদিগকে দেখিয়া রোগী সকল অতি ভদ্রভাবে অভিবাদন করিল এবং তাহাদিগের সুখ দুঃখের কথা অনেক বলিল। পরে আমরা আশ্রমের এক প্রান্তে তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বসিলাম। দেখিলাম তাহাদিগের সকলে আমাদিগকে ঘেরিয়া বসিল, অনেকে কষ্ট করিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা প্রায় এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের আরাধনা, গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলাম, তাহারা শান্তভাবে আমাদের সহিত যোগদান করিল এবং মধ্যে মধ্যে "জয় জগদীশ্বর, জয় বিশ্বেশ্বর, জয় বৈদ্যনাথ" বলিয়া উৎসাহের সহিত আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ঈশ্বরের নাম মহাব্যাধিগ্রস্তদিগের মহৌষধ ও পরম শান্তির কারণ, ইহা যেন তাহারা বুঝিয়াছে বোধ হইল। পরে সন্ধ্যার সহিত হিমাগম দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতে বলিয়া বিদায় লইলাম।

এই আশ্রমটী বৈদ্যনাথের একটী পুণ্য-তীর্থ। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু এবং দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজকুমারী প্রভৃত অর্থ-দানে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্যের সহায়তা করিয়া ইহকালে মহাকীর্ত্তি এবং পরকালে পরম সুখলাভের অধিকারিণী হইয়াছেন। যাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে অর্থদান এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সে অর্থ ও পরিশ্রমের সার্থকতা হইয়াছে। এখন আশ্রমের অভাব একটী উপযুক্ত স্থায়ী ফণ্ড। অন্যূন ৫০ হাজার টাকা না হইলে তাহার কোম্পানীর কাগজের সুদে ২০।২৫টী রোগীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে না। ইহার চতুর্থাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এ দেশের সকল ধনাঢ্য নরনারী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়া স্থায়ী ফণ্ডকে পরিপুষ্ট করিবেন এবং তাঁহারা দীনহীন কুষ্ঠরোগী-দিগের ও দীনহীনেরবন্ধু পরমেশ্বরের চির-আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অল্প বেলা আছে—সূর্য্য ডুবু ডুবু—ক্ষীণতেজ রৌদ্র তরুশিরে, সৌধশিখরে, নদীগর্ভে একটু একটু ঝিকিমিকি করিতেছে, এমন সময়ে কয়েকজন বেহারা একখানি পাল্কি স্কন্ধে করিয়া হুঁ হুঁ করিতে করিতে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরের রায়েদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাল্কির অগ্রে অগ্রে এক দীর্ঘকায় ভোজপুরী দরোয়ান—তাহার মস্তকে লাল পাগড়ী—গায়ে একটী হিন্দুস্থানী জামা—পায়ে নাগরা জুতা—ওষ্ঠের দুইধারে বিস্তৃত গুম্ফদ্বয় এবং মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই সুদীর্ঘ জুল্‌পি। পাল্কির সমভিব্যাহারী ঝি পাল্কির দরজা খুলিয়া পাখা হস্তে তাহার ভিতর বাতাস করিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে হেঁট হইয়া পাল্কির ভিতর মাথা প্রবেশ করতঃ ফুস্ ফাস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল।

বালকেরা বাহিরে খেলা করিতেছিল, দৌড়িয়া গিয়া বাটীর ভিতরে খবর দিল। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া পাল্কির মধ্য হইতে একটী টুক্‌টুকে বৌকে হাত ধরিয়া তুলিল, বৌ তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর আসিল। একটী ৪।৫ বৎসরের বালক, "আঙা বৌ এসেছে—আমাদের আঙা বৌ এসেছে গো গো" এই বলিয়া দৌড়িতে লাগিল।

বধূ বাটীর ভিতর আসিল, শাশুড়ী মাতা তাহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক "এস মা এস" বলিয়া হাত ধরিয়া একখানি পিড়ীর উপর বসাইলেন। নববধূর লজ্জা নিবারণ ঘোমটা একহস্ত পরিমাণ—সে আনত-মস্তকে তথায় বসিয়া রহিল। পাড়ার মেয়েরা রথদোলযাত্রীর ন্যায় দলে দলে রায়েদের কনে বৌ দেখিতে আসিল। কনে বউ বড়মানুষের মেয়ে, হীরা মুক্তায় জড়িত—ঘর আলো ক'রে, বসিয়া আছে। যে প্রতিবেশিনী আসে, একবার করিয়া তাহার ঘোমটা উত্তোলন করিয়া মুখ দেখে, আর বলে, "বাঃ বেশ সুন্দর বউ হ'য়েছে, রায়গিন্নী ঠাকুরণের ঘর স্বর্ণ প্রতিমায় আলো ক'রেছে।" ঘোমটা খুলিলেই বউ চক্ষু মুদিয়া থাকে। কেহ ১ মিনিট, কেহ ২ মিনিট, কেহ ৩ মিনিট তাহার ঘোমটা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া বউ দেখা চলিল। একে জ্যৈষ্ঠমাস—তাহাতে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা বউ, গ্রীষ্মাতিশয্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল। তাহার বাপের বাড়ীর ঝি আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকুরণরা ত বউ দেখিয়াছেন, এখন একটু সরিলে আমি উহাকে বাতাস করি—উনি একটু হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থ হউন। বড়-মানুষের মেয়ে, সুখের শরীর, উহার বড় কষ্ট হইতেছে।" এই বলাতে প্রতি-বেশিনীরা চলিয়া গেল। ঝি তাহার

গায়ের কাপড় খুলিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সমাগম—নরেন্দ্রনাথ বাটী আসিলেন। গ্রীষ্মাবকাশে তাঁহার কলেজ বন্ধ—তিনি এইক্ষণে দেশে আছেন। নরেন্দ্র নাথ কাঞ্চন নগরের রায়েদের বাটীর গোপীকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পৌত্র—সত্যচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র। তিনি এইক্ষণে কলিকাতার ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টীটিউসনে বি, এ, ক্লাশে পাঠ করেন—এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিবেন। নরেন্দ্রনাথ সুধীর, সভ্য, সত্যপ্রিয় ও সকলের প্রিয়দর্শন। তবে বনিয়াদি ঘরের ছেলে বলিয়া মনে একটু অভিমান আছে। তাঁহার পিতার অবস্থা এক্ষণে তাদৃশ সচ্ছল নহে—অনেক দিন সংসার ধারকর্জ্জের উপর চলিয়া থাকে। দুই একখানি করিয়া চক চাকড়া বন্ধক দিয়া এক্ষণে প্রায় এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাইমোহন।—রাইমোহন একটু উদ্ধতস্বভাব, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা। নরেন্দ্র ও রাই এই দুই পুত্র, পিতার বৃদ্ধাবস্থার অবলম্বন। রাইমোহনের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্ত্রী এক্ষণে পিত্রালয়ে। নবাগত বধূটী নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী—নাম সরোজবালা।

নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী গৃহের বড় বউ—আদরের সামগ্রী—শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। সে বড়মানুষের মেয়ে ব'লে তাহাকে খাইতে পরিতে কোন কষ্ট দেন না। আপনারা কষ্ট পাইলেও তাহাকে রাজরাণীর মতন করিয়া রাখেন। বউ কাজের মধ্যে কার্পেট বুনেন, নভেল ও কবিতা পড়েন, আর স্বামীর জন্য পান সাজেন। এইরূপে সরোজবালা শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ সরোবরে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া স্বামীর সোহাগহিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে লাগিল। স্বামী তাহার আব্দার মত কলিকাতা হইতে ভাল জরি, ফিতা, সাবান, টোয়ালে এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য আনিয়া দিতে লাগিলেন। সে একে বড়মানুষের মেয়ে, তাহার উপর শ্বশুরবাটীতে সুখের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া বিলাসিতার চরম সীমায় উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িলেন—সে এক্ষণে নরেন্দ্রের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী। তাহার মনোমুগ্ধকর মন্ত্র প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছেন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথের একটী পুত্রসন্তান হইল। বাটীতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

রাইমোহনের স্ত্রী সুশীলা শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছে। সুশীলা, সুধীরা, শান্তস্বভাবা ও সরলা। সে গৃহস্থ ঘরের বউএর ন্যায়, স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীর বিশেষ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সে গৃহের উন্‌কোটি চৌষট্টি কাজ আপনার হস্তে করিয়া থাকে, শ্বশুর শাশুড়ীকে নড়িতে দেয় না—সে গৃহস্থের মেয়ে, বড়মানুষের মেয়ে নহে; তাহার গৃহস্থালীর প্রতি অতিশয় যত্ন। আপনার সুখের জন্য পাগল নহে। শ্বশুর

শাশুড়ী তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ যত্নে ও সেবায় যৎপরোনাস্তি প্রীত এবং তাঁহারা দশ মুখে তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। পাড়া প্রতিবাসীরাও তাহার আচার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সুখ্যাতি ও প্রশংসা করে। এই সমস্ত আর সরোজবালার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি গোপনে বারুদে আগুন লাগাইয়া লঙ্কাকাণ্ড করিবার চেষ্টায় রহিলেন।

সরোজবালা মুখরা, প্রখরা ও চতুরা। শ্বশুরবাড়ী বলিয়া অনেক সময়ে চাপিয়া চলিতেন। বড়মানুষের মেয়ে বলিয়া মনে বেশ একটু গরিমা ছিল—কাহাকেও তিনি আপনার সমান জ্ঞান করিতে পারিতেন না। কাহাকে তিনি ভাল খাইতে পরিতে দেখিলে কুণ্ঠিতা হইতেন এবং বলিতেন, "ইস্ এর আবার যে বড় বড়মানুষি, এ আবার টাকা পেলে কোথায়?" একটী পুত্রসন্তানের জননী হইয়া স্বামীর উপর তাহার প্রভুত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দাম্ভিকা ও প্রচণ্ডা হইয়াছেন। কিন্তু এখনও শ্বশুরবাড়ীতে আছেন, এটাও সময়ে সময়ে একটু একটু ভাবিতেন। তিনি স্বামীকে প্রত্যহ কহিতে লাগিলেন "আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও, আমি আর এখানে থাকিব না—আমার বড় কষ্ট হইতেছে—ছোট দিদি আমার হিংসেতে মরেন, পোড়া লোকে কেবল তাহাকে ভালবাসে, আমাকে দেখ্‌তে পারে না।" এ দিকে সরোজবালা কলিকাতায় স্বহস্তে পিত্রালয়ে চিঠি লিখিলেন, "বাবা আমাকে শীঘ্র লইয়া যাইবেন, আমার এখানে বড় কষ্ট হইতেছে।"

একদিন প্রাতে সরোজবালার ভ্রাতা ইন্দুভূষণ বসু, তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাইকে দেখিয়া ভগ্নীর আহ্লাদের সীমা রহিল না—তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শরসন্ধান অব্যর্থ হইয়াছে—এইবার তিনি নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী যাইবেন। ইন্দুভূষণ সেই দিবস অবস্থিতি করিয়া পরদিবস বৈকালে ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নরেন্দ্রও স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। বড়বউ শ্বশুরবাড়াতে ২।১টী ভাবের লোকের নিকট শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, "তাঁহারা চখের মাথা খাইয়া কেবল আমার দোষ দেখেন, আমি তাঁহাদের পাতে বিষ গুলিয়া দিয়াছি, আর ছোট বউ তাঁদের মিছরীর কুঁদো—যা বলে তা মিষ্টি, যা করে তা মিষ্টি, ছোট বৌএর সব ভাল—এখন আমি বাপের বাড়ী চলে যাব—আমার বাপের ভাত আছে,—ওঁরা ওঁদের প্রাণের ছোট বউকে নিয়ে ঘর করুন—আমি আর এখানে থাকিব না—অমন শ্বশুর শাশুড়ীর মুখ দেখ্‌তে চাই না—দেখি আমাকে কে আনে?" বড় বউ চলিয়া যাইলে সেই সকল ভাবের লোক রায় গিন্নীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। রায় গিন্নী ক্ষোভে ও রাগে বড় বউকে যৎপরানাস্তি ভৎর্সনা করিলেন

—তাঁহার মন একেবারে তাহার প্রতি জ্বলিয়া গেল। তিনি নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা ! শুনিয়াছ, তোমার স্ত্রীর কথা—আমাদের নামে যা নয় তাই বলিয়া গিয়াছে—না জানি সেখানেও কত বলিতেছে।" নরেন্দ্রনাথ মায়ের নিকট স্বীয় পত্নীর জঘন্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তথা হইতে নতমস্তকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি অনেক দিন শ্বশুরালয়ে গমন করেন নাই। পরে শ্বশুর শাশুড়ী, স্ত্রী ও শ্যালকদিগের উপর্য্যুপরি পত্রানুরোধে মধ্যে মধ্যে দুই একবার যাইতেন।

দুর্ব্বল মানুষের মন প্রাসাদচূড়াস্থিত বায়ু-নিরূপক কলের ন্যায়—প্রতি ঘটনা-বাতে ঘুরিয়া যায়। যে নরেন্দ্র শ্বশুরবাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিতেন না—যাইলেও ত্রিরাত্রি যাপন করিতে চাহিতেন না, তিনি এক্ষণে স্থায়িভাবে শ্বশুরবাড়ী গিয়া উঠিলেন—তথায় শিকড় গাড়িলেন—আর নড়িতে চাহেন না। তথায় তাঁহার আর একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। তাঁহার পরিবার-বৃদ্ধির সহিত খরচের সীমাও বাড়িল। শ্বশুর মহাশয়ও কিছুদিন যত্নের সহিত জামাতাকে বাটীতে রাখিয়া এক্ষণে আর অধিক ব্যয় করিতে চাহেন না—জামাতার প্রতি তাঁহার অসন্তোষভাব প্রায় পদে পদে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দশজনের নিকট বলিতে লাগিলেন, "ঐ একটা অকর্ম্মা বিধবা জামাই আমার কাঁধে চাপিয়া রহিয়াছে, উহার জন্য আমি খরচান্ত হইলাম—আমি আর পারি না।" এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি লজ্জায় ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন, কিন্তু কি করেন, পড়িয়া পড়িয়া সকলি সহ্য করিতে লাগিলেন। স্ত্রী তাঁহার এখানে মুখ খুলিয়াছেন; সেও দশ কথা বলিতে ছাড়ে না। সে শ্বশুরবাড়ীতে আর যাইবে না। নরেন্দ্রনাথও আর তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর কালীপ্রসন্ন বাবু একজন বুনিয়াদী জমিদার বা ধনশালী ব্যক্তি নহেন। তিনি কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। ইদানীন্তন কতিপয় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মত তিনি আপনার নাম জাহির করিতে ও ধুমধাম দেখাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া আছে, সইস কোচম্যান আছে, ছেলের বাটীতে পড়াইবার মাষ্টার আছে, ঝি চাকর আছে, রাঁধুনী আছে, শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রকন্যারা আছে, মেয়ে জামাই আছে, অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্ব স্বজন আছে এবং তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ ব্যয়াধিক্য—এই সমস্ত তিনি লোকের নিকট গল্প করিয়া আপনার গুরুত্ব বাড়াইতেন। লোকের প্রকৃত উপকার-চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত কি না সন্দেহের বিষয়। যাহাদিগকে বাটীতে রাখিতেন, তাহাদিগের নিকট দ্বিগুণ কাজ আদায় করিয়া লইতেন, তাহাতে তাঁহার লাভ বই লোকসান ছিল না। কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন বাবুর

মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সংসারের কর্ত্তা হইল—সে ভগ্নীপতিকে নিজ সংসারে না রাখিয়া পৃথক্ করিয়া দিল, কিন্তু বাটীতে থাকিবার জন্য একটী ঘর দিল। নরেন্দ্রনাথ কি করেন, অগত্যা একটী চাকুরির অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন—কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন, একটী বিদ্যালয়ে একটী মাষ্টারি কার্য্য জুটিল—বেতন ৪০৲ টাকা।

(ক্রমশঃ)

ট্রান্সভাল যুদ্ধ।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অধিপতি ইংরাজরাজ এখন ক্ষমতা ও আধিপত্যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সসাগরা ধরা যথার্থই ইহাঁর করতলস্থ এবং ইহাঁর বিক্রমে ও প্রতাপে পৃথিবীর সকল জাতি সংত্রস্ত। ইংরাজ সম্মুখ-সমরে কোন্ জাতিকে না পরাস্ত করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক কৌশলে কোন্ শত্রুকুলকে না মিত্রতায় আবদ্ধ করিয়াছেন? বৎসরের পর বৎসর বহুদিন ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া মহাসভা উদ্‌ঘাটনকালে আনন্দ-সমাচার প্রচার করেন—"আমার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি এবং বৈদেশিকদিগের সহিত আমার বন্ধুভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" কিন্তু হঠাৎ সুদূর দক্ষিণ মহাসাগর-তীরে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত! যাহারা মিত্রজাতি ছিল, তাহারা ঘোর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান, যাহারা দুর্ব্বল অধীনপ্রায় ছিল, তাহারা রণোন্মত্ত হইয়া ইংরাজরাজ্য গ্রাসে অগ্রসর। এই অভাবনীয় ব্যাপারের জন্য অকালে পার্লেমেণ্টের উদ্বোধন হইয়াছে, পৃথিবীব্যাপী ইংরাজরাজ্য সকল হইতে সৈন্যসমাবেশ হইতেছে এবং ইংলণ্ডের ছোট বড় সকলে রণরঙ্গে মাতিবার জন্য অস্থির।

ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্রের বোয়ারগণ ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। ট্রান্সভাল ও বোয়ার শব্দ এতকাল এদেশে অশ্রুত ও অপরিচিত ছিল। বস্তুতঃ ট্রান্সভাল আফ্রিকার দক্ষিণাংশের যেরূপ একটী ক্ষুদ্র দেশ, তাহা আমাদের বঙ্গ দেশের একটী জেলা বলিলে হয়। কোথায় সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী ইংরাজ-সাম্রাজ্য, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র দেশ! আর বোয়ার একটী সামান্য অর্দ্ধ-সভ্য জাতি, দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশীদিগের বংশ হইতে উৎপন্ন, সুসভ্য ইংরাজদিগের সম্মুখে তাহারা নগণ্য। তথাপি এই ক্ষুদ্র দেশবাসী ক্ষুদ্র জাতির বিশ্বাস তাহারা জয়ী হইবে এবং ইংরাজদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে। তাহাদের এরূপ অসমসাহসিকতার একটু কারণ আছে, কয়েক বৎসর হইল একদল ইংরাজ সেনার সহিত তাহাদের সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে "মাজুবা" নামক রণক্ষেত্রে তাহারা জয়লাভ

করিয়া ইংরাজ সেনাদিগকে বন্দী করে এবং পরে ইংলণ্ড তাহাদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। তাহাদের আশা এবারেও তাহারা বিজয়ী হইবে এবং ইংলণ্ড তাহাদের ভয়ে ভীত হইবে। এই আশায় তাহাদের জাতীয় সমুদায় লোক—যুবক, বালক, বৃদ্ধ সকলে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে—এমন কি স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের সহিত প্রতিবেশী "অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট" নামক রাজ্যও যোগ দিয়াছে।

ট্রান্সভালের প্রধান অধিনায়ক প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার, তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর। ইনি একজন অতি অসাধারণ লোক, যেমন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ। সেনাপতি জুবার্ট ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত, তিনিও সুশিক্ষিত ও রণবিদ্যায় ধুরন্ধর। অরেঞ্জ ষ্টেটের অধিনায়ক প্রেসিডেণ্ট ষ্টিনও একজন মহৎ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইংরাজপক্ষের সেনা-নায়ক ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাধ্যক্ষ সার জর্জ হোয়াইট ও সার রেডভাস বুলার। এখন বুলারেরই প্রধান কর্ত্তৃত্ব।

এই যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়, কিন্তু প্রধান ও নিগূঢ় কারণ ট্রান্সভালের স্বর্ণখনি বলিয়া বোধ হয়। ৭।৮ বৎসর হইল এই স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজগণ এই স্বর্ণলাভের জন্য দলে দলে তথায় উপস্থিত হন। কয়েক বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হাজার হইয়া দাঁড়ায়। বোয়ারগণ "উটল্যাণ্ডার" বা বিদেশী বলিয়া তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা দেশবাসীদিগের সমকক্ষ হইয়া তাহাদিগের সহিত সমাধিকার লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইংলণ্ড যদিও ট্রান্সভালের স্বাধীনতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার " Suzerainty " বা চক্রবর্ত্তিত্ব আছে বলিয়া বোয়ারদিগকে তাঁহার ইচ্ছানুসারী হইতে হইবে বলিলেন। বোয়ারগণ ইংলণ্ড ভিন্ন আর কোনও রাজ্যকে "সালিসী" মানিয়া এই বিষয়ের বিচার করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত না হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রমে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বোয়ারগণ ইংলণ্ডের অভিসন্ধি ভাল নয় সন্দেহ করিয়া চরম পত্র (ultimatum) এই মর্ম্মে লিখিলেন "৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নবাগত ইংরাজ সৈন্য সকলকে সরাইতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ অপরিহার্য্য।" ইংরাজগণ বোয়ারগণের এই দুঃসাহসিকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আর কোনও উত্তর দিবার পথ নাই জানাইলেন। ইহা হইতেই যুদ্ধের উৎপত্তি।

গত অক্টোবরের মাঝামাঝি (আশ্বিন মাসের শেষে) যুদ্ধ ঘোষণা হয়। বোয়ারগণ প্রথমতঃ দুইখানি ইংরাজ রেলগাড়ী দখল করে, তাহার একখানি সৈন্যে পূর্ণ ছিল, আর একখানিতে সংবাদদাতা সকল ও

কোন কোন সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁরা বোয়ার-হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছেন। বোয়ারেরা ইংরাজদের রেলপথ ও টেলিগ্রাফ যেখানে পাইয়াছে নষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহাদের যাতায়াতের পথের অনেক সেতুও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

প্রথম যুদ্ধ গ্লেঙ্কোতে হয়, তাহাতে ইংরাজদের সেনাপতি জেনারল সাইমন্স এবং বোয়ারদিগের সেনাপতি জুবার্ট। ইংরাজেরা সমতল ভূমিতে, আর বোয়ারেরা পর্ব্বত-শিখরে থাকিয়া যুদ্ধ করে। বোয়ারেরা প্রথমে হঠিয়া যায়, কিন্তু পরে প্রবল তেজে আক্রমণ করিয়া ইংরাজ সেনাদলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। এই যুদ্ধে প্রায় ৩০০ ইংরাজ হত হয়, তন্মধ্যে অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী। স্বয়ং সেনাপতি সাইমন্স গুরুতররূপে আহত হইয়া শত্রুহস্তে পতিত হন। শত্রুরা যথোচিত সেবাশুশ্রূষা করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না, পরে সসম্মানে তাঁহার শবদেহ সমাধিস্থ করিল। জেনারল হোয়াইট বহু সৈন্য লইয়া লেডীস্মিথ নামক ইংরাজ-নগরে আছেন। জেনারল ইউল একদল সৈন্য লইয়া শত্রুহস্ত এড়াইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই সম্মিলন-সাধনে অরেঞ্জ ষ্টেটের বোয়ারগণের সহিত জেনারল হোয়াইটের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ৩০ জন ইংরাজ হত ও ৯৩ জন আহত হয়। গত অক্টোবর মাসের শেষে ইংরাজ পক্ষে আর একটী মহাদুর্ঘটনা হয়। গ্লেঙ্কোর যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের গতিরোধের জন্য জেনারল হোয়াইট ৪০ জন সেনাধ্যক্ষের সহিত ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে। তাহারা অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রসহ তাহাদের অনেকগুলি অশ্বতর শত্রুদলে মিশিয়া যাওয়াতে তাহারা নিরুপায় হইয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করে। বোয়ারদিগের প্রশংসার বিষয় এই, যখন এই বন্দী সৈন্য তাহাদের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে নীত হইল, তখন সকলে গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।'

বোয়ারদিগের পক্ষে আরও কিছু সৌভাগ্য ঘটিল। তাহারা কোলেঞ্জোনগর অধিকার করিল, নেটালের প্রায় সমুদায় উত্তর ভাগে আধিপত্য স্থাপন করিল এবং ইংরাজাধিকারবাসী অনেক বোয়ারকেও স্বদলভুক্ত করিতে সমর্থ হইল। এ দিকে বোয়ারগণ মেফকিং, কিম্বার্লী ও লেডীস্মিথ অবরোধ করিয়াছে। কিম্বার্লীতে বহুলক্ষ টাকার হীরক সংগৃহীত আছে। লেডীস্মিথে সেনাপতি হোয়াইট অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্য লইয়া ছাউনী করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল স্থান হইতে বার বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতেছে, বোয়ারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না, বরং বার বার হঠিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মাথুয়েন বেলমণ্ট ও গ্রাসপান যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ

সৈন্য কম থাকাতে বোয়ারদিগের বিক্রম ও সাহস বাড়িয়াছিল, কিন্তু এখন ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে দলে দলে সৈন্য সকল আসিয়া সমবেত হইতেছে। নৌ-সেনা সকলও রণতরীতে থাকিয়া স্থল সৈন্যের সহায়তা করিতেছে। মুষ্টিমেয় বোয়ার সৈন্য অসংখ্য ইংরাজবাহিনীর নিকট কতক্ষণ যুঝিবে? প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার গতিক দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছেন, এইরূপ জনরব। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এখনও অধিক কাণ্ড ঘটে নাই, উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি নিবারিত হউক এবং নূতন বিংশ শতাব্দী ধরাতলে শান্তির সহিত অবতীর্ণ হউক।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৫ই অগ্রহায়ণ কুচবিহারের মহারাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী সুকৃতির সহিত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সিভিলিয়ান পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্না নাথ ঘোষালের শুভবিবাহ আলীপুরের উডল্যাণ্ড রাজোদ্যানে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জগদীশ্বর বরকন্যাকে চিরসুখী করুন্।

২। বোম্বাইয়ে লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্টের স্থানে সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট গবর্ণর হইয়া আসিয়াছেন।

৩। পারসী দানবীর টাটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

৪। এতদিন বিলাত হইতে ষ্টিম এন্-জিন তৈয়ার হইয়া আসিত, সম্প্রতি জামালপুরে এ ডবলিউ রেণ্ডেল এক এঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা লেডী কুর্জন নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজ-প্রতিনিধি সহধর্ম্মিণীসহ কাল্কা হইতে দিল্লীতে এই এঞ্জিনযুক্ত রেল-শকট চড়িয়া আসিয়াছেন।

৫। আমাদের যুবরাজ-পত্নীর বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া আরও হিতব্রত সাধন করুন্।

৬। লর্ড মেয়রের ট্রান্সভাল যুদ্ধফণ্ডে কলিকাতা হইতে ৭৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৭। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের মধ্যে রাজপুতানা প্রথম এবং বোম্বাই দ্বিতীয় স্থানীয়। দুর্ভিক্ষের **প্রকোপ** ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গত সপ্তাহে সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছিল, নবেম্বরে ডিসেম্বরে প্রায় ১৪ লক্ষ হইয়াছে।

৮। জর্ম্মণ সম্রাট্ উইলিয়ম সাম্রাজ্ঞীর সহিত ইংলণ্ড দর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। ইংরাজ সাধারণ তাঁহাকে বহু

প্রকারে সমাদর প্রদর্শনে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বোধ হয় বৃদ্ধা দিদিমা ইংলণ্ডেশ্বরীকেই দেখিতে গিয়াছিলেন।

৯। এ বৎসর সমুদায় পৃথিবীতে গমের চাষ কমিয়াছে, তাহাতে গম ৩০ কোটি বুসেল কম হইয়াছে।

১০। বেঙের ছাতা উদ্ভিদের মধ্যে নগণ্য, কিন্তু ইহার চাষে অসম্ভব লাভ। কৃষিবিদ্যা বিষয়ক কোনও পত্রিকায় লিখিয়াছে, এক একর বা ৩ বিঘা জমিতে উৎপন্নের মূল্য ১৪৫২ পাউণ্ড বা প্রায় ২১,৭৮০ টাকা। খরচ বাদে লাভ বিঘা প্রতি প্রায় ৪০০০ টাকা।

১১। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড সালিসবরীর পত্নী গতাসু হইয়াছেন, লর্ড স্বয়ং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পীড়িত। ঈশ্বর এ দুঃসময়ে তাঁহাকে রক্ষা করুন্।

বামারচনা।

নীরবে।

নীরবে জনম মম—
গাইবেরে নিতি নিতি,—
নীরবে আমার প্রাণ
প্রাণের নীরব গীতি। ১।
নীরব আকাশে শশী,
নীরবে নীরবে ভাসি
প্রচারে মহিমা তাঁর
নীরবে নীরবে হাসি। ২।
প্রভাতে তরুণ রবি
নীরবে নভে উঠিছে,
অযুত কিরণধারা
নীরব রবে ঢালিছে। ৩।
নীরবে নীরদ উঠে
নীরবে আকাশে ধায়,
সুনীল গগনে তারা
নীরবে নীরবে চায়। ৪।
নীরব বরষ আসে
নীরবে বরষ যায়;
বিস্তীর্ণ জলধি পাশে
নীরবে তটিনী ধায়। ৫।
নীরবে কুসুম ফুটে
নীরবে ঝরিয়া যায়;
প্রাণের বেদনা দুঃখী
নীরবে নীরবে গায়। ৬।
নীরবে নলিনী ফুটে
প্রভাতে রবির আশে;
নীরবে আদর করে—
যায় না তাহার পাশে। ৭।
নীরবেতে আত্মা পক্ষী
বাস করে দেহনীড়ে,
নীরবেতে যায় উড়ে
সকল বন্ধন ছিঁড়ে। ৮।
নীরবে পরাণে মম
ফোটে নিত্য কত আশা;

নীরবেতে কহি কত
প্রাণের নীরব ভাষা। ৯।
নীরবে সে স্নেহ করে,
নীরবে আইসে পাশে ;
নীরবে সাধনা তার
সাধি আমি তারি আশে। ১০
তার সে অমৃত বাণী
নীরবে আমার প্রাণে,—
করি প্রাণ মধুময়
বাজিছে মধুর তানে। ১১।
নীরবে এ প্রাণ মন
সঁপেছি যাহার করে ;
নীরবে নীরবে সদা
সে যে অন্তরে বিহরে। ১২।
নীরবে মরণ মোরে
করিবেরে আলিঙ্গন ;
নীরবে চলিয়া যাব
ছাড়ি বন্ধু প্রিয়জন। ১৩।
নীরবে প্রাণেশে মম
দেখি আমি দিবা রাতি ;
নীরবে পালেন মোরে
হইয়ে পতির পতি। ১৪।

শান্তি।

অনন্ত আকাশে অনন্ত সাগর,
অনন্ত এ সৃষ্টি যত চরাচর,
অনাদি অনন্ত যত মরামর,
এক লক্ষ্য প্রতি সকলেই ধায়।১॥
সকলেরি দৃষ্টি একই প্রদেশে,
সকলেরি যাত্রা সেই এক দেশে,
সকলেরি যত্ন অশেষ বিশেষে,
কবে কত দিনে যাইবে তথায় ? ২ ॥
চাহে সবে সুখ কিসে শান্তি পাবে,
সকলেই চায় কেমনে জুড়াবে,
লক্ষ্য সব এক কিন্তু পথাভাবে,
জ্বলিতেছে কেহ দ্বিগুণ জ্বালায়।৩॥
মরিছে বিহঙ্গ আহার আশায়,
পুড়িছে পতঙ্গ প্রদীপ-শিখায়,
পোড়ে সূর্য্যমুখী পূজি সবিতায়,
উচ্চশির গিরি ভাঙ্গে ঝটিকায়।৪॥
নির্ব্বোধ মানব উন্মত্তের প্রায়,
উন্নত মস্তক জ্ঞান গরিমায়,
খুঁজে জল-তল দামিনী-প্রভায়,
জুড়াইতে চাহি—জ্বলে লালসায়।৫॥
উচ্চ রবে সবে ডাকে "শান্তি শান্তি"
প্রতিধ্বনি গায় "অশান্তি অশান্তি" !
"যত দিন রবে এই ঘোর ভ্রান্তি"
"সুখের চরম কামনা সেবায়"।৬॥
"কামনা যে বহ্নি জেনেও জাননা"
"কামনা যে বহ্নি জেনেও ছাড়না।"
"মোহের ছলনা দেখেও দেখ না"
"পুড়ে মর তাহে পতঙ্গের প্রায়"।৭॥
"দুদিনের তরে এই রঙ্গস্থল,"
"তোমরা তাহাতে অভিনেতৃ-দল।"
"পালা হলে শেষ কে রহিবে বল ?"
"ভোগাভোগ সার মাত্র এ ধরায়"।৮॥

"রঙ্গস্থল কভু ভেব না স্বদেশ"
"রঙ্গভূমি-বেশ ভেব না স্ববেশ !"
"করি কার্য্য শেষ যেতে নিজদেশ"
"কর সদা পুণ্য পাথেয় সঞ্চয়।" ৯॥
"মানব জীবন কর্ত্তব্যের তরে"
"কর্ত্তব্যপালন কর প্রেম-ভরে"
"কর্ত্তব্য লঙ্ঘনে অশান্তি সাগরে"
"ডুবিতে হইবে জানিও নিশ্চয়।"১০॥
কর্ম্মে অধিকার আছয়ে তোমার,
"জয় পরাজয় লাভালাভ তার—
সে সকল জেন বিধি বিধাতার,
তার তরে দুঃখ শোক কিছু নয়।" ১১।
"ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কর প্রাণপণ,
ইন্দ্রিয়েরা তব নহে রে আপন,
নীচ ভৃত্য তারা হয়েছে এখন
সদা স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তা সর্ব্বময়।" ১২।
"কর্ত্তব্য তোমার নিষ্কাম করম,
সর্ব্বজীবে দয়া ধর্ম্মরে পরম,
সদা আত্মনিষ্ঠা সাধনা চরম,
আত্মজ্ঞানে প্রাণ হবে শান্তিময়।" ১৩।
"পরমাত্মা ধ্যানে থেক সদা রত,
সেই পদে মতি রেখ রে নিয়ত,
বিরাজে সে পদে শান্তি অবিরত,
একমাত্র সেই আনন্দ-নিলয়।" ১৪ ॥

শ্রীমতী চমৎকার মোহিনী দাসী।
বিষ্ণুপুর।

দেবতা আমার।

টানিয়ে স্নেহের রাশি, অধীনীরে ভালবাসি,
কেন এত তৃপ্তি, নাথ, হৃদয়ে তোমার ?
সর্ব্বগুণান্বিত তুমি, গুণ-বিবর্জ্জিতা আমি,
তবে কেন ভালবাস দেবতা আমার ?১
করুণা-নিঝর তুমি, তাই স্নেহ-বারি আমি,
পেয়ে অবিরত ধারে সুশীতল হই ;
পূর্ণ স্নেহ মমতায়, কেবা হেন পতি পায় ?
তোমার স্নেহেতে সদা মুগ্ধা হ'য়ে রই।২
তব চক্ষুরন্তরালে, থাকি যদি কোন কালে,
কতই যাতনা দেব ! পাও তব চিতে ;
বুঝিতে পেরেছি আমি, তুমি দেবোপম স্বামী,
জ্ঞানহীনা, জানি না যে তোমারে পূজিতে।৩
বিমল চরিত্র তব, এক মুখে কিবা কব,
এমন দেবতা পতি আছে বল কার্ ?
আমারে হেরিলে, নাথ, ভুলে যাও দুখ যত,
হৃদয়ের শান্তি-প্রদ তুমি যে আমার।৪
যদি কিছু কষ্ট পাই, দূর করিবারে তাই,
সাধ্যমত চেষ্টা কত কর যে তখন ;
আমার সুখের তরে, তুমি নাথ অকাতরে,
নিয়ত সহিছ দুঃখ করি প্রাণপণ।৫
স্নেহ মায়া দয়া ধর্ম্ম, জগতের সার কর্ম্ম,
ওই দেব-মূর্ত্তিতেই বিরাজিত আছে ;
হেন স্নেহ কার কাছে, প্রভু এসংসার মাঝে ?
অনন্ত স্বর্গের সুখ পাই তব কাছে। ৬
সদা তব সঙ্গে থাকি, নয়নে নয়নে রাখি,

ইহাতে তোমার সুখ বুঝেছি অন্তরে ;
বহুপুণ্য ফলে আমি, পাইনু তোমারে স্বামী,
কতই করুণা বিধি করিলেন মোরে। ৭
অমর দেবতা হেন, মর্ত্ত্যে আসিয়াছে যেন,
হেরি তব গুণ এই অনুভব হয় ;
হৃদয় হইতে সতা, প্রবাহিত হয় নিতা,
নির্ম্মল প্রেমের ধারা মধুরতা-ময়। ৮
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী, শারদ কৌমুদী রাশি,
বিরাজিত সদা নাথ, হৃদয় তোমার,
মধুর মলয় বায়, তব হৃদে শোভা পায়,
কোকিল কাকলী দিব্য বীণা-ধ্বনি আর। ৯
তোমার অন্তরমাঝে, কোটী কোহিনুর রাজে,
নন্দনের পারিজাত হৃদে বিকশিত ;
যা কিছু সুন্দর আছে, হারি মানে তব কাছে,
সুধার সুধারা হৃদে সদা প্রবাহিত। ১০॥

শ্রীমতী হরিদাসী দাসী।
। কলিকাতা—ভবানীপুর।

কল্পনা।

নীরব শরত রেতে মনের উচ্ছ্বাসে,
বসেছিনু একাকিনী নির্ঝরের পাশে।
সোণার চাঁদিমা পানে
চেয়ে ছিনু আনমনে,
কাহার স্নেহের হস্ত পরশিল হিয়া,
সহস্র চিন্তার তার উঠিল বাজিয়া। ১
মধুর লাবণ্য মুখে অমিয় হাসিয়া
কে তুমি বালিকা-মুখ চুম্বিলে আসিয়া ?
অযাচিত স্নেহ ভার
সহিতে না পারি আর
প্রেমময় ! কেড়ে লও বালিকা হৃদয়.
ভুলে যাই দুঃখভার স্মরিয়ে তোমায়। ২
কেন এসে বালা-প্রাণ জুড়িয়া বসিলে ?
কেন এ কোমল প্রাণ আকুল করিলে ?
কেন তুমি মধু স্বরে
ডাকিলে অমন করে,
কেনবা রাখিলে স্মৃতি হৃদয়ে আমার !
ভুলিতে পারি না তোমা হৃদয়-আধার ! ৩
ঐ আলোময় মুখ হেরিয়া হেরিয়া
কত দিন গেল চলে আকাশে মিলিয়া ;
সেই সে বিশাল আঁখি,
যার পানে চেয়ে থাকি,
কত সুখ পাইয়াছি বলিব কেমনে :
ভুলিতে পারি না! দেব! ভুলিব কেমনে ! ৪
বিষাদ-পূরিত বুক আশায় বাঁধিয়া
ছেড়ে দাও চলে যাই আকাশ ভেদিয়া,
ভগন হৃদয়ে আর,
বহিবে না অশ্রুধার,
ছেড়ে দাও ছুটে যাই সুদূর গগনে,
ভুলিতে পারি না তোমা যাইব কেমনে ? ৫
দয়াময় ! দয়া কর অবোধ সন্তানে,
চুম্বন করো না আর বালিকা বয়ানে,
কেমনে স্নেহের ডোরে,
বাঁধিলে এ বালিকারে,
বুঝি না বুঝি না লীলা অবোধ সন্তান ;
চুম্বন করো না দেব ! বালিকা-বয়ান। ৬

কুমারী সুকুমারী দাস,
বরিশাল।

জন্মদিনের উপহার।

আজি সে পীযূষ ঢালা
জন্মোৎসব মা তোমার,
বিধি-বরে ধরাতলে
উপনীত পুনর্ব্বার।
নাগিছে হৃদয় ভাই
শুধু দেব-আশীর্ব্বাদ,
যাচিছে মা ভব তরে
তাঁর (ই) প্রীতি পরসাদ।
বরষিছে প্রাণ মন
শুভাশীষ অনিবার ;
খেলিছে মরম তলে
কত ভাব পারাবার !
অফুট কলিকা সম
তোর সে বালিকা-মুখ
জাগিছে অন্তরে আজি
ঢালিছে অমল সুখ।
স্মৃতি পুষ্পে গাঁথা তোর
শৈশব-কাহিনী গুলি।
নাচিছে মানস নদে
পুলক লহর তুলি।
তোর সেই কচি হিয়া
শত মধুরিমা-ভরা,
সপ্রতিভ ছবি খানি
প্রীতিপূর্ণ মনোহরা,
সরল-সুষমা ময়
তরল লাবণ্য-রেখা,
কোমল সুহাসি টুকু
রবে হৃদে চির লেখা।
এখন যৌবনোদ্যানে
পবিত্র কুসুম তুই—
নীরব মাধুরী-মাখা
নব বিকশিতা যুঁই।
বিভুর প্রসাদে কালে
শুভ্র শান্ত যুঁথী সম
ক'রো বাছা বিতরণ
পরিমল অনুপম।
ঢালিতে সৌরভ আগে
সোণার নন্দন বনে,
আকাঙ্ক্ষিত অর্ঘ্য হ'তে
অমরের শ্রীচরণে।
সপ্তদশ বর্ষাতীত
ত্যজি সে ত্রিদশভূমি,
আলো করে ছিলে ধরা
কুমারী রতন তুমি।
এড়ায়ে হিমাদ্রিসম
বিঘ্ন বাধা অগণন,
অষ্টাদশ বর্ষে আজি
করিলে মা পদার্পণ।
লইয়ে বালাই যত
প্রাচীন বরষ যাক্ ;
নব বর্ষ পলে পলে
কল্যাণ কুড়াতে থাক্।
থাক মা' শীতল করি
জনক জননী-ক্রোড়—
ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত
স্নেহের ত্রিদিব তোর।
তাঁহাদের আশালতা
কর বাছা কুসুমিত,

প্রিয় আচরণে কর
সতত তাঁদেরে প্রীত।
প্রেমের প্রতিমারূপে
বিরাজ কর মা' গেহে,
জুড়াও সবার হিয়া
মধুর ভকতিস্নেহে।
বিমল করুণা ধারা
বরষ' ব্যথিত পরে,
কামিনী কুলের মণি
হওনা বিধির বরে।
শৈশবের দেবভাব
পুণ্যের প্রভায় মিশি
অনুদিন ও আননে
খেলুক উজলি দিশি!
জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে কর্ম্মে
লভহ উন্নতি নিতি,
জগৎ তোমার শিরে
ঢালুক সোহাগ প্রীতি!
শুভ জন্ম দিতে তোরে
কি আশীষ দিব আর,
হও ঈশ-পাদমূলে
পবিত্র অরঘ্য ভার।
সাধের সে অমরার
কুসুম প্রকৃতিখানি,
মোহের কুহকে ভুলে
হারায়োনা হেথা রাণি!
চির নিরমল রোক্
তব ও নির্ম্মল মন,
সংসারের আনাঘ্রাত
থাক রে স্নেহের ধন!
দুঃখে অনাহত থাক
কুসুম কোমল কায়—
হও সুখী সর্ব্বসুখী
পরমেশ করুণায়!
স্নেহের শিশিরসিক্ত
কবিতা কুসুম-হার,—
ধর মা' ও চারু করে
আজিকার উপহার!
হ'ল না মালিকা গাছি
তব যোগ্য মা' আমার,
তবু নে' মা ভাবি শুধু
স্নেহ-দান মাসিমার!

আশীর্ব্বাদিকা
ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

মধুময়।

কিবা মধুময় হেরি আধ-মুকলিত ফুলে,
শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে।
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্থলে,
প্রভাতে মধুর শুনি বিহগিনী-কলরোলে।
নিশীথে বাঁশরীরব হৃদি নাচে তালে তালে,
নিদাঘে মধুর ছায়া ঘন বিটপীর তলে।
প্রাবৃটে মধুর রূপ বিজলি বারিদকোলে,
ধরিত্রী মাধুর্য্যে পূর্ণ বসন্ত ঋতু উদিলে।
শিশুর মধুর রব ডাকে যবে "মা" "মা" ব'লে,
প্রেমে মধুরিমা দেখি নবীন মিলনকালে।
সোহাগিনী মধু ঢালে মানের করুণ রোলে,
রূপরাশি হেরি মধু সাধুতা ছবিতে মিলে।
মধুর আধার হয় বিনয়ে সারল্য দিলে,
হৃদয় মাধুরীময় পরদুঃখে যবে গলে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,—কানপুর।

সাধারণ ... পুস্তকালয়

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪২০-২১ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ ১৩০৬। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির রাজধানীতে প্রত্যাগমন—১৮ই ডিসেম্বর লর্ড কুর্জ্জন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দরবার প্রভৃতির সমারোহ হইতেছে। মহিশুরের মহারাজা ও হাইদ্রাবাদের নবাব প্রভৃতি অনেক রাজা রাজ্ড়া রাজধানীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

চন্দ্রগ্রহণ—গত ২রা পৌষ রাত্রিশেষে একটী চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। গ্রহণ অনেক বেলা পর্য্যন্ত ছিল।

রাজ-প্রতিনিধির লক্ষ্ণৌ দর্শন—লর্ড কুর্জ্জন লক্ষ্ণৌ নগরে যে দরবার করেন, তাহাতে বার শত সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হন। এখানে এরূপ সমারোহ অনেক কাল হয় নাই।

জাতীয় মহাসমিতি—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বড়দিনের সময় কন্গ্রেস মহাসভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। লক্ষ্ণৌবাসিগণ সুন্দর আয়োজন করিয়াছেন। সভাপতি বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বক্তৃতাও অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে।

নূতন লর্ড বিশপ—কলিকাতার লর্ড বিশপ মহাত্মা ওয়েল্ডন্ এদেশীয় লোকদিগের সহিত যেরূপ মিশিতেছেন, আর কোনও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ এরূপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সদাশয়তার জন্য তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র দিয়াছেন। কলিকাতার দেশীয় ছাত্রদিগের নীতি ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য বিশপ বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

বোয়ার যুদ্ধ—মডার নদী-তীরে এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সেনাপতি মেথুয়েনের সৈন্যগণ অসাধারণ বীরত্ব

প্রকাশ করিয়াও বোয়ার-সীমা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হইয়াছে। ষ্টরমস্‌বার্গে সেনাপতি গাটেকার বোয়ারদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন, তাহাতে ছয়শত ইংরাজ-সৈন্য বন্দী হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি বুলার টুগুলাতে এক মহাযুদ্ধ করেন, তাহার ফলও শোচনীয় হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন প্রধান সেনাপতি জেনারল রবার্টস প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় দলবলে গিয়াছেন।

মহারাণীর সৌজন্য—(১) দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদিগের জন্য মহারাণী বিক্টোরিয়া এক লক্ষ বাক্স (চকোলেট) খাদ্য পাঠাইয়াছেন। বড়দিনের সময় সৈন্যগণ ইহা আস্বাদন করিয়া আনন্দ করিয়াছে। (২) ওকিফ নাম্নী এক বিলাতী রমণীর ৭টী পুত্র বোয়ার-যুদ্ধে ভলণ্টিয়ার হইয়া গিয়াছে, মহারাণী তাঁহাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন তিনি তাঁহার সন্তানদের জন্য গর্ব্বিত হউন।

স্ত্রীজাতির উদারশিক্ষা—জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে মহিলাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বেথুন কলেজে কয়েকবার বক্তৃতাদি হইয়াছিল, গত ২রা পৌষ প্রেসিডেন্সী কলেজের বাটিতে সেইরূপ অনুষ্ঠান হয়। অনেকগুলি ব্রাহ্মমহিলা তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শুভানুষ্ঠান—বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের সংশ্রবে একটী চিকিৎসালয় ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী বাসগৃহের ভিত্তি-স্থাপনের সংবাদ পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ওলড্‌হাম সাহেব ও কস্তুরাকুমারীর নামে এই দুইটী গৃহ অভিহিত হইবে।

বিলাতের দান—দক্ষিণ আফ্রিকার আহত সৈন্যদের সাহায্যার্থে ইতিমধ্যে বিলাতে প্রায় ৫কোটি টাকা উঠিয়াছে।

কায়স্থ-সমিতি—এ বৎসর বড়দিনের সময় মুঙ্গেরে ইহার অধিবেশন হইতেছে। লালা কায়স্থদিগের মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয় হ্রাস, মাদক সেবন ত্যাগ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, সমুদ্র গমনের সুবিধা এবং যুবকদিগের শিক্ষা বিধান প্রভৃতি বিষয় আলোচ্য।

মুসলমান শিক্ষা সমিতি—স্বর্গীয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর কলিকাতাস্থ উদ্যানে এ বৎসরের সমিতির কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা ও উৎসাহদান করিয়াছেন।

আত্ম-সংযম।

হিংসার ন্যায় দারুণ দুষ্প্রবৃত্তি অথবা ভয়ানক রিপুকে সংযত করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। পরের সুখ দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি করিতে পারাই আমাদের হিংসা সংযমের প্রধান উপায়। পরের

দুঃখে দুঃখিত হওয়া অপেক্ষা পরের সুখে সুখী হওয়া অধিকতর উদার হৃদয়ের কার্য্য। যাহাহউক যাহাতে পরের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জন্মে, সেইরূপ চিন্তা, কথা এবং কার্য্য আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। পরনিন্দা করিলে অথবা পর-নিন্দা শুনিলে হিংসা রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই জন্য পরনিন্দা পরিত্যাগ করা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। হিংসার প্রশ্রয়-কর চিন্তা, কথা ও কার্য্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পরার্থে নিযুক্ত থাকিলে হিংসারিপু আমাদের মন হইতে দূর হইবে।

এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। পরোপকারিতা ভিন্ন পরার্থ-সাধন অসম্ভব। অতএব যাহার যেরূপ শক্তি, আত্মোন্নতির জন্য পরোপকারে প্রবৃত্ত হইবেন। পরার্থসাধন ভিন্ন মানব-হৃদয় প্রকৃতরূপে উন্নত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ভাবিয়া দেখ, পরোপকার করা কেবল পরার্থ নহে, তাহার মধ্যে মানবের স্বার্থ সম্বন্ধও আছে। মানব কখনই মানবসমাজ ছাড়িয়া একাকী একস্থানে বাস করে না। অতএব তুমি যদি জ্ঞানী হও, ধনী হও, সুখী হও, সৌভাগ্যবান্ বা সৌভাগ্যবতী হও, যদি সেই সৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে চাও, তবে তোমার পরিজন বা প্রতিবেশী-কেও সেইরূপ করিবার চেষ্টা কর। নচেৎ তুমি বহুক্লেশে যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছ, মূর্খ নিরক্ষর পরিজনদিগের সহিত লূণ তেলের জন্য বিবাদ করিতে করিতে অথবা প্রতিবাসীর সহিত লাউ কুমড়ার স্বত্বাধিকার স্থির করিতে করিতে যদি তোমার উন্নত জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়, তবে তোমার জ্ঞানার্জনের সার্থকতা কোথায়? ধনী তুমি, হয়ত হিংসা-পরা-য়ণ হইয়া প্রতিবাসীর—এমন কি তোমার সহোদরের দরিদ্রতা কামনা করিতেছ। যদি সত্য সত্যই তাহাই হয়, তবে হয় তাহাকে তোমার ক্লেশার্জ্জিত ধনের অংশ হইতে ভরণ পোষণ করিতে হইবে, না হয় সে পেটের জ্বালায় তোমার জিনিস প্রবঞ্চনা করিয়া—এমন কি চুরি করিয়া খাইবে। অতএব পরের যাহাতে ধন হয়, জ্ঞান হয়, সদাশয়তা হয়, সচ্চরিত্রতা হয়, সে সকল কার্য্য করা কেবল পরার্থের জন্য নহে; তাহার মধ্যে প্রত্যেকের অতি সূক্ষ্ম স্বার্থও আছে। এই সকল বিষয় ভাবিয়া পরের মঙ্গলার্থে প্রাণোৎসর্গ করিলে ক্রমশঃ এমন একটী আসক্তি জন্মিবে যে, পরোপকার ভিন্ন মনে আর পরশ্রী-কাতরতা বা হিংসার ছায়াও প্রবেশ করিবে না। যখন মানব এইরূপ অভ্যস্ত হইবেন, তখনই তিনি হিংসা জয় করিতে সমর্থ হইবেন, বুঝিতে হইবে।

আর একটি কথা বলিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল আমাদের মনুষ্যত্ব লাভের সহায় বলিয়াই ভগবান্ আমাদিগকে সেই সকল প্রবৃত্তি দিয়াছেন। আমাদের অনুশীলনের দোষে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি রিপুরূপে পরিণত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সেই জন্য প্রত্যেক মানবকে অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রকার প্রলোভন হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। যাহাতে ক্রোধ জন্মিবে, যাহাতে অহঙ্কার উপস্থিত হইবে, লিখিয়া কত বুঝাইতে পারা যায়—যাহাতে একবিন্দু চিত্তবিকার ঘটিবে, আত্মসংযমেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে কথনই যোগ দিবেন না। বিধবা মহিলাগণ যাহাতে ব্রহ্মচর্য্যার ক্ষতি হয়, সে রকম কথা, বা চিন্তা হইতে শত দূরে থাকিবেন। গুরুজনের আদেশ, বন্ধুগণের অনুরোধ, প্রবলের শাসন, ব্যক্তিবিশেষের উপহাস, অবজ্ঞা ও তীব্র বিদ্রূপ, নিজ হৃদয়ের লালসা ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন, আত্ম-সংযমের জন্য, ভগবানের প্রীত্যর্থে সবই পরিত্যাজ্য—সবই উপেক্ষণীয়। জগতে এমন শত সহস্র ঘটনা দেখা যায় যে, সচ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল নিজের ওজন না বুঝিয়া, প্রলোভনের সম্মুখীন হওয়াতে চরিত্র-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অতএব কেহ আপনাকে জনক, শুকদেব বা অরুন্ধতী, বা সীতার মত সকল প্রলোভনের অতীত মনে না করিয়া, প্রলোভনমাত্র হইতে শত দূরে থাকিবেন। তবে যাঁহাদের চরিত্রের সম্পূর্ণ দৃঢ়তা জন্মিয়াছে স্পর্শ-মণির মত যাঁহাদের সংস্পর্শে লৌহও স্বুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের কথা এ প্রবন্ধে অনালোচ্য। (ক্রমশঃ)

বারি-বিজ্ঞান।

জল যদিও একটী সাধারণ বস্তু এবং ইহার সহিত যদিও আমরা সকলেই পরিচিত, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে জানিবার বিষয় এত আছে যে, এক ব্যক্তি সমস্তঃজীবনেও তাহা অনুশীলন করিয়া শেষ করিতে পারে না। জল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিতেছেন, তাহাদের সাধারণ নাম বারি-বিজ্ঞান। বারি-বিজ্ঞানের প্রধানতঃ তিনটী শাখা :—(১) বারি-স্থিতি-বিজ্ঞান (Hydrostatics), (২) বারি-গণিত বিজ্ঞান, (Hydrodynamics), (৩) বারি-গতি-বিজ্ঞান (Hydraulics)। শাখা সকলের নামে তাহাদিগের বিষয় সকলের স্থূল পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করা বৃহৎ ব্যাপার, আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইব না। স্থূলভাবে যে সকল বিষয় জানিলে এই শাস্ত্র অনুশীলনে প্রবৃত্তি হইতে পারে, তাহারই কিছু কিছু উল্লেখ করিব।

সমতলতা।

তরলতা অর্থাৎ যোগাকর্ষণের অল্পতা হেতু তরল পদার্থকে আকার প্রদান অথবা উপর্য্যুপরিরূপে স্তূপাকার করা যায় না। বায়ুবেগে নদী বা সমুদ্রের জল যদিও তরঙ্গাকার ধারণ করে, কিন্তু

উহা পরক্ষণেই নদী বা সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া যায়। কঠিন বস্তুর ন্যায় জলের যোগাকর্ষণ অধিক থাকিলে তাহা ঐরূপ মিশ্রিত না হইয়া স্তূপাকারেই থাকিত। কিন্তু যোগাকর্ষণের অসমতা হেতু মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গদিগকে পুনর্ব্বার জলের সহিত সমতল করিয়া ফেলে। এইরূপে জল সর্ব্বদা সমতলতা অন্বেষণ করে।

ভার-সমতা।

কোন জলরাশির পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক স্থান পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী। ভূকেন্দ্র হইতে জলপৃষ্ঠের প্রত্যেক ভাগের সমদূরতাকে জলের ভারসমতা কহে। এই জন্য তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশ ভূপৃষ্ঠের ন্যায় গোলাকার বা মধ্যভাগ-স্ফীত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র জলাশয়ে এই বিষয় পরীক্ষিত হয় না; কিন্তু সমুদ্র ও মহাসাগরাদিতে ইহা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ভূপৃষ্ঠে আমরা আপাততঃ গোলাকার বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়কেও গোলাকার বলিয়া বোধ হয় না।

তরল পদার্থের পরমাণু সকল পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় তাহার ভারসমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথন তরল পদার্থের কোন পরমাণু দৈবাৎ অপরাপর পরমাণু অপেক্ষা উচ্চতর হয়, অমনি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা উহা নিম্নদিকে আকৃষ্ট হইয়া জলপৃষ্ঠের সহিত সমতল হইয়া যায়। তরল পদার্থ সকলের ভারসমতা গুণ না থাকায়, অর্থাৎ একটুকু চাপ দিলেই তাহাদের পরমাণু সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ায় উপরি-উক্ত আকৃষ্ট পরামাণু অনায়াসেই জলরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া সমতল হয়। কেবল সমগাঢ়তা-সম্পন্ন তরল পদার্থকেই এইরূপ হইতে দেখা যায়; কিন্তু যদি একটী পদার্থ অপেক্ষা অপরটী অল্প বা অধিক গাঢ় হয়, তাহা হইলে অল্প গাঢ় পদার্থটী উপরে ভাসমান থাকিবে, তাহাদের উভয়ে কথনও মিশ্রিত হইবে না। জল এবং তৈল, বায়ু এবং জল এইরূপ অমিশ্রিত থাকিবে; তৈল জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং বায়ু তরল পদার্থের উপর ভাসমান হয়। জল এবং বায়ুর পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ভূপৃষ্ঠের স্থানবিশেষের সমতলতা নির্দ্ধারণ করিবার একটী সুন্দর কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। একটী কাচের নলের মধ্যে জল এবং এক বুদ্বুদ বায়ু কৌশলক্রমে প্রবিষ্ট করিয়া উহার উভয় প্রান্ত বন্ধ করিয়া রাথা হইয়াছে। কোন স্থানকে সমতল করিবার আবশ্যক হইলে উহার উপর ঐ নলাকার যন্ত্রটী স্থাপন করা হয়। ঐ স্থানটী সমতল না হইলে ঐ নলের একাগ্র অবশ্য নিম্নমুখ এবং অপর প্রান্ত কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধমুখ হইবে, এবং তাহা হইলে ঐ নলস্থিত জল নিম্নাভিমুখে এবং বায়ু উপরের প্রান্তভাগে গমন করিবে, কিন্তু স্থানটী সমতল হইলে নলটী কোন দিকে বক্র না হওয়ায় বায়ু-বুদ্বুদ নলের ঠিক্ মধ্যভাগে থাকিবে। অতএব যতক্ষণ

বায়ু-বুদ্বুদ নলের ঠিক্ মধ্যদেশে স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ মৃত্তিকা খনন করিতে হইবে। বায়ু-বুদ্বুদটী নলের যে প্রান্তের দিকে থাকে, সেই দিকই উচ্চতর, সুতরাং সেই দিক হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া লইলে স্থানটী সমতল হইবে।

কঠিন পদার্থ সকল রাশিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তরল পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বতন্ত্ররূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কঠিন পদার্থাপেক্ষা তরল পদার্থের প্রতিঘাত অল্প। তরল পদার্থের পরমাণু সকল এইরূপে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করায়, তাহারা পরস্পরকে ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব সকল দিকেই সমানরূপে আঘাত করে। পরস্পরের আঘাত প্রতিঘাতের এইরূপ সমতা থাকায় প্রত্যেক পরমাণু স্থিরভাবে থাকে। জলকে একবার চালিত করিলে এই সমতা বিনষ্ট হয় এবং যতক্ষণ না এ ভারসমতা সংস্থাপিত হয়, ততক্ষণ উহা চঞ্চলাবস্থায় থাকে। যদি জলের এই পার্শ্বিক ভার না থাকিত, তাহা হইলে কোন জলপাত্রের পার্শ্বদেশে ছিদ্র করিলে তাহা দিয়া জল নির্গত হইত না। কঠিন পদার্থের পার্শ্বিক ভার নাই, সেইজন্য বালুকাপূর্ণ কোন পাত্রের পার্শ্বদেশে ছিদ্র করিলে তন্মধ্য দিয়া বালুকা নির্গত হয় না। জলের পরমাণুগুলি যদি পরস্পর উপরে উপরে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের পার্শ্বে চাপ না লাগিয়া নিম্নাভিমুখে লাগিত; কিন্তু জলের একটী পরমাণু নিম্নস্থিত অপর দুইটী পরমাণুর মধ্যদেশে প্রবেশ করায় তাহাদের পার্শ্বদিকে চাপ লাগিয়া থাকে। কিন্তু এই পার্শ্বিক চাপ উপরের চাপ হইতেই উৎপন্ন হয়, কারণ উপরের পরমাণু সকল নিম্নস্থ পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যাওয়ায়, উপরের পরমাণুর যেমন নিম্নাভিমুখে গতি হয়, নিম্নের পরমাণুপুঞ্জের সেইরূপ পার্শ্বাভিমুখে গতি হইয়া থাকে। এইজন্য কোন তরলপদার্থপূর্ণ পাত্রের যত নিম্নদেশে ছিদ্র হইবে, ঐ তরল পদার্থ তত বেগে বহির্গত হইবে অর্থাৎ তাহারা উপরের অনেক পদার্থের ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের পার্শ্বাভিমুখ গতি প্রবল হইবে। যথা, এই চিত্রের ক নামক ছিদ্র অপেক্ষা

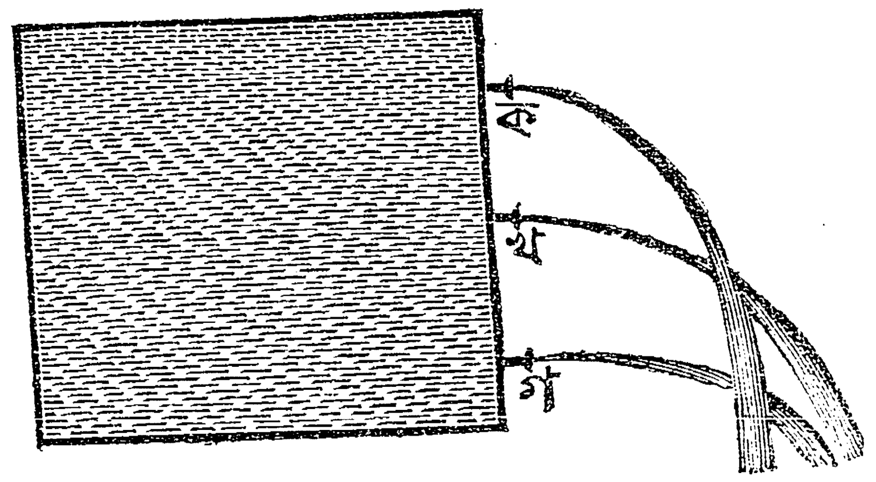

খ নামক ছিদ্রের জল অধিক বেগে এবং খ ছিদ্রাপেক্ষা গ ছিদ্রের জল অধিক বেগে পতিত হইতেছে। পার্শ্বিক গতি এইরূপে নিম্নাভিমুখ গতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কোন তরল পদার্থে পরিপূর্ণ পাত্রের অবস্থান বিশেষে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যদি কোন পাত্রকে ঊর্দ্ধাধোভাবে রাখা যায়, তাহা হইলে যেরূপ পার্শ্বিক গতির বল হইবে, উহাকে অনুপ্রস্থ ভাবে রাখিলেও সেইরূপ হইবে; তবে কেবল উপরিস্থ পরমাণুর সংখ্যানুসারে ঐ গতির অল্পাধিক্য হইবে। উপরে অধিক পরমাণু থাকিলে ভার অধিক হওয়া প্রযুক্ত বেগও অল্প

হইবে। কিন্তু যদি চতুর্দ্দিকেই সমান পরমাণু থাকে, তাহা হইলে পাত্র যে কোন ভাবে স্থাপিত হউক, পার্শ্বিক গতি সমান হইবে।

তরল পদার্থের ঊর্দ্ধদিকেও গতি আছে। এই ঊর্দ্ধাভিমুখ গতিও নিম্নাভিমুখ বেগ হইতে উৎপন্ন। যখন গাড়ু কিম্বা কেটলিতে জল ঢালা যায়, ঐ পাত্রের মধ্যের জল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, উহার নলের ভিতরেও সেই পরিমাণে জল উঠিয়া থাকে। ঐ পাত্রের তলদেশের জল তাহার উপরিস্থিত পরমাণু দ্বারা পিষ্ট হওয়ায় তাহাতে বেগ সঞ্চার হয়, এবং নলাভিমুখে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতেই উঠিতে থাকে। পক্ষান্তরে যদি নল দ্বারা জল প্রবিষ্ট করিয়া পাত্রটীকে পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে যে নলের সমুদায় জলই পাত্রের মধ্যে পড়িবে তাহা নহে, কিন্তু নলের যত উপর পর্য্যন্ত জল থাকিবে, পাত্রেরও ততদূর ঊর্দ্ধে উঠিবে। নলের অল্প পরিমাণ জলের চাপেই পাত্রের জলকে ঊর্দ্ধগামী করিবে। যদি একটী গ্লাসে গ্লাস অপেক্ষা উচ্চতর একটী নল রাখিয়া ঐ গ্লাসে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে সমুদায় নল কখন পূর্ণ হইবে না। গ্লাসের ঊর্দ্ধ সীমার সহিত সমান ভাগ নল জলপূর্ণ হইবে, এবং গ্লাস পরিপূর্ণ হইলে যদি আরও জল ঢালা যায়, উহা নলে না উঠিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহিরে পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

বিপদে।

১

কি এনেছ এ দাসের তরে
দয়াময় জগত-জীবন!
যা' এনেছ দাও শিরোপরে,
বুকে দাও অভয় চরণ।

২

হোক সর্প, হোক দাবানল
কিম্বা হোক ভীষণ অশনি,
দাও নাথ! স্নেহের সন্তানে
বরাভয় দিয়েছ যেমনি!

৩

তুমি দিবে, তাহে কিবা ভয়?
তুমি যে গো নিতান্ত আমার,
এই মাত্র চাহি শ্রীচরণে
মোরে শক্তি দিও সহিবার।

৪

জানি আমি, আমারে কাঁদায়ে
তুমি কভু রহিবে না স্থির,
এখনি আসিবে ছুটে কাছে,
আদরে মুছাতে আঁখি-নীর!

৫

ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ অণুকণা—
তবু দেব! চিনি যে তোমায়,
ক্ষুদ্র শিশু জড়পিণ্ড সম,
সেও চিনে স্নেহময়ী মা'য়।

৬

কি এনেছ—যা' এনেছ দাও,
আমি তব চরণ-ভিখারী,
অভাগারে ভিক্ষা দিয়ে যাও—
তোমাতে ডুবিতে যেন পারি।

৭

ভিক্ষা দাও, মেঘ-ভরা দিনে
তব নাম মরমে আসুক;
এ আঁধারে—অশনি-গর্জ্জনে,
ও চরণে পরাণ থাকুক।

৮

এস নাথ! বিপদের দিনে
সেবকের বিপদ-খণ্ডন,
বুকে দাও শকতি, ভরসা,
প্রাণে দাও অভয় চরণ।

৯

আমি হীন, দীন অভাজন,
তুমি দেব! ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
তবু তুমি আমারি! আমারি!
আমি হব কি দুখে কাতর?

১০

বিপদ বাহিরে প'ড়ে থাক্,
ঘরে থাকি তুমি আর আমি,
দাসের মিনতি রাখ আজি,
দয়াময় নিখিলের স্বামী।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

লিবরপুল অন্নপূর্ণা-সমিতি।

প্রতীচ্য জাতি যেমন জড়বিজ্ঞান ও নানা বিদ্যা-চর্চ্চায় আজ পার্থিব শক্তি, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সুখভোগের অপূর্ব্ব অনন্ত উৎস উন্মুক্ত করিয়াছে, তেমনি তাহারা দয়া, মায়া ও দরিদ্রবৎসলতা প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির অনুশীলনেও বুঝিবা এখন আর পশ্চাৎপদ নয়। এই নবোন্নত বিচিত্র জাতির জীবনগতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে বিলক্ষণ বোধ হয় ইহারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইংলণ্ডের কয়েকজন নরনারী একমনপ্রাণে যথার্থ মনুষ্যত্বের এমনি একটি সুমহৎ আদর্শ আপনাপন জীবন দ্বারা দেখাইয়াছেন যে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিদেশী আমাদেরই প্রাণ পুলকিত হয়, আর না জানি যাঁহারা নিজ শরীর মন দিয়া এই দরিদ্র দুঃস্থদিগের সেবাব্রত সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের অপার্থিব আত্মপ্রসাদ সুখের পরিমাণ কত!

প্রায় ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার জোনস্ নামক একটি ভদ্রলোক এমন একটি উপায় চিন্তা করেন যে কিসে লিবরপুল নগরের সমুদায় উপবাসী দরিদ্র-দিগকে নিত্য ক্ষুধানিবৃত্তির উপযোগী আহার দেওয়া যায়। তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প দ্বারা ক্রমে এক সমিতি স্থাপিত হইল, তাহার নাম "লিভরপুল অন্নপূর্ণা সমিতি" (The Liverpool Food Associa-

tion.) কিন্তু পরবর্ত্তী এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইয়াছে, উদ্দেশ্যও অপেক্ষাকৃত অনেক ব্যাপক হইয়াছে। অনেক স্নেহময়ী রমণী এখন স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া ইহার সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্যের বিস্তৃতির সহিত নামও বর্দ্ধিত হইয়াছে—"লিবরপুল অন্ন ও উন্নতিদায়িনী সমিতি (The Liverpool Food and Betterment Association). সমিতির ভাই ভগ্নীরা সর্ব্বদা অনুসন্ধানপূর্ব্বক নগরের যথার্থ দরিদ্র অভুক্ত নরনারী-দিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরমযত্নে পরিতোষপূর্ব্বক নানা দ্রব্য আহার করান। যে সকল হতভাগ্য দরিদ্র বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত আশ্রমে আসিতে পারে না, তাহাদের অন্নব্যঞ্জন সযত্নে বহিয়া লইয়া সমিতির ভাই ভগ্নীগণ তাহাদের নিকটে দিয়া আসেন। বালক বালিকাদের জন্য বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র পিতামাতার গৃহে তাঁহারা শিশু সন্তানের জন্য অকৃত্রিম বিশুদ্ধ দুগ্ধ যোগাইয়া মানব-শিশুর জীবন রক্ষা করেন। পীড়িতের পথ্যাদি প্রস্তুত করণ ও তাহা যথাকালে পীড়িত ব্যক্তিকে দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ বিভাগ আছে এবং সে জন্য অশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সমিতির পরিচ্ছদচিহ্নধারিণী রমণীরা পথ্য হস্তে গৃহে গৃহে পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কত স্নেহ যত্ন শুশ্রূষায় সেবা করেন ও তাহার যাতনার লাঘব করেন।*

বিগত ১৮৯৭ সালে সমিতি আর এক কল্পনা করেন। মধ্যে মধ্যে শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনসাধারণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আমোদে অনুরক্ত করিবার জন্য সঙ্গীত চর্চ্চা আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ কেহ কেহ এ অনুষ্ঠানের সফলতার আশা করেন নাই, কিন্তু ভাই-ভগ্নীদের উৎসাহ যত্নে আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। সঙ্গীত আমোদে যে শ্রমজীবী ও অন্যান্য দরিদ্র সাধারণ ক্রমেই অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিতেছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত-দিনে জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উৎসাহ দেখিয়াই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সমিতি গত বৎসরের বার্ষিক কৃতকার্য্য-তার যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত হিসাব দেখিলে আমা-দের কৌতূহল চরিতার্থ হয়, যথা:—(১) সাধারণ খাদ্য ২,৫৪,০০০, (২) পীড়িতের পথ্য ২০,৯৭০, (৩) চা, চিনি, রুটি ইত্যাদির পার্শেল, ১,৩৮০, (৪) পীড়িতের সন্তোষ ও সাহায্যদায়ক নানাবিধ দ্রব্য, ৩২০, (৫) সঙ্গীত অভিনয় ৬২, এবং এক বৎসরের সঙ্গীতাভিনয়ে উপস্থিত শ্রোতৃসংখ্যা ৪৩,৪০০।

---

* "The food is taken to the bed-side of the sick by voluntary lady workers who devote so many hours a day to the work of the Association. The ladies while so employed wear the uniform of the association, a blue nurse's cloak and an apron of lighter blue." The Graphic.

এই "লিবরপুল অন্ন ও উন্নতিদায়িনী সমিতি" দুঃখী মানুষের দুঃখ যথাসাধ্য মোচন করিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহাদের এই দেব-প্রতিম অপূর্ব্ব পুণ্য প্রয়াসের প্রতি কে না বিস্ময়মুগ্ধ সহানুভূতি অনুভব করিবেন?

শ্রীকিশোরী মোহন রায়।

আত্ম-গরিমা।

কিছু দিন গত হইল একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্রের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। আমাদের স্বদেশীয় একজন ডাক্তারের কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লোকটি কেমন?" ছাত্রটী উত্তর করিল "মন্দ নয়, কিন্তু বড় গুমর।" আমি বলিলাম "গুমর অকারণ কি?" উত্তর হইল "ঠিক্ অকারণ নয়, লোকটা পণ্ডিত বটে।" আমি বলিলাম "অনেক সময় গুমর একটু থাকা ভাল নয় কি?" ছাত্রটী কি উত্তর করিল ঠিক্ আমার মনে নাই; কিন্তু বোধ হয় যেন আমার কথায় সায় দিয়াছিল।

বস্তুতঃ আত্মগরিমা আমাদের নাই। আত্মগরিমা আত্মবিশ্বাসের ফল। বহুশত বৎসর ধরিয়া আমরা যেরূপ অবস্থায় আছি, তাহাতে আত্মবিশ্বাস আমাদের মনে অঙ্কুরিত পর্য্যন্ত হইতে পারে না। আমরা অনেক দিন ধরিয়া পর-পদানত এবং সেই জন্য পরমুখাপেক্ষী। স্বাধীনভাবে কাজ করা আমরা কখনও শিখিয়াছি কি না বলিতে পারি না, যদি শিখিয়া থাকি, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আত্মগরিমা আমাদের হৃদয় হইতে একরূপ বিদূরিত হইয়াছে। মুসলমান আমলে কি ছিল জানি না, কিন্তু ইংরাজ আমলে দেখিতে পাই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সাহেবের খাতির বেশী। পূজাপাদ ৺ রাজনারায়ণ বাবু তাঁর "সেকাল ও একাল" গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাবে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন;—একজন আসিয়া বলিল "ওদের বাড়ী পূজায় এবার বড় ঘটা।" অপর একজন জিজ্ঞাসিল "কেন?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল "গোরায় লুচী ভাজিতেছে।" সত্যসত্যই লোকের এখন গোরার প্রতি এত ভক্তি যে, গোরায় লুচী ভাজিলে সে লুচীর আদর বেশী হয়।

সুধু লুচী কেন, সকল বিষয়েই এইরূপ। সাহেব ডাক্তার, উকীলের প্রতিও আমাদের ভক্তি প্রগাঢ়। আমাদের একজন আত্মীয় উৎকট রোগাক্রান্ত। দেশীয় ভাল ভাল ডাক্তার হয়ত তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। তথাপি তাঁর ও আমাদের ইচ্ছা একজন সাহেব ডাক্তার পাইলে একবার দেখান। আমাদেরই বা দোষ কি? ডাক্তার বাবুদেরও ইচ্ছা একজন সাহেব ডাক্তার

দেখাইতে পারিলে ভাল হয়। আদালতে আমার অনেক টাকার একটা মোকর্দ্দমা উপস্থিত, খুব ভাল উকীল আমার দিকে আছেন। তবুও আমার ও উকীল বাবুর ইচ্ছা একজন সাহেব ব্যারিষ্টার থাকিলে ভাল হয়। কথা উঠিতে পারে সাহেব ডাক্তার ও ব্যারিষ্টার দেশীয় ডাক্তার ও উকীল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেক সময়ে তাহা হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়েই যে এইরূপ, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আমাদের কাছে লাল মুখের এতই প্রতিপত্তি যে, উহা পাইলে কালমুখ আমরা একেবারেই চাহি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার উকীলের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, চিকিৎসা ও ওকালতি সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহা অন্য সকল বিষয় ও ব্যবসা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এরূপ হইবার প্রধান কারণ আমাদের আত্মগরিমা নাই, গুমর নাই। নিজেদের অপেক্ষা আমাদের পরের উপর বিশ্বাস অধিকতর।

উপরে যে আত্মগরিমার অভাবের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই অভাবকে কেহ যেন অমায়িকতা বলিয়া মনে না করেন। অমায়িকতা ভদ্রতার রূপান্তর মাত্র। কিন্তু অনেক সময়ে আত্মগরিমার অভাব মনোবলের অভাবের পরিচায়ক। যাহার মনের তেজ নাই, আপনার প্রতি বিশ্বাস নাই, সে সহজেই পরের উপর নির্ভর করিয়া ফেলে, তার উপায় নাই। অমায়িকতার সহিত আত্মগরিমা থাকিতে পারে, কিন্তু একজন ক্ষীণচেতা ব্যক্তির আত্মগরিমা নাই।

ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে আত্মগরিমা অত্যন্ত প্রবল। আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্পবিস্তর ইংরাজের সংস্রবে আসিয়াছেন। কেহ কি কখন আত্মগরিমাহীন ইংরাজ দেখিয়াছেন? আমার ত মনে পড়ে না। আমার মনে হয় আত্মগরিমাহীন ইংরাজ অতুলনীয়। প্রত্যেক ইংরাজের বিশ্বাস তাঁর জাতির অপেক্ষা উচ্চতর জাতি জগতে আর নাই, এবং তিনি নিজেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। ইংরাজ ছাড়া জগতে আর সকল লোক তাঁর তাচ্ছিল্যের সামগ্রী। একজন ইংরাজ দুইজন ফরাসী, তিনজন জর্ম্মণ, চারিজন রুসীয়ের সমকক্ষ —এরূপ বিশ্বাস বোধ হয় পোনর আনা ইংরাজের আছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে—এমন কি এসিয়ার অন্য কোন জাতিকে ইংরাজত মানুষের মধ্যে ধরেন না। উপরে যে অনুপাত দেওয়া গেল, তাহা যেন কেহ কাল্পনিক মনে না করেন। অবশ্য ইউরোপের অন্য জাতিরাও অপর সকলকে তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরেজের মনোভাব আমরা যত বুঝিতে পারি, অন্য ইউরোপীয়ের তত পারি না। ইংরাজের আত্মগরিমা এত বেশী যে, যদি এক স্থানে ভাল দেশীয় ডাক্তার ও একজন খারাপ সাহেব ডাক্তর থাকেন, এমন ইংরাজ খুব কম আছেন যিনি তাঁর বাড়ীতে অসুখ হইলে শেষোক্তকে না ডাকিয়া

প্রথমোক্তকে ডাকিবেন। অনেক ইংরাজ জানেন যে তাঁহাদের এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু তাঁহাদের আত্মগরিমা এত প্রবল যে কেহই স্বদেশীয় অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দেশোপযোগী অভ্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

ইউরোপীয়দের আত্ম-গৌরব আমাদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, ইহা আমরা সকলেই জানি যে আত্মগৌরবই তাঁহাদের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ। এই আত্মগৌরব তাঁহাদিগকে আত্ম সম্মান ও আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে। আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা জাতীয়ত্বের দুই প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। লোকসমষ্টিমাত্র জাতি নয়। লোকসমষ্টি জাতি হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গুণ থাকা চাই। যেখানে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার অভাব, সেখানে ঐ সাধারণ গুণসকল স্থান পায় না। আত্মগরিমা এত প্রবল বলিয়া ইংরাজ কাহারও কাছে নত হন না। "আমরা অমুক কাজ করিতে অক্ষম অথবা অপরে আমাদের অপেক্ষা উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারে" এ কথা ভাবিতেও ইংরেজের কষ্ট হয়। "অন্যে যাহা করিতে সক্ষম, ইংরেজ তাহা করিতে পারে না" একজন ইংরেজের মনে এ কথা উদয় হওয়াই স্বজাতির প্রতি অবমাননা বলিয়া মনে হয়। একজন ইংরাজ বালক বা বালিকার সঙ্গে কথা কও, দেখিবে তার আত্মগরিমা, আত্মনির্ভরতা কত। প্রত্যেক ইংরাজের যেন মনে হয় যে জাতীয় সম্মান রক্ষার ভার কেবল তাঁহারই উপরে ন্যস্ত। এই আত্মগরিমাই ইংরাজকে এ প্রকার পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল করিয়াছে, ইহাই তাঁহার বুদ্ধিবিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ইহারই প্রসাদে তাঁহাকে কোনখানে পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায় না। ইংরেজ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহা প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় জাতি সম্বন্ধে খাটে। ইউরোপীয়েরা জানেন জগতের তাঁরা অগ্রণী; জগতের সমস্ত ভার বহন করিবার জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব।

আত্মগরিমা ব্যক্তিগত উন্নতির এক প্রধান সহায়, তাহা বুঝানই আবশ্যক বোধ হয় না। সকল কাজে যে আত্মগরিমা চাই, এ কথা আমি বলি না। জগতের অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে আত্মাভিমানের দরকার নাই,—দরকার দূরের কথা, অনেক মহৎ কার্য্য আছে, যাহাতে উহার স্থান নাই। কিন্তু অনেক বিষয়ে "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাব অনাবশ্যক, অসংলগ্ন এবং অপকারক। পারমার্থিক জীবনে এই মহাভাবের উপযোগিতা থাকিলেও পার্থিব জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে অন্যান্য গুণের সঙ্গে আত্মাভিমান থাকা চাই। বিশিষ্টরূপে কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইলে অনেক সময় আত্মগরিমার অভাব প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

মনুষ্যসমাজের অবস্থা আজও এত উন্নত হয় নাই যে, বিনা আত্মগরিমায় আমরা সংসারযাত্রা সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিতে পারি। যদি তোমার আত্মগরিমা না থাকে, তুমি লোকের তাচ্ছিল্যের পাত্র হইবে, দয়ার পাত্র হইবে। খুব কম লোকেই তোমার গুণের মর্য্যাদা বুঝিবে, তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে।

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে আত্মগরিমার যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। এমন একটী উন্নত জাতি দেখা যায় না যাহার আত্মাভিমানের অভাব আছে। আবার যে সব জাতি উন্নতিশীল, তাহাদের মধ্যে আত্মাভিমান খুব প্রবল। ইহাও দেখা যায় যে, ইহার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অবনতি আসিয়া পড়ে। দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না, হতভাগ্য হিন্দু জাতিই এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। যত দিন আমাদের জাতীয় গৌরব ছিল, ততদিন আমাদের মনে আত্মাভিমানও প্রবল ছিল। এখন আমরা "আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে" বসিয়া আছি এবং জাতীয় গৌরব ও উন্নতি অন্তর্হিত হইয়াছে।

আত্মগরিমার অবশ্য প্রকার ও মাত্রাভেদ আছে। চীন জাতির বিলক্ষণ আত্মগরিমা আছে। চীনেরা ভাবে তাহাদের মত উন্নত ও প্রতাপশালী জাতি জগতে আর নাই বলিলেই হয়। কাজে যে উহারা কি, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। চীনেদের আত্মগরিমা অন্ধ আত্মগরিমা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বড় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারাই কেবল "আর্য্য" নামের অধিকারী; তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই সর্ব্ব বিষয়ে জগতের নেতা ছিলেন এবং যাহা দেখাইয়াছেন আর কেহ তাহা পারেন নাই এবং পারিবেনও না। তাঁহারা মনে মনে ভাবেন "সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম, মোদের জুড়ি নাই।" এই প্রকার আত্মগরিমা ও চীন জাতির আত্মগরিমার মধ্যে যে বিশেষ কোন প্রভেদ আছে, তাহা বুঝা যায় না।

আর এক কথা। আত্মগরিমা কখন কখন এতদূর গড়ায় যে নিজের দোষের প্রতি অন্ধ করে। ইউরোপীয়দের আত্মগরিমা অনেক সময় এইরূপ মাত্রাধিক্য দোষে দূষিত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মধ্যেও এরূপ আত্মাভিমান খুব বিরল নয়। ইহার সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীলতার যোগ থাকিলে উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হয় না, কিন্তু যদি কঠোর রক্ষণশীলতা ইহার সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে উন্নতির পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহাই হউক আত্মগরিমা এরূপ প্রবল যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা প্রায়ই অজ্ঞতার ফল। কূপমণ্ডূক যেমন তাহার অল্পপরিসর কূপ ছাড়া আর কিছু জানে না, এবং তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর জলাশয় থাকিতে পারে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না, সেইরূপ যে সব লোকর জ্ঞান অল্প,

যাহারা পৃথিবীর কোন স্থানেরই সংবাদ রাখে না, তাহারা আপনাদের দেশকে জগতের সারাংশ এবং আপনাদের জাতিকে বিশেষরূপে ঈশ্বরানুগৃহীত মনে করে—অন্য কাহারও যে কিছু আছে ইহা ধারণা করিতে তাহারা অক্ষম। কাজে কাজেই এই সব লোক আত্মাভিমানপূর্ণ হইয়া পড়ে এবং ইহাদের দল যদি কোন সমাজে প্রবল হয়, তাহা হইলে সে সমাজে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কথা হইতেছে এই—সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য চাই। উন্নতি সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ। উন্নতি সাধন করিতে হইলে কতকগুলি গুণ আবশ্যক। সুধু তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। যদি কোন একটী গুণের অভাব হয়, কিম্বা যদি গুণ সকলের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উন্নতির পথে ব্যাঘাত পড়ে। পার্থিব উন্নতির পক্ষে যেমন আত্মগরিমার দরকার, তেমন অপর কতকগুলি গুণের সঙ্গে আপনার প্রতি অবিশ্বাস দরকার। গুণ সকলের কিরূপ সামঞ্জস্য দরকার তাহা অবশ্য বলা যায় না. তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে "আমার জ্ঞান বা বিবেচনা সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত" এরূপ মনোভাব হইলে বড়ই মুস্কিল, ঈদৃশ অবস্থা আত্মগরিমার অত্যধিক প্রাবল্য-জ্ঞাপক; এবং "আমার জ্ঞান বা বিবেচনা সর্ব্ববিষয়ের পরিমাপক" এই বিশ্বাস আপনার প্রতি অবিশ্বাসের পরম শত্রু। ঐরূপ অবিশ্বাস না থাকিলে "দেখে শিখা" ও "ঠেকে শিখা" অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং উন্নতির গতি বন্ধ হইয়া যায়।

দে, না, ব।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

(গত প্রকাশিতের পর)

সরোজবালা এইক্ষণে নিজের সংসারের কর্ত্রী। তিনি পিতা থাকিতে কখন হাঁড়ী ধরেন নাই, সুতরাং রন্ধনকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ও অপটু, তাহাতে আবার বড় মানুষের মেয়ে বলিয়া মনে বিলক্ষণ অভিমান আছে—হাঁড়ী ধরিতে পারিলেও বৃথা অভিমান ও লজ্জায় তাহা ধরিতে চাহেন না। ঐ ৪০৲ টাকা বেতনের মধ্যে একটী রাঁধুনী রাখা হইল এবং এখনও বাপের বাড়ীতে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বামী পুত্রের খাওয়া হইল কি না, তাহার বড় খপর রাখিতেন না। তাহাদিগের শয্যাদি রচনা হইল কি না তাহা দেখিতেন না! স্বামী এক কথা বলিলে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেন। তিনি এইক্ষণে স্ত্রীলোক যতদূর প্রচণ্ডা হইতে পারে তাহা হইলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে আলো দেওয়া

হইত না। স্বামী নিজহস্তে অনেক সময়ে সলিতা পাকাইয়া প্রদীপ সাজাইয়া ঘরে আলো জ্বালিতেন। স্বামী আপনি পান সাজিয়া খাইতেন। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের দুরবস্থার আর সীমা রহিল না। তাঁহার সহ্যগুণের যথেষ্ট পরীক্ষা ও পুরস্কার হইল। তিনি অনবরত ভাবিতে লাগিলেন, "আমি না বুঝিয়া শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি—আমি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের মনে কষ্ট দিয়াছি—এইক্ষণে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" একদিন নরেন্দ্রনাথ প্রাতে স্নান কার্য্য সমাধা করিয়া কোন কার্য্যোদ্দেশে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে—তিনি পদব্রজে রৌদ্রে পুড়িয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বাটী আসিলেন। ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আপনি একখানি পিঁড়ি লইয়া বসিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধাবশতঃ গৃহিণীর নিকট শীঘ্র শীঘ্র অন্ন চাহিলেন। গৃহিণী অনায়াসে স্বামীকে বলিলেন "মুখপোড়া বাঁদর, বাজার হাট নাই, বল্‌তে লজ্জা করে না, তোমাকে ভাত দিবে না উনুনের ছাই দিবে।" এই বলিয়া স্বচ্ছন্দে স্বামীর সম্মুখে ভাতের পরিবর্ত্তে একখানি থালায় করিয়া কতকগুলি পাঁশ সাজাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল—তিনি সংসার বিষসম বোধ করিতে লাগিলেন—এইরূপে অনেকক্ষণ তথায় নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

সময় সকল রোগের প্রতীকার করিয়া থাকে—সময়ের তুল্য সুচিকিৎসক বোধ হয় আর নাই। নরেন্দ্রের নিরুদ্দেশ হইবার পর সরোজবালা বিষম বিপন্ন হইলেন। তিনি যত কেন মানিনী, গরবিণী ও পাষাণী হউন না, তাঁহার সন্তানদিগের অনাহারে প্রাণবিয়োগ তাঁহার প্রাণে কি কখনও সহ্য হইতে পারে? তিনি রাঁধুনী ছাড়াইয়া দিলেন, আপনি স্বহস্তে হাঁড়ি ধরিয়া সন্তানদিগের জন্য অতি কষ্টে রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আয় এইক্ষণে কিছুই নাই। যা গহনা ছিল, ২।১ খানি করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন! ভাই প্রফুল্ল চরণ ভগ্নীর দুরবস্থার প্রতি একবার চাহিয়াও দেখেন না। তিনি স্বামীর প্রতি তাহার দুর্ব্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া দিনের মধ্যে ২।১ বার তাহাকে দূর ছ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না! তাঁহার স্ত্রীর সহিতও সরোজবালার একদণ্ড বনিত না—তাহারা যেন সাপে নেউলে এক গৃহে বাস করিত। প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ওমা! এমন নিষ্ঠুর ভাইত কখনও দেখি নাই—মায়ের পেটের ভাই যে এমন হয় তা কখনও জানি না"! সরোজবালা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেন, "ভাই-রাজায় হবে কি, বাপ-রাজায় রাজার ঝি—আমার বাপ যখন গিয়েছেন, তখন আমার সব গিয়েছে—ভাইয়ের দশ টাকা থাক্‌লে কি আর না থাকলে কি?" এইরূপে কষ্টে

ও দুশ্চিন্তায় সরোজবালা পীড়িতা হইলেন—তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল—অবশেষে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার মাতুল ভোলানাথ বাবু তাঁহাকে শৈশবাবধি কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন—তিনি তাহার এই পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন এবং যথানিয়মে তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন। সরোজবালা দুই মাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ অরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল। চিকিৎসক তাঁহার পশ্চিমাঞ্চলে হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন।

ভোলানাথ বাবু একজন সব্ ইঞ্জিনিয়ার, তিনি দিল্লী নগরে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করেন। তাঁহার ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে, তিনি এইক্ষণে কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছেন—সঙ্গে সরোজবালা ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, আপনার স্ত্রী সুমতি ও পুত্র সুবোধ। তাঁহারা রাত্রি দশটার সময়ে আলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া একটি পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিলেন। পান্থনিবাসের কার্য্যাধ্যক্ষ একজন সুন্দর যুবা পুরুষ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। পরদিবস সূর্য্যগ্রহণ—ভোলানাথ বাবু সপরিবারে গঙ্গাযমুনা-সংযমে স্নান করিতে গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাসায় একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন, পুত্র সুবোধ "বাবা ক্ষিদে পেয়েছে বলিয়া" নিকটে আসিল এবং আলাহাবাদ সহর দেখিবার জন্য বাপের নিকট আবদার করিতে লাগিল। সরোজবালার ছোট ছেলেটি সুবোধকে বাপের নিকট আবদার করিতে দেখিয়া মায়ের গলা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "মা! আমাদের বাবা কোথায়, আমাদের বাবা কি নাই?" মায়ের দুই চক্ষু দিয়া নীরবে অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল—তিনি অনেকক্ষণ অধোবদনে নিশ্চল ও নিঃস্পন্দভাবে থাকিয়া একটী হৃদয়-বিদারক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং আপনি আপন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। পার্শ্বে একটি কক্ষে ঐ পান্থনিবাসের যুবাপুরুষটি বসিয়াছিলেন—অকস্মাৎ কে যেন তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে ঘা মারিল—তিনি বিস্মিতনয়নে ঐ রমণী ও তাহার পুত্রের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রমণী পুত্রটীকে কোলে লইলেন এবং মুখচুম্বন করিলেন—কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী যেই মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক ঐ কক্ষের দিকে চাহিলেন, যুবাপুরুষ তাঁহার নয়নপথের পথিক হইল—তখন রমণীর সর্ব্বশরীর—পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত—কাঁপিয়া উঠিল—কে যেন তাহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব তাড়িতের বেগ সঞ্চালন করিল। তিনি পুনরায় যুবার দিকে চাহিলেন—তাঁহাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল—যে যার হারানিধি চিনিতে পারিলেন—উভয়ের হৃদয়পয়োধি উছলিয়া উঠিল।

তখন রমণী আর থাকিতে পারিলেন না—উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া যুবার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি আপনার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি—না বুঝিয়া কাঠুরিয়া-কামিনীর ন্যায় মহামূল্য হৃদয়-মণিকে তাচ্ছিল্যের কূপে ফেলিয়া দিয়াছি, আমার মত আর হতভাগিনী নাই। নাথ! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামী—যাহার তুল্য গুরু নাই—তাঁহার প্রতি উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে।" যুবা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং চৌকি হইতে উঠিয়া আপনার হৃদয়েশ্বরীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ উভয়ে আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ বাবু ভাগ্নী ভাগ্নী-জামাইকে যত্ন করিয়া সঙ্গে লইলেন। দিল্লীসহরে কিয়ৎকাল অবস্থিতির পর সরোজবালার দেহকান্তি প্রস্ফুটিত হইল—মুখে লাবণ্য ঢল ঢল করিল, চক্ষুর জ্যোতি বাড়িল, শরীরে শক্তির সঞ্চার হইল, মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইল—তিনি এক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তনে সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় "অসার খলু সংসারের সার শ্বশুরমন্দিরে" প্রবেশ করিলেন। প্রিয় সম্বন্ধী প্রফুল্লচরণ চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জার ভয়ে ৫।৭ দিন ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে আপনার সংসারে রাখিলেন, পরে পৃথক্ করিয়া দিলেন। মধুভাণ্ডে আর মিষ্টত্ব রহিল না—সুখকর সম্বন্ধীনাম নরেন্দ্রের নিকট কটু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র কি করেন, দুঃখ ধান্দা করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"স্বভাব না যায় ম'লে, ইল্লোত না যায় ধু'লে"—সরোজবালা ক্রমে ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধরিলেন—পূর্ব্ববৎ স্বামীকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন—অধিকন্তু শুচিবায়ুগ্রস্তা হইয়া স্বামীর পক্ষে ঘোর কষ্টকরী ও ভয়ঙ্করী হইলেন। স্বামী বাহির হইতে আসিলে তাঁহার মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিবেন—পায়ে গোবর-জল ঢালিবেন—কাপড় ছাড়াইবেন—তবে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন, নতুবা তাঁহাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। রাত্রে আসিতে বিলম্ব হইলে, স্বামীকে দুই তিন ঘণ্টা বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইত, এমন কি কখন কখন দরজা আদৌ খোলা পাইতেন না! এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে, নরেন্দ্রনাথ ক্ষোভ ও মনের দুঃখে দু একটী সঙ্গীর সহিত মদিরা পান করিয়া অসচ্চরিত্রা কামিনীদিগের আলয়ে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন। পরদিবস স্বামী বাটীতে প্রবেশ করিতে না করিতে সেই দুর্বৃত্তা সরোজবালা শতমুখী হস্তে তাঁহাকে ও তাঁহার যে যেখানে আছেন, তাঁহাদিগের উপর মধুবর্ষণ করিতে করিতে বাহির হইতেন। নরেন্দ্র তাঁহার সেই রণচণ্ডীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন—কোন দিন বা

অকস্মাৎ সরোজবালার সম্মুখে পড়িয়া গিয়া তাঁহার সেই মধুর বিষ-ঝাড়ান ঔষধের মিষ্টত্ব অনুভব করিতেন !!

একদিন নরেন্দ্র বেহুঁস মাতাল হইয়া বাটীতে আসিলেন। বাহিরবাটীতে একটী চৌবাচ্চা ছিল, পায়ে হোঁচট লাগিয়া তাহাতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িলেন। বাহিরে শব্দ হইল—সরোজবালা আলো ধরিয়া খড়্খড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী পড়িয়া গিয়াছেন। তখন নির্দ্দয়া সরোজবালা স্বামীকে তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক, "থাক্ পোড়ারমুখো, যেম্নি তেম্নি প'ড়ে থাক্" এই বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিয়া বকিতে বকিতে তথা হইতে চলিয়া-গেলেন।

পরদিবস প্রাতে সরোজবালা সেই ঘরের দরজা খুলিলেন, দেখিলেন চৌবাচ্চার চাতালের উপর তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয় সংসার-সহচর স্বামী মহানিদ্রায় অভিভূত—শরীর স্পন্দহীন—চক্ষু জ্যোতি-হীন—নাসিকা শ্বাস প্রশ্বাস রহিত—জিহ্বা বাক্যহীন—হস্ত পদ শীতল ও অসাড়। পাপীয়সি ! পতিঘাতিনি ! আর কি দেখিতেছ ? তোমার ইহ জন্মে ও পরজন্মে স্থল নাই—তুমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ নাই। সরোজবালা তখন, "অ্যাঁ ! আমার স্বামী আমি মারিয়া ফেলিলাম—উ ! কি সর্ব্বনাশ !!" এই বলিতে বলিতে সিহরিয়া নাচিয়া উঠিলেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, উন্মাদাবস্থায় বাঁচিয়া ছিলেন—সর্ব্বদাই মুখে বলিতেন,—"আমি কি ক'রেছি ! আমার প্রাণ ফেটে গেল যে—আমার বুক ফেটে গেল যে !!।"

শ্রীভু।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

গত নবেম্বর মাসের থিয়োজফিষ্ট পত্রিকায় "কে পেরাজি" নামক এক ব্যক্তি দুইটি বৃক্ষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, একটি লতা ও অপরটী গুল্ম। লতাটীর নাম জ্যোতিষ্মতী। ইহা উত্তর ভারত-বর্ষ ও আসামের পর্ব্বতাঞ্চলে নিভৃত উপত্যকা ও নিবিড় গহন বনে জন্মিয়া থাকে। যোগী এবং সন্ন্যাসিগণ অলৌকিক ক্ষমতা লাভাকাঙ্ক্ষায় ইহার অন্বেষণ করিয়া থাকে। দিবসে ইহা অন্যান্য লতার সহিত মিশ্রিত থাকাতে নির্ব্বাচিত হয় না, কিন্তু রাত্রিকালে ইহার জ্যোতি প্রদীপ্ত হইলেই ইহাকে চিনা যায়। ইহার পত্র হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়। ইহার রসে গলিত তাম ভস্ম হয়। এই তাম্রভস্মের অদ্ভুত গুণ আছে। অল্প মাত্রায় সেবন করিলে অনেক উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য হয় ; অনেক প্রকার কুষ্ঠরোগও আরাম হয় ; এবং অন্যান্য ধাতু এই ভস্মসংযোগে

স্বর্ণ হইয়া থাকে। ইহার পত্রও অগ্নি-উদ্দীপক ও অদ্ভুত গুণবিশিষ্ট ; চর্ব্বণ করিলে মস্তিষ্কের মালিন্য বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্ঞানালোক প্রতিভাত হয়। কিন্তু কখন কখন অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া প্রাণনাশকও হইয়া থাকে। একদা দশ জন সাধু এই পত্র ভোজন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আট জন আন্তরিক প্রদাহ অসহ্য হওয়াতে গতাসু হন এবং দুইজন মাত্র জীবিত থাকেন। তাহাদের এক জন "সিদ্ধান্ত বিন্দুর" গ্রন্থকার মধুসূদন সরস্বতী এবং অপর ব্যক্তি গদাধর ভট্টাচার্য্য। গদাধর একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত ন্যায় শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে।

গুল্মটীর নাম রোদন্তী। ইহার পত্র সকল ছত্রাকারে ক্ষুদ্র স্কন্ধদেশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। পত্রের প্রান্তভাগ হইতে বিন্দু বিন্দু জল অনবরত মুক্তা অশ্রুবৎ পতিত হয় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম রোদন্তী হইয়াছে। এই বিন্দুপ্রবাহ গুল্মস্কন্ধ বেষ্টনপূর্ব্বক পরিধি রেখাকারে পতিত হয়। এই প্রবাহ-রেখা খুদিয়া তাহাতে পারদ ঢালিয়া মৃত্তিকার দ্বারা লেপ দিয়া তিন দিন ও তিন রাত্রি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে মৃত্তিকার আচ্ছাদন অপসারিত করিলে একখণ্ড নিরেট রূপা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া তদ্দারা দ্রব লৌহ বা তাম্র স্বর্ণ করা যাইতে পারে। পেরাজি এই বৃক্ষদ্বয় আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মরণ সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

মরণ মরণ কর কেন ?
আমি কি মরণে ডরি ?
আমরণ সার করেছি
মরণ-ভয়-হরণ হরি ! ১

জীবনের কার্য্য যত মরণ করে সংযত,
(আমি) উদ্‌যাপিব জীব-ব্রত
মরণ মর্দ্দন করি। ২

সংসার-পিচ্ছিল-পথে পড়ে যদি কোন মতে
উঠিতে না পেরে কভু
অপঘাতে প্রাণে মরি।
সব দুঃখ ভুলে যা'ব, নূতন জীবন পা'ব,
আবার উঠে দাঁড়াব
মরণে চরণে ধরি। ৩

যদ্যপি সৌভাগ্যবশে, থাকিতে আপন বশে
হরিনামামৃত রসে
ডুবে এ জীবন-তরী।
জয়ধ্বনি দেবে দেবে,* মোক্ষ তুলে বক্ষে নেবে,†
মরণ মরিলে ভেবে (হেরে)
হাসিব বদন ভরি ! ৪।

* দেবে—দিবে, দেবগণ। † নেবে—নিবে বা লইবে।

কপিলাবাস্তু বা কপিল নগর।

ইক্ষাকুবংশীয় শুদ্ধোদন-রাজপুত্র শাক্যসিংহ বা গৌতম বুদ্ধ প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আজি সভ্যজগতের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫৫৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হন। তাঁহার জন্মস্থান কপিলাবাস্তু বা কপিল নগর। সপ্তত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বুদ্ধ-গয়ায় (গয়ার নিকট) তপঃ-সিদ্ধ পরম জ্ঞান লাভ করেন এবং তৎপরে বারাণসীর সন্নিকটে সরনাথ নামক জনপদে প্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। সরনাথ বারাণসী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখন ইহাকে জনশূন্য মরুস্থলী বলিলেও হয়। তিনি অযোধ্যা প্রদেশেও প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তৎপ্রদেশও একটী বিশাল জনপদ ছিল। পরিশেষে খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দে কুশী নগরে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কুশীনগর, বুদ্ধগয়া এবং সরনাথের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও ঐ সকল স্থানের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু কপিলাবাস্তু বা কপিল নগরের অস্তিত্ব এতকাল কেবল গ্রন্থমধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ইহার প্রকৃত স্থান ইতিপূর্ব্বে আবিস্কৃত হয় নাই। এই স্থানটী আবিষ্কার করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান হইতেছে। হরিদ্বারের সন্নিকট "কপিল" ও মায়াপুর এবং তথায় মায়াদেবীর (বুদ্ধদেবের মাতা) মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ মঠ দেখিয়া অনেকে সেই স্থানেই কপিলাবাস্তুর সম্ভাবনা বিবেচনা করেন। কেহ বা মগধমধ্যে (বেহারে) কপিলাবাস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে উত্তরকোশলান্তর্গত অযোধ্যার উত্তরাংশে কোন একটী স্থানে কপিলাবাস্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি নেপালের অন্তর্গত তৌলিক নগরের এক ক্রোশ উত্তরে তিলৌরাকোট নামক স্থলে একটী সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উহাই পতিত কপিলাবাস্তু। এই স্থানটী গোরক্ষপুরের উত্তর এবং অস্কা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তিলৌরাকোটের পূর্ব্বদক্ষিণ ছয় ক্রোশ দূরে অশোক রাজার এক স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতেই তথায় শাক্যসিংহের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যে স্থানে স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম রুমিন্‌দেও—লুম্বিনী দেবী (মায়া দেবী)। শাক্যসিংহের মাতার নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হইয়াছে। অশোক স্তম্ভের ৪০ পাদ পশ্চিমে খনন

করিয়া একটী প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহাই মায়াদেবীর মন্দির বলিয়া বোধ হয়; কারণ ইহার অভ্যন্তরে মায়াদেবীর প্রমাণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মস্তকটি প্রভিন্ন পতিত ছিল, এখন সংযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কালহস্তে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ৭৫ পাদ দক্ষিণে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, মায়াদেবী প্রসবান্তে তথায় স্নান করিয়া শুদ্ধা হইয়াছিলেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ অনেক বড় বড় প্রাচীরের ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে।

তিলৌরাকোট একটী প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাকারবেষ্টিত নগর। ইহার পূর্ব্বাংশ উপর্য্যুপরি দুইটী পৃথক্ পৃথক প্রাকারে ও পরিখায় বেষ্টিত ছিল। ইহার আয়তন পূর্ব্বপশ্চিমে ১০০ পাদ ও উত্তর দক্ষিণে ১৫০০ পাদ। ইহার পশ্চিমে পার্ব্বতীয় নদী বাণগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। খননকারী অনুমান করেন যে, এই প্রাচীরবেষ্টিত স্থলেই শুদ্ধোদনের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। তথায় তাহার প্রচুর ধ্বংসাবশেষও পতিত রহিয়াছে। অদূরে একটী ভগ্ন স্তূপের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে; উহাকে লোকে অসিত ঋষির মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি শিশু বোধিসত্ত্বেক সন্দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

গত দুই বৎসর ডাক্তার ওয়াডেল ও ডাক্তার ফুরার এই স্থানের আবিষ্কার সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন, কিন্তু বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া প্রোথিত নগরের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। আমরা তাঁহারই অনুসন্ধানের ফল গত মে মাসের থিয়োজফিষ্ট হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম।

বিজ্ঞান-রহস্য।

জীবাণুতত্ত্ব।

এ হেন অসীম বিশ্ব অচিন্ত্য অব্যয়,
ভাবিতে যাহার ভাব ভাব স্তব্ধ হয়,
ফিরে এসে ভয় পেয়ে মানস-কল্পনা,
ভ্রান্ত গাথা, ক্লান্ত চিন্তা, কে করে জল্পনা?
হেন বিশ্ব ওতঃপ্রোতোভাবে সমুদয়
পরিপূর্ণ অসংখ্য অসংখ্য প্রাণিময়।
ধরায় যেমন জল, স্থল বায়ু পরে
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী অবস্থিতি করে,
সেই মত এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল—
সমুদয় প্রাণিময় পূর্ণিত কেবল।

বিজ্ঞান বিভা, অসীম দ্যুলোক।

আমরা যে জগতে বাস করিতেছি

তাহা অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ। জল স্থল অন্তরীক্ষ কিছুই প্রাণিশূন্য নহে। আমরা স্থাবর জঙ্গম, আকীটমানব—স্থূল শরীরী সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া যেমন প্রতিনিয়ত আশ্চর্য্য হইতেছি, সেইরূপ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অদৃষ্ট জীব সকল অণুবীক্ষণ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইয়া থাকি। এই সকল সূক্ষ্ম অদৃষ্ট জীবকেই জীবাণু বলে। আমাদিগের দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, অধঃ ও ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্রই এই জীবাণুর প্রাদুর্ভাব। পরমাণু সকল যেমন সর্ব্ব স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, জীবাণুও তদ্রূপ সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পরমাণু মূল পদার্থ, জীবাণু সূক্ষ্মাণু জীব। পরমাণুর বিনাশ নাই, তাহা নিত্য পদার্থ; জীবাণু অনিত্য এবং ধ্বংসশীল; এমন কি ইহার জীবন মাত্রা অনুপল হইতেও স্বল্পতর, সময়ে নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। ইহা এত সূক্ষ্মতম এবং স্বল্পক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহার শক্তি এত প্রবল যে, প্রভূত শক্তিসম্পন্ন প্রকাণ্ড শরীরও মুহূর্ত্ত মাত্রে বিনাশ করিতে সক্ষম। মানব ও অন্যান্য স্থূল শরীরী প্রাণিগণ এই জীবাণু দ্বারা সর্ব্বদা ওতপ্রোতভাবে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে জীবাণুর অভিব্যাপ্তি। স্থূল খাদ্যদ্রব্য দূরে থাকুক, আমাদিগের পানীয় জল ও সেবনীয় বায়ু পর্য্যন্ত রাশি রাশি জীবাণু দ্বারা পরিমিশ্রিত। মানব বহুকালাবধি এই অদৃশ্য জীবাণুর অস্তিত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্প্রতি ইহার তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। বহুকাল গত হইল রোমীয় চিকিৎসকেরা শরীরমধ্যে সূক্ষ্ম জীবাণুর অভিসঞ্চারের কথা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রুধিরে জীবাণুর সঞ্চার হেতুই জ্বরাদি শোণিত-জাত মারাত্মক পীড়া সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এণ্টনি-ভন-লিউবেনহুক (Antony von Leuwenhook) নামক একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক প্রথম জীবাণুর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই সময়েই অণুবীক্ষণের সৃষ্টি হয়। সুতরাং অণুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু অনুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে "ব্যাকৃটিরিয়া" বা "মাইক্রোব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরাও উপযোগী শব্দাভাবে জীবাণু বলিয়া প্রকীর্ত্তিত করিলাম। জীবাণু নূতন কথা নহে. অনেকে এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোনও অভিধানে বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্বে ব্যাকৃটিরিয়া বা জীবাণু সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ সংস্কার ছিল। কেহ কেহ ইহাকে এক প্রকার কীটাণু বলিয়া প্রাণিজগতের অন্তর্ভূত করিয়াছিলেন, কেহ বা উদ্ভিজ্জাণু বলিয়া উদ্ভিদের অন্তর্গত করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে যে, ইহারা প্রাণীও নহে এবং উদ্ভিজ্জও নহে। ইহারা প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যবর্ত্তী জীব। একদিকে ইহারা যেমন প্রাণিগণের

ন্যায় গতিশক্তিবিশিষ্ট, অপর দিকে তেমনি উদ্ভিজ্জান্তর্গত ছত্রকের ন্যায় বর্ণোৎপাদক (ক্লোরোফিল) গুণ রহিত। সাধারণতঃ প্রাণীদিগের যে সকল প্রধান শারীরিক গুণ ও লক্ষণ আছে, তাহা ইহাদিগের নাই। দেহীর উত্তমাঙ্গ মস্তক ইহাদিগের নাই। ইহারাই প্রকৃত কবন্ধ। ইহাদিগের পাকস্থলী আছে কি নাই, তাহাও এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই; অথচ ইহারা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য শোষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃমিকীট যেমন মুখ ও পাকস্থলী রহিত হইয়াও প্রাণীদিগের জঠরস্থ জীর্ণ অন্ন-রস চর্ম্ম দ্বারা শোষণ করে, ইহারাও বোধ হয় সেইরূপ নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জীবাণু নানা প্রকার। কেহ কেহ অণ্ডাকৃতি, কেহ ত্রিকোণাকৃতি বা ত্রিভুজবিশিষ্ট, কিন্তু অধিকাংশই তরঙ্গাকৃতি। "ব্যাসিলাস্" নামে এক জাতীয় জীবাণু আছে, তাহাদিগের স্থিতিস্থাপক লোমাবিষ্ট পদ দৃষ্ট হয়। এই পদ বাঁশীর ন্যায় ফাঁপা, তদ্দ্বারা প্রাণি-শরীরের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। ইহারাই ম্যালেরিয়া বিষের বীজোৎপাদক। বৈজ্ঞানিকেরা সমগ্র জীবাণুদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর জীবাণু দেহীর অনপকারক—প্রত্যুত উপকারক। ইহারা সুস্থ শরীরস্থ বিশুদ্ধ শোণিতে অবস্থিতি করিয়া যথাসম্ভব দেহীর জীবনী-শক্তি প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। অপর শ্রেণীর জীবাণু প্রাণিগণের অপকারক। ইহারা প্রাণি-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনী-শক্তি অপচয় করিয়া থাকে। যতদিন শরীর সবল ও সুস্থ থাকে এবং জীবনী-শক্তি অপ্রতিহত থাকে, ততদিন অপকারক জীবাণু সকল কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না, বরঞ্চ উপকারক জীবাণু দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও নিহত হইয়া থাকে; কিন্তু যখনি জীবনী-শক্তির হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্যনাশ ও দেহ বলহীন হয়, তখনই ইহারা প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া দেহের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর ভক্ষ্য ও পানীয় মধ্যে অবস্থিতি করিয়া জীব-শরীরের অপচয় করিয়া থাকে। এক বিন্দু জল বা দুগ্ধে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বিচরণ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র এক খণ্ড আলুর মধ্যেও লক্ষ লক্ষ জীবাণুর আবির্ভাব। প্রজ্বলিত অগ্নি ও হিমশিলার অভ্যন্তর ব্যতীত ইহারা সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কোন বস্তু পচিলে বা উৎসেচিত হইলে তন্মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে অর্দ্ধ ছটাক কাঁচা দুগ্ধে এক ঘণ্টার মধ্যে ৬১,৬০০ জীবাণুর সঞ্চার লক্ষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুই ঘণ্টার মধ্যে ইহার অনেকগুলি মরিয়া যায়, তথাপি ইহাদিগের সংখ্যা ৫,৩০,০০০ বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুগ্ধ দোহনের চারি ঘণ্টার পর ৬,৮০,০০০, সাত ঘণ্টার পর ১০,২০,০০০ এবং ৯ ঘণ্টার পর ২০,৪০,০০০ জীবাণু দৃষ্ট হয়। দুগ্ধ দোহনের ২৪ ঘণ্টার পর কাঁচা দুগ্ধে ৮,৫০,০০,০০০ আট কোটি

পঞ্চাশ লক্ষ জীবাণু দৃষ্ট হইয়াছে, মৃত সংখ্যার তো কথাই নাই। এই সকল জীবাণু শরীরের অপকারক, সুতরাং যাঁহারা স্বাস্থ্যলাভেচ্ছায় কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। প্রাচীন চিকিৎসকেরা দুগ্ধ ও জল উষ্ণ করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পাঠিকারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একে তো জীবাণু সকল অণুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, তাহাতে তাহাদিগের সংখ্যা নিরূপণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যাঁহারা দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশের নক্ষত্র সকল গণনা অথবা উল্কাবৃষ্টির সংখ্যা নিরূপণের কৌশল অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না। যাহা হউক সম্প্রতি ওলিয়াজেল (Woliagel) নামক একজন বিজ্ঞানবিদ্ একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এইরূপ গণনাকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ডাক্তার নিউম্যান কৃত জীবাণুতত্ত্ব
হইতে সংগৃহীত।

প্রভাতী

(৪১৩ সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মলয় গিরি হইতে উন্মূলিতা চন্দন-লতিকার ন্যায় শ্রীহীনা হইয়া আসিয়া প্রভাতী আপন শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া রহিল।

বিভাতী পদ-তলে বসিয়া মাতার চরণ দুখানি ধীরে ধীরে টিপিয়া দিতেছিল। সুনীল মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কখনও কাঁদিতেছিল—কখনও হাসিতেছিল—কখনও ডাকিতেছিল—কখনও জিজ্ঞাসা করিতেছিল কোথা গেছিলি? কেন গেছিলি? প্রভাতী সুনীলকে কখন চুমো দিতেছিল, কখনও বুকে নিতেছিল, কখনও চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতেছিল।

ইতিমধ্যে চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, মধুমতী, অনিল ও প্রভাতী তিনজন যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রভাতী গৃহে ফিরিয়াছে। এই কথা প্রচার হইবা-মাত্র মধুমতীদের বাড়ীর লোকে আসিয়া প্রভাতীর গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। মধুমতীর মাতাও বহু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘোর আর্ত্তনাদে দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রভাতীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রভাতীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমার মা কোথায়? আমার মধুমতী কোথায়?" প্রভাতী কোন কথা কহিল না।

প্রভাতীকে সজলনয়ন ও নীরব থাকিতে দেখিয়া মধুমতীর জীবনের পক্ষে একান্ত নিরাশ হইয়া তাহার মাতা ভীষণ হাহাকার-রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে হৃদয়স্পর্শী ঘোর ক্রন্দনের রোলে ক্ষুদ্র গৃহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। প্রভাতী দেখিল এই উপযুক্ত সময়, তখন সে কহিল "আমি মধুমতীর সংবাদ কহিতেছি; তোমরা ক্ষণকালের জন্য নীরব হও।" প্রভাতীর কথা শ্রুত হইবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ঘোর ক্রন্দনধ্বনি বিলীন হইয়া গেল, গৃহ নীরব হইল। প্রভাতী কহিল "মধুমতী মরে নাই।" মধুমতী মরে নাই এই কথা শুনিয়া মধুমতীর মাতা বিস্ফারিতনেত্রে প্রভাতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন "বল বল তবে মা, আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় আছে?" প্রভাতী দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে। সে তখন সকলকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বুঝাইয়া কহিল "আমি মধুমতীর সংবাদ কহিব বটে, কিন্তু তোমরা অগ্রে আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে মধুমতীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবে।" স্থির ও কম্পিত কণ্ঠে সকলে কহিল "হাঁ করিব।" "যাহাতে মধুমতী সর্ব্বসাধারণের নিকট নিন্দিত না হয়, তাহা তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিবে?" স্থির কম্পিত কণ্ঠে সকলে কহিল "হাঁ করিব।"

তখন প্রভাতী মধুমতীর নিকট হইতে সেই সুন্দর চিত্র প্রাপ্তি অবধি তাহার পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিল। সেই গুপ্ত পর্ব্বতের ঠিকানাও কহিল। মধুমতীর মাতা মধুমতীর জীবনের পক্ষে একেবারে নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দেখিলেন যে তাঁহার মধুমতী সুখে ও শান্তিতে আছে।

মধুমতী তাহার অমতে একজন অপর জাতীয়কে বিবাহ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইলে যে তাহাদের সকলের সমাজচ্যুতি হইবে, সুখাতিশয্যবশতঃ মধুমতীর মাতা এ সকল কথাই ভুলিয়া গেলেন। মধুমতীর মাতা আহ্লাদে অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রভাতীকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার মনে তখন এই ভাবের উদয় হইতে লাগিল যে প্রভাতীই যেন তাহার কন্যার জীবনদায়িনী। তখন প্রভাতীর গৃহ শূন্য করিয়া অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। প্রভাতীর নিকট বিদায় লইয়া মধুমতীর মাতাও গৃহে গেলেন।

অনেক আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের প্রধান প্রধান লোক ও বড় বড় প্রজামণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মধুমতীর পিতা মধুমতীর বিবাহবৃত্তান্ত সকলের নিকট বিবৃত করিলেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া অনেকের সঙ্গে পুনঃসম্মিলন সংস্থাপন করিলেন, আবার কতক লোকের সঙ্গে বিবাদও উপস্থিত হইল। অনেকের সঙ্গে মতের ঐক্য হইল না। কিন্তু কন্যা-বৎসল পিতা মাতা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রিয় কন্যা জামাতাকে নিজ গৃহে আনিতে স্থিরসংকল্প হইলেন।

আজ বৈকালে বাদ্যভাণ্ড ও লোক কোলাহল বন্ধ করিয়া অনিল একাকী আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাতী পরিশুষ্ক ছিন্ন পদ্মমালোর ন্যায় বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, ছেলে মেয়ে দুটি কাছে বসিয়া অতি মধুরকণ্ঠে গাইতেছে :—

"প্রভুজী তুঁহি জীবন আধার।
দরশন দিজে মেয়,
অতি দীন হো কৃপা অবতার,
তুম্ হি পিতা মাতা, তুম্ হি ভরসা,
তুম্ হি জ্জেয়ান প্রাণ, তুম্ হি নিস্তার।"*

অনিল দেখিল প্রভাতীর অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার ইহলোক পরিত্যাগ করিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রভাতীর সেই অন্তিম অবস্থা দেখিয়া অনিলের প্রাণ ফাটিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তখন প্রভাতী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল অনিল তাহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে। প্রভাতী মেঘাবৃত শশীর ম্লান জ্যোতির ন্যায় চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি স্বামীর চক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল "কাঁদিতেছ কেন? কাঁদিবার তো কোন কারণ হয় নাই। দৈবের প্রতিকূলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতারা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর। অদৃষ্টফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তুমি আমার নিকট আসিয়া বস, আমি তোমাকে একবার জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই।" অনিল নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাতীর শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদের আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মধুমতীদের বাড়ীর লোকজন এবং তাহার আত্মীয়গণে প্রভাতীর ক্ষুদ্র গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বেও একদিন এই গৃহ এইরূপ পূর্ণ হইয়াছিল। মধুমতীর পিতা অতি ধনী লোক, তিনি গ্রামের অনেকের কথা অবহেলা করিয়া ও অনেকের মত লইয়া জামাতাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আসিলেন—মনে ভাবিলেন যাহারা এক্ষণে আমার মতাবলম্বী না হয়, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া আপনার সমাজে আনিতে পারিব। আর যদি না পারি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জাতি এবং সমাজের জন্য আমার প্রাণতুল্যা কন্যা ও জামাতাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? অনিল শ্বশুর মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই সময় প্রভাতীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সে এখন বড়লোকের জামাতা, বড়লোক শ্বশুরকে অসন্তুষ্ট করা কোন রকমেই উচিত কাজ হয় না। তাহার পর আবার ভূস্বামীর একমাত্র কন্যাকে সে বিবাহ করিয়াছে, যথাবিধি মঙ্গলাচরণ না করা উচিত হয় না, কারণ মধুমতীর জীবনের উপরেই তাহার পিতার সম্পত্তি লাভের আশা রহিয়াছে। বিশেষ শ্বশুর মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে আজ

* ব্রহ্মসঙ্গীত।

শুভ দিনে এভাবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুমোচন ঘোর অমঙ্গলের কারণ। অনিল আর শ্বশুরের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। অতএব প্রভাতীর নিকটে আর তার বসা হইল না। কিন্তু প্রভাতীর গুণ স্মরিয়া তার মনের মধ্যে ঘোর অশান্তির তরঙ্গ বহিতেছিল।

অনিল ত গেল, কিন্তু মধুমতীকে আর প্রভাতীর নিকট হইতে সরান যায় না। মধুমতী প্রভাতীর শেষ সময় দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল ও প্রভাতীর মুখের উপর পড়িয়া হাহাকাররবে কাঁদিতে লাগিল, যেন প্রভাতীর সঙ্গেই তাহার যাইবার ইচ্ছা। অবশেষে মধুমতীর আত্মায়েরা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া গৃহে লইয়া গেল। মধুমতী প্রভাতীকে ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু সেই অবধিই তার প্রাণ শূন্য ও শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। অনিল প্রভাতীর উপরে নিষ্ঠুরাচরণ করায় মধুমতীর প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, সেই আঘাতই তাহার প্রাণবিয়োগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই ঘটনার পরে সে অধিক দিন জীবিত ছিল না। যত দিন সে জীবিত ছিল, কাহার সঙ্গে—এমন কি অনিলের সঙ্গেও সে প্রাণ খুলিয়া মেশে নাই বা কথা বলে নাই। মরিবার সময় সে কেবল "সখি, সখি" "প্রভাতী প্রভাতীই" বলিয়াছিল। অনিল চলিয়া আসার পর প্রভাতীর একটা মোহ হয়, মোহের ভিতর সে যেন স্বপ্নের মত দেখিতে লাগিল। তাহাকে কে যেন একজন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মহাপুরুষ আসিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। স্বর্গে গিয়া সে দেখিল স্বর্গের সাধ সুন্দর সুমেরু পর্ব্বতের মূলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া স্বর্গগঙ্গা সুবর্ণের কূলে কূলে কুল কুল নাদে বহিতেছে। সে স্বর্গে পঁহুছিবামাত্র দয়া ধর্ম্মের অবতারের ন্যায় শত শত সুরসুন্দরীরা আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নন্দন কাননে লইয়া গেল।

নন্দন কাননের মধ্যভাগে একটি লতাকুঞ্জ। লতাকুঞ্জের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সেই লতা-কুঞ্জের উভয় পার্শ্বে ফল পুষ্প কিশলয়োপশোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম নানাবিধ সমুন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত আছে। অতি সুরভি কানন ও হংসকারণ্ডব চক্রবাকোপশোভিত মন্দাকিনী নদী রেখাকারে তাহার চারি দিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বায়ু তত্রত্য নীরজ ও স্থলজ অরবিন্দের সুগন্ধি বহনপূর্ব্বক তাহাকে সেবা করিতে লাগিল। সেই কুঞ্জসংলগ্ন মন্দাকিনীর তটাবলীতে নিরাহার তেজঃপুঞ্জ সর্ব্বপাপবিমোচক মহামুনিগণ মহাধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। সে দেখিল সেই লতাকুঞ্জের মধ্যে একখানি স্বর্ণ সিংহাসন রহিয়াছে। সিংহাসনের উপর সুরভি মন্দারকুসুমের আসন, চারি পার্শ্বে কৃষ্ণ ভ্রমর গান করিয়া বেড়াইতেছে। দেবীগণ তাহাকে সেই আসনে বসাইল। সে কহিল "অনিল কৈ? মধুমতী কৈ?"

দেবীরা বীণাঝঙ্কারের ন্যায় মধুরস্বরে কহিল "তাহারা তোমার পশ্চাতে আসিতেছে। ক্ষণকাল পরে আবার কহিল 'ঐ তাহারা'।"

প্রভাতী দেখিল মধুমতী শুষ্ক পদ্মের ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে। অনিলের স্বর্ণকান্তিও মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অতি মলিন। প্রভাতী তাহাদের দুঃখে অতি দুঃখিত হইয়া কহিল "ইহাঁরা কোথায় যাইবেন ?"

দেবীরা কহিল "ঐ থানে।"

প্রভাতী দেখিল তাহাদের জন্যও একটী লতা-কুঞ্জ। কিন্তু সেটি অতি কদর্য্য ও অন্ধকারময়। তাহাদের বসিবার জন্য ভূমিতলে কণ্টকাকীর্ণ দূর্ব্বার আসন রহিয়াছে।

সে তখন স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল ও দেবীগণের নিকট কহিল "আমি উহাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" কিন্তু দেবীরা কহিল "তোমার কাছে আসিবার উহাদের অধিকার নাই।"

প্রভাতী কহিল "উহাঁরা ভূমিতলে ও অন্ধকারে রহিবেন, আর আমি সিংহাসনে ও আলোকে রহিব, এ কেমন কথা ?"

দেবীরা কহিল "পৃথিবীতে যে যেমন কর্ম্ম করে, এখানে সে তেমনি ফল পায়।"

প্রভাতী কহিল "আমার পুণ্য আমি ইহাঁদিগকে দিতেছি, তাহা হইলে কি ইহাঁরা এখানে আসিতে পারিবেন না ?"

দেবীরা কহিল "হাঁ, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে ঐ সুন্দর স্থানটি হইতে চ্যুত হইতে হইবে।"

প্রভাতীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সে কহিল "তাহাই হউক, তাহাই হউক, আপনারা শীঘ্র আমার বাসনা পূর্ণ করুন্।" কিন্তু বাসনা আর পূর্ণ হইল না, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মোহভঙ্গ হইল, অতএব সে স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রভাতী প্রকৃতিস্থ হইয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে, তাহার জীবনদীপ নিভিবার আর অধিক বিলম্ব নাই; অচিরেই তাহাকে এ সংসার-ধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। যত মুহূর্ত্ত অতীত হইতে লাগিল, ততই তাহার শরীর অবসন্ন এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রভাতী মৃত্যুসময় আসন্ন বুঝিতে পারিয়া সহাস্যমুখে কিছুমাত্র কাতর হইল না, বরং

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

গাইতে লাগিল। তাহার পর সে অনিলকেই একমাত্র মুক্তিদাতা দেবতা ভাবিয়া অনিলের ধ্যানে মনোনিবেশ করিল। তখন "হরে মুরারে" গাইতে গাইতে আর অনিলকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি তাহার নিকট স্বর্গ-তুল্য হইল। অনিলকে ধ্যান করিতে করিতে প্রভাতী অনিলের সঙ্গে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। সে তখন চক্ষু মেলিয়াও অনিলকে দেখিতে লাগিল—চক্ষু মুদিয়াও অনিলকে দেখিতে লাগিল। অনিলকে ভাবিতে ভাবিতে প্রভাতী জগৎ ভুলিয়া গেল। জীবন মৃত্যু ভুলিয়া গেল।

মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে প্রভাতীর

পুনরায় মোহ হইল। সে মোহের ভিতরেও সে স্বর্গস্বপ্ন দেখিতেছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভাতী স্বপ্ন দেখিল সম্মুখে অমর-বাঞ্ছিত স্বর্গধাম। স্বর্গের মধ্যস্থলে মধুর নন্দনকানন। অতি মধুর মন্দার-পুষ্পগুলি সুরবালিকার ন্যায় বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতেছে। বৃক্ষের মূলদেশ ধৌত করিয়া অমৃত-নদী বীণাধ্বনি করিতে করিতে বহিতেছে। সূর্য্য-মরীচি-সন্নিভ হীরকরত্ন-সমলঙ্কৃত অপ্সর অপ্সরী ও কিন্নর কিন্নরীগণ চারি দিকে নাচিয়া গাইয়া বেড়াইতেছে। সেই থানে শত সূর্য্যের ও শত চন্দ্রের মাল্য দ্বারা বক্ষঃস্থল বিভূষিত করিয়া অনিল রত্ন-বেদীতে বসিয়া আছেন। আর প্রভাতী পারিজাতফুলের ছিন্ন দলগুলিতে উপবিষ্ট হইয়া অনিলের পদ সেবা করিতেছে।

এই সুখের মোহ তাহার আর কখনও ভঙ্গ হইল না। দেবদূত স্বয়ং নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভাতীর পবিত্র প্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্বর্গধামে লইয়া উপস্থিত হইল —অম্বুজা-সুন্দরী দাস গুপ্তা।

সরযূ ও সরলার কথোপকথন।

সরযূ। প্রিয় ভগিনী সরলে! আজ আমার কয়েকটী জিজ্ঞাস্য আছে, উহার সদুত্তর দানে পরিতৃপ্ত করিবে কি ? ভগিনি! প্রাচীন কালের পূজাপাদ আর্য্য ঋষিগণ যে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহারা বর্ণন করিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, গার্হস্থ্যাশ্রম কিরূপ ? এবং আমাদের এই গৃহ কি ভাবে গঠিত হইলে শ্রেষ্ঠাশ্রম নামের যোগ্য হইতে পারে ?

সরলা। স্নেহের ভগিনি সরযু! আজ যে তুমি গৃহস্থাশ্রমের গভীর তত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু ভগি! আমার জ্ঞান অতি অল্প, যথাসাধ্য তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর।

গার্হস্থ্যাশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম। ইহা একটী পুণ্যতীর্থ বিশেষ। প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমে প্রেম, পুণ্য, শান্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে এবং সেই সদ্ভাব কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আশ্রমবাসীদিগকে সুসৌরভে মুগ্ধ ও স্বর্গীয় সুখে সুখী করিয়া থাকে। গৃহাশ্রমে যে কয়েকটী গুরুতর পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা এই :—১ম পিতৃ-মাতৃ-সেবা, ২য় দাম্পত্য, ৩য় বাৎসল্য, ৪র্থ সৌভ্রাত্র। ইহা ব্যতীত স্বজনপ্রেম, পরোপকার, স্বদেশ-হিতৈষণা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা প্রভৃতি কতকগুলি পবিত্র কর্ত্তব্য আছে, ঐ সমস্ত সদাচার দ্বারা সংসার পুণ্যাশ্রমে পরিণত হইতে পারে।

১ম। পিতৃ-মাতৃ-সেবা। যে গৃহাশ্রমে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জনক জননীর প্রতি সন্তানগণের প্রগাঢ় ভক্তি, গভীর শ্রদ্ধা, নিঃস্বার্থ প্রীতিপূর্ণ সেবার ভাব আছে ও যেখানে পুত্র কন্যাগণ পূজ্যপাদ পিতার মধ্যে পরমারাধ্য বিশ্বপিতার পিতৃমূর্ত্তি ও স্নেহময়ী জননীতে প্রেমময়ী বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের প্রতিচ্ছায়া সন্দর্শন করতঃ প্রাণপণে ঐকান্তিক প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় রত হন এবং পিতা মাতার চির-অনুগত বাধ্য সন্তান হইয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকেন, সেই সাধু সন্তানদিগের সদনুষ্ঠানে আশ্রম পুণ্য ও শান্তি নিকেতনে পরিশোভিত হয়। পরিশেষে তাঁহাদের সেই অকপট স্নেহ ও ভক্তি বেগবতী স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সংসার সীমাকে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মপাদমূল স্পর্শ করিয়া থাকে।

২য়। দাম্পত্য। ইহা অতি উচ্চতর পবিত্র ব্রত। দম্পতী যদি অদ্বৈত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক একত্রে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎ কৃত-মানসৌ" এই যে মহর্ষি-বচন, ইহাই পতি পত্নী সম্বন্ধের একটী নিগূঢ় তত্ত্ববোধক বাক্য। দম্পতী যদি এই আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হইয়া; উভয়ে উভয়ের মঙ্গলানুষ্ঠানে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারেন ও উভয়ে একপ্রাণ হইয়া এই আশ্রমের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ভগবানে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক প্রীতির সহিত তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ ও যত্নবতী হন, তাহা হইলে এই সঙ্কটময় সংসারকে শান্তির আস্পদ তপোবনে পরিণত করিতে আর বিলম্ব হয় না। পত্নী যদি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, সাধ্বী সতী ও মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা হন, যদি তিনি দয়াবতী, শ্রদ্ধান্বিতা, সেবাপরায়ণা, শ্রমশীলা, মিতা-চারিণী, শান্তশীলা, ক্ষমাশীলা, ধৈর্য্য-বতী, সমদর্শিনী, সর্ব্বজীব-হিতৈষিণী, গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, প্রেমিকা, ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী হইয়া ধীরভাবে সন্তুষ্ট-চিত্তে সাংসারিক কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিতে বিশেষ রত থাকেন, ভর্ত্তার সকল ভার আনন্দের সহিত বহন করিতে প্রস্তুত হন এবং সুখ দুঃখ, বিপদ্ সম্পদ্, রোগ শোক প্রভৃতি সকল অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় অটল ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সমভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী থাকেন; তিনি যদি পতি-হিত-কামনায় আত্মোৎসর্গ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত না হন, এবং শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী ও সহচারিণী থাকিয়া প্রাণপণে পতিসেবায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে গৃহাশ্রম শান্তির আলয় হইয়া উঠে ও দম্পতী মধুর দাম্পত্যপ্রেমাস্বাদনে চির-পরিতৃপ্ত থাকেন। ঈদৃশ ধর্ম্মপ্রাণা পুণ্যবতী সাধ্বী গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবার উপযুক্ত। সাধ্বী পত্নীর ন্যায়

পতিরও সদনুষ্ঠানশীল হওয়া কর্ত্তব্য। স্বামীরও জ্ঞানী, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দয়ালু, ন্যায়নিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ও সর্ব্বতো-ভাবে দেবচরিত্র-সম্পন্ন হওয়া উচিত। গৃহস্বামীর ধর্ম্মপত্নী সম্বন্ধে শারীরিক মান-সিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ উন্নতি সাধনের সহায় হওয়া, মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপ সাধ্বী পত্নীকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী মনে না করিয়া শ্রদ্ধা প্রীতি সম্মানের সহিত ব্যবহার করা এবং পত্নী যাহাতে তাঁহার সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত হন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকা কর্ত্তব্য। নির্ম্মল শাশ্বত প্রীতি অর্থাৎ যে প্রীতি অনন্তকাল অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে, সেই অক্ষুণ্ণ প্রীতির অংশভাগিনী করতঃ পত্নীকে চিরসুখিনী করা পতিজীবনের একটী প্রধান অবশ্য পালনীয় ব্রতানুষ্ঠান বলিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য। ঐরূপ হইলে একপ্রাণ দম্পতী প্রাণের প্রাণ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বিমল সৌন্দর্য্য বিস্তার করত গৃহাশ্রমকে মধুময় ও স্বর্গের সৌরভে আমোদিত করিতে পারেন।

৩য়। বাৎসল্য। যে পিতা মাতা হৃদয়-কুসুম স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে প্রেম-ময়ী বিশ্বজননীর নিঃস্বার্থ স্নেহের দান ভাবিয়া অচঞ্চল ধৈর্য্য, অটল অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের লালন পালনের ভার আনন্দের সহিত বহন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত জনক জননী পদবাচ্য। তাঁহারা ঐ পবিত্র কুসুম সকলকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অর্থাৎ কুমার কুমারী দিগকে সদ্ভাবে সুবাসিত করিবার জন্য জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিনয়, সাধুতা, সদাচার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, ভগবৎ-বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেম প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ যথাসময়ে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত করিতে স্বতঃপরতঃ যত্নবান্ ও যত্নবতী থাকেন এবং সন্তানগণ যাহাতে দেব-জীবনে জীবিত, পরিবর্দ্ধিত এবং দেবকার্য্য-সাধনে তৎপর থাকিয়া দৈব বল লাভ করে ও ব্রহ্মপদে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক তৎ-সেবায় সদা নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের (পিতা মাতার) কর্ত্তব্য-পরায়ণতার বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখা যায় না। ঐরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মপরায়ণা পিতা মাতার গুণে কালে সন্তানগণ সঙ্কট-পূর্ণ সংসার সংগ্রামে অটল থাকিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর থাকিতে সক্ষম হয় এবং সেই সকল ব্রহ্মশিশু ব্রহ্মকৃপাবলে নিরন্তর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে থাকিয়াও বিমল শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

৪র্থ সৌভ্রাত্র। যে গৃহাশ্রমে এক বৃন্ত-স্থিত বিকশিত কুসুমের ন্যায় ভ্রাতা ভগিনীর মধুর সম্মিলন ও সংযোগ আছে এবং কুসুম সৌরভের ন্যায় যাহাদের সদ্গুণে আশ্রম-পদ সৌরভান্বিত, যাহারা সৌহৃদ্য, ও নিঃস্বার্থ প্রীতির সহিত পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া কখনই সদ্ভাবের ব্যভিচার করে না এবং উভয়ে উভয়ের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী

থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত ঐক্য, অনুরাগ, স্নেহ, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান্ ও যত্নবতী থাকে এবং তাহাদের উভয়ের প্রাণ উভয়ের প্রতি সদা উন্মুক্ত থাকে, জনক জননীর সেই নিখুঁৎ প্রেমের পবিত্র প্রতিকৃতি—সেই সোদর সোদরাগণ পরমানন্দে আশ্রমবাসীদিগকে পবিত্র সুখে সুখী করিতে থাকে। পরিশেষে সেই দেব-শিশু ও দেব-বালাদিগের বিশুদ্ধ সুনির্ম্মল সৌভ্রাত্র ও প্রেম সংসারসীমাকে অতিক্রম করিয়া জগন্ময় বিস্তারিত হইয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র জীবনকে প্রসারণশীল সাগরের ন্যায় উদার, গভীর, ও চির বর্দ্ধনশীল করে। সে রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্য সন্দর্শন করিলে সংসার শান্তিরসপূর্ণ তপোবন বলিয়া বোধ হয়।

৫। স্বজন-প্রেম ও পরোপকার। আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে এই দুইটীর সম্যক স্ফূরণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুবিশাল আশ্রম-তরুর সুশীতল ছায়ায় অবস্থিতি করিয়া আত্মীয় স্বজন যাহাতে সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতে পারেন এবং ঐ পুষ্পিত তরুর বিমল গন্ধে অর্থাৎ গৃহাশ্রমের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পবিত্রহৃদয় নর নারীদিগের সদাচরণে যাহাতে আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তজ্জন্য কর্ত্তব্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনী মাত্রেরই উচিত। আশ্রমস্থিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, পিতৃস্বষা, মাতৃস্বসা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি শ্রদ্ধাস্পদ ও কল্যাণীয় স্বজনগণের প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার ও কর্ত্তব্য পালন করা এবং তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে যত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রেম-ভাজন প্রতিবেশীদিগের সহিতও ঐক্য, সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনায় সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকা এবং উদারহৃদয় ও সমদর্শী হইয়া তাঁহাদিগকে স্বজন জ্ঞানে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা সদনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া জানিতে হইবে। প্রিয় ভগিনী সরযু! আতিথ্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের একটী নিত্য পালনীয় মহাব্রত। শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত অতিথিসেবায় নিরত থাকা গৃহীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতিথিগণ আশ্রমে আসিলে সপরিবারে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাঁহাদিগকে আপনার ন্যায় দেখা ও তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সাধুতে ভক্তি ও সাধু-সেবা গৃহস্থের একটী পরম ধর্ম্ম। যে গৃহের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই সাধু-সেবক ও সাধুভক্তিপরায়ণ এবং যে গৃহে সাধু সমাগম সর্ব্বদা হইয়া থাকে, সেই গৃহাশ্রম পুণ্যাশ্রম ও সেই পবিত্রাশ্রমে ভক্তবৎসল ভগবান্ নিত্য বিহার করিয়া থাকেন।

৬। স্বদেশ-হিতৈষণা। স্নেহের ভগিনি সরযু, গৃহাশ্রমে থাকিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন ও উন্নতির চেষ্টা করা গৃহীর একটী প্রধান ধর্ম্ম। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" মাতৃভূমিকে জননী এবং স্বদেশ-বাসী নরনারীকে ভাই ভগিনী বলিয়া জানিবে। স্বদেশবাসিগণ যাহাতে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখী হইতে পারেন, তজ্জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত শ্রমশীল ও যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। আশ্রমবাসিনী ভগিনীগণ যদ্যপি উদারহৃদয় ও স্বদেশ-হিতৈষণায় উদ্দীপিত হন, তাঁহাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। অবলা হইয়া রমণীগণ বহুবিধ উপায় ও চেষ্টা দ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধন ও কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন।

৭। বিশ্বজনীন প্রীতি। ভগিনি! পবিত্র গৃহাশ্রমে থাকিয়া কর্ত্তব্যপালন-তৎপর উচ্চাশয় গৃহিগণ ক্ষুদ্র সংসার আশ্রম অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিশ্বাশ্রমে আসিয়া পৌঁছেন এবং বিশ্বকল্যাণ সাধনে ও বিশ্ব-সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বিশ্ব-হিত কার্য্যে আত্মাকে ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হন। "ব্রহ্মার্পিতমনঃপ্রাণৌ বিশ্বকল্যাণ-দীক্ষিতৌ" গৃহী ও গৃহিণী ব্রহ্মেতে মনঃ-প্রাণ অর্পণপূর্ব্বক বিশ্বকল্যাণ ব্রত পালনে যখন দীক্ষিত হন, তখনই গার্হস্থ্যাশ্রমের মহত্ত্ব ও দেবভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সুনির্ম্মল বিশ্ব-প্রেম সরোবর যখন পবিত্রাশ্রমে প্রকাশিত হইয়া আশ্রমের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, তখন আশ্রমবাসীদিগের সাংসারিকতা, স্বার্থ-পরতা ও সংসার-মমতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মানবীয় অবস্থার পরিবর্ত্তে দেবভাবের বিকাশ হইতে থাকে অর্থাৎ সাংসারিকতা স্থানে নিঃস্বার্থতা, সংসার-সর্ব্বস্বতা স্থানে বিশ্বপ্রাণতা, এবং সংসার-মমতার স্থলে বিশ্বব্যাপী অনুরাগের সঞ্চার হইতে থাকে। তখন গৃহীর ক্ষুদ্র সংসার বিশ্ব সংসারের সহিত মিলিত হয়, তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে মিশাইয়া যায় এবং সঙ্কীর্ণচেতা গৃহস্থের ন্যায় আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার বন্ধু প্রভৃতি এই ক্ষুদ্র আমিত্ব-বোধ তাঁহার উদার চিত্তে বদ্ধ হইয়া থাকে না। তখন সেই উন্নতমনা গৃহী দিব্য চক্ষু অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতঃ এই অসংখ্যজীবপূর্ণ জগৎকে আমার বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই দেব-দুর্ল্লভ অবস্থা আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে অতি প্রার্থনীয়। এই অবস্থায় আশ্রমে ব্রহ্ম-কৃপা পবন নিয়ত প্রবাহিত, ব্রহ্ম-প্রসাদবারি নিয়ত বর্ষিত এবং ব্রহ্মপ্রেম সুধা নিয়ত সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এই উন্নত পবিত্র অবস্থায় আশ্রমবাসিগণ ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া জগৎ ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করেন এবং সুনির্ম্মল ব্রহ্মপ্রেম জলধিতে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মসহবাস ও ব্রহ্মশান্তি সম্ভোগ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে ধন্য করেন। তখন সেই সংসারাশ্রম মহর্ষির পুণ্য তপোবন হইতেও সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়া থাকে।

ট্রান্সভাল ইতিবৃত্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ারদিগের সহিত ইংরাজ জাতির যে মহাযুদ্ধ আজি প্রায় ছয়-মাসকাল ব্যাপিয়া চলিতেছে, ভগবদিচ্ছায় কবে ইহার শেষ হইয়া জগতে শান্তি পুনঃ-স্থাপিত হইবে ও আমাদের জননী ভারতে-শ্বরী নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইবেন, আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এই মহা-যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এখনও রহস্য স্বরূপ হইয়া আছে, কালে অবশ্যই ইহা প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি 'মাঞ্চেষ্টার ট্রান্সভাল কমিটী' নামক একটী ইংরাজ-সমিতি দ্বারা ট্রান্সভালের যে ইতিবৃত্ত প্রচারিত হইয়াছে তাহা হইতে এ বিষয়টী কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এই জন্য আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পাঠক পাঠিকা-গণের গোচর করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরাজ উপনিবেশ নহে। ইংরাজেরা তত্রত্য অধিবাসীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা জয় করিয়া স্বাধিকার-ভুক্ত করেন। ২৫০ বৎসর গত হইল ওলন্দাজেরা আফ্রিকার "কেপ কলোনি" দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া, কুটির বাঁধিয়া, ভূমি কর্ষণ করিয়া ক্রমে ইহাকে মনুষ্যের বাসোপযোগী করেন এবং তথায় সভ্যতার আলোক ক্রমে ক্রমে উদ্দীপন ও বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সহিত আমাদের (ইংরাজ-দের) সংগ্রাম বাধে। ফরাসী সৈন্য ওলন্দাজ-দিগের রাজ্য 'হলণ্ড' আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন। আমরা (ইংরাজেরা) এই উপলক্ষে ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ সকল ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লই। যুদ্ধ শেষ হইলে উপনিবেশ সকলের উপর আমাদের অধিকার পরিত্যাগ করিব অঙ্গীকার করি, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। ভিয়েনার কংগ্রেস সভার মীমাংসা অনুসারে জয়লব্ধ উপনিবেশ সকলে আমাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ওলন্দাজ উপনিবেশীদিগের মত লইয়া আমরা তাহাদিগের উপর শাসন স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, এ জন্য তাহারা ১৮১৫ সালে বিদ্রোহী হয়। আমরা এই বিদ্রোহ দমন করিলাম এবং বিদ্রোহীদিগের ছয়জন নেতাকে ফাঁসী দিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসীরা এই ছয়জনকে (ধর্ম্মবীর) স্বদেশের হিতার্থ প্রাণোৎসর্গকারী বলিয়া গণনা করিতে লাগিল। আমাদিগের প্রতাপে কিছু দিন বাহ্যতঃ শান্তি বিরাজ করিল। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আফ্রিকাস্থ দাসদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাদিগের প্রভুদিগের কোন ক্ষতি পূরণ করিলেন না। ইহার পর নানা কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেশবাসিগণের বিরাগ হইল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত "বোয়ারদিগের

মহাযাত্রা" চলিতে লাগিল। হাজার হাজার বোয়ার তাহাদের ভোজনপাত্র ও জলপাত্র প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রবল স্রোতের ন্যায় উত্তরদিকস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই দলের মধ্যে ট্রান্‌স্‌ভালের বর্ত্তমান সভাপতি পল ক্রুগার ছিলেন; তিনি তখন দশ বৎসরের বালক। এই যাত্রীদিগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক লোক বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা এই মহাযাত্রাকে একটী স্মরণীয় মহাঘটনা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মহোল্লাসের সহিত এতদ্‌ঘটিত দুঃখ, ক্লেশ ও যাত্রীদিগের বীরোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাযাত্রার দলস্থ লোকেরা বাসভূমি পরিত্যাগের পূর্ব্বে এই বলিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন "আমরা এই বিশ্বাসে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি যে ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্ট আমাদিগের নিকট হইতে আর কিছুই চান না এবং আমাদিগের আত্ম-শাসন আমাদিগকে নির্ব্বাহ করিতে দিবেন, তাহাতে কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না।" যাহাহউক ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সহজে ছাড়িতে চান নাই।

অরেঞ্জ নদীতটে আসিয়া যাত্রীরা দুই দলে বিভক্ত হয়—এক দল প্রিটোরিয়স নামক নেতার অধীনে ড্রকেনবর্গ পর্ব্বত-শ্রেণী পার হইয়া নেটালিয়া প্রদেশে বাস স্থাপন করে। আমরা তাহাদিগের অনু-সরণ করিলাম এবং ১৮৪৩ সালে তাহা-দিগকে পরাজয় করিয়া "নেটাল" ব্রিটিশ উপনিবেশ বলিয়া ঘোষণা করিলাম।

যাত্রীদিগের দ্বিতীয় দল অরেঞ্জ নদী প্রদেশে বাসস্থাপন করিল। ১৮৪৮ সালে বুম্‌প্লাট নামক স্থানে বোয়ারদিগকে পরাজয় করিয়া ইহাও আমরা অধিকারভুক্ত করিয়া লইলাম। ১৮৫৪ সালে এই রাজ্যটি আমরা বোয়ারদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করি। অরেঞ্জ নদীর উত্তরদিকে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না, এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। উক্ত প্রদেশের প্রান্তবাসী স্বাধীনতা-প্রিয় লোকেরা ভাল নদী পার হইয়া গেল এবং ১৮৫২ সালে "সাউথ আফ্রিকা রেপব্‌লিক" অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। আমরা তাহাদিগের সহিত একটী সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে ভালনদীর পরপারস্থ উপনিবেশী বোয়ার কৃষকেরা তাহাদিগের রাজকার্য্য আপনারা নির্ব্বাহ করিবে এবং তাহাদিগের আপনাদিগের আইন অনুসারে আপনাদিগকে শাসন করিবে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরিণাম ভাবিয়া এই অঙ্গীকার করা হয় নাই, এই জন্য তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই অঙ্গীকার এড়াই-বার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহার মূল কারণ এ দেশে হীরক ও সুবর্ণের খনির আবিষ্কার। ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যের এক কোণে হীরকের খনি বাহির হয়। সন্ধিসূত্র অগ্রাহ্য করিয়া আমরা হীরকখনি দখল করিয়া লইলাম। ঐতিহাসিক মহাত্মা ফ্রুড এই ঘটনাকে আমাদের ইতিহাসের

অত্যন্ত কলঙ্ককর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা বোয়ারদিগের মনে যার পর নাই অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

১৮৫২ সালে বোয়ারেরা চতুর্দ্দিকস্থ আদিম-নিবাসীদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ১৮৭৭ সালে জুলু জাতির সহিত যুদ্ধ বাধিয়া তাহারা ঘোর বিপদাপন্ন হয়। তাহাদিগের প্রধান বিপদ অর্থাভাব। সার্ বার্টল ফ্রিয়ার ও লর্ড কার্নার্ভান্ এই সুযোগে ট্রান্সভাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া (সাউথ আফ্রিকা কনফিডারেশন্) দক্ষিণআফ্রিকা মিলিত রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদিগের হৃদয়ে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ বর্দ্ধিত হয়। ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট বলপ্রকাশপূর্ব্বক এ ব্যবস্থার বাধা উৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ক্রুগার ও তাঁহার একটি বন্ধু সমগ্র কৃষিজীবী বোয়ারদিগের অগ্রণী হইয়া ইহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদিগের অভিযোগ এই যে পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা এই যে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। সার্ বার্টল ফ্রিয়ার রিপোর্ট করেন যে, বোয়ারদিগের অধিকাংশ লোক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিতে চায় সুতরাং ক্রুগার-প্রমুখ কৃষিজীবীদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোয়ারেরা স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সেনাবলের নিকটে তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য এই অসভ্যদিগের হস্তে বারবার পরাভূত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অলৌকিক উদারতা গুণে বোয়ারদিগের স্বাধীনতা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন। স্থূলদর্শী অজ্ঞ সমালোচকগণ এ ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু লর্ড চর্চহিলের ন্যায় স্থির-বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞের মন্তব্য এই যে ইহা না হইলে "ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার" অস্তিত্ব অসম্ভব হইত।

১৮৮৪ সালে প্রিটোরিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। তদনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সন্ধি পত্রের মুখবন্ধে লিখিত আছে মহারাণীর" (Suzerainty) সুজরান্টীর" (প্রাধান্যের) অধীনে ট্রান্সভালবাসীদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদত্ত হইল। ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট এই সীমাবন্ধনের বিশেষতঃ 'সুজরান্টী' অনির্দ্দিষ্ট শব্দের প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। বোয়ারেরা আপাততঃ মৌনী রহিল। ১৮৮৪ সালে লণ্ডন সন্ধিপত্র দ্বারা এই সন্ধিপত্র রহিত হইল, তাহাতে এই কথা আছে যে বোয়ারেরা অবাধাতে স্বাধীন ভাবে আত্ম-শাসন করিবে, কিন্তু মহারাণীর অনুমোদন ভিন্ন কোন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে তাহা মঞ্জুর হইবে না।

এই সন্ধির দুই বৎসর পরে ১৮৮৫ সালে বোয়ারদিগের দেশে প্রচুর স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল। স্বর্ণ আহরণার্থ দলে দলে বহুসংখ্যক ইংরাজ এ দেশে আসিয়া পড়িলেন। ইহাতে ট্রান্সভাল পূর্ব্বের ন্যায় কৃষিক্ষেত্র রহিল না, ইহার মুখশ্রী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। এই স্বর্ণলাভেচ্ছু লোকেরা 'উটলাণ্ডার' এবং বোয়ারেরা 'বর্গার' বলিয়া অভিহিত। এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিষম স্বার্থ সংঘর্ষণ চলিতে লাগিল। ১৮৯৬ সালের "জেম্শন রেড" জেম্শন সাহেবের আক্রমণ নামক প্রসিদ্ধ ঘটনা তাহারই প্রথম ফল। বোয়ারেরা আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে অর্পণ করেন। তাহাতে তাহাদিগের সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উটলাণ্ডারদিগের সহিত বর্গারদিগের বিরোধ ভঞ্জন হইল না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ তাহারই পরিণাম।

উদাসীনের চিন্তা।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নহে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে। এই উভয় শ্লোকাংশ একই তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। কর্ত্তা ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করিবেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। লেখক এই প্রবন্ধটি লিখিতেছেন। ইহা একটী কর্ম্ম, এই কর্ম্মের নানাবিধ ফল ফলিতে পারে। কিন্তু সেই ফল ফলাইবার জন্য কর্ত্তা প্রবন্ধটি যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন। যদি তিনি তাহা না করিয়া উহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখেন, কিংবা ছিঁড়িয়া ফেলেন, তাহা হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি। লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হউক, এতটুকু কামনা মনে রাখিয়া যদি প্রবন্ধ লিখিত হয় এবং তাহা যদি "সকাম কর্ম্ম" শব্দের বাচ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ "সকাম কর্ম্ম" অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যুত্তরে যদি বলা হয় "লেখক! তুমি যদি এতটুকু কামনা লইয়াও লিখিতে বস, তাহা হইলেও তোমার দুঃখের কারণ বর্ত্তমান রহিল; যেহেতু তুমি দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ প্রবন্ধটি শেষ করিতে অসমর্থ হইতে পার। শেষ করিতে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে এবং তোমার লিখিত প্রবন্ধ আর প্রেরিত হইল না। তোমার কামনা প্রাণে উঠিয়া পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রাণেই পর্য্যবসিত হইল এবং অতৃপ্ত কামনা জন্য ক্লেশ তোমার মনকে ব্যথিত করিতে লাগিল। প্রবন্ধ প্রকাশিত হউক, এই কামনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে তোমার এ যন্ত্রণা হইত না। কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইলেই বা কি, না হইলেই বা কি,

সন ১২৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত ... কলিকাতা

এতাদৃশ ভাব মনে থাকিলে কর্ম্ম চলিতে থাকিত, অথচ অতৃপ্ত কামনা জন্য শোক করিতে হইত না।" এই যুক্তি বলিতে ভাল, শুনিতে ভাল; কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যদি প্রবন্ধটী প্রকাশিত হউক, এই কামনাটুকুও মনে না জন্মে, তবে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিন্তু এই কামনাটী মনে রাখিয়াও যদি কর্ত্তা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাংশের মর্ম্মানুসারে মনকে প্রস্তুত করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার যদি এই জ্ঞান থাকে যে ভবিষ্যতের উপর যখন তাঁহার আধিপত্য নাই, তখন তাঁহার কামনা অতৃপ্ত থাকিয়াও যাইতে পারে, তাহা হইলে আর তাঁহার শোকের কারণ থাকিবে না। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তার মনে কোন না কোন কামনা স্বভাবতঃ উদিত হইবে, তাহা না হইলে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, কিন্তু কর্ত্তার মনে কামনা পরিপূর্ণ হইবে বলিয়া যে নিশ্চিত সংস্কার, তাহাই শোকের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই নিশ্চিত সংস্কারের অন্য নাম আশা। এ জন্য একজন কবি বলিয়াছেন "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" আশা অর্থাৎ কামনা পরিতৃপ্তি সম্বন্ধে মনের নিশ্চিত সংস্কারই দুঃখের কারণ, মনের তদ্বিপরীত অবস্থা রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যবিপত্তি ঘটিলেও দুঃখের উদ্রেক হয় না। এতদ্ভিন্ন কামনারও তারতম্য আছে। এমন অনেক কামনা আছে, যাহা পূর্ণ হইলেও দুঃখের কারণ নিরাকৃত হয় না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তটী দ্বারাই পুনর্ব্বার বুঝাইতেছি। লেখক যদি এই কামনা করেন যে, তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন, তাহা হইলে ইহা দুষ্কামনা। যদি এ কামনা পরিতৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য অতৃপ্ত কামনার ন্যায় ইহাও দুঃখের কারণ; যদি পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে লোক-প্রশংসা-প্রিয়তা প্রবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফূরিত হইতে থাকিবে এবং যে পরিমাণে এই প্রবৃত্তি স্ফূরিত হইবে, সেই পরিমাণে তাহার জীবনের সুখ দুঃখের ভার অন্যের উপর পড়িবে। ক্রিয়া করিয়া সে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, অপরে তাহার কাজ দেখিয়া হাসিল কি মুখ ভার করিল, এই তাহার লক্ষ্য; হাসিলে তাহার সুখ, মুখ ভার করিলে তাহার দুঃখের অবধি নাই। এই শ্রেণীর লোক কৃপাপাত্র, তাহারা জীবনে সুখ ক্রয় করিতে যাইয়া দুঃখের ভাগই অধিক ক্রয় করিয়া থাকে। এতাদৃশ দুষ্কামনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। লেখক যদি পাঠক পাঠিকাদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ প্রশংসা করুন কি না করুন, কিন্তু উপকৃত হউন্ এই কামনা যদি থাকে উহাকে সৎ কামনা বলিতে হইবে। যদি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের কেহ আপনাকে উপকৃত মনে না করেন, প্রত্যুত যদি কেহ মনে করেন যে, ইহা পাঠে তাঁহার ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি

লেখকের তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই; যেহেতু তিনি ফল সম্বন্ধে অনিশ্চিত বুদ্ধি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পাঠক পাঠিকাদিগের হিতসংকল্প করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু ফলের উপর যখন তাঁহার অধিকার নাই, তখন তাঁহার আক্ষেপ করিবার কারণও নাই। তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন এবং পাঠক পাঠিকা মাত্রেরই রুচি ও মতি গতির উপর আধিপত্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে সংকল্প লইয়া কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ফলাইয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যখন অপূর্ণ জীব, তাঁহার শক্তির সীমা আছে, তখন অভিসন্ধি সাধু হইলেও তাহা ফলবতী না হইতেও পারে। এ জন্যই যাঁহারা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কার্য্য-বিপত্তি জন্য দুঃখভাগী হন না। এজন্যই কর্ম্মফলত্যাগিগণ কর্ম্ম করিতে নিত্য সন্তুষ্ট। তাঁহারা বীরের মত কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কামনার তৃপ্তি কিংবা অতৃপ্তির দিকে লক্ষ্য নাই বলিয়া কার্য্য-বিপত্তি ঘটিলেও নিত্য সন্তুষ্ট।

শ্রীচণ্ডীকিশোরকুশারি।

আমাদের কষ্টি পাথর।

যেমন কষ্টি পাথরে ঘসিলে সোনা ভাল না মন্দ, ভেজালমিশান না খাঁটী, তাহার প্রমাণ হয়, তেমনই দুঃখ অভাব রূপ কষ্টি দ্বারা মানবচরিত্র সুপরীক্ষিত হয়।

যাঁহারা প্রকৃত সাধু, তাঁহারা দুঃখরূপ বিষ-বাণে বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়াও আপনাপন চরিত্রমাহাত্ম্য দেখাইয়া থাকেন! আর সামান্য লোক আমরা দুঃখে পড়িলে হাবুডুবু খাইয়া আরো চরিত্রহীনতার পরিচয় দেই!

আপামর সাধারণ লোক অভাবে পড়িয়া কেহ বা চুরী করে, কেহ বা দেউ-লিয়া নাম লিখিয়া চরিত্রবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, কেহ বা জাল জালিয়াতি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না এবং সর্ব্বোপরি দুঃখের জন্যই যে তাহাদের চরিত্র স্খলন হইল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন সহকারে শত সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট মহাপুরুষগণ কিরূপ ভাবে শিরে বহন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে চরিত্র-স্খলনে আমাদের দোষ? না সেই অভাবেরই দোষ? যদি অভাবেরই দোষ হইবে, তবে কেন ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মাগণ, শত অভাবে পড়িয়াও স্বীয় স্বীয় সুমহান্ চরিত্রপ্রভাব উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে ইতিহাসের বক্ষে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?

বাস্তবিক পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে বোধ-হয় অভাব না থাকিলে মানুষ মানুষ হইতে পারে না ও সুখের প্রকৃত আস্বাদ অনুভব করিতে পারে না। যাঁহারা আজীবন সুখৈশ্বর্য্য-সেবিত, তাঁহারা কখনই দীন দুঃখী ও শত অভাব-ক্লিষ্টের ক্লেশ নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন না। অধিক কি, যাঁহারা সংসারের এরূপ একদেশদর্শী যে তাহা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শনে অসমর্থ, তাঁহাদের ঐ একদেশ-দর্শিতা প্রকৃত মানব জীবন লাভের পক্ষে কত অন্তরায় হইয়া থাকে!

সত্য বটে ধনি-সন্তানদের মধ্যেও দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও সহৃদয় লোক দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম। এজন্য কাহার দোষ? লোকে বলিবে ধনিসন্তান-দিগকে দূষিতে পারি না, কারণ দোষ তাঁহাদের নয়,দোষ তাঁহাদের সুখৈশ্বর্য্যের।

সংসারে অভাবে না পড়িলে কেহ কখনই মানুষ হইতে পারে না এবং এই অভাব না থাকিলে বোধ হয় কেহ কখন যীশু-খৃষ্ট, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির নাম শুনিতে পাইত না। মহান্ শাক্য-কুলের একমাত্র প্রদীপ শাক্য সিংহও সর্ব্বত্যাগী হইয়া অভাবকে আলিঙ্গন না করিলে সিদ্ধার্থ হইয়া আজ শত কোটি মানবসন্তানের পূজা পাইবার যোগ্য হইতেন না। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ও এই অভাব সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াই অদ্বিতীয় স্বদেশ-সংস্কারক হইতে পারিয়াছেন। অভাবে এই মহাপুরুষগণের চরিত্র-মাহাত্ম্য আরো শত গুণ প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। একদিকে এই মহাত্মাগণ, অপর দিকে হীনচরিত্র আমরা 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' প্রবাদ সৃষ্টি করিয়াছি, আর তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন অভাবই মানবের অনন্ত উন্নতির সোপান স্বরূপ, অভাবই মানবের চরিত্রোৎকর্ষের পরিচায়ক কষ্টি পাথর!

এই সকল মহাপুরুষের চরিত্রালোচনা করিলে কি আমরা ইহাই বুঝি না যে আমরাই আমাদের শত্রু, আমাদের ঘৃণিত চরিত্রই আমাদের পরম বৈরী। এই বৈরি-দমনে সচেষ্ট না হইয়া সংসারের বহিঃ শত্রুর সহিত সহস্র সংগ্রাম করিয়াও আমরা প্রকৃত মানবজীবন লাভ করিতে পারিব না। অতএব অগ্রে আমরা নিজ চরিত্র পর্য্যালোচনা করি, পরে অভাবের দোষ দিব; এবং ভগবান অভাবের কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন, ও চরিত্রবান্ করিবার নিমিত্ত শত অভাবে আমাদিগকে বেষ্টিত করিয়াছেন, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি ও অভাবের জন্য ভগবান্‌কে দোষ না দিয়া স্বীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠার তিনি এই উত্তম সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে পারি; কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিলে তিনি জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায় হইবেন।

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।

গিরিদর্শনে।

কে তোমারে গিরিবর, করেছেন উচ্চতর,
সৃজিয়া এ ভূমণ্ডলে কহ না আমারে?
প্রাবৃট্-নিবিড় নব মেঘের আকারে?
আহা কিবা মনোহর! কত শিলা থরে থর
সুসজ্জিত অবিরল তোমার ও গায়ে,
স্বর্ণের সোপান যেন রেখেছে সাজায়ে!
তমাল পিয়াল শাল, নিবিড় লতিকা জাল
রহিয়াছে তোমা সদা করি আচ্ছাদন,
তাপ বৃষ্টি হিম বুঝি করিতে বারণ।
মরি কিবা মনোহর! সমভূমি সরোবর
শোভিতেছে ধরি কত রতন আকরে;
নির্ঝরে ঝরিছে নীর বীণার সুস্বরে।
মল্লিকা যূথিকা জাতি, বন্যফুল নানা জাতি
ফুটিয়াছে দশ দিক্ করি আমোদিত,
শত শত উপবন নন্দন-নিন্দিত!
তরুপরে ঝিল্লী সব, করিতেছে ঝিঁ ঝিঁ রব,
বিহঙ্গ বিভুর গীতি গায় সুধা-স্বরে;
কুরঙ্গ মাতঙ্গ কত কাননে বিচরে!
বল বল গিরিবর, কেন তুমি নিরন্তর,
ভেদিয়ে অম্বর-পথ উচ্চশিরে রয়েছ?
বুঝি বিশ্ব-বিভুপদ পরশিতে চলেছ?
ওরে শৈল, তোরে কহি, ভীম প্রভঞ্জন বহি,
না পারে তোমার শির করিতে হেলন,
ধন্য ধরাধামে তব অটল জীবন!
নিরজনে শান্ত মনে আছ তুমি কি বন্ধনে
বসিয়া যোগীন্দ্র সম সমাধি-আসনে?
অথবা কি কবি তুমি কাব্যের কাননে?
লতা গুল্ম পরিধান, ব্যোমদেশ শিরস্ত্রাণ,
অবনী আসন মরি হ'য়েছে তোমার;
রহিয়াছ ক্ষুধাতৃষ্ণা করি পরিহার!
প্রাতঃ সন্ধ্যা নাহি জ্ঞান, করিছ কাহার ধ্যান,
কে নির্ম্মিলা কহ তোমা করিয়া এমন?
চাহি না নীরস যুক্তি বিজ্ঞান দর্শন।
হায়রে! এ ভূমণ্ডলে, যাতনায় যেই জ্বলে
হেরিয়ে তোমায় সেই পা'ক পরিত্রাণ,
ভাবুক আনন্দ-নীরে জুড়াক পরাণ।
যবে আমি একা আসি, তোমার উপরে বসি
একমনে শূন্য পানে ফিরাই নয়ন,
তখনি ভুলিয়া যাই, প্রিয় পরিজন।
কি সান্ত্বনা পাই মনে, যখন প্রকৃতি সনে,
কেলি করি ফুল্ল প্রাণে তব দরশনে,
জন্ম জরা মৃত্যু মনে থাকে না সে ক্ষণে।
আমি এ মিনতি করি, কহ মোরে সত্য করি
কিরূপে হয়েছে তব অন্তর এমন?
মহাযোগে মহাদেব নিমগ্ন যেমন!
যে ভাবেতে আছি আমি, জানেন অন্তরযামী
বিশ্বের বিধাতা যিনি মঙ্গল কারণ,
বিপদে সম্পদে যাঁর সমান দর্শন।
সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর সম, এ প্রমত্ত মনে মম
দিবারাতি উঠিতেছে চিন্তার লহরী,
ষড়রিপু-আশীবিষে আছে ফণা ধরি!
যে পীযূষ পান করি, আছ তুমি ধৈর্য্য ধরি,
তাহার তিলেক মোরে করহ অর্পণ,
এ ভব-যাতনা গিরি! করি নিবারণ।

শ্রীফকির চাঁদ গোস্বামী।

বীরবালা কর্ম্মদেবী।

যশল্মীর ও মোহিল রাজ্যের মধ্য পথে চন্দন নামক স্থানে "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ঘটনায় মোহিলের বালিকা রাজনন্দিনী কর্ম্মদেবীর দুঃখময় লোকান্তর-স্মৃতি রক্ষার জন্য উক্ত সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ ও মর্ম্মভেদী অভিনয়-মূলক।

কর্ম্মদেবী মোহিল-রাজ্যেশ্বর মাণিকরায়ের কন্যা। মরুস্থলীর মধ্যে তৎকালে তাঁহার ন্যায় অসামান্যা রূপসী কুমারী আর কেহ ছিলেন না। যে সময়ে তিনি কুমারী কাল অতিক্রম করিতেছিলেন, রাজস্থানে বীরগণ মধ্যে অলৌকিক বীরত্বের স্রোত তখন পূর্ণ ও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। সমস্ত নৃপতি ও সর্দ্দারগণ প্রতিবেশী রাজন্যগণের সঙ্গে এবং দিল্লীশ্বরের সহিত সময়ে সময়ে বলপরীক্ষা করিতেছিলেন। কুমারীগণ বীর-পত্নী নামে গৌরবান্বিতা হইবার জন্য আন্তরিক স্পৃহা বহন এবং দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। প্রবলপ্রতাপ মুন্দরাধিপ রাওচণ্ড মাণিক রায়ের সম-সাময়িক নৃপতি। তিনি রাঠোর-বংশীয়; ধনে, মানে, পরাক্রমে সর্ব্বাংশেই মাণিক রায়ের অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠতর। মাণিকরায় অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া চণ্ডের চতুর্থ পুত্র বীরবর অরণ্যকমলের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া উচ্চতম কুলগৌরব লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যশল্মীরের অন্তর্গত পুগলের শাসনকর্ত্তা রাণা রণঙ্গদেবের বীরত্ব চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু, সাধু স্বীয় অসামান্য বীরত্বে অতি অল্পকাল মধ্যে মহাবীর্য্যবান্ যোদ্ধা বলিয়া দেশমধ্যে পরিচিত হইলেন। পুত্রের পরাক্রমে রণঙ্গদেবের রাজশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধু প্রায়ই নাগোর ও সিন্ধুনদের তীর-ভূমিমধ্যে সসৈন্যে স্বীয় বীরত্বাভিনয় প্রদর্শন করিয়া অপরিমিত ধন সঞ্চয় ও পশুপাল সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্যের পুষ্টি সাধন করিতেন। তাঁহার বীরত্ব-গাথায় কুমারীগণের হৃদি মধ্যে অভূতপূর্ব্ব স্তিমিত আলোক উদ্ভাসিত হইতেছিল। অরণ্যকমলের সহিত কর্ম্মদেবীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া পিতা মাতা যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, কর্ম্মদেবীর হৃদয়ে কিন্তু তেমনটি হয় নাই। অরণ্যকমল রূপে, গুণে, বীরত্বে তদানীন্তন যোদ্ধৃগণ মধ্যে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন হইলেও কর্ম্মদেবীর নিকট কে জানে কেন তেমন তিনি আদরের পাত্র হইতে পারেন নাই। ফলে অনেক সর্দ্দার ও সামন্তকন্যা অরণ্যকমলকে পতিলাভে আগ্রহান্বিতা ছিলেন। আবার কর্ম্মদেবীর রূপ সৌন্দর্য্য এরূপ প্রচারিত হইয়াছিল যে মরুস্থলীর প্রান্তসীমার

অনেক গলিত-দশন, যুবক-পুত্রের পিতাও তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন, সুতরাং অরণ্যকমল যৌবনের সঙ্গিনীরূপে কর্ম্মদেবীকে লাভ করিবেন বলিয়া দিন দিন স্ফূর্ত্তিমান্ হইতেছিলেন।

মাণিকরায় একদিন স্বীয় রাজধানীর প্রাসাদোপরি বসিয়া আছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন চণ্ডের বীরপুত্র স্বনামখ্যাত সাধু সসৈন্যে রাজ্যের সীমান্ত দিয়া পিতৃরাজ্যে গমন করিতেছেন। সাধুর বীরত্ব মাণিকরায় অনেকের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনা কর্ত্তব্য বোধে তাহার আয়োজন করিলেন। সাধু অতি বিনয় ও সম্মানসহকারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীর সামন্ত সর্দ্দারগণ সাধুর সম্মান রক্ষার জন্য মাণিক রায়ের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহার বীরকাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী সখীগণ সঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; সকলের মুখে একবাক্যে সাধুর প্রশংসা যতই শুনিতেছিলেন, তাঁহার বক্ষ ততই ধীরস্পন্দনে স্ফীত ও কম্পিত হইতেছিল। সাধুও সকলের সম্মান রক্ষা করিয়া নিজ মুখে স্বীয় জীবনের অভাবনীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের সেই সকল অমানুষিক শূরত্বের কথা সভাসদ্গণের প্রীতি-ভক্তি স্বতঃই আকর্ষণ করিতেছিল। বালিকা কর্ম্মদেবী অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি এতদিন যাহার নামমাত্র শুনিয়া, হৃদয়ে কল্পনাময়ী মূর্ত্তি আঁকিয়া নিদ্রায় চেতনায় ভাবী সুখ ভোগ করিতেছিলেন, আজ সেই দেবমূর্ত্তিকে চক্ষুর সমক্ষে পাইয়া একেবারে মনঃপ্রাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে সখীগণ সমক্ষে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া অরণ্যকমলের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব ব্যক্ত করিলেন। পিতা মাতার কর্ণে কর্ম্মদেবীর এই মনোভাব আঘাত করিল—উচ্চতম কুলগৌরবলাভের আশা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু সাধুকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহাদিগেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্বতঃই যেন তাঁহাদিগের অনুরাগ সাধুর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং আদরিণী কন্যার আবদারে আঘাত করিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইল না। সেই রাত্রেই সাধুর নিকট প্রস্তাব করিলেন, সেই সঙ্গে চণ্ডের দ্বারা বিবাহে ব্যাঘাত ঘটিবার ও অরণ্যকমলের দ্বারা বিপদ বিরোধ উপস্থিত হইবার আশঙ্কাও জ্ঞাপন করিলেন।

সাধুর বীর-হৃদয় চণ্ড বা অরণ্যকমলের দ্বারা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভীত বা কম্পিত হইল না। তিনি বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথারীতি নারিকেল ফল গ্রহণ করিয়া দুই চারি দিন মধ্যেই মহাসমারোহে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নবজামাতাকে বিবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া বরকন্যা বিদায়কালে মাণিক রায় রক্ষিরূপে কিছু সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য সাধুকে অনুরোধ করিলেন। সাধু

তাহা প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না। পিতা মাতার মন ; অনেক বুঝাইয়া স্বীয় পুত্রকে পঞ্চশত মাত্র সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন। সাধু ক্রমে স্বীকৃত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশশত সৈন্য ও নবপ্রণয়িনী সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে অরণ্যকমল কর্ম্মদেবীর বিবাহ ব্যাপার অবগত হইলেন। সিংহের গ্রাস শৃগাল গর্দ্দভের মুখে ; তাঁহার রোষ ও ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। দুঃখে রাগে হিংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চারি সহস্র সৈন্য লইয়া তদ্দণ্ডেই সাধুর পথাবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ সাধু সপত্নীক চন্দন নামক স্থানে পৌঁছিয়া অরণ্যকমলের অভিযান-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সাধু পশ্চাৎপদ বা ভীত না হইয়া সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে উভয়দলে সাক্ষাৎ হইল। প্রথমতঃ মল্লযুদ্ধে একটী রাঠোর বীর সাধুর পক্ষীয় জয়টঙ্গার হস্তে নিহত হইলেন। ক্রমে সমর ভীষণ ও দলযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে উভয় পক্ষেই হতাহত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বলক্ষয় করা অরণ্যকমল ও সাধু উভয়েরই মত-বিরুদ্ধ, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর মল্লযুদ্ধের অভিপ্রায় করিলেন। সাধু কর্ম্মদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মদেবী বলিলেন "নাথ! আপনি অগ্রসর হউন, সত্বর শত্রু সংহার করুন। যদি আপনার বিপদ ঘটে, জানিবেন অভাগিনীও আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গদ্বারে পৌঁছিবে।" বীরহৃদয় সহধর্ম্মিণীর বীরোৎসাহে উন্মত্ত হইল, প্রবলবেগে শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অরণ্যকমলকে আঘাত করিলেন, অরণ্য প্রত্যাঘাতে আত্মরক্ষা করিয়াও ভূমিচুম্বনে বাধ্য হইলেন, কিন্তু পড়িতে পড়িতে সাধুর শিরে যে আঘাত করিলেন, সমরসিংহ বীর চূড়ামণির তাহাতেই পতন ঘটিল। উভয়েই ভূ-শয্যায় শয়ন করিলেন, অরণ্যকমল উঠিলেন—সাধু আর উঠিলেন না। ছয়মাস মধ্যে অরণকমলও ঐ আঘাতে স্বর্গে গিয়াছিলেন। কর্ম্মদেবী স্বচক্ষে স্বামীর পতন দেখিলেন এবং যথার্থ দেববালার ন্যায় মহিমা প্রকাশ করিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইল, প্রান্তর প্রাণিশূন্যবৎ হইল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাধুর শবদেহ কর্ম্মদেবীর সম্মুখে আনীত হইল। তিনি মৃত পতির চরণে বার বার প্রণিপাত করিলেন। চিতা সজ্জিত ও প্রজ্বলিত হইল। স্বামীকে স্বহস্তে চিতানলে নিক্ষেপ করিয়া পার্শ্বস্থ সৈনিকের নিকট হইতে একখানি অস্ত্র চাহিয়া লইলেন। বাম হস্তে কৃপাণ লইয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ছেদনপূর্ব্বক সৈনিকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "আমার শ্বশুরকে বলিও তাঁহার পুত্রবধূর হস্ত এইরূপ ছিল।" পরে উগ্ররুদ্রা মূর্ত্তিতে বাম হস্ত ছেদনের আদেশ করিলেন। আদেশ অবহেলায় কাহারও সাহস হইল না, কার্য্য সম্পন্ন হইল। অজ্ঞান অবস্থায় স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিতে করিতে হস্তখানি "আমাদিগের কুল-কবিকে দিও"

বলিয়া চিতাগ্নিতে শয়ন করিয়া স্বামি-সহ স্বর্গারোহণ করিলেন। রাণা রণঙ্গদেব সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। নিতান্ত মর্ম্মভেদী অভিনয় ও স্মৃতি হইলেও অলৌকিক পতিভক্তির নিদর্শন রক্ষার জন্য সেই স্থানে একটী সরোবর খনন করাইয়া তাহার সহিত পুত্রবধূর নাম সংযোগ করিয়া দিলেন। কর্ম্মদেবীর কার্য্য বড়ই কঠোর হইলেও তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি মহৎ, কি পবিত্র !! রমণীগণ মধ্যে ঐরূপ পতির প্রতি অনুরাগ ভক্তি সংক্রামিত হওয়া প্রার্থনীয়। কর্ম্মদেবীর দৃষ্টান্ত রাজস্থানে ব্যর্থ হয় নাই এবং ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নারীজীবনের কর্ত্তব্য।

আমরা আজ অধম অজ্ঞান অকর্ম্মণ্য নারী জাতি। বিধাতা যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এ সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সে কার্য্য সমূহ আমরা সম্পন্ন করিতেছি কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারি, এতটুকু জ্ঞান এবং শক্তি পর্য্যন্ত আজ আমাদের নাই। প্রাত্যহিক রন্ধন ইত্যাদি আবশ্যক কার্য্য শেষ হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি ; কিন্তু ইহাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

'ঘরকন্না'ই নারী জাতির কার্য্যক্ষেত্রের শেষ সীমা নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংঘাতে যদিও এ কথা আমরা অনেকেই অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, তথাপি কেহ বা অলসতা, কেহ বা অন্যায় স্বাধীনতা বা অধীনতা, কেহবা লোকলজ্জা-ভয় ইত্যাদি নানা কারণে জীবনকে কর্ত্তব্য পথে চালিত করিতে পারিতেছি না।

গৃহ-কোণের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত শেষ করিতেছি ; কিন্তু কই তাহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ? কোথায় সম্পূর্ণ শান্তি ? পরিমাণ করিয়া বলিতে পারি না, কি এক অপরিসীম প্রেম তৃষ্ণা, কার্য্য তৃষ্ণা মানুষের প্রাণ সতত ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে ! মনে হয় এ তৃষ্ণা মিটিবার নয়। ইচ্ছা করে এ সংসারে আমি সহস্র ব্যক্তির জননী হইব, সহস্র ব্যক্তির ভগিনী হইব, আমি সংসারের কার্য্যক্ষেত্র লুঠিয়া লইব। আমি ডাক্তার হইয়া রোগী দেখিব, বিদুষী হইয়া বিদ্যা বিলাইব, শোকার্ত্তের প্রাণে শীতল সান্ত্বনা আনিয়া দিব, দীন দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র বাঁটিয়া দিব, শিল্পী হইয়া আংরাকা হইতে রেসমের ক্যাপ, কার্পেট হইতে কন্থা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া তুলিব! মানুষের প্রাণের শুভ ইচ্ছা ও সৎ সংকল্পের অবধি কোথায় ?

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ অবসানে সুন্দরী গৃহস্থ মেয়েটীর মত প্রেমময়ী দেবী বরষা

যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানব-হৃদয় চঞ্চল করিয়া ফেলে; তিল তিল করিয়া পুকুরের তীর জলে ভরিয়া উঠে, কূলে কূলে স্বচ্ছ শীতল জলরাশি তল্ তল্ ছল্ ছল্ করিয়া হাসে, প্রভাতে মধুর স্নিগ্ধ বর্ষা-বায়ু যখন ধীরে মানবের শরীর স্পর্শ করিয়া ছুটিয়া যায়, তখন প্রকৃতির এই ঈষৎ আঁধারময় ঘন মাধুর্য্যের মাঝখানে, কি জানি কেন নারী-হৃদয়েও একটা অপর্য্যাপ্ত ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়! কি মনে হয়? ঠিক্ করিয়া বলিতে জানি না; কেবল এটুকু বুঝিতে পারি যে এ ক্ষুদ্র সাংসারিকতায় মন পরিতৃপ্ত হয় না, যেন দেখিতে দেখিতে সহসা বর্ষার জলের মত এক অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবন প্লাবনময় করিয়া তুলে।

সংসারের চারি দিকে যে অসীম কার্য্যরাশি অবিন্যস্ত ভাবে ছড়ান রহিয়াছে, আমরা সময় সময় বুঝিতে পারি সারাটী জীবন প্রাণপণে খাটিলেও ইহা কোন ক্রমে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিব না। অনেক সময়ে নৈরাশ্য আসিয়া প্রাণটা আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। তখন ভাবি হায়! কিছুই হয় নাই, কিছুই হইল না, কিছুই হইবার নয়! আমাদের প্রাণের এই সুগভীর আর্ত্তনাদ কি ঘুচিবার নয়? সমস্তই যে কেবল কল্পনায় পর্য্যবসিত হইতেছে, কিছুইতো কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। ইহা অনুভব করিয়া অন্তরে ব্যথা পাইতেছি, কিন্তু কেন কিছু হইতেছে না তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি তেমন সামর্থ্যও লাভ করিতে পারিতেছি না।

হায়! ঈপ্সিত কাজ করিবার পথে কেন এত অসুযোগ, কেন এত অসুবিধা? কেন বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হইতে এ সহস্র অন্তরায়? কিছুই যদি হইবার নয়, কিছুই যদি হইবে না, তবে মানব-হৃদয়ে এ দুর্দ্দমনীয় পিপাসা কেন সঞ্চারিত হইয়াছিল? যদি এ জীবন সুধু অলস অকর্ম্মণ্য কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তবে বাঁচিয়া কি সুখ? জীবন যাপন কিসের জন্য? কিছুই যদি করিবার নাই, কিছুই যদি করিব না, তবে এ জীবন লইয়া কি করিব?

প্রতিদিনের রন্ধন হইতে পরিজনবর্গকে আহার প্রদান, গৃহের প্রত্যেক জিনিসের পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, গৃহস্থালির প্রত্যেক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা নারী-জীবনের সর্ব্ব প্রথম করণীয়। ইহাতে কেবলই যে কর্ত্তব্য সাধন করা হয় এমন নহে, এই সমস্ত সম্পন্ন করিয়া যে এক অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় তাহা বোধ হয় প্রত্যেক ভগিনীই অল্পাধিক পরিমাণে স্ব স্ব জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। সন্তানপালন নারী-জীবনের এক প্রধানতম ও কঠিনতম কর্ত্তব্য। শিশুর রক্ষা ও শিক্ষার বিধান সহজ কার্য্য নহে। সন্তানদিগকে আহার দিয়া ঘুম পাড়াইয়া প্রত্যেকেই তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে

প্রত্যেকেই কি "মানুষ" নামের যোগ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইতেছে?

কেহ বা বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার গুণে কালে "মহাত্মা" নামে অভিহিত হইতেছে, কেহ বা বাল্যাবধি কুশিক্ষা পাইয়া ও কুসংসর্গে বাস করিয়া পাপে ডুবিয়া যাইতেছে; পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অসুখী করিতেছে; পরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিজে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতেছে। ইহার কারণ কি? জননীর শিক্ষা, নিষ্ঠার দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সুরুচি ও সৎদৃষ্টান্তের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ দাস দাসীর উপরে সন্তানবর্গের ভারার্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকেন, ইহাতে শিশুর অশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। বেতনভোগী দাস দাসীর অজ্ঞতা, শিথিলতা ও নির্ম্মমতা বশতঃ শিশুর স্বাস্থ্যহানি হইবার কথা এবং ঐ সমস্ত অশিক্ষিত কুরুচি-প্রিয় দাস দাসীর সংসর্গে বাস করিয়া উহাদের অনেক কুপ্রবৃত্তি অভ্যস্ত হইবার সম্ভাবনা। এমন কি গৃহের অন্যান্য কার্য্যের ভারও দাস দাসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া অবৈধ, নিজের কাজ নিজে না দেখিলে তাহা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতনের সময় হইতে সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া সমাজকে শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছে। যে গুলিকে আমরা কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাও দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছি। এ সমস্ত আমাদের দ্বারা বিদূরিত হওয়া যদিও অসম্ভব, তথাপি যদি আমরা এই সমস্ত কুসংস্কারকে প্রশ্রয় না দেই, তাহাহইলে সময়ের আবর্ত্তনে একদিন হয়ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আমরা শিশুদিগকে "ভূত" "জুজু" ইত্যাদি উপদেবতার ভয় দেখাইয়া অনেক আবদার হইতে নিরস্ত করিয়া থাকি। শিশুর কোমল হৃদয়ে এই ভয়ের বিভীষিকা আজীবন বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যদিও প্রবীণতর শিক্ষা যুক্তি তর্ক দ্বারা এ সমস্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তথাপি শৈশবের সেই ধ্রুব বিশ্বাস সম্পূর্ণ দূর হইয়া উঠে না। ছেলের ভীরু স্বভাব প্রাপ্ত হইবারও ইহা একটী কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, সুতরাং ইহা সমাজের অবনতির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। আমরা বুঝিতে পারি না, কোন্ একটী কথা শিশুর কোমল প্রাণে কিরূপ কার্য্য করিবে। এই সকল অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহার কুফল আমরা বহুকাল পরে অনুভব করিয়া থাকি। শিশুর কচি দাঁত দুটি দেখা দিবার পূর্ব্ব হইতে আধ আধ বাক্য স্ফূরণ হইবার সময় হইতেই শিক্ষার সময় উপস্থিত হয়। শিশু শায়িত থাকিয়া যখন রাঙ্গা জিনিষটী দেখিলে পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন হইতেই প্রকৃত শিক্ষার কাল উপস্থিত

হয়। এ বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা নহে, ইহা জ্ঞান শিক্ষা। এখন হইতে তাহার নিকট যে চিত্র ধরা যাইবে, তাহাই তাহার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে; এখন যে শিক্ষার বীজ বপন করা যাইবে, তাহাই ধীরে ধীরে তাহার শৈশব কৈশোর যৌবন বহিয়া বহিঁয়া ক্রমে ভাবী জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত মহাত্মা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনের উন্নতির প্রধানতম সহায় মাতার সৎশিক্ষা। মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্রবিদ্যাসাগর, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, থিওডোর পার্কার, সেণ্ট অগষ্টিন, জর্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতি মহাত্মাগণ কেবল জননীর দুর্জ্জয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

আমরা যাহাতে আংশিক পরিমাণেও আদর্শ জননীর উপযুক্ত হইতে পারি, সে জন্য আমাদের অজস্র চিন্তা ও পরিশ্রম, ঐকান্তিক অধ্যবসায়, চেষ্টা ও উদ্যোগ থাকার বিশেষ প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

সংসার।

সংসার আমাদের কাছে দুই প্রকার বোধ হয়—কখনও বিষময়, কখনও মধুময়। তাহার কারণ, যখন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা নিজের দিক্ দিয়া সংসারকে দেখি, তখনই দেখিতে পাই পাপ তাপ শোক দুঃখপূর্ণ জ্বালাময় সংসার। আবার যখন শোকে দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, আত্মার আনন্দকে ডাকিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া জগৎকে দেখি, তখন সংসার কি সুন্দর, কি মধুময় বলিয়া বোধ হয়! পিতা মাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর ভালবাসা, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য প্রেম—সকলেরই মূলে তাঁহার অনন্ত প্রেমের নিদর্শন পাইয়া থাকি। তখন দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি তাঁহার পূজার উপকরণ লইয়া তাঁহারই অর্চ্চনা করিতেছে। শস্যশালিনী পৃথিবী ফলপুষ্প ধন রত্ন লইয়া তাঁহারই চরণে প্রদান করিতেছে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রাণীই তাঁহার কাজ করিতেছে। একটি কীট জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নড়িয়া চড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সেও তাঁহার কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা তাঁহার সৃষ্টির প্রধান জীব মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি অন্য জীবকে তাঁহার প্রসাদ ভোগ করিতে দিয়াছেন, কিন্তু প্রসাদদাতা কে? তাহা জানিবার

শক্তি তাহাদিগকে দেন নাই। সে শক্তি কেবল মনুষ্যকেই দিয়াছেন। যাঁহার কৃপায় আমরা এত সুখে আছি, তাঁহার কত করুণা! ভাবিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া উঠে। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার দিক্ দিয়া সংসারকে দেখি বলিয়াই, জন্মমৃত্যুর শোক দুঃখের বশীভূত হইয়া, সংসারকে দুঃখময় বলিয়া বোধ করিয়া থাকি। আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার ধন বলিয়া "আমার" "আমার" করিয়া থাকি। সেইখানেই আমাদের মহাদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন "তাঁহারি সব," "আমি তাঁহার" এই রূপ ভাবিয়া থাকি, সংসারের প্রত্যেক কাজকে তাঁহারই কাজ বলিয়া মনে হয়, তখনই আমরা প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হই। আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিবে ও ঈশ্বরের মধ্য দিয়া সংসারকে দেখিবে, নতুবা সংসারে দিশা-হারা হইয়া তীব্র হইতে তীব্রতর যাতনা ভোগ করিতে হইবে। অমৃতের প্রস্রবণ থাকিতে পঙ্কিল কূপোদক পান করা, আর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারকে নিজের দিক্ দিয়া দেখা দুইই সমান।

"আমার" বলিবার আগে যদি ভাবিয়া দেখি, যে, আমি হইলাম কোথা হইতে? কোন্ মহাপ্রাণ হইতে এ ক্ষুদ্র-প্রাণ সকল হইতেছে? তাহা হইলে, দেখিব সকলই তাঁহা হইতে হইতেছে, তাঁহাতেই আছে, পরেও তাঁহাতেই থাকিবে; আর "আমি" "আমার" বলিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন বলিব "আমি তাঁহার", "তিনি আমার"। "আমি" কথাটি, একেবারে ছাড়িতে হইবে, তবে ঈশ্বরকে লাভ করা যাইবে। তখন অন্তর ও বাহ্য আনন্দে পূর্ণ হইবে। ঈশ্বর আনন্দময়। কোন কবি সংসারকে ঈশ্বরের দিক্ দিয়া দেখিয়া গাহিয়াছেনঃ—

"আনন্দময় তোমারই বিশ্ব—শোভাসুখ-
পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা-
অনুগামী॥"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

এদেশীয় অনাথা বিধবাগণের জীবিকা লাভের উপায়।

আজকাল এদেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহা ভাবিতে গেলে শরীর অবসন্ন হয়, চক্ষু আর জল-ভার বহন করিতে সক্ষম হয় না। এদেশে দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা রমণীগণের অপ্রতুল নাই। কিন্তু তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের নিতান্ত অপ্রতুল। উপায়ের মধ্যে আছে মাত্র এক ভিক্ষাবৃত্তি!

শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, কাজ করিলে কাজ করিবার শক্তি আছে। নাই কি ? নাই মাত্র সহায় ও সম্পদ।

এ দেশে দুঃখিনী বিধবা রমণীগণ কি উপায়ে অনায়াসে, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্‌বিষয় লিখিতে হইলে কয়েকটী বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। প্রথমতঃ তাহারা যে ব্যবসা করিতে মনঃস্থ করিবে, তাহা সহজ হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ তাহাতে যেন অধিক অর্থের প্রয়োজন না হয়। তৃতীয়তঃ সে ব্যবসা যেন সুন্দররূপে চলিতে পারে। চতুর্থতঃ সকলের সহিতই যেন তাহার সংস্রব থাকে। পঞ্চমতঃ সেই সকল জিনিসের অধিক কাট্‌তি হওয়া আবশ্যক। ষষ্ঠতঃ যাহাতে স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জার ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার উপায় করা বিধেয়। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক, কোন্ কোন্ ব্যবসা তাহাদের উপযোগী।

সূতা কাটা দুঃখিনীদের একটী প্রধান ব্যবসা। ইহাতে অধিক অর্থের প্রয়োজন নাই, অল্পপরিমাণ মূলধনেই এই কারবার অনায়াসে চলিতে পারে। পূর্ব্বে এই ব্যবসা দ্বারা দুঃখিনী বিধবারা অনায়াসে যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এবং অনেকেই ইহা অবগত আছেন। এ স্থলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাগবাড়ী একটী গণ্ডগ্রাম। তথায় কমলা-নাম্নী একটী বিধবা বাস করিত। অল্পবয়সেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। পিতা মাতা কি অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বর্ত্তমান ছিল না। ঐ বিধবা এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় এক কুটীরে বাস করিতেছিল। তাহার স্বামী কি পিতামাতার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। এমত অবস্থায় কমলা কেবল সূতা কাটার উপর নির্ভর করিয়াই জীবন যাপন করিতে লাগিল। দেশী সূতার তৎকালে অতিশয় আদর ছিল। ব্যবসায়িগণ বাটী হইতে, কাটা সূতা লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে তুলা দিয়া যাইত। কমলা এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই অনেক টাকা উপার্জ্জন করিল। বিশ কি পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাহার হাতে প্রায় হাজার টাকা সঞ্চিত হইল। "আমার মৃত্যুর পর এই টাকা কে খাইবে" ইহা ভাবিয়া গ্রামস্থ স্বজাতীয় বিশ্বনাথ নামক জনৈক বিচক্ষণ লোককে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন "আমি একটী ভোজ দিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনারা আনুকূল্য করেন, তবে আমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" বিশ্বনাথ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তদনুসারে বিশ্বনাথের যত্নে ১২৬৭ সালে দোল পূর্ণিমা দিবসে, এক বৃহৎ ভোজ দেওয়া হয়। দীন, দুঃখী, বৈষ্ণব, অন্ধ, আতুর প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া উপযুক্ত মতে বিদায় করা হইল। সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহস্থাশ্রমী প্রায় ২।৩ হাজার লোক আমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছিল। এই কার্য্যে কমলার প্রায় ৭।৮শত টাকা ব্যয়

হইয়াছিল। দেশে বিদেশে কমলার সুনাম প্রচারিত হইল।

কমলা এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। সূতা কাটা পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল, প্রতিবৎসরই তিনি দোল পূর্ণিমা দিবসে এক একটা ভোজ দিতেন। প্রত্যেক কাজেই এক শত কি দেড় শত টাকা ব্যয় হইত। পরিশেষে ঐ বিশ্বনাথের পরামর্শে, কমলা একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া যান। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণী "কমলার পুকুর" নামে বিখ্যাত। ১২৭২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলার মৃত্যুর পর গ্রামস্থ মাতব্বর ও অন্যান্য লোকে সমবেত হইয়া তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে সংবাদ দিয়া আনাইলেন এবং বলিলেন, "কমলা এখন মৃত। সে প্রতি বৎসরই অনেক টাকা দানে ব্যয় করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় তাহার ঘরে আরও টাকা আছে। তুমি তাহার জ্ঞাতি ও আত্মীয়। অতএব তুমি তাহার ঘরে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ টাকা পাও কি না?" তদনুসারে ঐ ব্যক্তি গৃহের ভিত্তি খনন করিয়া টাকা পয়সা কিছুই পাইল না। তাহাতে সকলের মনেই সন্দেহ হইল। ঐ বিশ্বনাথ বলিলেন ঘরে যত হাঁড়ি কুঁড়ি আছে, সমুদয়ই অনুসন্ধান কর। তদ্রূপ করা হইল। একটি ছোট কলসীতে তেঁতুল ভরা ছিল। বিশ্বনাথ সেইটী ধরিয়া তুলিলেন, এবং দেখিলেন, তেঁতুলপূর্ণ কলসী যে প্রকার ভারী হওয়া উচিত, ইহা তদপেক্ষা অধিক ভারী। সন্দিগ্ধ-চিত্তে সমস্ত তেঁতুল বাহির করিলেন, দেখিলেন চতুর্দ্দিকে তেঁতুল বেষ্টিত হইয়া ১২৫ টাকা বিরাজ করিতেছে! দেখিয়া সকলেই অবাক্!

তৎপরে আর একজন একটী ধন্যার পাত্রে ঐরূপে ২৫টী টাকা পাইল। কমলার জলের কলসী রাখিবার একটী মৃত্তিকা-স্তম্ভ ছিল, বিশ্বনাথ সেইটী ভগ্ন করিলেন তাহাতে ছোট একটী মৃণ্ময় পাত্রে ৫০টী টাকা পাইলেন। এইরূপে তাহাদের অনুসন্ধান শেষ হইল।

সকলে মিলিত হইয়া ঐ টাকা দ্বারা কমলার শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহের মন্ত্রণা করিল। শ্রাদ্ধ উত্তমরূপেই নির্ব্বাহিত হইল। কমলা যে কুটীরে বাস করিত, তাহা ঐ গ্রামের একজন লোক এক টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া আনিবার সময়, বিশ্বনাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, এমন সময় ঐ ঘরে কমলার জিনিস পত্র রাখিবার যে একটী মাচা ছিল, তাহার একটী বাঁশ ফেলিবার সময় "ঝনাৎ" করিয়া একটী আওয়াজ হইল, তাহা বিশ্বনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিশ্বনাথের অনুজ্ঞাক্রমে বংশ খণ্ড দ্বিখণ্ড করা হইলে দেখা গেল তাহার মধ্যে ৫০ টাকা। এই টাকা সকলের অনুমতিক্রমে, দীন দুঃখীকে দান করা হইল।

এই সংবাদটি অলীক নহে, প্রকৃত ঘটনা। তৎকালীন অনেক লোকেই ইহা বিশ্বাস করিবেন। তাঁহারা এরূপ বিষয় অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যদি ভারতের

অনাথা রমণীগণ এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের জীবনোপায়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। যদিচ বিলাতী কাপড়ের প্রসাদে এখন দেশী সূতা ও দেশী কাপড়ের আর তদ্রূপ আদর নাই, তথাপি এই কার্য্য দ্বারা যে লাভবান্ হওয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই। যদি এ দেশে প্রচুর পরিমাণে সূত্র নির্ম্মিত হয়, তবে তাহার কাটতিও বেশ হইবে, দেশেরও উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি।

বঙ্গমাতার আর একটী সুপুত্র বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু কয়েক মাস পূর্ব্বে দেওঘরে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার সংবাদ দিয়াছি। ইনি একজন কৃতবিদ্য, নানা ভাষাজ্ঞ, সাহিত্য রসপায়ী, দেশহিতৈষী, সমাজ-সংস্কারক, সাধুচরিত্র, ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মবাদী ও উদার ধর্ম্মের উপদেষ্টা ছিলেন। ইহাঁর অশেষ গুণে ভূষিত পবিত্র জীবন সকলেরই বিশেষ অধ্যয়নযোগ্য এবং ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য দেশবাসী সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কিছু দিন হইল কলিকাতার ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে ইহাঁর স্মরণার্থ এক সভা হয়, তাহাতে তাঁহার অনেক বন্ধু ও গুণানুরাগী অনেক ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেবরেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণ পরলোকগত মহাত্মার গুণ বর্ণন করিয়া যে সকল কথা বলেন, তাহাতে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইয়া যান। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে "saint" বা আদর্শ ঋষি এবং তাঁহার জীবন অসাধারণ ও অমূল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইনি যথার্থই শেষ জীবনে দেওঘরের জীবন্ত বৈদ্যনাথ হইয়া বিরাজ করিয়া স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিঃ মর্ত্ত্যলোকে বিকীর্ণ করিতেছিলেন। ইহাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কমিটী হইয়াছে, বরাহনগরের জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাহার সম্পাদক। যাঁহারা স্মৃতিস্থাপন ফণ্ডে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

রাজনারায়ণ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাঁহার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব কিছু প্রকাশিত হইবার নহে। আমরা আশা করি তাঁহার একখানি সুবিস্তৃত জীবনী শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বামাবোধিনীর এক লেখিকা

তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে যে কবিতা লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববারে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি এক লেখক বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা প্রকটিত হইল।

সোণার মাণিক সব চলে গেল একে একে,
শত বাজ যেন আজ বাজিছে মায়ের বুকে।
না শুকাতে আঁখি-নীর আবার শোকেতে প্রাণ
অভাগিনী জননীর ভেঙ্গে হ'ল শত খান।
দেওঘরে ছিল যেই দেবের দুর্লভ ধন,
নিঠুর শমন আজি কেড়ে নিল সে রতন।
একাধারে এতগুণ ভাগ্যে ঘটে বল কার?
সহজে পাবে না খুঁজে হাজারে একটী তার।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সাহিত্য ভাণ্ডারে তার
রতন মণি খচিত শত শত অলঙ্কার।
বেদী হ'তে বিলাইলা কি অমূল্য উপদেশ,
সারগর্ভ কথা সব ভুলিবে না বঙ্গদেশ!
কাব্যরসে সুনিপুণ রসিকের চূড়ামণি,
হাসি খুসি দিবানিশি অনন্ত ভাবের খনি।
দেশ ও বিদেশে নাম—সুনাম সুখ্যাতি অতি
দেশ-হিতে সদা মন, পরহিতে সদা মতি।
শোধনে কুরীতি নীতি চির বদ্ধ-পরিকর,
পাপাচার নিবারণে দৃঢ় পণ নিরন্তর।
ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা মন—আচরণে ব্রহ্মচারী,
কিবা মিষ্ট আলাপন শিষ্টাচার বলিহারি!
কি মধুর ব্যবহার! শান্ত শিষ্ট ক্ষমাশীল,
গুণিজন-গুণগ্রাহী ব্যাপকতা নাহি তিল।
উদারতা অতুলন, অটুট হৃদয় বল,
বিমল চাঁদের মত চরিত্রটী নিরমল।
স্বভাবে শিশুর মত, সরলতা মাখা প্রাণে,
প্রকৃতিতে কি মহত্ত্ব যে দেখেছে সেই জানে।
সুখ দুঃখে সমভাব—ধৈর্য্যে হিমাদ্রি-শেখর,
বিনয়েতে অবনত—ফলভরে তরুবর!
রোগে শোকে শীর্ণকায়, তবু আশা ভরা বুকে,
গভীর বিষাদ ভারে বিষণ্ণতা নাহি মুখে।
সম্মুখে সদাই গতি, পিছু ফিরে নাহি চায়,
ছুটিছে অনন্ত পানে বিমুক্ত বিহঙ্গপ্রায়।
মরতের ছাই মাটি মরতে রাখিয়ে তায়,
স্বরগে অমর আত্মা ডঙ্কা মেরে চলে যায়।
কতই আনন্দ সেথা নন্দন কাননে আজি,
মিলিয়াছে দেবতারা অপরূপ রূপে সাজি।
তুষিবেন প্রিয়জনে মনে বড় আকিঞ্চন,
তাই বুঝি সুরপুরে উৎসবের আয়োজন!
সাধিয়ে দেশের হিত রাজনারায়ণ আজ,
আসিবেন অমরাতে তাই বুঝি বিশ্বরাজ
বসেছেন কেন্দ্র হয়ে দেবতা সমাজ মাঝে,
অসংখ্য তারকা মাঝে প্রেমচন্দ্র যেন রাজে।
মধুর মিলন কিবা—অমরে অমরে হেরি
ভাসিছে আনন্দনীরে কিবা শোভা মরি মরি।

সাদরে ও কর ধরি সুধাইলা মৃদুস্বরে
এত দিন ছিলে তুমি স্বর্গ ছেড়ে দেওঘরে!
এস এস এস ভাই শান্তি-নিকেতনে বসি,
জুড়াও তাপিত প্রাণ মায়ের ভবনে পশি,
জননীর স্তন্যসুধা প্রাণভরে কর পান
মিটায়ে মনের সাধ কর তাঁর নাম গান॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

পদ্মা। *

কাব্যের নাম—পদ্মার কবি প্রমথনাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গায়ক কেমন? তাঁহার একটি গান শুনিলেই চেনা যায়; প্রমথনাথের এক খানি কাব্যেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তরুণ কবির ভাবী উচ্চাসন অঙ্গীকার করিয়া 'পদ্মা' সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। 'পদ্মা' কোন সুচরিত্রা প্রেমলুব্ধা নায়িকার নাম নহে; কবি পদ্মা নদীর বিলোল আতট-বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিলীলা দেখিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহার চিত্তের আবেগ ও কবিত্বকলার উদ্দাম হর্ষ যেন সেই নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। উভয়ই নিত্য চঞ্চল ও দুর্লভ লক্ষ্যের অনুসরণে গতিশীল, এই জন্য স্বদেশীয় নদীর নামে কবি তাঁহার কাব্য-খানির পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে চারিটি সুন্দর ছত্র দ্বারা গ্রন্থের মুখবন্ধ করা হইয়াছে ও কবি স্বীয় বিস্তারিত অভিপ্রায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্ত এবং কবিত্বময় একটি গদ্য সন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার গদ্য রচনা-দক্ষতা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ভাষা—পদ্মার শব্দ সম্পদ উৎকৃষ্ট, ভাষা-সুন্দরী কবিতা-গুলিতে সাজিয়া বাহির হইয়াছে;—

"উদ্দাম ঝঞ্ঝা জলদগর্জ্জন,
বর্ষণ ঘন অনুভাকম্পন,
পুষ্পিত বীথি বিটপী নর্ত্তন,
কহ্লার ভরা সরসী"

প্রভৃতির ন্যায় বহুসংখ্যক পদ সুলভ, যদ্দ্বারা তাহার ললিত ভাষার উপর অধিকার প্রতীয়মান হইবে,—ইংরেজীতে যাহাকে শব্দ চিত্রাঙ্কন (Word painting) বলে, পদ্মার কবিতায় সেই গুণটি বিশেষরূপে বিদ্যমান। অনেকগুলি ছত্রেই পাঠক ভাষার একটি পুণ্যশ্রী লক্ষ্য করিয়া প্রীত ও আশান্বিত হইবেন।

উপমা—একটি চিত্র দেখিলে প্রকৃতির অপরাপর অনুরূপ দৃশ্য মনে জাগাইয়া কবি সৌন্দর্য্যের একটি পূর্ণ অবয়ব আঁকিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের সঙ্গে মনুষ্য-মনের সুগভীর পরিচয় বিজ্ঞাপিত হয়; উপমাকে আলঙ্কারিকগণ কবিত্বের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শক্তিবলে কালিদাস ভারতীয় পাঠকবৃন্দের নিকট রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু খগরাজ, তিলফুল, রামরম্ভা, বিম্বফল প্রভৃতি কয়েকটি বাঁধা সামগ্রীতে উপমা পর্য্যবসিত হইয়া সুন্দরীগণকে দীর্ঘকাল বিড়ম্বিত করিয়াছিল। আধুনিক কবিগণ চিত্র স্পষ্ট করিতে

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১॥০। কলিকাতা, ২৬নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যাইয়া ইঙ্গিতে প্রকৃতির অনুরূপ দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রচ্ছন্ন উপমার অস্পষ্ট আভাসে একটি স্পষ্ট ছবি পাঠকের চক্ষুতে জাগিয়া উঠে। 'পদ্মার' কবিত্ব সেইরূপ উপমায় অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি ফল্গু নদী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ও প্রচ্ছন্ন মধু
কি অভিসম্পাতে পলাতক চিরদিন।"

এই অর্দ্ধব্যক্ত পদটি একটি লজ্জাক্রান্তা সুন্দরীর প্রতি গুপ্ত প্রণয়ীর আমন্ত্রণ মনে জাগাইয়া, ফল্গুর প্রচ্ছন্নতার মধ্যে এক সলাজ মধুর সৌন্দর্য্য আবিষ্কৃত করিয়াছে। আর একটি পদ এইরূপ :—

"শেষে হটি' হটি' পাছে ভীরু রৌদ্রটুকু
স'রে স'রে যাবে; একে একে ছাড়ি' ছাড়ি'
নদী ধাপগুলি, সৌধের কাণায় গিয়ে
ঠেকিবে কিরণ, তার পর চলে যাবে
উচ্চবৃক্ষ চূড়ে, শেষ উঁকি ঝুঁকি চেয়ে
লুকাইয়া পড়িবে গহনে।"

কবি প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তথাপি যেন আমরা দেখিতে পাইতেছি কোন পুরুষের সকরুণ দৃষ্টিতে স্বভাব-সরমে অভিভূতা একটি ভীরু রমণী পল্লীগ্রামের নানা কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া শেষে উচ্চতরুশিরে অর্দ্ধবিলীন হর্ম্ম্যের গবাক্ষ হইতে সেই রূপ-পিপাসী পথিকের প্রতি একবার শেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। রৌদ্রের শেষ রেখার সঙ্গে একটি গৃহস্থ-বধূর সাদৃশ্য পাঠকের নিকট সূচিত হইতেছে, অথচ কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। নদী যখন অবগাহককে বলিতেছে :—

নিঃসঙ্কোচে এস চলি'
চঞ্চল চরণক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষ দলি'
আরো এস নামি,—যেথা গভীর হৃদয়ে
ফুটে নৃত্য গীত; ল'ব সে গুপ্ত নিলয়ে
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বাঁধি;
সান্ত্বনা শুশ্রূষা সনে দিব ধৌত করি,
সকল কলঙ্ক-রেখা, শুভ্র বাস পরি'
যেও তুমি স্নাত, শুদ্ধ, যথা ইচ্ছা সুখে
গ্লানি শুধু ফেলে যেও, পাতি লব বুকে।"

নদীর আহ্বানের অন্তরাল হইতে আমরা আত্মোৎসর্গ-সরস প্রেমউন্মাদিনীর পরিবেদনা-পূর্ণ আমন্ত্রণের সুর স্পষ্ট শুনিতেছি; কবি নিজে কবিতার প্রত্যেক পংক্তি না লিখিয়া পাঠক দ্বারাই চিত্রপট সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছেন, স্থূল উপমা হইতে এইরূপ সাদৃশ্য অঙ্কনে নিপুণতা অধিক, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রমথ বাবু যেখানে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাবে উপমেয় উপমানকে উপস্থিত করিয়াছেন, সেখানেও বেশ মৌলিক রস খেলিয়াছে। সন্ধ্যার তারাগুলির প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

"ব্রত শেষে দেবকন্যা একে
একে শত শত কনক প্রদীপ
দিত কি ভাসায়ে স্থির নীল নভ-
নীরে।"

কোন রূপসীর স্থির মূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া কবি এই উপমাটি দিয়াছেন,

"কিম্বা পুন অহল্যার প্রায়
বিধাতার বরে, অভিশপ্ত শিলা হায়,

সহসা রমণী হ'য়ে উঠিল বিকাশি
তরুণ যৌবনে।"

বিগ্রহের প্রশান্ত মহিমাকে কবি কয়েকটি কথায় জীবন্ত সুন্দরীরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। আকাশের কথা প্রসঙ্গে উপমা অতি সুন্দর হইয়াছে,

"ভিন্নাঞ্জন নভ হেরিব প্রশান্ত
পুণ্য স্পর্শে এঁকে গেছে রোমাঞ্চের রেখা
বেণুরবে ব্রজে যথা কদম্ব সুন্দরী।"

কবি সান্ধ্যাকাশের "তাম্র মেঘের" উল্লেখ করিয়াছেন, এই "তাম্র" শব্দে মেঘের বর্ণ প্রকৃতরূপে ফলিয়া উঠিয়াছে। বাল্মীকি একদিন 'সন্ধ্যাকে' "চন্দন রঞ্জিত" বলিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাই মনে হইল।

রহস্য—প্রমথ বাবুর রহস্য কথায়ও বেশ নিপুণতা আছে; তাঁহার রহস্য তীব্র নহে—মৃদু, তাহাতে আক্রমণ নাই, কিন্তু একটু নির্ম্মল হাস্য আছে, তাহা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। পল্লীগ্রামের বৈঠকখানায় "তামাকের শ্রাদ্ধ দ্যাখে
ধোঁয়া গেলে কত।
কিস্তি মাৎ বিস্তি পঞ্চাশ শব্দ নিয়ত।"
প্রভৃতি বর্ণনায় ব্যঙ্গের ভাষায় বেশ একটি প্রকৃত চিত্র ফুটিয়াছে। পাঠশালার বর্ণনায় 'সটিক' শব্দ শুনিলে কোন গ্রন্থাদির উপর প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই প্রথম অনুমান হইবার কথা, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে গুরু-মহাশয়ের "সটিক মাথা" পাইয়া পাঠকগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। পঞ্চবটীর পথিককে যখন পাণ্ডারা ষ্টেশনে সুদীর্ঘ তালিকা খুলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন কবি উপদেশ দিলেন :—

"ওরি মাঝে
একজন, ধীর নম্রে করিয়া বরণ
পথে ঘাটে বিরোধের করিও ভঞ্জন।"

এই 'বরণ' শব্দটিও একটু কৌতুক হাস্য সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই।

উদ্দীপনা—উদ্দীপনায় প্রমথনাথ সুদক্ষ। স্বদেশ সংগীতে সেই উদ্দীপনার অপূর্ব্ব বিকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের কথা প্রসঙ্গে "রুদ্র মন্দ্রে বঙ্গ সিন্ধু আসুক তাণ্ডবে" এবং "ছাই হবে শতগ্রন্থি সংহিতা, সংস্কার অক্ষম শাসন।" প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠক কবির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হইবেন। প্রকৃতি বর্ণনায় :—

"হাস—ঝরিবে মুকুতা সঘনে;
চাহ—ভাতিবে চৌদিক কিরণে;
গাহ—উঠিবে ঝঙ্কার ভুবনে"

প্রভৃতি কথায় কবিত্বের উন্নত সৌন্দর্য্য উৎসাহিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্বরণ যখন প্রেমিকার নিকট হর্ষোচ্ছ্বাসে বলিতেছেন,

—"স্নেহ যত্নে অতি
দাঁড়াইলে, বসন্তের প্রথম বিকাশ
সম্মুখে আমার"

এবং সেই সদ্য প্রস্ফুট মালতী কুসুম তুল্য তপতীর স্নেহালিঙ্গনের পুণ্য আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া রাজত্বকে তুচ্ছ করিতেছেন,

"অয়ি শুচিস্মিতে,
রাজ-যশ, মিথ্যা কথা। সভয়ে যতনে

লাঞ্ছিত, স্তাবক শুধু রটয়ে ভুবনে!
রাজকৃপা, পীড়নের মিষ্ট পূর্ব্বাভাস!
রাজনীতি, সর্পসম ফেলিছে নিঃশ্বাস
সদা সন্তর্পণে প্রজার কুটীর ঘিরে,
স্নেহ মায়া দূর হ'তে কেঁদে যায় ফিরে!
—আজ তুমি হে রমণি, এনেছ হৃদয়
কঠোর রাজত্ব মাঝে।"

তখন প্রেমের উদ্দীপনার পূর্ণ কবিত্ব পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লালা বাবু সায়ংকালে সংসার পরিত্যাগ সংকল্পে আবদ্ধ হইয়া যখন প্রকৃতির দিকে চাহিলেন, তখন

"হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারি দিক্ ভরা
কেবল বিদায়যাত্রা; মুক্ত মায়া-হরা,
মহান্-গমন।"

হৃদয়ের অত্যধিক আবেগে প্রকৃতি যেন জাগিয়া বিদায় ইচ্ছার প্রতিধ্বনি শুনাইয়া তাঁহার সংসারের পাশ কাটিতে শক্তি দিল। অনেক কবিতাতেই প্রমথ বাবুর এই উন্নত উদ্দীপনা-শক্তি পাঠককে স্বীকার করিতে হইবে।

চিত্রাঙ্কন—আর একটি গুণের কথা বলিয়া উপসংহার করিব। দুচারিটি কথায় কবি যে এক একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে দৃশ্যগুলি সম্যক্ অভিব্যক্ত হইয়াছে। "পাড়াগাঁয় শুভ উষা আসিল হাসিয়া" এই ভাবে পল্লীর যে একখানি চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে

"ঘুম থেকে ত্রস্তে উঠি গেরস্তের মেয়ে
ঘর দোর ঝাঁট দিতে চলে ব্যস্ত হয়ে।"

প্রভৃতি কথায় গৃহস্থের বাড়ী যেন কোন চিত্রালেখ্যে আঁকা হইয়াছে। "বাদলা" নামক কবিতাটিতেও এই ভাবের সুদৃশ্য চিত্র অনেকগুলি পাওয়া যাইবে।

প্রমথনাথ একখানি কাব্য লিখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাতেই যে তিনি সুকবি তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

পদ্মার উৎকৃষ্ট মুদ্রাঙ্কন, কাগজ ইটালী হইতে আনীত, সুদৃশ্য ছবি এবং সুন্দর গঠনশ্রী বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নূতন সংবাদ।

১। ইংরাজী নূতন শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে কয়েকটী বর্ষীয়ান্ মহৎ লোক ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন :—

(১) জেম্‌স মার্টিনো, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় দার্শনিক, ধর্ম্মোপদেষ্টা ও নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনী-পাঠিকাদের সুপরিচিতা হারিয়েট মার্টিনোর সহোদর।

(২) রসকিন—সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ও উদার ধর্ম্মের প্রচারক রসকিন অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

(৩) সার হণ্টার ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল

প্রশংসার সহিত রাজকার্য্য করিয়া বিলাতে শেষ জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইনি ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারত গেজেটিয়ার প্রভৃতির গ্রন্থকার।

(৪) রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব—রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের সপ্তম পুত্র। অতি শান্তস্বভাব এবং দেশ-হিতকর কার্য্যে সকলের উৎসাহদাতা ছিলেন।

(৫) বাবু নবীনচন্দ্র রায়—ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিয়া বহুকাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করেন এবং শত সহস্র লোকের জীবিকার উপায় করিয়া দেন। প্রায় ৩০ বৎসরকাল বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের অজ্ঞাতে ভগবৎ ধ্যান ধারণা ও প্রেমাস্বাদনে জীবন যাপন করিয়া গত ১লা ফাল্গুন ৮২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সার লাণ্ডহার্ষ্টের হস্ত হইতে সার নর্থকোট শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভার রাজ-প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের প্রতীকার বিধানার্থ কলিকাতা টাউন হলে নগরবাসীদিগের এক সভা হয়, তাহাতে স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করেন। দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে তিনি দশ হাজার এবং লেডী কুর্জ্জন এক হাজার টাকা দিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য মহোদয়ের দানে ইতিমধ্যে ফণ্ডে ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। বিলাতেও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ হইয়াছে।

৫। 'বেঙ্গলী' নামক ইংরাজী পত্র সাপ্তাহিক ছিল, দৈনিক হইয়াছে। সুবিখ্যাত অনারেবল বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সিদ্ধি প্রার্থনা করি।

৬। ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন, তাহার স্মরণার্থ মাঘোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতায় আদি, সাধারণ ও ভারতবর্ষীয় সমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপাসনা করিয়াছেন।

৭। সাহিত্য-সেবক বাবু দীনেশচন্দ্র সেনকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

৮। কলিকাতার টেঁকশালে স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হইতেছে। গিনির দাম ১৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

৯। সেনাপতি লর্ড রবার্টস দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার রণকৌশলে কিম্বার্লী মুক্ত হইয়াছে এবং ইংরাজ সৈন্যগণ শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বোয়ারেরাও প্রাণপণে যুঝিতেছে। যুদ্ধ আরও ঘোরতর হইবার সম্ভাবনা। বুয়ার সেনাপতি ক্রঞ্জি ৪ হাজার সৈন্য সহ ধরা দিয়াছেন।

১০। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণে ছোট লাট বাহাদুর সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বামারচনা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন।

(গীতা)

বল মোরে কমল-লোচন,
কেন এই জীব-হিংসা তরে
করিতেছ এত আয়োজন,
সবি যাবে দুদিনের পরে?
দয়াময়! তুমি ভয়হারী,
ও চরণে লয়েছি শরণ,
বল দেব! বুঝিতে না পারি
সৃষ্টি কেন কর বিনাশন?
ভাই ভাই কেন এ লালসা?
শোণিতের স্রোত যাবে বহি,
মেটে না কি রাজ্যের পিপাসা
চিরদিন বনবাসে রহি?
কেবা কার! অণু পরমাণু
ধূলি সাথে মিশাব ধূলিতে।
চির মেঘে কেন দীপ্ত ভানু
ঢাকিছে এ সমর-ভূমিতে।
বীরধর্ম্ম অস্ত্র সঞ্চালন
এই শুধু কঠিন হৃদয়ে,
ক্ষমা সে যে শ্রেষ্ঠ আভরণ,
শত শ্রেষ্ঠ শোণিতের চেয়ে।
রাজ্য চায় লউক তাহারা
আমরা ও চরণ-কাঙ্গালী।
এই রাজ্য—স্বর্গ চায় যারা
তারা কি প্রয়াসী বনমালী?
কি জগৎ সমুখে নেহারি,
ও চরণে কি বৈকুণ্ঠ রাজে;
ছার আশা নিবারি শ্রীহরি,
যেন লীন হই ওর মাঝে।
দয়াময় করেছ সৃজন,
কেন তবে সংহার-মূরতি?
হৃদয়েতে শান্তির আসন
বিছাইয়া থাক দিবারাতি।
থেকে থেকে শিহরয় হৃদি,
শত শত পতিহীনা নারী
অশ্রুজলে বহাইছে নদী,
পুত্রহীনা কাঁদিছে ফুকারি।
থাক্ দেব সংগ্রাম-লালসা,
হৃদয়েতে জাগাও করুণা,
প্রলয়ের নাহিক পিপাসা,
ও চরণে হারাব আপনা।
পীতাম্বরে ঢাকা শ্যাম তনু,
নব জলধর বেশ ধরি
এস কাছে, অণু পরমাণু
মিশে যাবে তোমায় শ্রীহরি।

হৃদয়েতে তোমার আসন,
নয়নেতে তব রূপ ভাতি,
রসনাতে নাম সুধা পান,
কাজ নাই যশোলাভ খ্যাতি।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সন্তানের মমতা।

কি লিখিব ভাবি তাই. ভাবিয়ে না ভাব পাই.
দিশেহারা সদা সর্ব্বক্ষণ।
আর নাহি সহা যায়, হিমানীতে স্নিগ্ধ নয়,
অনলেতে পুড়িতেছে মন ॥
বিপদ অনিল সহ, জ্বলিতেছে অহরহ,
নির্ব্বাণ কি হবে এ অনল ?
পীড়া রূপে রাহু আসি, গ্রাসিল আত্মজ শশী,
অমৃতে যে উঠিল গরল ॥
নাহি মম পিতা মাতা, নাহি স্বামী নাহি ভ্রাতা,
নাহি বন্ধু নাহি আত্মজন।
মৃত্যুতে না সুখ পাব, পুত্র কার হাতে দেব,
কেবা তারে করিবে যতন ?
কেবা অঙ্কে লয়ে শোবে, নিশিতে না ঘুমাইবে,
কে জাগিবে আমার মতন ?
মূর্চ্ছিত হইলে পরে, পাখা জল লয়ে করে,
কে করিবে মূর্চ্ছা নিবারণ ?
স্নান করিবার কালে, পীড়া হয়ে ভূমিতলে,
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িবে যখন ;
নিকটেতে কেবা থাকি, অঞ্চলে মুছাবে আঁখি,
কোলে লয়ে বসিবে তখন ?
বসিলে ভোজনাসনে, মূর্চ্ছা হয়ে ধরাসনে,
অচেতনে করিলে শয়ন—
জগদীশ রাখ রাখ, দয়াময় নাম রাখ,
কর রক্ষা দুঃখিনী-নন্দন ॥
শৌচ প্রস্রাবের ঘরে, গেলে পুত্র থাকি দ্বারে,
সেই খানে মূর্চ্ছা যদি হয়,
ত্বড়িৎ বেগেতে গিয়া, জল শৌচ করে দিয়া,
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয় ॥
নাহি ঘৃণা নাহি জ্ঞান, [illegible] করিয়া স্নান,
সুস্থ কিসে থাকিবে সন্তান,
বরফ ঔষধ ঘরে, ডাব বারি করে ধরে,
তবু যেন শঙ্কাকুল প্রাণ ॥
স্বার্থ ভাব নাহি মনে, পুত্র বাঁচিবে কেমনে,
এই স্বার্থ দিবস যামিনী,
এই ভাবে কাটি কাল, নাহি ভাবি পরকাল,
সন্তানের তরে পাগলিনী।
বিজনে ফুটিলে ফুল, বিজনে হয় নির্ম্মূল,
কেহ নাহি দেখিতে গো চায়।
স্বার্থপর যত নর, কে হইবে অগ্রসর,
কণ্টক ফুটিবে ব'লে পায় ॥
পবিত্র সরসীপরে, মীন কুল খেলা করে,
দেখ দেখ অতি মনোহর।
সে জীবন শুখাইলে, মীন নাহি থাকে জলে,
জীবন না থাকে অতঃপর ॥

চন্দন বৃক্ষেতে ঘিরে, আছে যত বিষধরে,
পুষ্পমধ্যে কীট বাস করে।
পাপের যে ফলাফল, পাইলাম প্রতিফল,
গর্ভে এই সন্তানকে ধরে ॥

শ্রীল—হতভাগিনী।

বসন্তের * মাতৃ-আহ্বান।

১

ওমা, আয়, আয় !
খোকাত থাকে না আর, তাহারে ভুলানো ভার,
"মা" "মা" বলি ডাকি সে যে ধূলায় লুটায়,
সে যে গো ! দুধের ছেলে, থাকে না তোমারে ফেলে,
তোমা বিনা কারো কোলে যেতে নাহি চায়।
সে যে গো ! তোমার তরে কাঁদিয়া পাগল করে,
একাকী ফেলিয়া তারে গেলি মা কোথায় ?
অমাবস্যা অন্ধকার ঢাকিয়াছে চারি ধার
নয়ন মেলিতে ভয় উপজে হিয়ায় !
আমি ত খোকারে নিয়া, কোন মতে সামালিয়া,
রাখিতে পারি না আর ঘরের কোণায় !
সে যে "মা" "মা" বলি উঠি পথ পানে ধায় ছুটি,
ভয় করে অন্ধকারে করি কি উপায় ?
একাকী ফেলিয়া তুই গেলি মা কোথায় ?

২

ওমা, আয় আয়,
বাবা যে নাহিক ঘরে, চলে গেছে ক্রোধ ভরে,
একাকিনী ফেলি তোমা, জান না কি তায় ?
লিখেছিলে কত পত্র, লিখে নাই এক ছত্র,
কখনো আসেনি সে যে দেখিতে তোমায় !
কতবার নাম নিয়া, কাঁদিয়াছ বিনাইয়া,
চমকি উঠেছ ঘুমে ডেকে ডেকে তায় !
তোমারে দেখিতে কভু, সে যে গো ! আসেনি তবু,
একটু সান্ত্বনা দিতে এ রোগ-শয্যায়।
সাত মাস পরিপূর্ণ, হৃদয় হয়েছে চূর্ণ,
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি জল নাই তায় !
তবু সে পাষাণ প্রাণে, চাহে নাই মুখ পানে,
তবু সে আসেনি কভু দেখিতে তোমায় !
আজ মা, এ খালি ঘরে, পরাণ কেমন করে,
বিছানা পড়িয়া আছে, তুমি নাই তায়।
যদিও রোগেতে শীর্ণ, ছিলে অতি জরা জীর্ণ,
যদিও উঠিতে বল নাহি ছিল গায়,
যদিও রাঁধিয়া ভাত, দিতে না মা ; সারা-রাত
তবু যে নিকটে শু'য়ে এক বিছানায়,

* অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, কোনও সম্ভ্রান্ত উকীলের দৌহিত্রী।

কি সুখ হইত প্রাণে, আমি জানি, প্রাণ জানে,
আজ মা কাহার বুকে ঘুমাইব হায়!
কোথায় গেলি মা তুই আয়, আয়, আয়!

৩

ওমা আয়, আয়,
শুনেছি দাদা * র কাছে, বাবা নাকি বলিয়াছে,
আবার করিবে বিয়া সে যেন কোথায়!
তাই সে তোমার প্রতি, নিদয় আছিল অতি,
তাই সে মোদের পানে ফিরিয়া না চায়!
তাই সে আসেনি আর, দেখা দিতে একবার,
তাই সে বাসেনি ভাল কখনো তোমায়!
অগ্নি-পরীক্ষার তরে, তাই নাকি অত করে,
"টিকা"র আগুন মাগো। ছুঁড়ে দিত গায়,
(সীতার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝা'ত তোমায়)!
তাই সে না খাওয়াইয়া, একা ঘরে খিল দিয়া,
রাখিত অমন ভাবে আহা হা! তোমায়!
তাই নাকি অবিরত, নিতান্ত পরের মত,
প্রহার করিত বাবা আমা দুজনায়!
শুনেছি দাদার কাছে, বাবা নাকি বলিয়াছে,
আবার করিবে বিয়া সে যেন কোথায়?
তুমি মা, থাকিতে ঘরে, তারা নাকি "দোজ" বরে,
কখনো দিবে না বিয়া বলিয়াছে তায়,

* বসন্ত মাতামহকে "দাদা মশায়" বলিয়া ডাকে।

কি জানি বাবার মনে, কি রয়েছে সঙ্গোপনে,
কেন যে তোমারে এত কাঁদাইত হায়!
বাবা জানে, আর জানে নিজে বিধাতায়!

৪

ওমা আয় আয়,
তুইও মা পরের মত, চ'লে গেলি, বুঝিনাত,
কার কাছে রে'খে গেলি আমা দুজনায়!
এই যে এসেছে নিশি, আঁধারিয়া দশ দিশি,
ভবিষ্যৎ তারো চেয়ে ম্লান দেখা যায়।
কাহার দুয়ারে যাব? কোথায় আশ্রয় পাব?
কোথায় দাঁড়াব মোরা হায় হায় হায়!
আমরা পরম দীন, পিতা থেকে পিতৃ-হীন,
অভাগা দেখিয়া কেহ ফিরিয়া না চায়!
তুমি ছিলে পিতা মাতা, তুমি ছিলে ভয়ত্রাতা,
তুমি বিনা আমাদের কে ছিল ধরায়?
সেই তুমি নাই আর যাইব কোথায়?

৫

ওমা আয় আয়,
খোকা ত থাকে না আর, তাহারে বুঝানো ভার,
"মা" "মা" বলি কাঁদি সে যে ধূলায় লুটায়!
সে যে গো! দুধের ছেলে, থাকে না তোমারে ফেলে,
তোমা বিনা কারো কোলে যেতে নাহি চায়!
ক্ষুধায় আকুল স্বরে, সে যে কাঁদে সকাতরে,
আমি কি খাওয়াব তারে? পাব কি কোথায়?

আমি যে তাহারে নিয়া, কোন মতে সামালিয়া,
রাখিতে পারি না আর ঘরের কোণায়
সে যে "মা" "মা" বলি উঠি, পথ পানে ধায় ছুটি,
(যে পথে লইয়া গেছে শ্মশানে তোমায়)!

শ্রীশর্ম্মিষ্ঠা।

উপহার।

(হ)রিছে জীবন কাল অতি চতুরতা ক(রে),।
ন(রে) কিন্তু জেনে শুনে মিছা কাজে কাল (হ)রে॥
ভুলে(কৃ)তান্তেরে মুগ্ধ পশ্চাতে নাহি (রে) চায়।
মুগ্ধ বৈ(ষ্ণ)বী মায়াতে উপায় কি (হ)বে হায়!
হরষিত (হ)য়ে কাটে শীত উ(ষ্ণ) চারি কাল।
যৌবন জোয়া(রে) যায়, হয় (কৃ)শ বৃদ্ধ কাল॥
তাই বলি মন (কৃ)ষ্ণ কৃ(ষ্ণ) বল অবিরাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃ(ষ্ণ) (কৃ)ষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম॥
(হ)ইল অধিক বেলা যেতে হবে পারাপা(রে)।
ও (রে) মোর মূঢ় মন অচিরে উদ্যোগী (হ)রে॥
দিন (রা)ত শুধু তুমি মিছা কাজে ঘু(রে) মর!
হয়ে অ(ম)রার লোক কর্ম্মদোষে (হ)লি মর॥
ত্যজ মন (হ)তবুদ্ধি হরিনা(ম) কর সার।
মূঢ় মন তো(রে) বলি ধর (রা)ঙা পদ তাঁর॥
দৃঢ়রূপে ধরে(রা)খ শ(ম) দম ভক্তি ডোরে।
বল মুখে হরে রা(ম) (রা)ম রাম হরে হরে॥
প্রেম সূত্র ভক্তি সূচি যত্নে করি আহরণ;
হরিনাম মহামূল্য মুকুতা করি গ্রহণ;
হৃদয় আবেগ ভরে গাঁথিনুরে এই হার।
প্রাণসম বন্ধুগণ বিনা গলে দিব কার?
নাহি কোন ধন মম কিবা দিব উপহার?
প্রাণের সুশীলা ধর বসন্তের বক্ষহার॥

পেচক।

কেও একাকী জাগি গণিতেছে যেন
নিদ্রা-মগ্ন ধরণীর নিশ্বাস পতন,
থেকে থেকে তীব্রকণ্ঠে ডাকিয়া কাহারে
জানাতেছে হৃদয়ের সুতীব্র বেদন ?
যেন কোন অভিশপ্ত প্রেতাত্মার মত
পূর্ব্বের কাহিনী স্মরি করিছে বিলাপ,
কিম্বা রজনীর নিদ্রা না পারি ভাঙ্গিতে
কঠোর ভাষায় তারে দেয় অভিশাপ।
মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল যেন এ ধরায়,
আসিয়াছে সাথে লয়ে রোদন বিলাপ,
শুনিছে রজনী যেন হইয়ে নীরব
ওর ওই সকরুণ তীব্র পরিতাপ।
আঁধারেতে নির্ব্বাসিত প্রাণীর মতন
ভ্রমিতেছে নিরানন্দে একাকী গম্ভীর,
ওকি আঁধারের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রকাশিছে হৃদয়ের দুঃখ সুগভীর ?
ওকি মরণের স্বর ধরণীর প্রাণে
জাগাইয়া বিভীষিকা হয় অদর্শন,
ঈর্ষার ভ্রূকুটি হানি আলোকের পানে,
আঁধারের সাথে হায় ! ছায়ার মতন।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

পূজা।

কি দিয়ে পূজিব পদ জানি না ত প্রভু !
আমি অতি দীন হীন ভকতি-বিহীন,
আশা তবু ভবার্ণবে পদাম্বুজ ধরি
তরিতে পারিব এই পাপের পাথার।
সহায় সম্বল দাসে দেহ কৃপা করি
তব দয়া বিনে আর কি আছে আমার ?
পাপি-শ্রেষ্ঠ আমি, তবু জননী কি কভু
শত দোষে দোষী পুত্র পারেন ত্যজিতে ?
তেমনি তুমিও মাতঃ জীবন আঁধারে
চাঁদনি প্রকাশ কর দিয়ে তব জ্যোতিঃ।
পাপরাশি-পরিপূর্ণ জীবন আমার,
ধন্য হোক তব কর-পবিত্র পরশে।
পত্র পুষ্প নাহি পাই আছে ত হৃদয়,
দাও তাহে ভক্তিরূপ সুবর্ণ প্রসুন,
নীরস ক্ষেত্রেতে করি বীজের বপন,
প্রকাশিত কর দেব তোমার শকতি,
উন্মূলিত হবে কি না জান তুমি তাহা
সংসারের পাপাসক্তি তরু দৃঢ়-মূল।
আঁধার হৃদয়ে পুণ্য-প্রভা প্রকাশিয়া
বিতর করুণা তব অমৃত-নির্ঝর।

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।

No. 422-23. March and April, 1900.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪২২-২৩ সংখ্যা। ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৬। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত—ফাল্গুন না যাইতে যাইতে ব্রিটিশ ভারতে দুর্ভিক্ষপীড়িতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ এবং দেশীয় রাজাদের রাজ্য সকলে ৯ লক্ষের অধিক গণিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের গণনার বাহিরে আরও কত লক্ষ লোক আছে! কোটি কোটি লোক অনাহারে মৃতপ্রায়, ভারত-বাসীর সাহায্যের জন্য ভারতবাসিগণ কি হস্ত প্রসারণ করিবেন না ?

কাশ্মীরের গবর্ণর—কলিকাতা মিউ-নিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের সহোদর বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের চিফজষ্টিস ছিলেন, এখন গবর্ণর হইয়াছেন।

বিলাত-প্রবাসী ভারতবাসী—সর্ব্ব-শুদ্ধ ২৮৬ জন ভারতসন্তান ও ২৯টী ভারতকন্যা বিলাতে অবস্থিতি করিতে-ছেন। বাঙ্গালী পুরুষ ৭২ জন এবং রমণী ৫ জন।

অন্ধ-বিদ্যালয়—গত ৩রা মার্চ্চ কলি-কাতা ওভারটুন হলে এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়। এই বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতা বাবু লালবিহারী সাহা ধন্যবাদের পাত্র।

উত্তর পশ্চিমে স্ত্রীশিক্ষা—এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬টী বালিকা ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ২য় ও আর একজন ৩য় স্থানীয়া হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাঁদের মধ্যে একজনও স্থানীয় হিন্দু নহেন, ৩ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন দেশীয় খৃষ্টান মহিলা।

বিধির নির্ব্বন্ধ—বোয়ারদিগের সেনাপতি মহাবীর ক্রঞ্জী ১৬ বৎসর পূর্ব্বে যে ২৭শে ফেব্রুয়ারি দিবসে ইংরাজ সেনাপতিকে সৈন্যদলসহ বন্দী করেন, সেই ২৭শে ফেব্রুয়ারি ৪ সহস্র সৈন্যসহ স্বয়ং ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রবার্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহাঁরা কেপ কলোনী কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন।

ইংরাজ পক্ষের জয়—ক্রঞ্জীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বোয়ার সেনাগণ লেডীস্মিথ পরিত্যাগ করাতে সেনাপতি হোয়াইটের সমভিব্যাহারী বহু সহস্র সৈন্য উদ্ধার লাভ করিয়াছে। এই দুই ঘটনাই ইংরাজ পক্ষের মহোল্লাসের কারণ হইয়াছে এবং এজন্য ইংলণ্ডে যেমন, ইংলণ্ডের অধীনস্থ সমগ্র দেশেই তেমনি জয়োৎসব হইতেছে।

লেডী ডফরিন ফণ্ড—সম্প্রতি ইহার বার্ষিক সভা হয়, তাহাতে রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। ডফ্‌রিন হাঁসপাতালে পীড়িত স্ত্রীলোকদিগের আশানুরূপ সমাগম হয় না। যাহাতে ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীগণ ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গিয়া সাহায্য দান করেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। এ অতি সৎ প্রস্তাব।

দুর্ভিক্ষে দান—ইতিমধ্যে ভারতবাসীদিগের সাহায্যার্থ বিলাতী ফণ্ডে ১৫ লক্ষ এবং ভারতবর্ষীয় ফণ্ডে ৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিলাতের লর্ড ষ্টান্‌লি নামক এক ভারত-হিতৈষী মহাত্মা পরদানসিন স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ৬ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—শিক্ষা বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার জন্য এই বিদ্যালয় হইতে ৪৩টী বালিকা প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ৩৫টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা—ভক্তি-উষা দাস ও শান্তিলতা চন্দ্র। নিম্ন শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা—স্বর্ণলতা দাস, হিরণ্ময়ী সেন, সুহাসিনী সেন ও শশিপ্রভা বিশ্বাস। অষ্টম ষ্টাণ্ডার্ডে উত্তীর্ণা তিনজন, তন্মধ্যে ক্ষণপ্রভা সিংহ ১ম স্থানীয়া। সপ্তম ষ্টাণ্ডার্ডে উত্তীর্ণা ৪ জন, তন্মধ্যে হেমন্ত কুমারী বাগ্‌চি ২য় স্থানীয়া হইয়া ২৮৲ পুরস্কার লাভের যোগ্যা হইয়াছেন। ৬ষ্ঠ ষ্টাণ্ডার্ডে উত্তীর্ণা ৮ জন, তন্মধ্যে সুধীরবালা বসু ২০৲ পুরস্কারের যোগ্যা। ৫ম ষ্টাণ্ডার্ডে ৫ ও ৪র্থ ষ্টাণ্ডার্ডে ৯ জন বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক।

ট্রান্সভাল ফণ্ডে দান—বিধবা অনাথ ও আহতদিগের সাহায্যার্থে জয়পুরের মহারাজা ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি—আসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে লর্ড কুর্জন বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি রক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট দায়ী। তাঁহার শাসনসময়ে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪০০ শত হইয়াছে।

টাউনহল সভা—বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সম্মানার্থ এক মহাসভা হইয়াছিল। দেশের প্রধান প্রধান লোকগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। রমেশ বাবু আবার বিলাতে গিয়া ভারতের জন্য খাটিবেন। ইনি দীর্ঘজীবী হউন।

বিবিধ বিবরণ।

আয়র্লণ্ডে বৌদ্ধ মূর্ত্তি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক সময় পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সমগ্র আসিয়া মহাদেশ ব্যতীত সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইয়ুরোপের অনেক স্থানে বৌদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভ ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল ভূরি ভূরি আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে আতলান্তিক অর্ণবস্থ কোন কোন দ্বীপেও বৌদ্ধ কীর্ত্তি ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি আয়ার্লণ্ডের জলাভূমিতে একটী পিত্তলের বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিটী প্রায় একপাদ উচ্চ—প্রচারক ভাবে দাঁড়াইয়া যেন উপদেশ প্রদান করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এইরূপ মূর্ত্তি সকল সিংহলে প্রস্তুত হইয়া শ্রমণদিগের কর্ত্তৃক দিগ্‌দিগন্তরে নীত হইয়াছিল।

অশোক বন।

মহাবোধি সভার সম্পাদক ধর্ম্মপাল আনাগারিকা সিংহলী কাদমপোতা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া সীতা দেবীর কারাবাস অশোকবনের স্থিতি-স্থলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি তিনি সেই স্থান সন্দর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক আর্য্য-সন্তানকে আহ্বান করিয়াছেন, অথচ সে স্থানটী যে সিংহলের কোন্ অংশে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। কাদমপোতা গ্রন্থে রক্ষোরাজ রাবণের রাজত্বকাল হইতে বঙ্গ রাজপুত্র বিজয়ের সিংহল বিজয় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। সিংহলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা টরণার সাহেবও এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও রাবণ কেতাব নামক একখানি পালী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে রাবণের রাজত্বকাল ও রামের সহিত যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত আছে। ইহাও এক প্রকার রামায়ণ এবং বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে; কিন্তু রাবণের রাজধানী শ্রীলঙ্কাপুর বহুদিন হইল সাগরগর্ভসাৎ হইয়াছে। টরণার মহাবংশ গ্রন্থের অনুবাদের এক

স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাঁহার শাসনসময়ে (১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দে) একদা সিংহলের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র দেশ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং তত্রত্য সমুদ্রতলও স্বল্পগাধ হওয়াতে পিত্তলময় প্রকাণ্ড প্রাকারাংশ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। টরণার ইহাই সাগরমগ্ন শ্রীলঙ্কাপুরের প্রাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হইয়া তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। কাদমপোতা গ্রন্থে যদি অশোক বনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাহইলে ইহা শ্রীলঙ্কাপুরের অন্তর্গত বা রাবণের প্রাসাদের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মপাল ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলে দেশের মহোপকার সংসাধিত হইতে পারিবে।

উড্ডয়ন যন্ত্র।

পক্ষীর ন্যায় উড্ডীয়মান হইয়া আকাশমণ্ডল পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা মানবমনে বহুকাল ধরিয়া আন্দোলিত হইতেছে। এই ইচ্ছা হইতেই ব্যোমযানের উৎপত্তি। কিন্তু ব্যোমযান দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ ইহা আয়ত্তাধীন নহে। ইচ্ছামত অন্তরীক্ষ ভ্রমণই মানবের অভিলষিত বিষয় ও প্রধান উদ্দেশ্য। সম্প্রতি একজন রুসীয় ও ফরাশি এই মত একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটী ধাতুনির্ম্মিত ও গ্যাস দ্বারা পরিচালিত এবং ঘণ্টায় শত মাইল গমনক্ষম। যন্ত্রটী সম্পূর্ণ ও ব্যবহারোপযোগী হইলেই উদ্ভাবকেরা তাহা সাধারণ্যে প্রদর্শন করিবেন। এরূপ একটী যন্ত্র যথেচ্ছ ব্যবহারোপযোগী ও নিরাপদ হইলে মানব জাতির বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। রেলওয়ে কল্পনার সময় উহা যেরূপ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, ইহাও যে এখন তদ্রূপ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

মানবী না দানবী?

আমেরিকার কানসাম প্রদেশের অন্তর্গত গোরণ নামে একটী ক্ষুদ্রনগর আছে। তথায় কুমারী ইলা ইউয়িং নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আছে, তাহার বয়স প্রায় ২৬ বৎসর। তাহার দেহের উচ্চতা আট ফিট চারি ইঞ্চ। পৃথিবীতে এতবড় দীর্ঘাকৃতি লোক আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার যখন ১২ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, তখন এ সাত ফিট দীর্ঘ ছিল, তখন ইহার সমবয়স্কারা ইহাকে দানবী বলিয়া উপহাস করিত, ইউয়িং তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইত। কিন্তু যখন সারকস্ ও মিউজিয়মের অধ্যক্ষেরা তাহাকে সাপ্তাহিক পঞ্চাশৎ ডলার (প্রায় দুই শত টাকা) বৃত্তি দিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন আর তাহার দীর্ঘতার প্রতি অভিযোগ রহিল না! সে এখন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। অদ্যাপি বিবাহ করে নাই।

দন্তহীন বংশ।

ক্যানাডাবাসী একজন কৃষকের ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার একটিও দন্ত উঠে নাই। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার ৪টী সন্তান হইয়াছে, তাহারাও দন্তহীন; কাহারও দন্ত উঠে নাই। ক্যানাডা প্রদেশে এই ঘটনা প্রকাশিত হওয়াতে তত্রত্য বিজ্ঞানবিদেরা ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একটী দন্তহীন পুরুষের সন্তানগণ দন্তহীন হওয়াতে একটী দন্তহীন বংশ হওয়া সম্ভব, ইহাই বিবেচনার বিষয়। আমরা একখানি ইংরাজি বিজ্ঞানগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, মনুষ্য তরল খাদ্য আহার করিলে, চর্ব্ব্য বস্তুর অভাবে দন্ত অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে, সুতরাং তাহার সন্তান সন্ততিগণও তদ্রূপ আহার নিবন্ধন দন্তহীন হইয়া যাইবে; কাজে কাজেই তাহার বংশও দন্তহীন হইবে।

কুলীন কুমারী।

(গল্প)।

হরিনন্দনপুর বিক্রমপুর প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সিন্ধুসুন্দর এই গ্রামের প্রভু। সিন্ধুসুন্দর নিকষ কুলীনসন্তান। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার ন্যায় কুলীন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কুলগৌরবে উক্ত প্রদেশের সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলী সিন্ধুসুন্দরকে মহাসম্মান করিতেন। সিন্ধুসুন্দরের আদেশ মাত্র "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়", কেন না তিনি কুলীনের শ্রেষ্ঠ মহাকুলীন। সিন্ধুসুন্দরের এবম্বিধ মহান্ প্রতাপের কাহিনী অবশ্য অন্য কেহই বড় একটা স্বীকার করেন না, তবে সিন্ধুসুন্দরের নিজ-মুখে আমরা ইহা অনেক বার শুনিয়াছি।

সিন্ধুসুন্দরের পূর্ব্বে কোনও পৈতৃক বিষয়াদি ছিল কি না বলা যায় না। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস কোথায় ছিল, তাহাও কেহ জানিতেন না, তবে তিনি যে ক্রমান্বয়ে পঞ্চ বিংশতিটি রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া পঞ্চবিংশতিটি কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এ কথা অনেকেই জানিতেন। এ জন্য অনেকেই তাঁহার করে কন্যা সম্প্রদান করা পরম গৌরব মনে করিতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাঁহাদিগের পাণিপীড়ন করিতেন, তাঁহারা কখনও আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল, কারণ বিবাহরাত্রি ব্যতীত পতির পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন আর তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। "কাট্‌না" কাটাও তাঁহাদের ইহ জীবনে ঘুচিল না, কখন ঘুচিবে কি না ভগবান্ই বলিতে পারেন!

সিন্ধুসুন্দর শেষ বারে যে বিবাহটী করেন, সেই স্ত্রীকে লইয়াই এখন তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং শ্বশুরের (এই স্ত্রীর পিতা) উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় শ্বশুর শাশুড়ীর লোকান্তরের পর হইতে তিনি হরিনন্দনপুরে বাস করিয়া তৎপল্লীবাসী কুলীনগণকে ও শেষ স্ত্রী কমলাকে গৌরবান্বিত করিতেছিলেন। এখন সিন্ধুসুন্দরের বয়স পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে, কমলার বয়ঃক্রম অষ্ট বিংশতি বর্ষ মাত্র। কমলার গর্ভে সিন্ধুসুন্দরের একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইতাগ্রে অন্য স্ত্রী হইতে সিন্ধুসুন্দর অপত্যস্নেহের মধুর আস্বাদ পান নাই, কমলা তাঁহাকে এই অমূল্য রত্নটি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রাণাধিক-প্রিয়া।

সিন্ধুসুন্দর তাঁহাদের পরম স্নেহের সামগ্রীটির নাম রাখিলেন "কনক-নলিনী"। কনক-নলিনী তাহার নামের সার্থকতা করিয়াছিল। কনকনলিনী রূপে লক্ষ্মী, গুণে রাণী। যে একবার তাহাকে দর্শন করিত, সেই মুগ্ধ হইত—সেই তাহাকে বড় আপনার জিনিষ বলিয়া মনে করিত। এই স্নেহময় সামগ্রীটি পিতা মাতার বিমল স্নেহ ও প্রতিবাসিগণের নির্ম্মল আদর যত্নে আপনার অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিকিরণ করিতে করিতে ক্রমে বিকসিত হইতে লাগিল। কমলা কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কুলীন সিন্ধুসুন্দরের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন "মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইয়া কেবল তাহাদের মাথাটি খাওয়া হয়, গৃহধর্ম্মে মন থাকে না, গুরুজনে ভক্তি করে না, "সাঁজ সেজুতির" (ব্রত বিশেষ) মুখে আগুন ধরয়ে দেয়, যে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে চায় বা সে পন্থা অবলম্বন করে, সে নিরেট মূর্খ—গাধা, এ সিন্ধুসুন্দর শর্ম্মার এমনটি হবার যো নাই"। তদুত্তরে পত্নী কমলা বলিতেন "ঐত তোমাদের যত কুসংস্কার। (কমলা পিতা মাতার নিকট কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন) মেয়েদের লেখা পড়া না শিখ্‌য়ে তাদের অজ্ঞান ক'রে রাখলে কি জগতের কোনও উপকার হয়? না সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়? ঐ যে ঘোষেদের সুশীর মা লেখা পড়া কিছু জানে না, সংসারের কাজ লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত, ছেলেদের সময় মত নাওয়াতে খাওয়াতে অবকাশ হয় না, শত জন্মে একবার তাদের গায়ে এক ফোঁটা তেল পড়ে না, জ্বর হ'লে সাগু ক'রে দিবার অবসর হয় না, জ্বরের পথ্য মুড়ি, এই সকল অনিয়মে ছেলেদের শ্রী দেখ দেখি! বাছাদের কোন অভাব নাই, অথচ তাদের মুখের দিকে চাইতে কষ্ট হয়, যেন তারা কত দীন দরিদ্রের সন্তান, যেন মাতৃ-পিতৃ-হীন। এই রকম হলেই কি রমণী-জীবনের সার্থকতা হয়! লেখা পড়া শিক্ষা করা কি কেবল চাকরী করিবার জন্য? রমণী জননী জাতি, রমণী গৃহলক্ষ্মী। রমণী যদি শিক্ষিতা না হইয়া একটি নগণ্য জীব

বিশেষ হইয়া থাকে, তবে আর সংসারে মঙ্গল হইবে কিসে? তোমরা যে "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া একটা শ্লোক আওড়াও, সে দোষ রমণীর নহে—তোমাদেরই। তোমরা যদি নারীজাতিকে সৎশিক্ষা দাও, তবে আর সমাজের এ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? মূর্খ অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই সমাজের মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সমাজের আবর্জ্জনা নারীজাতিকে যদি সৎ শিক্ষা না দাও, তবে সমাজের সে আবর্জ্জনা কথনই ঘুচিবে না। অধুনা স্ত্রী-শিক্ষার নামে হৃদয়ে একটা উৎকট ভীতির সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু সৎ শিক্ষার অভাবেই রমণীজাতির সে অধঃপতন। যে শিক্ষা-বলে ভারতে সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী, অপালা, ঘোষা, ক্ষণা, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি দেবীগণ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু সমাজে সেই প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন কর, দেখিবে সমাজে সুখের স্রোত বহিয়া যাইবে—সংসার অমৃতে পরিপূর্ণ হইবে।" কিন্তু এমন অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সত্ত্বেও কুলীন সিন্ধুসুন্দর সে কথা গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ তর্ক বিতর্কও নিবৃত্ত হইত না। কিন্তু কেবল বচসায় কোনও ফল নাই বুঝিয়া কমলা তাঁহার নবমবর্ষীয়া কন্যা কনকনলিনীকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্বামী সিন্ধুসুন্দরের অজ্ঞাতে সতীশকে অনুরোধ করিলেন। সতীশ কমলার প্রতিবাসীর পুত্র ব্রাহ্মণসন্তান, তবে নিকষ কুলীন নহেন, এ জন্য সিন্ধুসুন্দর কোন কার্য্যকলাপেও তাঁহার বাটী জল গ্রহণ করিতেন না। কমলা কিন্তু গোপনে সিন্ধুসুন্দরের হইয়া বিশিষ্টরূপে সে কার্য্যটা সমাধা করিয়া আসিতেন।

সতীশ এফ, এ, অবধি পড়িয়াছেন, সচ্চরিত্র, নম্রস্বভাব, পরোপকারী, দয়ালু। এই সকল অমূল্য গুণাবলীর জন্য গ্রামের সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু সিন্ধুসুন্দর কথনও তাঁহার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহেন নাই, কারণ সতীশ ইংরাজি-পড়া কলেজের ছোকরা, তাহার উপর সে কৌলীন্য প্রথাকে Don't care করিতে চাহে, তদুপরি তিনি কুলীনসন্তান নহেন, এই সকল অপরাধে তিনি সিন্ধুসুন্দরের প্রিয় ছিলেন না! তাহা হইলেও কমলার অনুরোধে তিনি প্রসন্নচিত্তে কনকনলিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

ক্রমে কনকনলিনী বালিকা জীবনের সীমা উত্তীর্ণা হইয়া কৈশোরের শেষ সীমা অধিকার করিল। ধীরে ধীরে যৌবন-সুলভ লক্ষণগুলি দেহে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কমলা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত স্বামীকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিলেন! সিন্ধুসুন্দরও যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে---তবে, তাঁহার পাল্‌টা ঘর মেলা দুর্ঘট, সুতরাং উপায় কি? যাই হউক পাত্রান্বেষণ হইতে লাগিল।

এখন কনক নলিনীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। এখন হইতে কনকনলিনীর হৃদয়ে কি

একটা বোঝা চাপিল। তাহার সে প্রফুল্লতা—সে নির্ম্মল সচ্ছ আনন্দ—সে শান্তি—আর কিছুই নাই। সে সর্ব্বদাই কি চিন্তা করে, কখনও নীরবে নির্জ্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক ফুলায়, বদনমণ্ডলে বিষাদের কাল ছায়া পড়িয়া যেন সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য লুণ্ঠন করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। কনকনলিনী এখন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কি ভাবে—কি করে—কি বলে কিছুই ঠিক্ নাই। কমলা কন্যার এবম্বিধ ভাব দর্শনে বড়ই ব্যথিত হইলেন। কন্যা পীড়িতা ভাবিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু পীড়ার কিছুতেই উপশম হইল না। চিন্তার অদম্য পেষণে কনকনলিনী ক্রমে বিষম জ্বরাক্রান্ত হইলেন। কমলা চিকিৎসার সুব্যবস্থা বা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটি করিলেন না, দেব দেবীর চরণে কতই মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই দেবতারা প্রসন্ন হইলেন না—ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসকগণ একে একে জবাব দিয়া গেলেন, দম্পতী-হৃদয়ে বিষম বেদনা চাপিল, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে স্নেহময়ী কন্যার জীবনে হতাশ্বাস হইয়াও আশায় বুক বাঁধিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময় সতীশ ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়াছেন। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একজন "এল্ এম্ এস্" হইবেন ইহা সকলেরই বিশ্বাস। সতীশ আপাততঃ স্বদেশে বসিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিবার বাসনায় আবশ্যক ঔষধ পত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া শুনিলেন কনকনলিনী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সংবাদ শ্রবণ মাত্রে তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, হৃদয় শতধা হইয়া বিদীর্ণ হইতে চাহিল। কে জানে প্রতিবাসী কুলীন-কুমারীর জন্য কেন তাঁহার এ অবস্থা!!

তিনি অমিতবলে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া কতকগুলি ঔষধাদি সঙ্গে লইয়া সিন্ধুসুন্দরের বাটী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলার নির্ব্বাণোন্মুখী আশা আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন "বাবা! আমার কনক বুঝি ফাঁকি দেয়, দেখ যদি তুমি তাকে রাখ্‌তে পার।" সতীশ ছল ছল নেত্রে রোগিণীর পার্শ্বে বসিলেন, ধীরে ধীরে রোগিণীর হস্তখানি লইয়া নাড়ী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার সমগ্র হৃদয় মন্থন করিয়া যেন কি একটা তাড়িত স্রোত বহিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মাসী মা! এখনও আশা আছে, দেখি ভগবান্ কি করেন?" এই বলিয়া তিনি একটু ঔষধ লইয়া কনককে সেবন করাইলেন। কনক সেটুকু গিলিয়া নিমীলিত নেত্রে বলিল "কে তুমি?"

সতীশ। আমি সতীশ।

কনক উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে উন্মত্তার ন্যায় বলিয়া উঠিল "সতীশ! আমার সতীশ!

আমার ইষ্টদেবতা সতীশ! তুমি কেন কুলীন্-সন্তান হইলে না সতীশ!" সতীশের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। সিন্ধুসুন্দর ভাবিলেন রোগিণী প্রলাপ বকিতেছে। কথা কয়টি তাড়িত-প্রবাহে কমলার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিল। অমনি তিনি স্নেহের পুতলী কনকের ব্যাধির কারণ স্থির করিয়া মনে মনে বলিলেন "মা যদি এ যাত্রায় শয্যা ছাড়িয়া উঠ, বল্লালী প্রথার মুখে আগুন দিয়ে তোমার সতীশ তোমারে দিব, সতীশ আমার কনকেরই যোগ্য।"

জানি না মাতার এই আশ্বাস-বাণী নীরবে তাহার হৃদয়ে পশিয়াছিল কি না, সে কিন্তু সতীশের চিকিৎসায় দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

ক্রমে আরও ছয় মাস কাটিল, এখন কনক বেশ সারিয়া উঠিয়াছে।

একদা প্রসঙ্গক্রমে কমলা স্বামীকে বলিলেন "সতীশ আমার কনকের প্রাণ দান করিয়াছে, সতীশের কল্যাণেই আমরা কনককে পাইয়াছি, তাহার জন্য তাহাকে কি কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়?"

সিন্ধু। উচিত সত্য, কিন্তু আমাদের নিকট হইতে সে কিছু লইবে বলিয়া ত বোধ হয় না। তবে আমি পূর্ব্বে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতাম না, এখন তার বাড়ী যাই, তার সঙ্গে কথা কই।

কমলা। ইহাই যে তাহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার, এরূপ মনে করিও না। তুমি কুলীন, তুমিই আছ, তার জন্য তার কিছু আসে যায় না। আর যে কৌলীন্য-প্রথায় সপত্নী-যন্ত্রণা, অনূঢ়া-যন্ত্রণা, বৈধব্য-যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, সে কৌলীন্য-প্রথার আবার মূল্য কি?

সিন্ধুসুন্দর গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন "কৌলীন্যের আবার মূল্য নাই! তুমি মনে রেখ সিন্ধুসুন্দরের ন্যায় কুলীন-সন্তান তোমাকে লইয়া সংসার করিতেছে।

কমলা। সে আমার বাপের বিষয় পেয়েছ ব'লে, তা না হলে আর ২৪ জনের যে দশা করেছ, আমারও তাই করতে।

সিন্ধুসুন্দর আপন কুল-গৌরবে ফুলিয়া উঠিয়া কহিলেন "মুখ সামলে কথা কও, এখন ইচ্ছা করলে কত গণ্ডা আনতে পারি। এই কুল দেখেই তোমার বাপ ঘুরে পড়েছিলেন।"

বিবাদ ক্রমেই বাধে দেখিয়া কমলা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "ধান ভান্‌তে শিবের গান কেন? এখন সতীশের পুরস্কার ঠিক্ কর।"

সিন্ধুসুন্দর অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন, বলিলেন "তুমি কি দিতে চাও?"

কমলা। কনকের প্রাণদাতা সতীশের হাতেই আমি কনককে দিতে চাই, তাহা হইলেই তার উপযুক্ত পুরস্কার হয়।

সিন্ধুসুন্দর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কমলাকে এক চপোটাঘাত করিয়া কহিলেন "যত বড় মুখ, তত বড় কথা? শ্রোত্রিয়-ঘরে নিকষ কুলীনের কন্যা! তার চেয়ে ছুঁড়িকে বিষ দিয়ে মারা ভাল।"

"তোমার কুল নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও,

আমার মনে যা আছে কোর্‌ব। কৌলীন্য-অনলে দহিবার জন্য বিধাতা এমন সুন্দর সামগ্রীটি সৃষ্টি করেন নাই”।

আরও ছয় মাস অতীত হইল, কমলা আর কন্যার বিবাহের জন্য স্বামীকে উত্ত্যক্ত করেন না। কনকের মুখেও কোন বিষাদের চিহ্ন নাই। কনক যেন এখন কোন অমৃতময় রাজ্যের আনন্দের পুতুল। কিন্তু সিন্ধুসুন্দর নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কি জানি গৃহিণী কখন কি ঘটান, শেষে কি নির্ম্মল “কুলে পোকা” ধরিবে!! এই চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি তাঁহার একটি পাল্‌টা ঘরে কন্যার যোগ্য না হোক, তাঁহার যোগ্য একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রটির আরও তেরটি সংসার আছে, বয়ঃক্রমে ষষ্টির নিকট। তিনি কুলীনদিগের বিবাহ প্রথা অবগত ছিলেন। কন্যার রূপ বয়স যেরূপ হউক, তাহাতে কি? বিশেষতঃ কন্যা দেখাটা তিনি তত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না। কুল ও অর্থের দিকেই তাঁহার সমধিক টান। যথাসময়ে লোলচর্ম্ম, ক্ষীণদৃষ্টি ও চলৎ-শক্তিহীন বর-বেশী বৃদ্ধ আসিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। বিবাহ-মণ্ডপ পূর্ব্ব হইতে বাহিরে ঠিক্ ছিল, অন্তঃপুর-বাসিনী কমলা তাহার সংবাদ পান নাই। সিন্ধুসুন্দর ছলক্রমে কনককে বাহিরে লইয়া আসিলেন—কনক আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, দেখিলেন তাঁহাকে পাত্রস্থা করিবার আয়োজন হইয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে “মাগো আমার সর্ব্বনাশ হয়” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে আকুল বেদনা-মাখা কণ্ঠস্বর কমলার হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া কনককে বুকে টানিয়া লইয়া ক্রুদ্ধা বাঘিনীর ন্যায় স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন “বাছার সর্ব্বনাশের যোগাড় করিয়াছ কেন? পঁচিশটি রমণীর মাথা খাইয়াও কি আশ মিটে নাই? তোমার চেয়ে পশুরা ভাল, তাহারাও আপনার শাবককে রক্ষা করে। ঐ ঘাটের মড়া বুড়মিন্সে কি আমার কনকের যোগ্য? আমি আমার কনককে সতীশের হস্তে আজ ছয় মাস হল সমর্পণ করেছি, ওতে তোমার অধিকার কি? সতীশই উহার একমাত্র অধিকারী।” বর ও তৎপক্ষীয়-গণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন “ব্যাপার কি বাঁড়ুয্যে মশায়”—বাঁড়ুয্যে মহাশয় ওরফে সিন্ধুসুন্দর—কমলার হাত হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া সকলকে বলিলেন “ও কিছু নয়, ওঁর কিছু বায়ু-প্রবল ধাত, উনি ঐ রকম আবল তাবল বকেন” বলিতে বলিতে তিনি কমলাকে সজোরে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আঘাতে ও আতঙ্কে কমলা মূর্চ্ছিতা হইলেন, সিন্ধুসুন্দর কনককে লইয়া পাত্রস্থা করিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিল—কনক অনন্যো-পায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই সভায় একটি যুবক প্রবেশ করিলেন। যুবকের আরক্ত

নয়ন, উন্মত্ত অবস্থা, হস্তে ছোরা। যুবককে দেখিয়া ক্ষণকাল সকলে স্তম্ভিত হইলেন। সেই অবসরে কনক ক্ষিপ্রগতিতে যুবকের হস্তের ছোরা লইয়া “যেন জন্মান্তরে তোমার দাসী হইতে পাই” বলিতে বলিতে আপনার গলদেশে সেই ছোরাখানি বসাইয়া দিল—প্রফুল্লিত কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল! যুবক কাতর প্রাণে বলিয়া উঠিলেন “হায়! কৌলীন্য-প্রথা! হায় কুলীনকুমারী!” যুবকও সে বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, তাঁহার মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। এ যুবক সতীশচন্দ্র, কমলা স্বামীর অজ্ঞাতে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কনককে এই সতীশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

কুলবধূ।

নবীনা ও প্রাচীনা।

সে কালে নব-পরিণীতা হিন্দু কুল-বধূর প্রতি উপদেশ যে পথে প্রবাহিত হইত, কালের গতিতে আজ কাল তাহা হইতে ভিন্ন পথে ইহাকে প্রবাহিত করিবার আবশ্যকতা বোধ হয়। সামা-জিক অবস্থা অনুসারে উপদেশের গতি নির্দ্দিষ্ট হয়—সুতরাং এই অলক্ষ্য অথচ ভয়ানক পরিবর্ত্তনের দিনে যে তাহার ইদানীন্তন গতি কিয়ৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। সেকালকার হিন্দু কুলবধূ যাহা ছিল, আজ কাল তাহা নাই, সুতরাং সেকালকার উপদেশমালায় আজকাল-কার হিন্দু কুলবধূর মতিগতি পরিচালিত হওয়া অসম্ভব।

সেকালের সেই সাত হাত ঘোমটা-টানা সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা বধূ আর আজ কাজকর্ম্মের অবসরে শ্বশুরালয়ে বসিয়া বাড়ীর লাউগাছটীর জন্য অশ্রু-আবিল-লোচনা হইয়া থাকে না, স্বামীর নিকটে যাইতে সঙ্কোচে ভয়ে এতটুকু হইয়া যায় না, স্বামীর সাদর সম্ভাষণ বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া ঘরের অপর পার্শ্বে বসিয়া সূক্ষ্মস্বরে মাতার জন্য রোদন করিতে থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মম পতি এবং ততোধিক নির্ম্মম ননদ ও শ্বশ্রূ-শ্বশুরের বিষময় গালিবর্ষণ অথবা প্রহারও সহ্য করে না। আজিকার নববধূ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে গঠিত। নববধূ আজ ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরী, অন্ততঃ বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলিতে পারদর্শিনী। যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয়ে প্রেম-

প্রবৃত্তি সদ্যোজাগ্রত হইয়াছে, তাহার প্রথম উচ্ছ্বাসে সে সমগ্র জীবন একটী নবাগত জীবের চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছে; বয়ঃসমুচিত "সেণ্টিমেণ্টের" আধিক্যে নভেলের প্রভাব মিলিয়া বঙ্গ-সংসারে রোমান্সের মূর্ত্তিস্বরূপে নব-পরিণীতা বধূটীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—রমণী স্বামী বই আর কিছুই জানে না। স্বপনে, ভ্রমণে, রন্ধনে, ভক্ষণে, পঠনে সর্ব্বকালে রমণীর একমাত্র দেবতা স্বামী, সর্ব্বকালের চিন্তার বিষয় স্বামীর সম্ভাষণ — স্বামীর সোহাগ।

বস্তুতঃ আজকালকার হিন্দু দম্পতীর পরস্পর আকর্ষণ এত বাড়িয়াছে যে এই বাঙ্গালী দম্পতী যে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সতত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকিত, ইহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। আমি বলিতে চাহি না যে সে কালে প্রেম ছিলনা, অথবা সকল দম্পতীই কলহ-পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু পঞ্চাশৎ বর্ষের কিঞ্চিদূর্দ্ধকাল পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে যে প্রেম ছিল, তাহা আজকালকার প্রেম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেকালের পত্নী পতিকে আপনার অপেক্ষা বহু উচ্চ বিবেচনা করিতেন, স্বামীও তাহাই জানিতেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে প্রেম জন্মাইত, তাহা ভয় ও ভক্তি-মিশ্রিত —আজকালকার মত সমানে সমানে প্রেম নয়। সেকালকার প্রেম দলনীর প্রেম, শৈবলিনীর নহে। যে প্রেম শৈবলিনী চন্দ্রশেখরে বৃথা অন্বেষণ করিয়াছিল, সে প্রেম প্রতাপের ভালবাসা নহে, মিরকাসিমের দলনীর প্রতি অনুগ্রহ। সে কালের পত্নী ইহা অপেক্ষা পতির নিকট অধিক আশা করিত না। বস্তুতঃ বঙ্কিম চন্দ্রের চন্দ্রশেখর মিরকাসিমের সমসাময়িক সমাজের চিত্র নহে, শতবর্ষ পূর্ব্বের কথা।

কিন্তু আজকালকার বঙ্গ কুলবধূ স্বামিগত প্রাণ—"রোমান্স" "সেণ্টিমেণ্ট" এবং প্রকৃত ভালবাসার অপূর্ব্ব সম্মিলন। সারা জগৎটা তাহাদের কাছে কিছুই নহে, পরস্পরের সাহচর্য্যেই তাহাদিগের অনন্ত সুখ পর্য্যবসিত, শয়নাগারই তাহাদের

"—দুজনার দেশ,
নিখিলের সব শেষ—

পত্নী পতিগত-প্রাণা, পতি পত্নীগত-প্রাণ এবং বলিতে লজ্জা হয়, প্রায়ই চরণাশ্রিত!

এই প্রকার "সৃষ্টিছাড়া" ভালবাসা যাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র, সে প্রকার দম্পতীকে সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক চার্লস্ ল্যাম্ব সাহেব "too loving" অতিরিক্ত অনুরাগী বলিয়াছেন। প্রেমের আবেশে দুজনার মধ্যে একটা জগতই হউক, স্বর্গই হউক, কিছু সৃষ্টি করিয়া সমস্ত বহির্জগৎকে বাহিরে রাখা প্রেমের পরাকাষ্ঠা সন্দেহ নাই এবং তাহাই প্রেমিক জীবনের পূর্ণ পরিণতি। মানব-হৃদয়ের একটী মহৎ প্রবৃত্তি এতদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত হইলেও অপরাপর কর্ত্তব্য-নিচয় ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এই প্রবৃত্তির তৃপ্তিসম্পাদনে মানব-

চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নাই। মানব কেবল প্রেমিক নহে, তাহার জীবন নানাবিধ কর্ত্তব্যের সমষ্টি। প্রতি রমণীর প্রেমিকা হওয়া ব্যতিরেকে অপরাপর নানাবিধ কর্ত্তব্য আছে। প্রথমতঃ পত্নীর সম্পূর্ণ কার্য্য পতিকে ভালবাসিলেই পূর্ণ হইল না। পতির তুষ্টি সম্পাদন, পতির ধর্ম্মে সহায়তা করা, পতির বিপদে সম্পদে বন্ধুবৎ পরামর্শ প্রদান করা—সকলগুলিই পত্নীর কার্য্য, কেবল তাঁহাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিলেই এ সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইল না। পত্নীর উচিত পতিকে কর্ত্তব্য সাধনে সাহায্য করা, কিন্তু হয়তো প্রেমিকা নিজের তুষ্টির জন্য তাঁহার পতিকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে চাহেন, তাহার কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহ শ্লথ করিয়া দেন। পত্নীত্বের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্যক্ সাধন করিতে হইলে এই সুখস্পৃহাটুকু পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পতিপ্রেম দ্বারা পত্নীর কর্ত্তব্য সাধনের বিস্তর সহায়তা হইতে পারে, সুতরাং আজকালকার প্রেমিকা হয়তো পতির প্রতি কোনও কর্ত্তব্যে বিরতা নহেন। কিন্তু ইহাতে শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবর ননন্দা প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের বিস্তর ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। প্রতিবেশিগণের প্রতিও প্রত্যেক রমণীর কর্ত্তব্য আছে এবং সমগ্র মানবসমাজের প্রতিও তাঁহার এক নির্দ্দিষ্ট প্রকার ব্যবহার করা উচিত। পতির প্রতি ঔপন্যাসিক প্রেম এতাদৃশ কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে ততটা অনুকূল নহে। মানবসমাজে বাস করিতে হইলে এই সমুদয় কর্ত্তব্যসাধনে কোনও ক্রমে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু অতি-প্রেমিকা এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীনা।

এই সমুদয় উপদেশ সেকালেও যেমন প্রযোজ্য ছিল, আজও সেই প্রকার প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু আজকালকার বধূ সাধারণতঃ অতিশয় পত্যনুরাগিণী এবং পতির খাতিরে শ্বশ্রূশ্বশুর প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনেও তিনি বিশেষ পশ্চাৎপদ নহেন। সুতরাং আজকাল এই সকল উপদেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিলেও চলে। এখন রমণীর চরিত্র বুঝিয়া উপদেশকে ভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত করা আবশ্যক।

আজকালকার নববধূ অপরাপর কর্ত্তব্যে যেমনই পারদর্শিনী হউন না কেন, স্বীয় পরিবারের বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে নিতান্ত উদাসীনা। এবিষয়ে তাঁহাদিগের ব্যবহার বিস্তর মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী ও অতিথি তাঁহার সহানুভূতি ও যত্নের পাত্র, কিন্তু ইহাদিগের প্রতি বধূর বিরাগ না থাকিলেও বিশেষ অনুরাগ নাই। এ বিষয়ে আজকালকার পুরুষদিগের দোষ রমণীগণ অপেক্ষা কম নহে। পল্লিবাসীদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও সহানুভূতি অভাবে সমাজবন্ধন দিন দিন শ্লথ হইয়া যাইতেছে, ইহা বড়ই শোচনীয়। এক্ষণে ইহার প্রতীকার করিবার উপায় বাল্যাবধি পুরুষ ও রমণীদিগের পরস্পরের সহানুভূতির

উদ্রেক করা। ছেলে পিলেরা একত্র খেলা ধূলা করিলে তদবধি তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সঞ্চিত হয় এবং তাহা রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিলে বিনষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা আজকাল সহানুভূতি উৎপাদনের এই সুন্দর যন্ত্রটিকে বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছি। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বালবন্ধুদিগের সহিত সহানুভূতি যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছুই করিতেছি না। সে কালের ছেলেপিলেরা যেমন মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিত, আজকার ছেলেপিলেরা তাহা করে না; সেকালে যেমন নববধূরা পিত্রালয়ে যাইলে সখীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৌড়াইত, এখন সেরূপ যায় না; আজকালকার বধূদিগের হৃদয় হইতে স্বামীর প্রেম ও সাংসারিক আকর্ষণ ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ সহানুভূতি দূরীভূত হইয়াছে।

সাংসারিক আকর্ষণের মধ্যে নববধূর পতিপ্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং পতিগৃহের প্রতি পিতৃগৃহ অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ। এটুকু ভাল সন্দেহ নাই। পিতৃগৃহ তাহার আপনার গৃহ নহে, পতিগৃহেই সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সুতরাং পতিগৃহের প্রতি তাহার অধিক আকর্ষণ রাখা ও পতির সংসারের উন্নতি সাধনকল্পে যত্ন করা প্রত্যেক বুদ্ধিমতী রমণীর কর্ত্তব্য এবং ইহা পতির সুখসম্বর্দ্ধনের অঙ্গীভূত। কিন্তু পতিগৃহ স্বগৃহ হইলেও পিতা রমণীর পর নহেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে বঙ্গসমাজে শ্বশুর জামাতার মধ্যে এক প্রকার অযথা সাধারণ বৈরীভাব সঞ্জাত হইতেছে। শ্বশুর জামাতাকে অথবা জামাতা শ্বশুরকে সম্পূর্ণ আপনার জ্ঞান করিতে পারেন না। কন্যার বিবাহ অবধি শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে এই অবাঞ্ছনীয় ভাবের পুষ্টি হইতে থাকে। ইহার কারণ নানাবিধ ও মূলস্পর্শী, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা অনুসন্ধান করিবার অবকাশ নাই। এই অনুচিত অসদ্ভাব কোনও প্রকারে বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রায়ই এতাদৃশ ভাবের অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

সাধারণতঃ সেকালে নববধূ পতিগৃহের প্রতি কোনও দৃষ্টি না রাখিয়া পিতার পক্ষাবলম্বিনী হইতেন এবং পতিগৃহের সর্ব্বনাশ করিয়াও পিতৃগৃহের সৌষ্ঠববর্দ্ধনে যত্নশীল হইতেন। আজকালকার বধূ এই প্রকার সমাজনাশক পদ্ধতি অবলম্বন করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের পদ্ধতিও সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। এখন বধূ প্রায়ই পিতৃ-সম্পর্কিত ব্যক্তির প্রতি একান্ত উদাসীনা। পিতা ও পতির সংঘর্ষে বধূ সতত স্বামীর পক্ষাবলম্বন করেন এবং পিতার উপর অযথা রুষ্ট হন। যদি পিতা একটিবার স্বামীর প্রতি সম্মান অথবা আদর প্রদর্শনে অজ্ঞাতসারে একটুকু ত্রুটি করেন, তবে কন্যা পিতার প্রতি আজন্ম অপরিশোধ্য ঋণ ভুলিয়া যান। স্থানে স্থানে এ প্রকারও দেখা যায় যে পিতার বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগে কন্যা স্বামীর

পক্ষ অবলম্বন করেন। পদে পদে কন্যা শ্বশ্রূ শ্বশুর অথবা স্বামীর প্রতি ব্যবহারে পিতার দোষ অন্বেষণ করেন এবং অল্পেই পিতার উপর রুষ্ট হন। এতটা না হইলেও সুবিধা পাইলে কন্যা পিতার নিকট হইতে অজস্র অর্থ শোষণ করিয়া পতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। আজকালকার জামাতৃগণ শ্বশুরকে নিজেদের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী বিবেচনা করেন এবং সময়ে অসময়ে শ্বশুরের অবস্থার প্রতি তিল মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে অবিরত-ধারে অর্থ শোষণের চেষ্টা করেন। কোনও কারণে শ্বশুরের তাহাতে ত্রুটি হইলে জামাতা বাবাজি অগ্নিশর্ম্মা হইতে বিস্মৃত হন না, কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি রুষ্ট হন। বেচারা পিতা কন্যার শত উপকার করিয়া —জামাতার মন রক্ষার শত চেষ্টা করিয়াও উভয়ের বিরাগভাজন হন।

কন্যার পিতার প্রতি এবম্বিধ ব্যবহার যে একান্ত গর্হণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্যনুরাগিণী হইলেও পিতার প্রতি ভক্তিমতী হওয়া রমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব এবং উচিত। পিতা ও পতির পরস্পর বিরোধে রমণীর কোনও পক্ষ অবলম্বন করা একান্ত গর্হিত। কন্যা উভয় পক্ষের অসদ্ভাব যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র থাকিবেন এবং উভয় পক্ষের অন্যায় ও ত্রুটি নিজের ব্যবহার দ্বারা সারিয়া লইবেন, আদর্শ কুলবধূর ইহাই কার্য্য।

এ বিষয়ে আমাদিগের সমাজের একটি মহৎ দোষ এই যে কোনও রমণী পতির প্রতি পিতার ব্যবহারের কোনও দোষে সেই পিতার প্রতি রুষ্ট হইলে শ্বশ্রূ শ্বশুর অথবা তৎপক্ষীয় অপর কোনও ব্যক্তি তাহার অসন্তুষ্টি যুক্তি দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করেন না, প্রত্যুতঃ তাঁহারা অনুমোদন বা প্রশ্রয় দ্বারা এই অতি গর্হণীয় প্রবৃত্তি বধূহৃদয়ে পরিপুষ্ট করেন। এতাদৃশ অনৈসর্গিক সন্তুষ্টি সমাজের পক্ষে যে নিতান্ত হানিকর, তাহা বোধ করি বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীনরেশ।

ভারতের অনাথা ও বিধবাদিগের জীবিকার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)।

দ্বিতীয়তঃ সূত্রী কাটা—সূতা কাটা যেমন লাভকর ব্যবসায়, সূত্রী কাটাও তদ্রূপ লাভকর। অনাথাদের পক্ষে এইটীও বেশ সুবিধাজনক ব্যবসায়। ইহাতেও অধিক মূলধনের আবশ্যক করে না, কাট্‌তিও বেশ আছে—লাভও

যথেষ্ট, পরিশ্রমও নাই। বিবেচনা করুন, একসের কোষ্টা বা পাট খরিদ করিলে, তাহার মূল্য এক আনা কি দেড় আনা হইবে, কিন্তু একসের সূত্রীর বা দড়ীর দাম, অন্যূন তিন আনা। সুতরাং প্রতি সেরে দুই আনা কি অন্ততঃ দেড় আনা লাভ থাকে। একজনে রোজ অন্যূন তিন সের সূত্রী কাটিতে পারে, সুতরাং প্রত্যহ প্রতি জনে পাঁচ আনা কি ছয় আনা লাভ করিতে সক্ষম। ন্যূনকল্পে রোজ চারি আনা লাভ হইবেই হইবে। একজন মজুরে সারাদিন শোণিত-শোষক পরিশ্রম করিয়াও চারি আনার অধিক রোজগার করিতে পারে না, সুতরাং এ ব্যবসায়টী সর্ব্বাংশে উত্তম বলিয়া বিবেচ্য। বিধবা অনাথাগণ সূত্রী কাটা ব্যবসায় দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ সেলাই কাজ—আজকাল দেশে বাবুগিরীর বড়ই প্রাদুর্ভাব। পিরাণ, কোট, ছাতা ছাড়া একটী লোকও নাই। অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পর্য্যন্ত সকলের অঙ্গেই পিরাণ আছে। এজন্য সেলাই কার্য্যের এখন বিশেষ সমাদর; ইহাতে দু-দশ পয়সা লাভও আছে। যদি এ দেশস্থ বিধবা ও অনাথিনীগণ এই সেলাই কার্য্যে নিপুণা হন, তবে বিশেষ লাভবতী হইতে পারেন। তাঁহাদের জীবিকার জন্য আর পরের মুখাপেক্ষিণী হইতে হয় না। যদিও আজকাল কলের সেলাই দ্বারা, দর্জিদের ভাত মারিবার উদ্যোগ করা হইয়াছে, তথাপি তাহাতে লাভের হানি হয় নাই, এবং দরজিদেরও আদর কমে নাই ইহা নিশ্চয় কথা।

চতুর্থতঃ উলের কাজ—ইংরেজ রাজত্বে সাহেবী অনুকরণে আজ কাল এ দেশে উলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। মোজা, টুপী, কম্ফর্টর, ফুল, পাখা, চেইন ইত্যাদি অনেকানেক জিনিস উল দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহাতে লোকের নিতান্ত আগ্রহও আছে। বাবুদের ইহার প্রতি বিশেষ আদর। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ভারতের অনাথা ও বিধবাগণ এই উল সূতার কাজ শিক্ষা করিলে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। অনেকেই এই কার্য্য দ্বারা বিশেষ লাভবতী হইতেছেন।

পঞ্চমতঃ চুলের কাজ—এদেশীয় অনেক রমণী কেশরজ্জু (চুণ্টি বা চুলের দড়ী) নির্ম্মাণ করতঃ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এক এক গাছি ভাল চুণ্টী আট আনা, বার আনা ও এক টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ সকল চুণ্টীতে অন্যূন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ৪০।৫০।৬০ গাছি সূক্ষ্মসূত্র থাকে। আজ কাল নূতন সভ্যতার সহিত চুল বাঁধিবারও বিশেষ আঁটা আঁটি দৃষ্ট হইতেছে। ভদ্র-লোকের ও অপর সাধারণ লোকের মেয়েরা সর্ব্বদা চুণ্টী ক্রয় করিয়া থাকে। যদি এদেশীয় বিধবা ও অনাথা রমণীগণ উক্ত চুলের কাজ শিক্ষা করেন, তবে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ মাটীতে বা পাথরে ছাঁচ কাটা—মাটীর বা পাথরের ছাঁচ তুলিবার প্রথা এ দেশে প্রচলিত। উক্ত ছাঁচ দ্বারা ক্ষীরের ও নারিকেলের নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সকল ছাঁচ সকলেই ক্রয় করে, তাহাতে অনেক বিধবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ভারতীয় দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা রমণীগণ এই কার্য্যে শিক্ষিতা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সপ্তমতঃ চিত্রকার্য্য—অনেকানেক ব্যক্তি হিন্দুদেবদেবীর এবং বড় বড় লোকের ছবি আঁকিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। চিত্রবিদ্যায় লোকের আদর আছে। ছবি আঁকিয়া লোকের মন যেরূপ সুখী করা যায়, গীত, বাদ্য ব্যতীত, আর কিছুতেই তদ্রূপ করা যায় না। চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী কোন কোন চিত্রকর যেরূপ দেখে, অবিকল তদ্রূপ ছবি আঁকিতে পারে। কোন ধনী বা কোন জমীদারের ভাল একখানা ছবি অঙ্কিত করিতে পারিলেই অনেক টাকার কাজ হয়। চিত্রবিদ্যায় রমণীগণ পুরুষ অপেক্ষা কোনও অংশে অনুপযুক্তা নহেন। চিত্রকরের চরিত্র গম্ভীর হওয়া আবশ্যক। চঞ্চলতা চিত্রাঙ্কনের প্রধান প্রতিবন্ধক। রমণীগণ স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতিসম্পন্না। এজন্য চিত্রবিদ্যায় রমণীদিগের পটুতা শীঘ্রই জন্মিতে পারে। ভারতের অনাথা রমণীগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেক সুবিধা হইবার কথা।

অষ্টমতঃ বেঁত, বেতি ও বাঁশের কাজ—এ দেশে বেঁত বেতি ও বাঁশ নির্ম্মিত অনেক জিনিস এদেশীয়দের নিত্য ব্যবহার্য্য। পাখা, ডালা, সুর্প প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস বাঁশের বেতি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এ সকল কার্য্য অনায়াসে রমণীগণ শিক্ষা করিতে পারেন এবং তাহাদের কাটতিও এদেশে বিশেষ আছে। রমণীগণ এ ব্যবসা দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইতে পারেন। বেঁত দ্বারা যে সকল "পেটেরা" পেটিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা সকলেই যত্নপূর্ব্বক ক্রয় করে, মূল্য কম নহে। অতএব ইহাতে লাভও হইবার সম্ভাবনা।

নবমতঃ সাদা কাপড়ে ফুল তোলা—সাদা কাপড়ের উপর বুটা তুলিয়া ঢাকার অনেক লোক লাভবান্ হইয়াছেন ও হইতেছেন। অল্প মূল্যে কাপড় খরিদ করিয়া তাহাতে ফুল (বুটা) তুলিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। রমণীগণ এ ব্যবসা দ্বারাও অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

শ্রীঅমৃত লাল নাথ।

পাগলের মায়া।

বৈশাখ মাস—বেলা দ্বিপ্রহর—সূর্য্যদেব চারিদিকে অনল বৃষ্টি করিতেছেন, পক্ষিগণ যে যার বাসায় চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছে, পথে কেবল দু একটী লোক বিশেষ কার্য্যানুরোধে গমনাগমন করিতেছে—এমন সময় ভাগলপুরের বাজারের নিকট একটী অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার গৃহ ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাজারের লোক ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত গৃহের চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইল। এমন সময় দেখা গেল একজন সুন্দর যুবা-পুরুষ সেই জ্বলন্ত গৃহের সম্মুখে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছে। আগন্তুক লোকেরা দেখিয়া অবাক্—কেহ কেহ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নৃত্য করিতেছ কেন?" যুবা কেবল আপন মনেই নাচিতেছে—কিছুই উত্তর করে না। অনেক পীড়া-পীড়ির পর বলিল, "দিনত শেষ হুয়া, হাম লাল ঘোঁড়া ছুটায়া।"

পুলিস আসিয়া যুবাকে গ্রেপ্তার করিল এবং যথানিয়মে থানায় লইয়া গেল। পর-দিবস জেলার ডেপুটি মাজেষ্ট্রেটের এজলাসে ঐ ব্যক্তির বিচারের দিন, সে ও বৃদ্ধা উভয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই বৃদ্ধার ঘরে আগুন দিয়াছ?" আসামী নিরুত্তর—অনেকবার প্রশ্নের পর, সে ঈষৎ হাসিল এবং কহিল, "ক্যা মজাদার! হাম্ লাল ঘোঁড়া ছুটায়া।" হাকিম এই প্রকার উত্তর শুনিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত—তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া যুবার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার ভাব ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এ প্রকৃতিস্থ নহে, নিশ্চয়ই ইহার মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।" পুলিস্ ইন্স্পেক্টর হরিহর বাবু কহিলেন, "আমি ইঁহাকে দু একবার দেখিয়া থাকিব, ইনি আমাদিগের জজ আদালতের সেরেস্তাদার বলিয়া বোধ হইতেছে।" হাকিম পুনরায় যুবার দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—দেখিলেন তাহার চক্ষুদ্বয় দিয়া অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে। হাকিম তখন কহিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে—ইহাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠান যায়।" তৎপরে হাকিম একটী দিন ফেলিয়া দিয়া এজলাস ছাড়িয়া আপনার খাস কামরায় উঠিয়া গেলেন।

পুনরায় বিচারের দিন উপস্থিত হইল, যুবা আদালতে নীত হইল এবং ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষায় পাগল বলিয়া সাব্যস্ত হইল। হাকিম তাহাকে পাগলা গারোদে

পাঠাইলেন এবং পুলিসের ইন্স্পেক্টরকে তাহার আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিবার জন্য অনুমতি করিলেন।

পাগলের নাম হরিধন বসু, পিতার নাম দীনেশচন্দ্র বসু, নিবাস হোগোলকুড়ীয়া—কলিকাতা। হরিধন বিশেষ কার্য্যক্ষম ও সচ্চরিত্র থাকায় জেলার জজ সাহেব তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। হরি-ধনের অকস্মাৎ এরূপ দৈহিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বয়ং হাঁসপাতালে তাহাকে দেখিতে গেলেন। হরিধন সাহেবকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে আপন মনে গারোদের ভিতর পাইচালি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাহেব তাহাকে তিন চারি বার ডাকিলেন, উত্তর না পাইয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি আদা-লতে আসিয়া আমলাদিগের নিকট পাগলের বাটীর ঠিকানা লইয়া স্বহস্তে তাহার পিতার নামে এক টেলিগ্রামের ফারম্ লিখিয়া দিয়া খরচ সমেত একজন কর্ম্মচারীকে টেলিগ্রাফ্ আফিসে পাঠাইলেন।

টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র দীনেশ বাবু ভাগলপুর রওনা হইলেন। তথায় জামিনে পুত্রকে খালাস করিয়া কলিকাতায় আনি-লেন। পুত্র বাটীতে আসিলে জননী তাহার সেই মলিন মুখচন্দ্রমা ও কঙ্কালাবশিষ্ট দেহখানি দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে কে যেন গুরুতর আঘাত করিল, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইল, তিনি তখন বিকৃত স্বরে ডাকিলেন, "হরিধন, বাবা হরিধন!" হরিধন নীরব—মুখে কথাটী নাই। হরি-ধনের মাতা নলিনী পাগলিনীর ন্যায় তাহার হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহি-লেন, "বাবা হরি! কথা কস্‌না কেন বাবা—আমার প্রাণ যে কেমন কর্‌ছে, তুই কথা কহিলে আমার প্রাণ জুড়াবে।" পাগল পূর্ব্ববৎ নীরব—জননী রেকাবে নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য সাজাইয়া পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু সকল প্রয়াসই বিফল হইল। জননী তখন কপালে করাঘাত করিয়া "আমার সর্ব্ব-নাশ হইয়াছে, আমার কপাল পুড়িয়াছে" এই বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থিত এক কক্ষ মধ্যে হরিধনের স্ত্রী সরলা দুই বৎসরের একমাত্র পুত্রটীকে কোলে লইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—অন্ত-স্তলোত্থিত অগ্নিশিখায় তাহার হৃৎপিণ্ড গলিয়া গলিয়া যেন চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া পড়িতেছে এবং পরিধেয় আর্দ্র করিতেছে। নির্জ্জনে সরলার দুঃখ-পয়োধি উছলিয়া উঠিতেছে—কে আর দেখিবে? যিনি দেখিবার তিনিই দেখিতেছেন!

হরিধনের খুড়ীমা আসিয়া বধূমাতাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "বাছা হরিধন! বৌমা আসিয়াছেন, কি বলিবে বল—তোমার প্রাণের পুত্র সুশীল তোমার যাইবার পর 'বাবা, বাবা' বলিয়া ডাকে,

আর তোমাকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। তুমি একবার উহাকে কোলে লইবে না?” হরিধন নীরব—মুখে বাক্য নাই, কিন্তু সে একদৃষ্টে ছেলেটীর দিকে তাকাইতে লাগিল—কে যেন তাহার হস্তখানি ধরিয়া বালকটীর অঙ্গে রাখিল। বালকটী তাহার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল এবং সর্ব্বদুঃখাপহারক শিশুহাস্য হাসিয়া ঐ স্থানটীকে সুখময় করিল। পাগল একবার মৃদুহাস্য হাসিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বালকটীর দিকে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সরলা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—স্বামী কেন আমার এরূপ হইলেন—তিনি কখনত আমার প্রতি নির্দ্দয় নহেন—তিনি যখনই বাটীতে আসেন, অগ্রে মায়ের পদধূলি লইয়া আমার সহিত হাসিয়া কথা না কহিয়া কোন কাজই করেন না। আজ মা জিজ্ঞাসা করিলে কথা কন না—বাবা জিজ্ঞাসা করিলে কথা কন না! খুড়ী মা জিজ্ঞাসা করিলে কথা কন না! বাড়ী শুদ্ধ সকলে তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত ও ব্যস্ত—মা উচ্চৈঃস্বরে ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহার কর্ণপাত নাই। হা জগদীশ্বর! এমন কেন হইল, আমিত কখনও কাহার মন্দ করি নাই—স্বপ্নেও একবার কাহারও মন্দ ভাবি নাই, তবে আমার কপালে এমন হইল কেন? সরলা আবার ভাবিতেছেন স্বামীর বুঝি আমার আহারাদি হয় নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে, তাই ভাল করিয়া বাঙ্ নিঃসরণ হইতেছে না—ক্ষণপরেই মনে করিতেছেন তাইবা কিরূপে হইবে, মা ত খাবার লইয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য কত সাধিলেন, কৈ তিনিত কিছুই খাইলেন না কিম্বা খাইবার কোনও কথাও কহিলেন না।

রাত্রিকাল উপস্থিত—সে দিন হরিধন কিছুই আহার করিল না—সে যে ঘরে শয়ন করিল, সরলা সেই ঘরেই শয়ন করিতে গেলেন। রাত্রে সরলা নির্জ্জনে স্বামীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিবেন—স্বামীর মনের ভাব বুঝিবেন—তাঁহার ব্যথিত চিত্তের কোনওরূপ সান্ত্বনা করিবেন—এই সমস্ত ভাবিয়া স্বামীকে যতই সাদর সম্ভাষণ করেন, স্বামী তাঁহার নীরব। সরলা স্বামীর হস্ত ধরিয়া স্বহস্ত-রচিত পালঙ্কোপরিস্থ শয্যায় শয়ন করাইলেন, আপনি গভীর দুঃখভারাবনত-হৃদয়ে খোকাকে লইয়া ঘরের মেজের উপর শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা তাঁহার চক্ষু স্পর্শ করিল না—তাঁহার অন্তঃকরণ চিন্তার দোলায় দোদুল্যমান—মনে কত সাত পাঁচ ভাবিতেছেন আর চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

পরদিবস দীনেশ বাবু একজন দ্বারবান্ নিযুক্ত করিলেন। হরিধন বাহিরে যাইলে সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, হরিধনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমস্তই তাহার হস্তে ন্যস্ত হইল। হরিধন সূর্য্যোদয়ে গৃহত্যাগ করিয়া আপন মনে যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া

যাইত, দরোয়ান সঙ্গে সঙ্গে যাইত। এই-রূপে অনেক দিন বাহিরে বাহিরে কাটিয়া যাইত, আহারাদি কিছুই হইত না। যে দিন দরোয়ানের নিকট পয়সা থাকিত, সে খাবার কিনিয়া বাবুকে দিত ও আপনি খাইত। বাবুর ইচ্ছা হইত কোন দিন খাইত, না হয়ত খাবার পড়িয়া থাকিত, বাবু চলিয়া যাইত। পাগল চলিতে চলিতে কখন আকাশের দিকে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া তাকাইয়া থাকিত—কখন হেটমুণ্ডে গুটি গুটি চলিয়া যাইত—কখন বিকট ভ্রূভঙ্গিতে কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিত, কখন স্বাভাবিক নেত্রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কখন হাসিত, কখন কাঁদিত!

একদিন পাগল বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বালকটী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে। হরিধন অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রন্ধনশালার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী বাহিরে আসিয়া দেখেন যে পুত্র হরিধন অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতেছে আর তাহার মুখখানি যেন কোন বিশেষ আন্তরিক কষ্টজনিত দুঃখে বিবর্ণ হইয়াছে। মাতা পুত্রের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা হরিধন! কি হইয়াছে, তুমি এত কাঁদিতেছ কেন?” হরিধনকে নিরুত্তর দেখিয়া মাতা কহিলেন, “চল কোথায় যাইতে হইবে।” হরিধন অগ্রে অগ্রে চলিল, মাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। খোকা যেখানে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, পাগল সেইখানে আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইল। জননী বুঝিতে পারিয়া খোকাকে মাটী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং বার বার চুম্বন করিতে করিতে তাহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। পাগল তথায় আর না দাঁড়াইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

পাগল প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া খোকাকে দেখিয়া যাইত। খোকা ঘুমাইতেছে, পাগল আসিয়া তাহার পার্শ্বে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত। বাতায়নের দ্বার দিয়া বালারুণের স্বর্ণাভ কিরণ খোকার মুখের উপর পড়িয়া কেমন সুন্দর দেখাইত, সেই প্রাতঃকালীন শিশির-সিক্ত নবীন কুসুম কলিকাবৎ কোমল বপুখানি পবিত্রতা ও সরলতায় মাখিয়া কেমন শোভা পাইত, মৃদুল মারুতহিল্লোল কেমন ফুর্ ফুর্ করিয়া খেলিতে খেলিতে খোকার মস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুলিকে কাঁপাইত, সে কেমন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেয়ালা করিত—এই সমস্ত পাগল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে দেখিত—কখন হাসিত, কখন কখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিত—অবশেষে চলিয়া যাইত। পাগল কিছু খাইতে পাইলে, খোকার জন্য কাপড়ের খুঁটে একটু বাঁধিয়া রাখিত। আপনার খাইবার বা পরিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু খোকার একটু কষ্ট দেখিলেই সে আপন মায়ের কাছে আসিয়া কাঁদিত, মাতা তাহার অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতীকার করিতেন।

খোকাকে কেহ ধমকাইলে বা মারিলে পাগল কাঁদিত।

দীনেশ বাবুর বাটীর সম্মুখে একটী সান-বাঁদান পুষ্করিণী ছিল। সম্প্রতি বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে, সেই পুকুরে জল থই থই করিতেছে। একদিন তুপরবেলা বাটীর সকলে যে যার কাজে বিব্রত, এমন সময় খোকা খেলাইভে খেলাইতে বাটীর বাহিরে আসিয়া ঐ পুষ্করিণীর সানের উপর দিয়া যেমন তুএকটী ধাপ নামিতেছে, পাগল দৌড়িয়া তাহার মায়ের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা পাগলের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরধারে গিয়া জানিতে পারিলেন খোকা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ! মা "বাবারে সর্ব্বনাশ হ'লরে" বলিয়া চিৎকার করাতে চাকর, দাসী, দরোয়ান যে যেখানে ছিল, তথায় দৌড়িয়া আসিল। সকলে একবারে পুকুরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অনেক অন্বেষণের পর তাহারা খোকার মৃত দেহ উপরে তুলিল। পাগল তখনই সেই সানের উপর শয়ন করিল—তিন দিন তথায় সেই অবস্থায় ছিল, কেহ তাহাকে তুলিতে বা কিছু আহার করাইতে পারে নাই। পাগল যত দিন বাঁচিয়াছিল, প্রত্যহ একবার করিয়া ঐ সানের ঘাটে আসিয়া বসিত—আপনি নীরবে চক্ষুর জলে বুক ভাসাইত। কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্ববৎ কাপড়ের খুঁটে খাবার বাঁধিয়া রাখিত, আর ঐ পুকুরের জলে একটী শিশ দিয়া ফেলিয়া দিত—বোধ হইত যেন সে খোকাকে ডাকিতেছে।

শ্রীভু—

মডার-ক্ষেত্রে বুর-সেনাপতি ক্রঞ্জি।*

বুরগণ। ভ্রাতৃগণ নেহার সম্মুখে
রণোন্মত্ত সিংহসম ব্রিটীশ বাহিনী
প্রজ্বলিত বীর্য্যভরে আসিছে বিক্রমে।
ওই শুন ম্যাকৃসিম উগারি অনল
মৃত্যুর বারতা মহা ঘোষিছে চৌদিকে!
অজেয় জগতে নাকি ব্রিটীশ-নন্দন,
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর আজ্ঞাবহ তাহাদের,
শঙ্কিত তপন দেব অস্ত নাহি যান
তাদের সাগরাম্বর সাম্রাজ্যের পরে।
কিন্তু ভ্রাতৃগণ! হউক বিক্রান্ত মহা
প্রতিদ্বন্দ্বিদল, তথাপি যুঝিব মোরা
মাতৃভূমি তরে, যত দিন বুরদেহে
হবে প্রবাহিত রক্তস্রোত, তত দিন
ট্রান্সভাল কভু পর-অধীনতা পাশে
দিবে নাকো ধরা, হউক মোদের এই
প্রতিজ্ঞা অটল। দেখ দেখ ভ্রাতৃগণ!
কি সুন্দর চারি দিকে শোভিছে গৌরবে
স্বর্ণময়ী মাতৃভূমি! কোন্ দেশ বল,
এ হেন সৌন্দর্য্য শোভা ধরে এ জগতে?
কোন্ দেশ আর স্নাত—সদা ভাসমান
প্রবাহিণী-নীরে? কোন্ দেশ-গর্ভভূমি
উজলে এমন অগণ্য সুবর্ণ, আর
হীরকের খনি? শত শ্যাম শস্যক্ষেত্রে
বক্ষ পূর্ণ কার? হেন মাতৃগলে হায়!
পর-অধীনতা পাশ চাহে পরাইতে।
গত নিশি শেষে দেখিনু স্বপন, যেন
জননী মোদের কহিছেন সম্বোধিয়া,
এ কিঙ্করে তাঁর "প্রভাতে ঘটিবে কালি
সমর বিষম! দেখিও বৎস আমার
যেন সে আহবে বীরের জননী বলি
জননী তোদের হয়রে বিদিত বীর!
এ জগতমাঝে; দেখেরে জগতজন
পুত্রগণ মম রক্ষিতে স্বদেশমান
তুচ্ছি প্রাণ সমরে বিমুখ নহে কভু।
গৌরবের ভরে কৃপাণ শয্যার পরি
লভিতে শয়ন ফিরো গৃহে; যশোমাল্য
মাতৃভূমি শিরে পরাইতে নহে লভো
রণক্ষেত্রে সগৌরবে বীরের শয়ন।
যেই স্বাধীনতা মণি ললাট আমার
উজলিছে, দেখো বৎস! হেন রত্নহীন
হয় নাকো কভু যেন জননী তোদের।"
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম 'হে জননী!
তোমার আশীষে, বুরপুত্রগণ তব
আত্মবলিদানে রক্ষিতে প্রস্তুত সদা
ও ললাটমণি। যতদিন ধমনীতে
বহিবে শোণিত, ও রতন-হীনা কভু
জননী তাদের হবেনাকো, এ প্রতিজ্ঞা
জানিও অটল। এখনো শ্রবণে মোর
গত নিশি কথা ধ্বনিছে উৎসাহ যেন
রণভেরি সম; দেখ ভ্রাতৃগণ! ওই
সমগ্র প্রকৃতি উৎসাহিছে মো সবারে,
ধরেছে নবীন বেশ আজি, দেখ ওই
মেঘশূন্য দিবা আলোক আশীষ বর্ষি,
শিয়রে মোদের উৎসাহিছে শুন ওই
মডার সুধীরে, কহিতেছে কলকলে
"আজি মোর তীরে লভ সবে জয়মাল্য,
নতুবা গৌরবে রক্ষিতে স্বদেশ-মান
আত্মবলিদানে লভ সবে বীরগণ
অমর সুযশ—মর-জীবনের শ্রেষ্ঠ
কর্ত্তব্য পালন।" নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি
দিগন্তের কোলে শুন ওই আহ্বানিছে
পড়িতে ঝাঁপায়ে জীবন মরণ পণ
সমর-সাগরে। স্মর ভ্রাতৃগণ! গত
বেলমণ্ট রণ, সবে করি প্রাণপণ
আসিল বিপক্ষ দল বুরব্যূহ ভেদি
হরিতে মোদের শ্রেষ্ঠ আগ্নেয়াস্ত্র হায়!
প্রচণ্ড ঝটিকা সম অরি-আক্রমণ
রোধিবারে দলে দলে সৈন্যগণে বৃথা
পড়িল সমরে দেখি, রক্ষিতে তাহারে
কহিলেন সেনাপতি ডাকি সৈন্যগণে
"পারো যদি বীর কেহ অটল বিক্রমে
অরি-আক্রমণ-রোধ করিতে ক্ষণেক,
মোরা সেই অবসরে তবে বীরগণ!
অন্য নিরাপদ স্থানে করিয়া অন্তর
পারি এই আগ্নেয়াস্ত্র করিতে রক্ষণ;
নতুবা শত্রুরা ঘোর সৈন্য অপচয়
করি ইহা অধিকার করিবে অচিরে।"
অটল অচল গর্ব্বে পর্ব্বত যেমন
পাতি লয় বক্ষোপরে বজ্রাগ্নি অনল,
অরির অনল মুখে বীর বিংশ জন
তেমনি সগর্ব্বে আর তেমনি নির্ভয়ে
দাঁড়াল আসিয়া বেগে ক্ষিপ্ত সিংহ সম।

* বুর-সেনাপতি ক্রঞ্জি মুষ্টিমেয় সৈন্যকে অসংখ্য ইংরাজ সেনার সহিত অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৯দিন বিষম বিক্রমের পরিচয় দিয়া অবশেষে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।

বাজিল বিষম রণ, হটাইতে সবে
আক্রমিল শত্রুগণ বিষম আক্রোশে,
কিন্তু কভু সিন্ধুগতি ভেদিতে কি পারে
অটল অচল দৃঢ় পর্ব্বত প্রাচীর ?
বিস্মিত বিপক্ষগণ সে বীরত্ব হেরি,
বাখানিলা যতক্ষণ ছিল প্রাণ দেহে।
নাহি ত্যজি স্থান কভু কিম্বা শত্রুগণে
ভেদিতে সে দৃঢ় ব্যূহ বিন্দু অবসর
নাহি দিয়া হায়! মৃত্যুকোলে বেলমণ্টে
যে গৌরবে বীর-শয্যা লভিয়াছে সবে,
যেন মোরা ভ্রাতৃগণ! তেমনি শয়ন
লভি সবে মহাকীর্ত্তি বুর ইতিহাসে
রাখিয়া ভবিষ্য বংশ দৃষ্টান্তের তরে।
এস তবে ভ্রাতৃগণ! অটল নির্ভয়ে।
দেখুক বিপক্ষগণ ক্ষুদ্র বটে তবু
ধরে কিনা মহাবীর্য্য ট্রান্সভাল ভূমি!

লজ্জাবতী বসু।

ব্যায়াম ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম।

হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত চালনার নাম ব্যায়াম। বিধাতার আদেশে মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্র ভ্রূণ ও শৈশবে চঞ্চল শিশু নিয়তই ব্যায়াম সাধন করিতেছে। ব্যায়াম ব্যতীত অঙ্গ পরিপুষ্টি, রক্ত সঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, ও পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়ার উৎকর্ষ রক্ষিত হয় না। যে সময়ে পুরুষেরা ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য করিতেন, ও স্ত্রীলোকেরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বহস্তে সন্তান পালন ও রন্ধন প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকার্য্য করিতেন, সে সময়ে জীবনধারণ ও ব্যায়াম প্রায় একই কথা ছিল। তথাচ পুরাকালে নানাপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় পুরুষ অশ্বযান ব্যতিরেকে একপদও অগ্রসর হওয়া অপমানজনক জ্ঞান করেন, অথবা হস্তপদের সৃষ্টি কেবল ভৃত্যদিগকে কর্ণমর্দ্দন ও পদাঘাত করিবার জন্যই মনে করেন, এবং যে সমুদয় রমণী রন্ধন, সন্তানলালন পালন প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকার্য্যের ভার হীন চরিত্র ও নানাবিধ কুৎসিতরোগগ্রস্ত পাচক পাচিকা ও দাস দাসীর উপর অর্পণ করিয়া স্বীয় "পুষ্পাধিক সুকুমার" দেহ-লতা নবনীত শয্যায় স্থাপন করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহ তিলোত্তমা সম্মিলনের দৃশ্য ভাবনা করেন, অথবা নিতানবফ্যাশন-শোভিত অলঙ্কার-সজ্জায় প্রতিবেশিনীকে পরাস্ত করিবার উপায় কল্পনা করেন, তাঁহাদের "নিত্য অসুখ" নামক জীবনের দুর্ব্বিষহ ভার মোচনের একমাত্র উপায় ব্যায়াম। যে সমস্ত প্রাচীন বা অর্দ্ধপ্রাচীনা মহিলা পদব্রজে গঙ্গার ঘাট, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন যাতায়াত করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যে ও পিঞ্জরাবদ্ধা নবযুবতীদের স্বাস্থ্যে, আকাশ

পাতাল প্রভেদ। অনেক প্রসিদ্ধ জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে ব্যায়ামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বহুশতাব্দী ধরিয়া মূরপদানত স্পেনিয়ার্ডগণ কেবল কায়িক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই বলবান্ কৃষকশ্রেণীসম্ভূত কতিপয় অসীমসাহস ও বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি মূরদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীময় সভ্যতা ও বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু যখন ধনের গৌরবে সেই জাতি কায়িক পরিশ্রমে ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন অল্পকালমধ্যে হীনতেজ হইয়া পড়িল। অতএব ব্যক্তি কিম্বা জাতি নির্ব্বিশেষে ব্যায়ামের সুব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন।

ব্যায়ামের ফল।

১। ফুস্ফুস্ সংক্রান্ত—ফুস্ফুসে রক্ত ও বায়ুর গতি বর্দ্ধিত, রক্ত অধিক পরিষ্কৃত এবং ফুস্ফুস হইতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড ও অতিরিক্ত অঙ্গার নিঃসৃত হয়। ব্যায়ামের অভাবে অতিরিক্ত অঙ্গার দগ্ধ না হইয়া বসায় পরিণত হইয়া অস্বাভাবিক স্থূলতা বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য ফুস্ফুস্ দুর্ব্বল হয় ও সহজে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। অতিরিক্ত ব্যায়াম সাধনে ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য (congestion), এমন কি রক্তস্রাব (hemoptysis) পর্য্যন্ত হইতে পারে।

২। হৃদয় ও ধমনী সংক্রান্ত—রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামের অভাবে হৃদয় শক্তিরহিত, প্রসারিত বা ডাইলেটেড ও বিকৃত বসা (fatty degeneration) পূরিত হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামবশতঃ হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হওয়া (rupture), হৃৎ-স্পন্দন বা বুক ধড়ফড়ানি (palpitation), ও হৃদয় সম্বন্ধীয় অন্যান্য পীড়া হইতে পারে।

৩। চর্ম্ম সংক্রান্ত—রক্তাধিক্য ও ঘর্ম্মাধিক্য হয়। ব্যায়ামকালে চর্ম্মে শীতল বায়ু স্পর্শে স্বেদরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যায়ামান্তে অধিক ঘর্ম্ম নির্গমন হেতু চর্ম্ম শীতল হয়; সেই সময়ে "ঠাণ্ডা" লাগিবার ভয় অধিক।

৪। মাংসপেশী সংক্রান্ত—সমুদয় অঙ্গচালনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল একটী অঙ্গ বা মাংসপেশী চালনা করিলে সেই অঙ্গ বা মাংসপেশী প্রথমতঃ অতিবর্দ্ধিত হইয়া পরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্তস্থল, ইংরাজ বালিকাদের মেরুদণ্ডের ন্যুব্জতা বা কার্ব্ভেচার অব্ দি স্পাইন (curvature of the spine)। যৌবনারম্ভে এই রোগের প্রবলতা দেখা যায়। এই সময়ে সমুদয় দেহের সঙ্গে সঙ্গে কোমল অস্থিসমূহ শীঘ্র বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং একদিকে মাংসপেশী অধিক পরিচালিত হইলে অপরদিকে মেরুদণ্ড হেলিয়া পড়ে। অবিশ্রান্ত পিয়ানোবাদন, চিত্রকরণ, সেলাই ও উলবুনন বশতঃ হস্ত ব্যথিত ও ক্লান্ত হয় এবং স্কন্ধ নত হইয়া পড়ে। স্কন্ধ ও হস্ত উত্তোলন করিবার জন্য বালিকা যত চেষ্টা

করে, অতি-উত্তেজিত মাংসপেশী-সংলগ্ন কোমল মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ ততই বিকৃত হইয়া পড়ে।

৫। স্নায়ুমণ্ডলী সংক্রান্ত—স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধনেও মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামের অভাবে উগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং হিষ্টিরিয়া, হাইপোকণ্ড্রিয়া প্রভৃতি বায়ু রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়ামশীল ব্যক্তি অবকাশাভাব বশতঃ মানসিক উন্নতি-সাধনে তৎপর হয় না। সেটী ভাল নয়।

৬। পাকযন্ত্র সংক্রান্ত—যকৃতে ও পাকযন্ত্রসমূহে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা ও পাকশক্তি বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজিনাস্ ও ফ্যাটী বা তৈলাক্ত খাদ্য, ফস্‌ফেট ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ ও জলের অধিক প্রয়োজন হয়। মুক্ত স্থানে ব্যায়াম (ডিস্‌পেপ্‌শিয়া) অজীর্ণ রোগের মহৌষধি। ব্যায়ামের অভাবেই ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণতা জন্মে।

৭। অন্ত্র সংক্রান্ত—ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ মলের জলীয় ভাগের হ্রাস হয়।

৮। কিড্‌নি সংক্রান্ত—ঘর্ম্মাধিক্য বশতঃ মূত্রের পরিমাণ হ্রাস হয়। ব্যায়ামান্তে মূত্রে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়।

৯। ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত—অধিক ব্যায়াম করিলে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির হ্রাস হয়।

উত্তম ব্যায়ামের চিরস্থায়ী ফল।

ক্ষুধা ও পাকশক্তি বৃদ্ধি, সুনিদ্রা, বক্ষোবিস্তার, মাংসপেশীসমূহের আকার ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি এবং অধিক শ্রম-সহিষ্ণুতা। এই সপ্তবিধ ফল লক্ষিত না হইলে ব্যায়ামের অপরিমিততা বা অনিয়মিততাই ইহার কারণ বুঝিতে হইবে।

১। ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত ঃ—(ক) নিশ্বাস প্রশ্বাস যাহাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও অনিয়মিত (laboured) কিম্বা গভীর ও দীর্ঘ (sighing) হইলে, ফুসফুসে রক্তাধিক্য (congestion) হইয়াছে মনে করিয়া ব্যায়াম তৎক্ষণাৎ স্থগিত করা উচিত।

(খ) কার্ব্বণের ক্ষতি পূরণার্থ ঘৃত মাখন প্রভৃতি তৈলাক্ত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(গ) মদ্য স্পর্শ করিবে না। মদ্য কার্ব্বন ডায়ক্‌সাইড নির্গমনের ব্যাঘাত জন্মায় এবং ইচ্ছাশক্তি (will power) খর্ব্ব করে।

(ঘ) অতিরিক্ত কার্ব্বন ডায়কসাইড দ্বারা যাহাতে বায়ু দূষিত না হয়, এই জন্য মুক্ত কিম্বা বায়ু-সঞ্চারিত স্থানে ব্যায়াম করিবে।

২। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত—ব্যায়াম আরম্ভে হৃৎপিণ্ডের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০—১৪০ হইলে, কিম্বা অনিয়মিত হইলে, প্রথমতঃ ব্যায়াম স্থগিত করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে।

৩। চর্ম্ম সংক্রান্ত—(ক) চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।

(খ) ব্যায়ামকালে সামান্য ভাবে অঙ্গ আবৃত করিলে চলে। কিন্তু ব্যায়ামান্তে সূক্ষ্ম ফ্লানালের ন্যায় সর্দ্দি-নিবারক বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

(গ) সময়ে সময়ে প্রয়োজন মত অল্প জলপান করিবে। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নিবন্ধন দেহে জলের অভাব হয়। এই অভাব পূরণ করা আবশ্যক। প্রচলিত সংস্কার বশতঃ ব্যায়ামকালে জল স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না, এই জন্য ব্যায়ামান্তে অতিরিক্ত পিপাসা বশতঃ এককালে অধিক জল পান করা হয়, এবং পাকস্থলীতে ও রক্তে অতিরিক্ত শীতল জল প্রবেশ করে।

৪। মাংসপেশী সংক্রান্ত—সমুদয় অঙ্গের সমভাবে চালনা করিতে হইবে।

৫। আহার সংক্রান্ত—প্রোটীড্, ফ্যাট, প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্য ও ফস্‌ফেট্ ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণাক্ত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বেথুন কলেজ ও ইহার পারিতোষিক বিতরণ।

গত ১৭ই মার্চ্চ বেথুন কলেজ গৃহে ইহার ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোট লাট সারজন উডবরন্ সভাপতির কার্য্য করেন এবং তাঁহার পত্নী স্বহস্তে ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দান করেন। অনেক গণ্যমান্য সাহেব বিবি ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণটী পরিপূর্ণ ও অতি সুশোভিত হইয়াছিল। বালিকাগণ সুন্দর সঙ্গীত ও আবৃত্তি দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। পরে ছোটলাট বাহাদুর বিদ্যালয়ের কার্য্যের এবং ইহার লেডী প্রিন্সিপ্যাল কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম্ এর সুখ্যাতি করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত মধুর বক্তৃতা করেন। কলেজ কমিটীর সভাপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ম্যাকলিন সাহেবও একটী বক্তৃতা করিয়া ছোটলাটকে ধন্যবাদ দেন।

বেথুন কলেজ বঙ্গ দেশের কেন, সমুদয় ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষালয়ের শীর্ষস্থানীয়। স্বর্গীয় মহাত্মা বেথুন ১৮৪৯ সালের মে মাসে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আপনার অর্থসামর্থ্য সমুদায় ইহাতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার ২ বৎসর মাত্র পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বেথুনের মৃত্যুর পর তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড ডালহাউসী স্কুলের প্রতিপোষক হন এবং ১৮৫২ হইতে ৫৬ সাল পর্য্যন্ত নিজে ইহার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করেন। ডালহাউসী অনেক কারণে এ দেশের লোকের বিরাগ-ভাজন, কিন্তু এ

দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ধন্যবাদার্হ। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত ইহা শিশু-বিদ্যালয় মাত্র ছিল। এই সময় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামক এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইহা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান হয়। ১৮৭৯ সালে এ বিদ্যালয় হইতে কুমারী কাদম্বিনী বসু (এক্ষণে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথমে উত্তীর্ণ হন। তিনি এবং কুমারী চন্দ্রমুখী বসু (যিনি এখন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ) এই দুই ছাত্রীকে লইয়া কলেজ বিভাগ খোলা হয় এবং ইহাঁরা দুই জনেই প্রথম এফ, এ, ও পরে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুমারী চন্দ্রমুখী পরে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের দৃষ্টান্তে গত ২০ বৎসরের মধ্যে অনেক বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে উচ্চতম পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিয়াছেন।

১৮৭৮ সালে যখন বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন হয়, তখন তৎসঙ্গে বোর্ডিং বা ছাত্রীনিবাস স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ সালে বোর্ডিংয়ের ছাত্রী-সংখ্যা অধিক হওয়াতে স্কুলের প্রাঙ্গণেই একটী স্বতন্ত্র দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, ছাত্রীগণ এখন তাহাতেই বাস করিতেছেন। যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বেথুন বিদ্যালয় আছে, তাহা পরলোকগত রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়া যান। বেথুনের ব্যয়ে সুন্দর বিদ্যা-মন্দির নির্ম্মিত হয়। ছাত্রীনিবাস গৃহ কতক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে এবং কতক বেথুন-রক্ষিত ফণ্ডের টাকার সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৮৮৮ সালে বেথুন বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়াছে এবং অন্যান্য কলেজের ন্যায় বেথুন কলেজ ছাত্রীগণ এম, এ পর্য্যন্ত উপাধি পরীক্ষায় পাঠাইবার অধিকার পাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে এই বিদালয় হইতে কেহ উপাধি পরীক্ষা দিলে প্রাইভেট ছাত্র বা শিক্ষকদের মত সেনেটের বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা উপাধি পাইবার যোগ্য হইতেন। এই বিদ্যালয়ের স্কুল বিভাগে হিন্দুকুলোদ্ভব ভিন্ন আর কোনও বালিকা অধ্যয়ন করিতে পারে না। কিন্তু কলেজে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল বালিকাই পাঠের অধিকারিণী। এ বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০টী, তন্মধ্যে ১৩৯টী বাহিরের, ৩১টী ছাত্রীনিবাসের। ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দু ৭৪, ব্রাহ্ম ৫৭, খ্রীষ্টান ৩৮ এবং ইহুদী ১ জন। কলিকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, মহাকালী পাঠশালা এবং অনেক খ্রীষ্টান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তথাপি বেথুন বিদ্যালয়ের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় নাই। ইহার কলেজ বিভাগের পরিপুষ্টি ও সুফল অধিক আনন্দজনক। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বেথুনের একজন প্রধান সহায় ছিলেন এবং তিনি

দীর্ঘকাল বেথুন স্কুলের সম্পাদকের কার্য্যভারও নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। লোকান্তর গমনের কিছু পূর্ব্বে তিনি এই বিদ্যালয় দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "এই বিদ্যালয়ের এত উন্নতি সেই বেথুন সাহেব দেখিতে পাইলেন না ?"

পারিতোষিক বিতরণ স্থলে বালিকারা যে সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী কবিতা বিশেষ উপাদেয় ও সময়োপযোগী বলিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সুপ্রিয়ার ন্যায় "ভিক্ষুণী" হইয়া কোন্ রমণী ভারতের বর্ত্তমান মহা-দুর্ভিক্ষ নিবারণে অগ্রসর হইবেন ?

নগর-লক্ষ্মী।

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে   শুধালেন জনে জনে
ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা ?
শুনি' তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে করযুড়ি', "ক্ষুধার্ত্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি,
এমন ক্ষমতা নাই, স্বামি !"
কহিল সামন্ত জয়সেন,
"যে আদেশ প্রভু করি'ছেন,
তাহা লইতাম শিরে, যদি মোর বুক চিরে'
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ ;
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ ?
নিশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল,
"কি ক'ব, এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা প্রেত,
রাজ-কর যোগান কঠিন ;
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"
রহে সবে মুখে মুখে চাহি' ;
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক্ সে সভা-ঘরে, ব্যথিত-নগরী পরে,
বুদ্ধের করুণ আঁখি দু'টি
সন্ধ্যা-তারা-সম রহে ফুটি'।
তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্র শিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা   বেদনায় অশ্রুপ্লুতা ;
বুদ্ধের চরণ-রেণু ল'য়ে
মধু-কণ্ঠে কহিল বিনয়ে।—
"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যা'রা খাদ্যহারা,   আমার সন্তান তারা ;
নগরীরে অন্ন বিলা'বার
আমি আজি লইলাম ভার।"
বিস্ময় মানিল সবে শুনি ;—
"ভিক্ষু-কন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী।
কোন্ অহঙ্কারে মাতি',   লইলে মস্তক পাতি',
এ হেন কঠিন গুরু কাজ !
কি আছে তোমার কহ আজ !"
কহিল সে নমি' সবা কাছে,
"শুধু এই ভিক্ষা-পাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে, অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া ;

প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।”
“আমার ভাণ্ডার আছে ভরে’
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা ;
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।”

সন ... সালে প্রতিষ্ঠিত ... কলিকাতা

বারি-বিজ্ঞান।

(৪২০-২১ সংখ্যা ২৭১ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] লৌহের গুঁড়া কোনও দাঁড়ি পাল্লার একদিকে ও এক পাত্র কুইনাইন অপর দিকে রাখিয়া যদি ওজন করা যায়, তাহা হইলে কুইনাইন অপেক্ষা লৌহ ভারি হইবে, অথবা যদি এক ইঞ্চি স্থূল ও এক হাত দীর্ঘ একখানি শোলা এবং ঐ মাপের একখানি চন্দন কাষ্ঠ ওজন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে শোলা অপেক্ষা চন্দন কাষ্ঠ ভারী হইবে। এই নিমিত্ত বলা যায় যে শোলা অপেক্ষা চন্দন কাষ্ঠ ভারী, এবং কুইনাইন অপেক্ষা লৌহ ভারী। এইরূপে সকল পদার্থের ভার তুলনা করিয়া প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভার নিরূপণ করা যায়। কিন্তু এই প্রকার ওজন করিয়া সকল পদার্থের ভারের তুলনা করা অসম্ভব। সেই জন্য সকল পদার্থকে যদি একটী পদার্থের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকের ভারের পরস্পর তুলনা সহজেই করা যাইতে পারে। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া একটী কোন বিশেষ পদার্থকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া বৈশেষিক ভার (Specific gravity) নিরূপণ করা হইয়া থাকে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা চোলাই করা বিশুদ্ধ জলকে এই আদর্শ পদার্থ স্থির করিয়া সকল পদার্থের ভার তাহার ভারের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, যে জলকে কোন পাত্রে না রাখিয়া ওজন করা যায় না, তাহাকে আদর্শ করা হইল কেন? তরল বস্তুর বৈশেষিক ভার নির্ণয় করিতে হইলে এই আপত্তি সঙ্গত বটে ; কিন্তু কঠিন বস্তু সম্বন্ধে এরূপ কোন আপত্তি হইতে পারে না। কোন কঠিন বস্তুর বৈশেষিক ভার নির্ণয় করিতে হইলে উহাকে জলমধ্যে মগ্ন করিয়া ওজন করিলেই হইল। যদি একখণ্ড স্বর্ণকে জলের মধ্যে ওজন করা যায়, ঐ সুবর্ণ খণ্ড আপনার আয়তনের সমান জলরাশিকে স্থানান্তরিত করিবে। এক ঘন বুরুল * পরিমাণ সোণা এক ঘন বুরুল পরিমাণ জল সরাইয়া দিয়া আপনার স্থান করিয়া লইবে, তাহার অধিক বা অল্প জল কখনই সরাইবে না। কারণ এক ঘন বুরুল

* ঘন বুরুল অর্থাৎ দীর্ঘে ১ বুরুল, প্রস্থে ১ বুরুল ও গভীরতায় ১ বুরুল।

মাপের সোণা ও এক ঘন বুরুল মাপের জল একই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং একঘন বুরুল মাপের সোণা বা প্রস্তর অথবা লৌহ একই পরিমাণ জল স্থানান্তরিত করিবে। সমান আয়তন হইলে ভারী ও লঘু সকল পদার্থই একই পরিমাণ জলকে স্থানান্তরিত করে। এ সম্বন্ধে আয়তনই বিচার করা কর্ত্তব্য, ভারের অল্পাধিক্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

কোন বস্তুকে জলের মধ্যে ওজন করিলে তাহার ভার কমিয়া যায়, ইহার কারণ এই যে জলের যে উপরের দিকে চাপ আছে, ঐ চাপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলমগ্ন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই জন্য তাহার ভার কমিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে অনায়াসে জলের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়, কিন্তু সেই কাষ্ঠকে স্থলে আনিলে হয় ত নাড়িতেও পারা যায় না। জল ঐ কাষ্ঠকে ধারণ করিয়া তাহার ভার হ্রাস করিয়া দেয় বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে। যে বস্তু জল অপেক্ষা অধিক ভারি, তাহা জলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় জলের প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। ঐ প্রতিঘাত জলমগ্ন বস্তুর আয়তন অনুসারে হইয়া থাকে। যে সকল বস্তুর আয়তন সমান, তাহাদের ভার পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একই প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের ভার একই পরিমাণে হ্রাস হয়। কোন বস্তুকে জলে ওজন করিলে যে পরিমাণ জল ঐ বস্তু দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, ঐ বস্তুটীর সেই পরিমাণ ভার হ্রাস হইয়া যায় এবং ঐ জলের সহিত ওজন করিলে পূর্ব্বের ওজন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু যে সকল বস্তু জল অপেক্ষা লঘু, তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। জল অপেক্ষা লঘু বস্তু জলে সম্পূর্ণ মগ্ন হয় না বলিয়া তাহারা আপনাদের আয়তনের তুল্য পরিমাণ জল স্থানান্তরিত করিতে পারে না ; যতটুকু অংশ জলমগ্ন থাকে, কেবল ততটুকু জল সরিয়া গিয়া তাহার স্থান করিয়া দেয়। এই জন্য কাহার বৈশেষিক ভার ঠিক হয় না। যদি ঐ বস্তুকে বলপূর্ব্বক জলে মগ্ন করা যায়, তাহা হইলেও জলের প্রতিঘাত ঐ বস্তুর ভার অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, ঐ বস্তুর ভার হ্রাস হইয়া যায়, এবং যে পরিমাণে ঐ প্রতিঘাত ভার অপেক্ষা অধিক হয়, বস্তুটী সেই পরিমাণে উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে।

কোন বস্তুর বৈশেষিক ভার নির্ণয় করিতে হইলে উহাকে পাল্লার নিম্নে আংটা দ্বারা ঝুলাইয়া জলে নিমগ্ন করিতে হয়, অথবা পাল্লা দুইটী খুলিয়া কেবল দুই গাছি তারে একদিকে বাটখারা ও একদিকে ঐ বস্তুটী সংলগ্ন করিয়া কেবল ঐ বস্তুটিকে জলের মধ্যে নিমগ্ন করিতে হয়। বাটখারা কি পাল্লা জলে মগ্ন করা উচিত নহে। এইরূপে ঐ বস্তুটীকে জলে ওজন করিয়া যদি দশ সের হয়, এবং

বাহিরে ওজন করিয়া যদি নয় সের হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুটী জল অপেক্ষা দশগুণ ভারী ইহাই স্থির হইল।

কিন্তু যে সকল বস্তু জল অপেক্ষা লঘু, তাহাদের ভার নিরূপণ করিবার নিয়ম এরূপ নহে। যে বস্তু জল অপেক্ষা লঘু, তাহা সম্পূর্ণরূপে জলের মধ্যে প্রবেশ করে না, সুতরাং তাহার যেরূপ আয়তন, সে পরিমাণ জল স্থানান্তরিত করিতে পারে না; কিন্তু উহার ওজন অনুসারে জলকে ঠেলিয়া দেয়। জাহাজে যদি কোন বোঝাই না থাকে, তাহা হইলে উহা কতকদূর জলমগ্ন হয়; কিন্তু যে পরিমাণে বোঝাই অধিক হইবে, জাহাজও সেই পরিমাণে জলমগ্ন হইবে, সুতরাং এ স্থলে ভার অনুসারে জল স্থানান্তরিত হয়। এই নিমিত্ত ঐ জলের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া জাহাজের কাষ্ঠের বৈশেষিক ভার নিরূপণ করা যাইতে পারে না; কারণ সমুদায় জলের পরিমাণ স্থির করাও যেরূপ কঠিন, নিমগ্ন বস্তুটীর যথার্থ আয়তন স্থির করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য।

জল অপেক্ষা লঘু কোন বস্তুর বৈশেষিক ভার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জল অপেক্ষা ভারী যে বস্তুর বৈশেষিক ভার জানা আছে, এমন একটী বস্তুকে ঐ লঘু বস্তুর সহিত সংযুক্ত করিয়া ঐ উভয়কেই তন্মধ্যে নিমগ্ন করিতে হইবে, এবং উভয়ের যে ভার নিরূপিত হইবে, তাহা হইতে ঐ ভারী বস্তুর ভার বাদ দিলেই অবশিষ্ট ভারটী লঘু বস্তুর বৈশেষিক ভার হইবে।

যে সকল বস্তুর ভার জলের ভারের সহিত সমান, উহাদিগকে জলের মধ্যে যে অবস্থায় স্থাপন করা যাইবে, সেই অবস্থাতেই থাকিবে। যদি কোন জলপূর্ণ পাত্রে দুই চারি বিন্দু জল এরূপ আস্তে আস্তে নিক্ষেপ করা যায় যে ঐ বিন্দুগুলির গতি সঞ্চারিত না হয়, তাহা হইলে বিন্দুগুলি পাত্রস্থিত জলের উপরিভাগেই মিশ্রিত হইবে; কিন্তু প্রবল বেগে নিক্ষেপ করিলে উহাদের বেগ যে স্থানে গিয়া শেষ হইবে, সেই স্থানের জলের সহিত মিশ্রিত হইবে।

হাইড্রোমিটার অর্থাৎ বারিমাণ নামক যন্ত্র দ্বারা তরল পদার্থের বৈশেষিক ভার নিরূপিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে একটী কাচের বড় গোলকের সহিত অঙ্কিত একটী নল সংযুক্ত আছে, এবং তাহার নিম্ন ভাগে পারদপূর্ণ আর একটী গোলক আছে, তদ্দ্বারা যন্ত্রটী ঠিক লম্বভাবে জলের উপর স্থির থাকিতে পারে। নলে যে মাপ অঙ্কিত, তদ্ দ্বারা বৈশেষিক ভার জানা যায়। এই ভার যত অল্প হইবে, নলটী তত জলমগ্ন হইবে।

সকল পদার্থেরই ভার এইরূপে জলের ভারের সহিত তুলনা করিয়া বৈশেষিক ভার নিরূপিত হইয়া থাকে। কোন এক পদার্থ অপেক্ষা অন্য পদার্থ অধিক বা অল্প ভারী বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জলের সহিত উহাদের পরস্পরের ভারের তুলনা করা হইয়াছে।

প্রস্রবণ, উৎস, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি।

জল নানা আকারে পৃথিবীতে অবস্থিতি করে। বাষ্প, মেঘ, নদী, সমুদ্র, তুষার, প্রভৃতি সকলই এক জলের নানাপ্রকার আকার ও অবস্থা মাত্র। কিরূপে মেঘ নদী প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, তাহা পরে লিখিত হইতেছে। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি সকল যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তদীয় উত্তাপ দ্বারা জল-পরমাণু সকলকে স্বতন্ত্রিত করে, ঐ পরমাণু সকল বায়ু অপেক্ষা লঘুতর হওয়ায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; এবং অবশেষে স্থির বায়ুরাশিতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় অবস্থিতি করে। ক্রমে ক্রমে যত অধিক বাষ্প এইরূপে তথায় একত্রিত হইতে থাকে, উহার আয়তন ও ভার বৃদ্ধি হওয়ায় আর স্থির ভাবে থাকিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ঐ একত্রিত বাষ্পরাশিকে মেঘ এবং তাহার পতনের অবস্থাকে বৃষ্টি কহে। মেঘ হইতে যখন প্রথমে বৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে উহা সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে পড়ে, কিন্তু পতনের সময় উহারা পরস্পরের আকর্ষণে একত্রিত হইয়া বড় বড় ফোঁটার ন্যায় হয় এবং ভার বৃদ্ধি হওয়ায় সহজেই পৃথিবীতে পতিত হয়। কিন্তু যদি উহারা এইরূপ একত্রিত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে পড়িত, তাহা হইলে কিয়দ্দূর আসিয়াই তাহাদের সম-ভারের বায়ুর মধ্যে স্থির হইয়া থাকিত।

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে কেবল সমুদ্রই ছিল। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া পরে মেঘ ও তুষার উৎপন্ন হইল; তদনন্তর নদী ও অপরাপর জলাশয় সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয়, যদি তৎসমস্তই ভূপৃষ্ঠে থাকিত, তাহা হইলে উদ্ভিদ সকল অতিরিক্ত শৈত্য নিবন্ধন বিনষ্ট হইত। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি ঐ উদ্গত বাষ্পরাশি আর পৃথিবীতে পতিত না হইত, তাহা হইলে বৃক্ষ লতা জলাভাবে শুষ্ক হইয়া পড়িত। পরমেশ্বরের কেমন জ্ঞানগর্ভ কৌশল! সকল সময় সমান-পরিমাণ জল আবশ্যক না হওয়ায় তিনি ঐ জলরাশিকে আকাশে কিছুকাল বাষ্পাকারে রাখিয়া দেন এবং বর্ষার সময় তাহাকে পুনর্ব্বার ধরাতলে প্রেরণ করেন। ঐ বাষ্প সকল যদি আকর্ষণ দ্বারা একত্রিত না হইত, তাহাহইলে বৃষ্টি হইত না, সুতরাং উদ্ভিদ সকল নষ্ট হইত; আবার যদি ঐ আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হইত, বৃক্ষাদিকে বিনাশ করিত। কিন্তু পরমেশ্বর কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে মেঘ ও বৃষ্টির উৎপত্তি করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে কেমন সুন্দর কৌশল দ্বারা উদ্ভিদগণের জীবন রক্ষার্থে নিয়োজিত করিতেছেন। ইহা দেখিলে তাঁহাকে অপারজ্ঞানবান্ ও পরমকরুণাময় না বলিয়া থাকা যায় না।

পৃথিবীতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ নদী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে মিশ্রিত হয়, এবং যে ভাগ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ পুনর্ব্বার বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট ভাগের

একাংশ উদ্ভিদ্‌গণ তদীয় মূল দ্বারা শোষণ করে এবং অপরাংশ ভূগর্ব্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎস রূপ ধারণ করে। মেঘ হইতে বাষ্পবিন্দু পতিত হইয়া পথিমধ্যে যেমন অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বৃষ্টি-ধারা হয়, ভূপৃষ্ঠের জলও সেইরূপ পৃথিবীর ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিবার সময় অনেকে একত্র মিলিত হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় হয়, ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র নদী সকল অনেকে একত্র সংযুক্ত হইয়া প্রবল বেগে ভূগর্ভমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে এবং যেথানে মৃত্তিকা এরূপ কঠিন যে তাহা ভেদ করা যায় না, সেই স্থানে গিয়া একত্র হইয়া হ্রদাকারে সঞ্চিত হইতে থাকে। যথন ঐ হ্রদে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হয়, তথন উহা ইতস্ততঃ নদীর ন্যায় আকারে প্রবাহিত হইতে থাকে। পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করিলে যে জল উহাতে উপস্থিত হয়, তাহা ঐ ভূগর্ভ-নিহিত হ্রদের জল।

পর্ব্বতেও ঐরূপ হ্রদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হ্রদ সকল পর্ব্বতের শিথর দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যে জল প্রবেশ করে, তাহা ক্রমে নিম্নতর শৃঙ্গে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতগর্ভে এক স্থানে সঞ্চিত হয়, এবং ঐ সঞ্চিত জল যথন অতিরিক্ত হইয়া থাকে, তথন উহা পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪১৬-১৭ সংখ্যা ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

কণ্ঠমণি, কমনীয় করণাধিপাধিপ, করাল, করুণাকর, করুণানিধান, করুণানিধি, করুণাময়, করুণালয়, করুণার্ণব, করুণা-সাগর, করুণাসিন্ধু, কর্ত্তা, কর্ম্মফল-বিধাতা, কর্ম্মসাক্ষী, কর্ম্মসিদ্ধিদাতা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, কলঙ্কভঞ্জন, কলুষনাশন, কল্মষহর, কল্যাণ, কল্যাণময়, কল্যাণদাতা, কবি, কাঙ্ক্ষিত-ফলদাতা, কাঙাল-শরণ, কাঙালের ধন, কাণ্ডারী, কাতরশরণ, কান্ত, কান্তিমান্, কামকার, কামকৃৎ, কামপূর, কামদ, কামেশ্বর, কাম্যফলবিধাতা, কারণ, কারণ-কারণ, কারুণিক, কারু, কারুণ্য-রত্নাকর, কালকাল, কালকৃৎ, কালত্রয়জ্ঞ, কালত্রয়-দর্শী, কালত্রয়াতীত, কালাত্মা, কালা-কালের কর্ত্তা, কালেশ, কালভয়-নিবারণ, কালান্তক, কিল্বিষ-নাশন, কীর্ত্তনীয়, কীর্ত্তিত, কীর্ত্তিমান্, কুভাব-বারণ, কুকর্ম্ম-দলন, কুজনতারণ, কুমতি-নাশন, কুশল, কুহকী, কুতূহলী, কূটস্থ চৈতন্য, কৃতান্ত-দমন, কৃতী, কৃতকর্ম্মা, কৃপণের ধন, কৃপানিধি, কৃপাময়, কৃপাসিন্ধু, কৃপাঘন, কৃপালু, কৃষ্ণ, কৃতাবিদ, কেন্দ্র, কেবল সত্তা, কৈতবহর, কৈবল্যধাম, কৈবল্যদায়িনী, কোবিদ, ক্রতুপতি, ক্রিয়াশীল, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ, কোটিব্রহ্মাণ্ডপতি, কোটিভুজ, কোটিশীর্ষ, কৌতুকী, কৌশল, কৌশলী, ক্লেশপঙ্ক-নিবারণ, ক্লেশহরণ, ক্লান্তিবিমোচন, ক্ষম, ক্ষমাশীল, ক্ষন্তৃ, ক্ষমতাবান্, ক্ষালক, ক্ষুৎ-পিপাসা-বিবর্জ্জিত, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপতি, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমবান্। (ক্রমশঃ)

"অমানুষিক বন্ধুপ্রেম।"

(প্রাপ্ত)

বিদেশীয় লোকেরা ভারতবাসীদিগকে নিতান্ত নগণ্য ও হেয় বলিয়া মনে করেন। ভারতবাসীরাও আপনাদের নীচতা হীনতা বুঝিয়া বৈদেশিক জনসাধারণ অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে হীন মনে করেন। অরণ্যে সুগন্ধি কুসুম ফুটিলে যেমন লোকে সহসা তাহার সুবাস পায় না, তেমনই দেশের বিরল স্থানে এমন সুন্দর সুমধুর চরিত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, লোক-চক্ষু আজও তাহাদের ভালরূপ সন্ধান পায় নাই।

দেশের স্থানে স্থানে ছাত্রদের মধ্যে এমন মহাপ্রাণতা, স্বদেশ-প্রীতি, স্বাধী-নতার সমাদর ও অমানুষিক বন্ধু-প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর—যাহা দেখিলে হৃদয় বিমল ও আনন্দরসে আপ্লুত হয় এবং আশা হয় যদি সংসারের কলুষিত বাষ্পে ইহাঁদের বিমল চরিত্র-প্রভা ম্লান না করে, তাহাহইলে ইহাঁদের এই চরিত্রের প্রভাবে একদিন এ অধম পতিত দেশ আবার তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি আমার এ আশা ফলবতী হউক।

সকলেই জানেন মহানগরী কলিকাতা এখন প্লেগে আক্রান্ত। দিনের পর দিন শত শত লোক এই ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। এই রোগে একবার আক্রান্ত হইলে আর রক্ষা নাই, কথন কদাচিৎ দুই একজনকে বাঁচিতে দেখা যায়। যে বাড়ীতে এই রোগ হয়— নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত আর কেহই তথায় রোগীর সহিত অবস্থান করিতে সাহসী হয় না।

বিগত ১৬ই মার্চ্চ শনিবার মাণিকগঞ্জ মেস বা ছাত্রাবাসের শ্রীশচন্দ্র বসু নামক একটি ছেলের প্লেগ হয়। তথন মেসে তাহার বালক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত আপনার বলিতে কেহই ছিল না। সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তথন রুগ্ন ও নিতান্ত দুর্ব্বল; তাহা দ্বারা তথন কোন সাহায্য পাইবার আশাই ছিল না। কিন্তু যে ভীষণ ব্যাধিতে নিতান্ত আত্মীয়-স্বজনও ভীত হয়, সেই ব্যাধির সম্বন্ধে যাঁহাদের সহিত শ্রীশ বাবুর এক বাসায় বাসজনিত বন্ধুতা ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধই ছিল না, সেই মেসের ছেলেরা এক জনও মেস

ত্যাগ করিয়া গেল না। ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত যায় নাই। সকলেই সাধ্যমত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ছেলেরা পীড়ার প্রারম্ভেই শ্রীশ বাবুর বৃদ্ধ পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন এবং আত্মীয় স্বজন কেহ নাই বলিয়া চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয় এই জন্য বড় ডাক্তার ডাঃ আর, এন দত্ত, নীলরতন সরকার ও প্রাণধন বসুকে আনিয়া দেখাইয়াছিলেন। আর শ্রীশ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকিশোরের সহিত ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ রায়ের সৌহৃদ্য নিবন্ধন তিনি স্বয়ংই আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যান। চারিজন ডাক্তার একবাক্যে রোগকে প্লেগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও যথা-বিহিত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দেন। চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হইলেও বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছার ব্যতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিন দিন দুই রাত্রি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগের পর সোমবার রাত্রি ১২টার সময় শ্রীশ বাবুর প্রাণ-বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোন আত্মীয়ই এই সময়ের মধ্যে আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। মেসের ছেলেরাই ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশান-ঘাটে অন্তিম কার্য্যও সমাধা করেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাদিগকে এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি হইতে দূরে লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় বলিয়াছিলেন "প্রাণ কিশোর বাবু না আসিলে আমরা কিছুতেই যাইতে পারি না।" মৃত্যুর পরেও তাঁহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে "আমাদের ত্রুটিতে বুঝি এইরূপ হইল—প্রাণ কিশোর বাবু কাছে থাকিলে বুঝি তাঁহার ভ্রাতাকে বাঁচাইতে পারিতেন।" মহাজনদের রীতিই এইরূপ, তাঁহারা আপনাদের ত্রুটিই অনুসন্ধান করেন—গুণ অনুসন্ধান করেন না। মেসের ছেলেরা সকলেই যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের মধ্যেও আবার বীরপ্রতাপ বাবু, বিপিন বাবু, অবিনাশ বাবু, গিরিশ বাবু ও প্রমথ বাবু বিশেষ ভাবে সেবা করেন। ইহাঁরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাত্রি দিন অবিশ্রান্ত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যেও আবার বিপিন বাবু এই তিন দিন, ২ রাত্রি একই ভাবে শ্রীশ বাবুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। আত্ম-চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও ইহাঁদের মনে উদিত হয় নাই। এরূপ অসীম কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বন্ধুপ্রণয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না! যে সকল অজ্ঞ লোকে প্লেগ কি তাহা বুঝিতে পারে না, সাধারণ জ্বর ভাবিয়া রোগীর সেবা করে—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; আর ইহাঁরা সকলেই দেখিতেছেন, সকলেই বুঝিতেছেন, বেশ জানেন, রোগীর সংস্পর্শে ও বিষ-নিঃশ্বাসে তাঁহাদের সর্ব্ব শরীর বিষাক্ত হইয়া যাইতেছে, তবু তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হন নাই! এইরূপ অসামান্য কর্ত্তব্য-পরায়ণতা

ও বন্ধু-প্রণয় যে কোন গৌরবান্বিত দেশের পক্ষেও নিতান্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আর যে দেশে এমন মহৎপ্রকৃতি দেবোপম সন্তানগণের জন্ম হইয়াছে, সেই দেশ ধন্য! যে সকল অসাধারণ মহাপ্রাণ ব্যক্তিগন ইহাঁদের জন্মদাতা ও যে রত্নগর্ভা জননীরা ইহাঁদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহারাও শত ধন্য! তাঁহাদের আবাস-গৃহ স্বর্গ! তাঁহাদের পরিবার নন্দন কানন, তাঁহাদের ক্ষণজন্মা সন্তানগণ আপনাপন পারিজাত সৌরভে জগৎ সুবাসিত করিয়াছেন! তাঁহাদের পদধূলি প্রভাবে দেশ শত শত ধন্য হউক! বীর-প্রতাপের নাম 'বীর প্রতাপের' ন্যায়ই যশোযুক্ত হউক। অবিনাশের নাম চির অবিনাশ হউক, প্রমথ গিরিজা ও অন্যান্য ছাত্রগণের নাম লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে থাকুক! আর বিপিন, যিনি মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীশ বাবুকে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার নাম জন-সাধারণ অক্ষয় প্রীতি সহকারে দিবানিশি কীর্ত্তন করিতে থাকুন। এইরূপ মহাপুরুষগণের পুরস্কার ইহাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদ বিমল বারি-ধারাবৎ ইহাঁদের উপর বর্ষিত হউক! ইহাঁদের স্পর্শে মৃত মাতৃভূমি পুনর্জীবিত হউক।

আমি আশা করি বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণ এই বীর সন্তানগণের বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়ানন্দে পুলকিত হইবেন ও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিবেন।

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

এক বৃন্দাবনের মধ্যে ২৪টী বন আছে, তাহার মধ্যে ১২টী বন এবং ১২টী উপ-বন। প্রেমের পূর্ণ অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রিয় পারিষদগণ হইতে এই সমস্ত বন আবিষ্কৃত হয়। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে অসংখ্য যাত্রী বনভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। এই যাত্রায় ভরত-পুরের রাজা বাহির হন বলিয়া এই বন ভ্রমণকে সাধারণ চলিত কথায় 'রাজার বন ভ্রমণ' বলিয়া থাকে। রাজার বনযাত্রা ১৫ দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়। এই বনের যাত্রিগণের অধিকাংশই সাধু বৈষ্ণব এবং কাঙ্গালী। এই যাত্রার ৬।৭ দিন পরে গোকুলবাসী গোঁসাইগণ নিজ নিজ শিষ্য সেবকগণ সমভিব্যাহারে আড়ম্বরের সহিত বন-যাত্রায় বাহির হইয়া থাকেন। এই যাত্রাকে চলিত কথায় 'গোঁসাইয়ের' বনভ্রমণ বলা যায়। এই বন-যাত্রীরা ধীরে ধীরে ভ্রমণ করেন এবং সমুদয় স্থানে আমাদের দেশের কৃষ্ণ-যাত্রার

মত ভগবান্ কৃষ্ণের লীলা সকল অনুকরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আজমিরী, মূলতানী, গুজরাটী প্রভৃতি বড় বড় শেঠগণ এই যাত্রায় বাহির হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিয়া কোন কোন বাঙ্গালীও এ যাত্রায় গমন করেন। মথুরায় ভূতেশ্বর নামক স্থান হইতে যাত্রা বাহির হয়। এখানে ভূতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং একটী কুণ্ড আছে। এবার গোঁসাইয়ের যাত্রিদল নির্দ্ধারিত দিনের ১০ দিন পরে বাহির হইয়াছিল, এই বিলম্ব হেতু মথুরা হইতে অনেকেই ফিরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমরা দুই সঙ্গিনীতে মিলিয়া মথুরা হইতে মধুবনেই যাত্রা করিলাম। মধুবনে একটী বড় কুণ্ড আছে, কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বড় বড় নিম্ববৃক্ষ এবং সুন্দর সুন্দর তমাল গাছ ও কদম্বগাছে সুশোভিত আছে। কুণ্ডের চারিধার বাঁধান এবং বসিবার সুন্দর স্থান ছিল, কিন্তু এক্ষণে কোন কোন স্থান ভগ্ন হইয়াছে এবং সেই সেই ভগ্ন ফাটালের মধ্যে মধ্যে জল-ঢুণ্ডিক প্রভৃতি সর্প বাস করিতে দেখা যায়। তথাচ সে স্থলে বসিলেই কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় মুগ্ধ হয়। কুণ্ডের অদূরে মহাত্মা ধ্রুবের তপস্যা স্থান আছে। এই স্থানটী বড়ই মনোরম বোধ হইল। মধ্যস্থলে মঞ্চের ন্যায় উচ্চ স্থান ও চারি দিক্ নানাবিধ পুষ্প, লতা, কণ্টকাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। শুনিলাম পূর্ব্বকালে মঞ্চের ক্রোড়দেশ দিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবাহিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে শ্যাম-সলিলা যমুনার পরিবর্ত্তে গোধুম যব প্রভৃতি শস্যাদির শ্যামল ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইল। এখানে আসিয়া সুনীতি দেবীর অঞ্চলের ধন সুকুমার ধ্রুবের চরিত্র স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মন ক্ষণেকের জন্য বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরক্ষণেই আবার বালকের তপস্যার ধন 'পদ্মপলাশ-লোচন হরিকে' স্মরণ করিয়া প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইতে লাগিল। চারি দিক্ চাহিয়া শূন্যময় হেরিলাম, মস্তক যেন ঘূর্ণিত হইল, হৃদয়মধ্যে যেন কি আগুন লাগিল, বক্ষঃস্থল যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল, চক্ষু ফাটিয়া যেন জল পড়িতে লাগিল, সঙ্গিনীর কোলে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িলাম! সেই বহু প্রাচীনকালের কথা অদ্য নূতন করিয়া হৃদয় মাঝে কত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিল!

এখানে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রাম-বাসিগণ বড়ই আতিথ্য-পরায়ণ এবং সত্যপ্রিয় বলিয়া বোধ হইল, কারণ গোঁসাইজীর যাত্রার দিন বা সময় স্থির করিতে না পারিয়া আমরা দুই জনেই মধুবনে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ বড়ই আনন্দিত হইল, কতজন আমাদিগকে দেখিতে আসিল! আমরা কুণ্ডের ধারে কদম্ব বৃক্ষের তলায় আসন করিয়া বসিলাম। এ স্থলে বলা আবশ্যক, প্রায় সমুদয় বৃন্দাবনবাসীর হরিনাম জপিবার মালা প্রভৃতি রাখিবার ঝুলি সর্ব্বক্ষণই সঙ্গে থাকে, তদনুসারে আমারও মালা ঝুলি আছে। আমার

সঙ্গিনীর অনবধানতা বশতঃ দুই আনা পয়সা সমেত আমার মালা ঝুলি কুণ্ডের জলে পড়িয়া গেল। আমার সঙ্গিনী তখনই ব্যস্ততার সহিত জলে পতিত হইয়া সন্তরণ দ্বারা উক্ত স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যার পর নাই ভীত এবং ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিল, ''উধার মৎ যাইও, উধার মৎ যাইও, সাপে কাট খাগা।" তাহাদের বার বার নিষেধ এবং আমার বিনীত নিষেধ শুনিয়াও আমার অসমসাহসী সঙ্গিনীকে অতলস্পর্শ কুণ্ডে ডুব দিতে অগ্রসর দেখিয়া একজন গ্রামবাসী একগাছি দীর্ঘ যষ্টি অবলম্বন করিয়া জলে নামিয়া বহু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহার অন্বেষণ বিফল দেখিয়া অন্য একজন লোক কূয়াতে পতিত দ্রব্যাদি উদ্ধারক কাঁটা আনিয়া বহু পরিশ্রমে পতিত দ্রব্যটী উদ্ধার করিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা তাহাকে দুইটী পয়সা দিতে গেলাম, তাহা কোন মতে গ্রহণ করিল না, অধিকন্তু আমা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুরী এবং ক্ষীর ভোজন করাইল। তাহারা যেরূপ সমাদরে এবং ভক্তির সহিত দেবতার ন্যায় অতিথির সৎকার করিল, আমাদের জীবনে ইহার অণুমাত্রও আচরিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। তাহারা অর্থের অভাবে ভোজনের দক্ষিণা স্বরূপ কতলগুলি যব অঞ্জলি পূর্ব্বক আমাদের হস্তে প্রদান করিল। আমরা তাহা লইয়া কি করিব? জিজ্ঞাসা করিলে বিনীত হইয়া বলিল, "মায়ি! বেনিয়া দোকানমে ধর্‌দে, আউর কোন চিজ্ লে।"

গোধূম, যব, কলাই প্রভৃতি শস্যের চাষ যাহাদের কার্য্য এবং গো মহিষাদি পশুপাল যাহাদের ধন সম্পত্তি, তাহাদের মধ্যে এরূপ আতিথেয়তা দর্শনে আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম। এ বৎসর ঐ প্রদেশে অনাবৃষ্টি হেতু সকলেরই মুখে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। যাহারা আমা-দিগকে দেখে, তাহারাই কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করে "মায়ি! কেত্‌না দিন্‌মে মেই বর্ষিবে? বহুৎ দিন মেই নাহি বর্ষে হামারি বালবাচ্চা থোড়া দিনমে ভুখি মর যাবে।" আহা! তাহাদের কাতরোক্তি শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। জগদীশ্বর! একবার কৃপা দৃষ্টিপাত কর, ধরণী সুজলা সুফলা হউক, গ্রামবাসিগণের হাহাকার ধ্বনি দূর হউক!! (ক্রমশঃ)

হস্তস্য ভূষণং দানং
সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণং।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং
ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনং॥

দানেন পাণি র্নতু কঙ্কণেন,
স্নানেন শুদ্ধি র্নতু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তি র্নতু ভোজনেন
জ্ঞানেন মুক্তি র্নতু মুণ্ডনেন॥

—চাণক্য।

বিজ্ঞান রহস্য।

তাড়িত-তত্ত্ব আবিষ্কারাবধি বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তড়িৎ আর এখন জলদ-পটলে অবস্থিতি করিয়া ক্ষণপ্রভাকারে জনগণকে চকিত ও চমকিত করিতেছে না অথবা ভীষণ গর্জ্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অশনিরূপে পতিত হইয়া জগৎকে সন্ত্রস্ত করিতেছে না। এখন ইহা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অনেক প্রয়োজন সংসাধন করিতেছে। ইহা লৌহ-তার অবলম্বন করিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা দূর দূরান্তরে বার্ত্তা বহন করিতেছে এবং উচ্চারিত স্বর ও ফলিত প্রতিবিম্ব চালনা করিয়া দূরস্থ লোকদিগের সহিত সম্ভাষণ করাইতেছে। ইহার আহৃত শক্তির প্রভাবে স্থলে শকট ও জলে পোতাদি চালিত হইতেছে, নগর ও গৃহ সকল আলোকিত, যন্ত্র ও শিল্প কল পরিচালিত এবং রন্ধন-কার্য্যও নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহা বাতাদি অনেক প্রকার উৎকট ব্যাধির উপশমার্থেও প্রযুক্ত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত কেবল লৌহ-তার অবলম্বন করিয়া ইহার দ্বারা বার্ত্তাদি বহন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি মার্কোনী নামক একজন বিজ্ঞানবিদ্ বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি একটী তাড়িতযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিনা তারে শতাধিক মাইল বার্ত্তা প্রেরিত হইতেছে। বর্ত্তমান ট্রান্সভাল যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতিগণ এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উভয় উপকূল ইতিপূর্ব্বে ইহার দ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। উদ্ভাবনকর্ত্তা অনুমান করেন যে পর্ব্বত এবং তদ্রূপ অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে ৫০০।৬০০ মাইল বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরিত হইতে পারিবে। নাইকোলা টেস্লা নামক একজন আমেরিকান্ বিজ্ঞানবিদ্ ইহার অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়া যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি বলেন পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য ও অর্ণব ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না, ইহা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে বার্ত্তা প্রবর্ত্তন করা যাইবে, দূরত্ব ইহার সীমা বদ্ধ করিতে পারিবে না। প্রতি মিনিটে ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ পর্য্যন্ত শব্দ প্রেরিত হইবে। পারিসের আগামী জগৎ-মেলায় তিনি নিউইয়র্কের সহিত পারিসের রীতিমত সংযোগ স্থাপন করিবেন। দিন দিন এইরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির অভ্যুদয়ে জনগণ চমৎকৃত হইতেছে। টেলিগ্রাফের বার্ত্তাবাহিনী শক্তি, টেলিফোঁর স্বরবাহিনী শক্তি, ফণোগ্রাফের ধারণা ও আবৃত্তি শক্তি, গ্রাফোফন ও কেণ্টোগ্রাফির ধারাবাহিক আবৃত্তি ও অভিনয় শক্তি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক

চিন্তার হৃদয়ান্তরে মুদ্রিত শক্তি। ইহাই টেলিপাথি। আমরা উপযুক্ত শব্দাভাবে ইহাকে দূর-বোধ বা দূর-জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিলাম। এই শক্তি দ্বারা এক ব্যক্তি দূরস্থ থাকিয়াও কেবল চিন্তার দ্বারা অপরের মনে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত বা মুদ্রিত করিতে সমর্থ হয়। ইহা প্রকারান্তরে ইচ্ছা-শক্তি হইলেও ইহার প্রক্রিয়া ভিন্ন প্রকার। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বোধ হয় এই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্ববিদ্ ছিলেন এবং দূর দূরান্তরে থাকিয়াও জনগণের চিন্তা উদ্রেক করিতেন। অধিকন্তু বর্ণিত আছে তাঁহারা কামচর ছিলেন, যদৃচ্ছা গমনাগমনও করিতেন। রেভারেণ্ড টমাস জে শেল্টন নামক একজন ধর্ম্ম-প্রচারক এই শক্তির বিশেষ উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিগত দশ বৎসর ধরিয়া আমি ও আমার কন্যা এডিনা বিনা তারে ও টেলিফোঁ ব্যতীত পরস্পর কোন চিন্তা দ্বারা যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমরা সহস্র সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও পরস্পরে কথোপকথন করি, কদাচ পত্র লিখিবার প্রয়োজন হয় না। আমি দূরে থাকিয়া চিন্তা দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করি, পত্রের প্রত্যুত্তর দান করি, গৃহস্থালীর সামান্য কার্য্যগুলিও সম্পাদন করিয়া লই। কখন কখন এত দূরে গিয়া পড়ি যে, ডাক তথায় ৩।৪ দিনেও পৌঁছিতে পারে না। আমি কেবল ডেক্‌সে বসিয়াই চিন্তা প্রভাবে দূরস্থ কন্যার সহিত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কথোপকথন দ্বারা নির্ব্বাহ করি, কখনও একটি ভুল হয় না। প্রথম অবস্থায় কিছু আয়াস করিতে হইত, কিন্তু এক্ষণে এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, অধিক চিন্তা করিতে হয় না। সুতরাং আমি যেখানেই যাই না কেন, মনে হয় যেন বাটীতেই আছি, কারণ এডিনার সহিত আমার যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে।"

অনেকে এই ব্যাপারটী কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী প্রকৃত ঘটনা, আমরা একটী বিশ্বস্ত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের বিষয়ে বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদগ্রণী "বৈজ্ঞানিক কুহকী" (Wizard of science) ইডিসন্ বলিয়াছেন যে ইহারা আরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে। এক জনের মনের সহিত অপর ব্যক্তির মনের যে তাড়িতাকর্ষণিক সহানুভূতি, (Magnetic sympathy) আছে, তদ্দ্বারা ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তিনি নিজে একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহার নাম টেলোমেটার (Telometer); ইহা দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সহজে যোগ স্থাপন হইবে। যন্ত্রটী সামান্য টেঁক ঘড়ীর ন্যায়। উপরিভাগে (Dial) দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম শলাকা আছে, ও সাঙ্কেতিক বর্ণ সকল প্রকটিত আছে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য শব্দকারী যন্ত্র (alarm) আছে। একমনে কোন

ব্যক্তি বা বিষয় চিন্তা করিলে চিন্তাশক্তি-জাত তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের সূক্ষ্ম ফল চিন্তাজাত তাড়িত দ্বারা সঞ্চালিত হয়। শলাকা দ্বারা দিঙ্‌ নির্ণয় ও সাঙ্কেতিক বর্ণ সাহায্যে কথোপকথন অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রত্যেকে এইরূপ এক একটী যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলেও পরস্পরের সহিত যোগ রাখিতে পারিবে। ধন্য বিজ্ঞানমাহাত্ম্য!

ব্যাস কাশী।

কাশীশ্বর শিবের সহিত বিবাদ করিয়া এবং শিব কর্তৃক কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যে স্থলে নব কাশী প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাস কাশী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার পূর্ব্বপারে স্থিত। রামনগর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র পল্লীও ইহার সহিত সংযুক্ত। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার কৌশলে মহর্ষির উদ্যম ব্যর্থ হইলে, তিনি নিরাশ ও অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার সদাশিবের প্রসন্নতা লাভের জন্য যে স্থলে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। লোকের বিশ্বাস ইহাই ব্যাসের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। ইহাকে ব্যাসেশ্বর শিব বলে। এখানে প্রতিবর্ষে মাঘ মাসের প্রতি শুক্রবারে মেলা হইয়া থাকে। দূর দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী এই সময় এখানে আগমন করিয়া পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অন্যান্য সময়ে ইহার মাহাত্ম্য নাই, প্রত্যুতঃ এখানে মরিলে পরজন্মে "গর্দ্দভ" হয় বলিয়া পর্ব্বসময়েও কেহ অধিকক্ষণ থাকে না, পূজার্চ্চনা করিয়াই চলিয়া যায়। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিগত ২৭শে মাঘ শুক্রবার প্রাতে ব্যাসেশ্বর দেখিতে যাত্রা করিলাম। ৭টার সময় স্নানাদি সমাপন করিয়া তরণীযোগে কাশীর কেদার ঘাটের সম্মুখীন গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব কূলে অবতরণ করিলাম। এ সময়ে গঙ্গার জলাংশ অনেক অল্প, পুলিনাংশ শুভ্র সৈকতময়, সমগ্র পূর্ব্বোপকূল ব্যাপিয়া অর্দ্ধ ক্রোশাধিক প্রসারিত রহিয়াছে। সমুদ্রোপকূলস্থ বালুকারাশি স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকারে পরিণত এবং তরঙ্গাকারে উচ্চনীচ হইয়া যেমন ভ্রমণের বিঘ্নকর হইয়া থাকে, ইহা সেরূপ নহে, সমতল বালী-স্তর আস্তরণের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া গমনের সৌকর্য্য সাধন করিতেছে। বিশেষতঃ সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে পুলিন বিধৌত হইয়া বিশেষ সুগম হইয়াছে। সমভিব্যাহারী বালকেরা

আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া কূর্দ্দন করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। গমনপথের অভাব নাই, স্থানবিশেষ লক্ষ্য করিয়া দলে দলে যাত্রী সকল স্বীয় স্বীয় সুবিধা বুঝিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বালুকারাশির উপর ভ্রমণ করিয়া উপকূলের শেষ ভাগের উর্ব্বরা ভূমিতে উপস্থিত হইলাম। গোধূম, যব, সর্ষপ, মসুরী, অড়হর, চণক প্রভৃতি বিবিধ শস্যক্ষেত্র সকল ফুল শস্যে সুশোভিত হইয়া তীরভূমি সুসজ্জিত করিয়া রহিয়াছে। আলীপথ অনুসরণ করিয়া ক্রমে উপরি ভাগের সমতলে উত্তীর্ণ হইলাম। এখানকার শোভা আবার ভিন্নতর। চতুর্দ্দিকে ফলবান্ বৃক্ষের উদ্যান সকল হরিদ্-বর্ণে সজ্জিত হইয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। পিয়ারা, দাড়িম্ব, কুল, বেল, লেবু প্রভৃতি ফল সকল প্রচুর রূপে ফলিয়া বৃক্ষ সকল নত করিয়া রাখিয়াছে; আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃক্ষ সকল গাঢ় হরিৎপত্রে আচ্ছন্ন হইয়া মুকুলোদ্গমের প্রতীক্ষা করিতেছে এবং অশ্বথ, বট ও নিম্বাদি বনস্পতি সকল ছায়া বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষীপল্লী সকল উপবনস্থ তপঃকুটীরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এইরূপে আম্র-কানন, বিল্ববন, পেয়ারা উদ্যান, শস্যক্ষেত্র সকল অতিক্রম করিয়া অবশেষে গন্তব্য স্থান ব্যাসতীর্থে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহা গঙ্গাতট হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূর। মোগলসরাই রেলওয়ে ষ্টেশন হইতেও ক্রোশাধিক দূর হইবে। আসিবার ভাল পথ নাই, সুতরাং গাড়ী বা শকট যাতায়াত করিতে পারে না; একজন অনেক কষ্টে একখানি হাল্‌কা এক্কা আনিয়াছিলেন। যাহা হউক এখানে দর্শনীয় পদার্থ কিছুই নাই। একটী সামান্য ক্ষুদ্র আম্রকাননের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গটী বহুদিনের হইতে পারে, কিন্তু কুটীরটী অল্প দিনের বোধ হয়। কুটীরের উপরে একটী অশ্বথ গাছ, তাহাও বোধ হয় শতাধিক বৎসরের হইবে না। আর একটী চারা নিম্ববৃক্ষ ও অপর একটী ক্ষুদ্রতর অশ্বথ বৃক্ষ; নিকটে একটী কূপ এবং সম্মুখে অঙ্গনের শেষ ভাগে, যাত্রী-দিগের বিশ্রামের জন্য সম্প্রতি একটী আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। অঙ্গনে এই সময়ে একটী ক্ষুদ্র বাজার বসিয়া থাকে এই মাত্র। এক পার্শ্বে ইক্ষু মাড়িবার একটী অপূর্ব্ব যন্ত্র রহিয়াছে। ইহা ঘানী গাছের মত। ইক্ষু খণ্ড খণ্ড করিয়া গাছের গর্ভে ঢালিয়া দেয়, দুইটী গরুতে যথোপযুক্ত ভারের সহিত টানিতে থাকে এবং ঘানীর মুখ হইতে বা নল দিয়া তৈলের ন্যায় রস বাহির হইতে থাকে, তাহাই ছাঁকিয়া পান করে। ইহা ৪ পয়সা সের বিক্রীত হয়। আমরা ৯৷৷০ টার সময় পৌঁছিয়াছিলাম। ব্যাসেশ্বর সন্দর্শন করিয়া সম্মুখস্থ চত্বরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম-পূর্ব্বক ইক্ষুরস পান ও কিছু জলযোগ

করিয়া ১১ টার পর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রত্যাগমনের সময় রামনগরের রাজ-প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়ী হইয়া আসিলাম। মন্দিরটি শিল্পকার্য্যে পরিপূর্ণ অতি সুন্দর। কাশীর মধ্যেও এমন সুন্দর একটী মন্দির নাই। ইহা পাষাণময় উচ্চবেদীর উপরে বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত, ইহা একটী দর্শনীয় বস্তু। ইহার সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত কুণ্ড বা সরোবরও দর্শনের যোগ্য। এখানেও এই সময়ে বাজার বসিয়া থাকে। এখান হইতে প্রশস্ত রাজপথ সকল চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত। আমরা একটী বর্ত্মের অনুসরণ করিয়া আম্রকানন সকল অতিক্রম করিয়া রামনগরের বাজারে আসিলাম। এ স্থানটী সহরের ন্যায়। কিছু দূরেই রাজবাটী ও দুর্গ। দুর্গের সম্মুখে একটী কুটীরে একটী ব্যাঘ্র রক্ষিত আছে। রক্ষক পিঞ্জরের দ্বার আবৃত করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা লইয়া ব্যাঘ্র প্রদর্শন করিতেছে। দুর্গের অপর প্রান্তে গঙ্গাতটে রাজার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির। ইহা "রাজার ব্যাস" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষে ইহাও দর্শন করিতে হয়। কিন্তু এখানে এত ভিড় হয় যে, অনেকের ভাগ্যে দর্শন সংঘটন হয় না। আমরা বহু কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহির হইতে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঘাটের প্রকাণ্ড সিঁড়ী দিয়া দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। তৎপরে একটী সামান্য দ্বার দিয়া উপরে উঠিতে হয়। এইখানেই বিশেষ কষ্ট। ভিতরে; তত ভিড় না হইলেও যখন সহস্র সহস্র লোক এই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া যাতায়াত করে, তখন ইহার দুর্গমতা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শান্তি রক্ষার্থে প্রচুর প্রহরী থাকিলেও ইহার কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারিতেছে না। মন্দিরের পার্শ্ব হইতে যদি নির্গমনের জন্য ভিন্ন একটী অধিরোহিণী বা পথ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। দর্শনান্তে এইখানে নৌকারোহণ করিয়া আমরা কেদার ঘাটে প্রত্যাগমন করিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিতে ৩টা হইয়াছিল।

তাহিতী দ্বীপের পুরাবৃত্ত।

বামাবোধিনীর পাঠিকারা অবগত আছেন যে, উত্তর আমেরিকার পশ্চিমোত্তর অলস্কা প্রদেশে অদ্যাপি রামসীতার পূজা হইয়া থাকে। অলস্কা আসিয়ার পূর্ব্বোত্তর সাইবিরিয়া প্রদেশের ঠিক্ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। উভয় প্রদেশের মধ্যে বেরিং প্রণালী ব্যবধান মাত্র। এই প্রণালীর প্রসারতা কেবল ৩৬ মাইল বা ১৮ ক্রোশ। ইহার মধ্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও পুলিন থাকাতে এবং এখানকার জলের

গভীরতা স্বল্প হওয়াতে রুসেরা ইহার উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা এক সময়ে আসিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল, অর্থাৎ আসিয়া ও আমেরিকা এক ছিল। আর্য্য-জাতি যখন সমগ্র ভূমণ্ডলের সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন, তখন সসাগরা পৃথিবী সমস্তই তাঁহাদিগের অধীন ছিল, এই জন্যই মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে মেক্সিকো ও ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে স্থানে স্থানে প্রোথিত নগর সকলের ধ্বংসাবশেষ স্তূপের মধ্যে আর্য্য-কীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। আসিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগর। ইহারও মধ্যস্থ অনেক বড় বড় দ্বীপে আর্য্য-কীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাহিতী দ্বীপবাসীদিগের পুরাবৃত্তের সার সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন। ইহার সৃষ্টি-কাহিনী আমাদিগের পুরাণের অনেকটা অনুরূপ। তাহিতী দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রায় দুই তিন সহস্র মাইল দূর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের যত্নে সমস্ত দ্বীপবাসীরাই এখন খ্রীষ্টিয়ান্। দ্বীপটী ফরাসীর অধিকৃত; কিন্তু দেশীয়েরা আপনাদিগের শাসনপ্রণালীর অনুবর্ত্তী। তাহাদিগের আচার ব্যবহার এখন কতকটা ইয়ুরোপীয় ধরণে অনুকৃত, সুতরাং তাহাদিগের পুরাণের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ ভক্তি না থাকাই সম্ভব। তাহাদিগের পুরাণে বর্ণিত আছে যে, "তার" * নামে একজন অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ অণ্ডের মধ্যে বাস করিতেন। অণ্ড বহুকাল শূন্য দেশে অন্ধকারমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বিদীর্ণ হইয়াছিল, তখন তিনি বহির্গত হইয়া আপনাকে একাকী দেখিয়া প্রসিদ্ধ দেবতা "তু" (তোয়) † কে উৎপন্ন করিয়া আহ্বান করিলেন। তু তাঁহার সহায় ও সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

যখন সমস্ত বিশ্বসংসারের সৃষ্টি কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, তখন দেশ ও স্থান পরিপূর্ণ করিবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য দেব দেবীর সৃষ্টি হইল। অবশেষে তাঁহারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া মানবেরও সৃষ্টি করিলেন এবং মানবকে পৃথিবীতে স্থাপন করিলেন।

তার তুরীয় বা চতুর্গুণবিশিষ্ট এবং চারি নামে চারি স্থানে অবস্থিত। প্রথম স্বর্গ বা গোলকের তার। ইনি দশ রূপে দশ স্বর্গে বা স্বর্গস্থ দশলোকে অবস্থান করেন। দ্বিতীয় মর্ত্ত্যের তার। ইনি মহান্ ভিত্তি রূপে পৃথিবীর মধ্যস্থলের পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার উপরেই ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় স্থলের তার এবং চতুর্থ পাতালের তার। পাতালের তার তেমোহানী গহ্বর দিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহিতীর সন্নিকটে রাইয়াতিয়া দ্বীপে এই গহ্বরটী দৃষ্ট হয়। ইহা এককালে একটী আগ্নেয়-গিরির মুখ ছিল। এক্ষণে নির্ব্বাপিত

* তার—তৄ—পার হওয়া; তার—ত্রাণকর্ত্তা।
† তু—তু—পূর্ণ করা অথবা তোয়—পালন করা।

হইয়া কেবল গহ্বরমাত্রে পর্য্যন্ত আছে। যাত্রীরা এই স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। পারকিন্স নামক একজন নাবিক এই গহ্বরে নামিয়া বাতি জ্বালিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিল। সে দেখিতে পায় এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বা কুটীর আছে এবং বক্র পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরে একটী বেগবতী স্রোতস্বতীর কল্ কল্ শব্দ শ্রুত হইতেছিল। তাহিতীরা ইহাকে তারের তমসা নদী বা বৈতরণী বলিয়া থাকে। তত্রত্য আর্দ্র বায়ুতে বাতি নিবিয়া গেলে পারকিন্স আর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং অতি কষ্টে অন্ধকারে হাতাড়িয়া হাতাড়িয়া বাহিরে আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। তার যে প্রথম মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার নাম "তায়" * রাখিয়াছিলেন। ইহাকে তিনি মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করেন এবং সর্ব্বগুণে ভূষিত করেন। পরে তাহাকে দেবী হীনের সহিত বিবাহ দেন। হীন তীফতু দেব ও ফাহতু দেবীর কন্যা। ইহাঁর সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই মুখ ছিল এবং ইনি অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। তায় বালুকাতে আবৃত থাকিত এবং অত্যন্ত মৎসরস্বভাববিশিষ্ট ছিল। তাহার একটী পালিত শ্বেত বক ছিল, সে মানবদিগকে ভুলাইয়া নিহত করিত।

সৃষ্টির পর জগতে বহুদিন সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরিশেষে অসন্তোষ উৎপন্ন হইলে দেবগণ ও নরগণ পরস্পরে বিবাদ ও বিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তার এবং তু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শাসন জন্য অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তারকমণ্ডলীকে অভিসম্পাত করিলেন, তাহারা মিট্ মিট্ করিতে লাগিল এবং চন্দ্রকে শাপ দিলেন, সে ক্ষয় প্রাপ্ত ও নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু হীন অতি দয়াবতী ও স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহার গুণে তারা সকল উজ্জ্বল হইল এবং চন্দ্রমাও শুক্ল পক্ষ প্রাপ্ত হইল। তার ও তু-র শাপে সমুদ্র হ্রাসতা বা ভাটা প্রাপ্ত হইয়াছিল, হীনের বরে উচ্ছ্বাস বা জোয়ার প্রাপ্ত হইল; নদী সকল শাপগ্রস্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, হীনের বরে উৎসরূপে নির্গত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকল শাপে গলিতপত্র হইয়া ফল ফুল পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতপ্রায় হইয়াছিল, হীনের বরে তাহারা পুনর্ব্বার নবপত্র ও ফুল ফলে সুসজ্জিত হইয়া জীবিত হইল। এই প্রকারে সমস্ত সংসার অদ্যাপিও শাপ ও বর ক্রমান্বয়ে ভোগ করিয়া আসিতেছে। মানবও দেব-শাপে মর্ত্ত্য হইয়াছে। হীন তাহার উদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বপুরুষ তাহাকে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করিল। হীন তথাপিও অনুনয় করিয়া তারকে বলিয়াছিল যে "মানব একে দেবশাপে অস্থির হইয়াছে, তাহার উপর আর মৃত্যুযন্ত্রণা বিধান করিও না—দেখ আমি চন্দ্র, তারকা, সিন্ধু, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতি সকলেরই দুঃখ প্রশমিত করিয়াছি, তুমি যদি অনুগ্রহ

* তায়—পালন করা।

কর, তবে মানবকেও পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিব।" তার গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল, "যখন প্রভু তার মৃত্যুশাপ দিয়াছেন, তখন আমার শ্বেত বক গিয়া অবশ্যই মানবকে মৃত্যুকবলে পাতিত করিবে, তোমার কোন কৌশলই খাটিবে না।" এই বলিয়া তারও অবশেষে নিজে শাপের ফল ভোগ করিয়া মৃত্যুকবলে পতিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মপুস্তকের মতে নারীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নরের পতন হয়, অর্থাৎ নারীই নরের মৃত্যুর কারণ। তাহিতীর পুরাণমতে নরই নরের মৃত্যুর কারণ।*

* ১৮৯৯ ডিসেম্বরের থিয়োজফিষ্ট হইতে সঙ্কলিত।

কাব্যবোধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাব্য নিরূপণ।

কাব্যের প্রতিবাক্য কবিতা। কবির প্রতিভাসম্ভূত অলৌকিক ও অত্যন্ত চমৎকারজনক পদাবলী কাব্য শব্দে অভিহিত। অনেক আলঙ্কারিক "রসাত্মক বাক্যকে" কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অতি প্রশস্ত ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যানুসারে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ শৌদ্ধোদন তাঁহার অলঙ্কারসূত্রে "কাব্যং রসাদিমৎ বাক্যং শ্রুতং সুখবিশেষকৃৎ" বলিয়াছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ শৌদ্ধোদনি মতানুসরণ করিয়া সাহিত্য দর্পণে কাব্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্ দোষাস্তস্যাপ-
কর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কার-
রীতয়ঃ।"

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে। দোষ (শ্রুতি দুষ্ট অস্ফুট ইত্যাদি) ইহার অপকর্ষক এবং গুণ অলঙ্কার রীতি প্রভৃতি ইহার উৎকর্ষসাধক। সুতরাং কেবল "রসাত্মক বাক্য"ই কাব্য নহে; তাহা নির্দ্দোষ এবং গুণালঙ্কার রীতি যুক্ত হওয়া আবশ্যক। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বলিয়াছেন;—

"যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস
লয়ে।"

যাহা হউক মৌলিক ও শাব্দিক ব্যুৎপত্তি হেতু কবিতাই কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা। কবির প্রতিভা বা কবির শক্তিই কাব্যের প্রসূতি। এই শক্তির অভাবে কাব্য প্রসূত হয় না, প্রত্যুত উপহসনীয় হইয়া থাকে। মর্ম্মট ভট্ট এই শক্তিকে "কবিত্ব বীজ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।*

* কাব্য প্রকাশ। ১ম উল্লাস, ৩ শ্লোক।

নির্দ্দোষ কাব্য।

সন্ধ্যাবর্ণন।

"ক্রমে অবসান দিন, পশ্চিম গগনে,
দেখা দিলা দিনমণি, লোহিত বরণে।
উজলিল দিক্ দশ; নবজলধর,
কাঞ্চনে মণ্ডিত উঠে ঢাকিয়া অম্বর।
উরসে বিদ্যুৎ খেলে ঝলসে নয়ন,
নিকষ প্রস্তরে লেখা কষিত কাঞ্চন।
বৈকালিক বায়ু বহে মৃদুল শীতল,
তাপ উগারিয়া স্নিগ্ধ হৈল ক্ষিতিতল।
শাখা তুলি তরুরাজী লাগিল নাচিতে,
ঢলিয়া পড়িল বেলা দেখিতে দেখিতে।
গৃহচূড়ে, বৃক্ষশিরে, পর্ব্বত উপর,
উচ্চতর তুঙ্গ শৃঙ্গে উত্তর-উত্তর।
ক্রমে আরোহিল ভানু, দিগঙ্গনাগণ
ক্ষণিক হাসিয়া শেষে ঢাকিল বদন।
পতির বিদায়কালে পতিপ্রাণা সতী
অমঙ্গলভয়ে করি গোপন যেমতি
মনোভাব, হাসিয়া সম্ভাষে প্রাণেশ্বরে,
বদন ঝাঁপিয়া কান্দে অদর্শনে পরে।

ইহা নির্দ্দোষ এবং সগুণালঙ্কার রসান্বিত কাব্য।

"নিশীথ সময়। স্তব্ধ নিখিল জগৎ।
অচেতন জনগণ নিদ্রিত ভারত।
কেবল পবন বেগে পাদপ মর্ম্মরে,
একতানে ডাকে ঝিল্লী সাঁই সাঁই ক'রে।
নীরবে অম্বর পথে জ্বালিয়া কিরণ,
কোটি কোটি লোকপাল করিছে গমন।
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, মহাসূর্য্য কত,
অনন্ত আকাশ কোলে ছুলিছে নিয়ত।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপেছ সংসারে,
ধন্য হে! অনন্ত দেব! প্রণমি তোমারে।

এ কবিতাটীও নির্দ্দোষ অথচ গুণ, অলঙ্কার রসাদি ও বিশেষ সংঘটন নাই।

সদোষ কাব্য।

মানস সরসে যথা মরাল সুন্দরী,
কনক কমল বনে বুলে কেলি করি।
সুধাময় জলরাশি পক্ষ সঞ্চালনে,
ঢল ঢল, মন্দ মন্দ তরঙ্গ তাড়নে,
শিহরে মৃণালদল; প্রফুল্ল কমল,
মরাল সঙ্গমে কাঁপে আবেশে বিহ্বল,
আহা! সে সুখের স্বপ্ন থাকে কতক্ষণ?
কেলিপ্রিয় রাজহংসী নিঃশব্দে যখন
নিমেষে এড়িয়া তারে দলান্তরে যায়,
আকুল কমল খেদে প্রবাহে লোটায়।
স্বর্ণ শতদল তিতি বহে শতধারে
লুকায় নিরাশে মুখ তরণী মাঝারে।

এইটী অলঙ্কার ও রসদোষ সত্ত্বেও সুন্দর কবিতা। ইহার দোষ সকল যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কাব্য ভেদ।

কাব্য ত্রিবিধ। ধ্বনি বা উত্তম কাব্য, গুণীভূত ব্যঙ্গ বা মধ্যম কাব্য এবং চিত্র বা অধম কাব্য।

অতিশয় ব্যাখ্যাবাচক, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যঙ্গদ্যোতক কবিতাকে ধ্বনি কাব্য বা উত্তম কাব্য কহে। যথাঃ—

"জয় সিংহে চাহি কন মিবার কৌতুকে,
মহারাজ! কেন আর চাহি ঊর্দ্ধমুখে?
নিঃশব্দে নক্ষত্র-মুখ আবরি কিরণে,
পূর্ণ কলানিধি-কলা ভ্রমিছে গগনে;
প্রকৃতি অনুরঞ্জিত জ্যোৎস্না আভাতি,

তৃতীয় প্রহর প্রায় অনুমিত রাতি।
সময় বহিয়া যায় লগ্ন-ভগ্ন হয়,
কন্যা সম্প্রদান করিবার এ সময়।
অনুমতি দিতেছেন নিমন্ত্রিতগণ,
শুভ কর্ম্মে বৃথা কাল ব্যাজ কি কারণ?
মিলিয়াছে মনোমত কন্যা যোগ্য বর,
বিধিমতে বরণ করুন্, নরবর!
বিধির নির্ব্বন্ধ কার সাধ্য করে আন?
আজ হৈতে এক হৈল কনোজ চৌহান!
ক্ষত্রকুলতিলক পার্থিব বংশধর'
মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজরাজেশ্বর।
ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ পূজিত,
অদ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ পৃথ্বী-পরিচিত।
তাঁর পূজ্য শ্বশুর! "আপনি মতিমান্",
ভূ-ভারতে আপনার কে আছে সমান?

পৃথ্বীরাজ স্বয়ংবরস্থলে সহসা উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক সংযুক্তার পাণিগ্রহণ করিলে জয়সিংহ সভাস্থ রাজন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন এমন সময় মিবারাধিপতি সমর সিংহ সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক রাজগণকে বন্দী ও জয়সিংহকে অবরুদ্ধ করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতেছেন, পৃথ্বীরাজের শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করাতে উত্তম ব্যঙ্গ হইয়াছে। "শ্বশুর" শব্দ অনাদরে অপমানসূচক গালি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিরতি আহারে, বিরক্তি বিহারে,
নিবৃত্তি বিষয়-গ্রামে।
নাসাগ্রে নয়ন, তন্ময় মন,
নিষ্ঠ ইষ্ট-দেব নামে।
বিশ্ব শূন্য জ্ঞান, মৌন চিন্তা, ধ্যান,
সমান দিন যামিনী।
কহ সখি! একি, ভাব এবে দেখি,
যোগিনী না বিয়োগিনী?

ধ্বনি বা উত্তম কাব্য বাচ্য লক্ষণ ভেদে বহু প্রকার। তৎপ্রতিপাদক সূত্র সকল সহজবোধ্য নহে এবং উদাহরণ সকলও প্রায় আদি রস সংঘটিত দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহা এই কাব্য বোধ-প্রস্তাবে উদ্ধৃত করা সঙ্গত নহে; বিশেষতঃ তাহা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় তাদৃশী উপযোগী বলিয়াও বোধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(শেষ)

গৃহকর্ত্রী নিজে রন্ধনকার্য্য না করিলে বা রন্ধনের তত্ত্বাবধান না লইলে, কখন পরিষ্কৃত ও উত্তম হয় না। পানীয় জল প্রতিদিন পরিষ্কার পাত্রে ধৌত করিয়া রাখা হয় কি না, এ সব সামান্য সামান্য বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। পরিচারকদিগের হস্তে খাদ্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা নিতান্ত অবিধেয়। গৃহের জিনিষগুলি যথাস্থানে রাখা হইল কি না, গৃহপালিত জীব জন্তু

গুলি রীতিমত আহার্য্য পাইল কি না ও সযত্নে রক্ষিত হইল কি না, প্রতিদিন এ সকল বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ জন্যই ইংরেজদিগের মধ্যে “গৃহস্বামীর সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট হওয়া উচিত” এই নীতি কথাটী শুনিতে পাওয়া যায়। একদা জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মহাশয়! আপনার ঘোড়ার এরূপ পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইল?” তিনি তদুত্তরে বলিলেন, “প্রভুর চক্ষু দ্বারা” বস্তুতঃ, চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গৃহের যে কার্য্যে প্রভুর সুদৃষ্টি না থাকে, তাহা কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। গৃহকর্ম্মে ও সাংসারিক ব্যয়ে সতত ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কোন একটী কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, গৃহস্বামীর নিজের সে বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা উচিত। যদি গৃহস্বামী পরিচারক অথবা অপর কোন লোকের উপর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে সে কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হয় না। যদি কেহ যথার্থই নিজের কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অন্যের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, নিজেরই আপন কর্ম্মে মন দেওয়া উচিত। কথামালার উল্লিখিত “সারসী ও তাহার শিশু সন্তান” নামক গল্পটী দ্বারা আমরা ইহার সত্যতা অনুমান করিতে পারি।

স্বয়ং সাধারণ ভাবে, অর্থাৎ বিশেষ মনোযোগ না করিয়াও, কোন কার্য্য করিলে যেরূপ সুসম্পন্ন হয়, অপরে যত্নের সহিত সেই কার্য্য করিলেও তদনুরূপ হয় না। “ইসপের গল্প” নামক গ্রন্থে বর্ণিত, “গোশালে প্রবিষ্ট হরিণ” নামক গল্পটী এ বিষয়ের যাথার্থ্য সুন্দর রূপ সপ্রমাণ করিতেছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলেই, তদ্বিষয়ে আপনাকে মনোযোগী হইতে হইবে। গৃহের প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি গৃহস্বামীর সুদৃষ্টি না থাকিলে, গৃহকার্য্যসমূহ কোন কালেই উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না।

নরনারীকে এই ভাবে স্বীয় গৃহ সুগঠিত করিতে হইবে যেন, সেই গৃহপালিত সন্তান আত্মত্যাগ, বিনয়, সত্য ও সাধুতা প্রভৃতি গুণরাজি দ্বারা বিভূষিত হয়। সেই গুণরাশি বালকের জীবন-সংগ্রামে যেন ঢাল তরবারির কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যখন সে বিপদ-পরিপূর্ণ সংসার মরুভূমির উপর দিয়া বিচরণ করিবে, তখন গৃহের অভ্যস্ত উপরি-উক্ত সুধাময় গুণাবলী যেন অদৃশ্য স্বর্গীয় দূতের ন্যায় বালকের সহায় হয়, এবং নিরাশার মধ্যে হৃদয়ে আশার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। গৃহিগণ নিজ নিজ গৃহ উল্লিখিত গুণসমূহে সুশোভিত না করিলে, তাঁহারা নিজেরাও সুখ শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন না এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানগণ হইতে কেবল স্বার্থপূর্ণ ও মৌখিক শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ

করিবেন। নরনারীর প্রভাবেই গৃহ শান্তিধামে পরিণত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিতে পারে, আবার নরনারীর অযথা আচরণে সুখশান্তিপূর্ণ গৃহ পিশাচাগারে পরিণত হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গৃহের যাবতীয় সুনীতি ও সুশৃঙ্খলা; পারিবারিক শিক্ষা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এ সমস্তই একটী মহতী নীতির অন্তর্নিবিষ্ট। সেই নীতি সূত্রটী এই,—সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরে প্রীতি স্থাপন। যেমন একমাত্র ধান্য প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে তুষ, তণ্ডুল, অন্ন, চিপীটক, খৈ প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রীই প্রস্তুত করা যায়; যেমন দুগ্ধ প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা দধি, মাখন, ঘৃত, ছানা প্রভৃতি বাহির করা যায়; সেইরূপ একমাত্র সেই বিশ্ব-দেবতার চরণারবিন্দে প্রাণ মন সংযোগ করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষাদি সর্ব্ব সম্পদই সুলভ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের সহবাস এমনই মধুর, এমনই শীতলস্পর্শ, এমনই মোহ-নিবারক, এমনই সন্নীতি-প্রস্ফুরক যে, একমাত্র তাঁহাতে যোজিত-চিত্ত হইলে, দম্পতীর হৃদয়ের সর্ব্ব সন্তাপ নিবারিত হয়; অন্তঃকরণের অপসংস্কার অপনোদিত হয়; স্মৃতিশক্তির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের শুভ্র কিরণ প্রবিষ্ট হয়। দম্পতী যদি সেই জ্ঞানের আলোকে নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিতে অভ্যাস করেন, তবে অচিরেই তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনসমূহ স্ব স্ব সন্তানদিগকে সৎপথে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয়। আর তন্নিবন্ধন অচিরেই সমস্ত পারিবারিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়। অতএব নরনারীর সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রযত্নে পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করা অত্যাবশ্যক।

শ্রীবিনোদিনী সেন—পূর্ণিয়া।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

তত্ত্বগীতা—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা। ডাকমাশুল সমেত ৶১০ আনা।

ইহাতে পঞ্চ বিংশতিটী তত্ত্বগীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্ব অতীব নিগূঢ়। দার্শনিক অভিজ্ঞান না জন্মিলে তাহার গূঢ় ভাব সকল ব্যক্ত করা সুকঠিন। শঙ্করাচার্য্য কেবল ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহারই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া গীতাগুলি প্রধানতঃ প্রণীত হইয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বের সঙ্গীত প্রাচীন ব্রহ্মসঙ্গীতে (রামমোহন রায়ের) দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ তত্ত্বগীতার পুস্তক বঙ্গভাষায় এই প্রথম। গীতাকার প্রত্যেক গীতার বিষয় বা তত্ত্ব তাহার শিরোদেশে বিবৃত করিয়া

গীতার অভিনবত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তকখানি যেমন উপাদেয়, ইহার মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যও তদনুরূপ সুন্দর হইয়াছে এবং মূল্য যেরূপ অল্প করা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণে অনায়াসে পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা নিম্নে দুইটী তত্ত্বগীতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিলাম।

আত্ম-সাধন।

রাগিণী মল্লার। তাল ঢিমে তেতালা।

আমি নিত্য আত্ম-অভিমানী।
পরাপর ভেদে পর সাধনা না জানি।
দেহ—দেব-নিকেতন, দেহী দেব নিরঞ্জন,
স্বরূপেতে প্রতিষ্ঠিত,
সর্ব্বত্র বাখানি।
চিদানন্দ হৃদাকাশে, স্বপ্রকাশ স্বীয় ভাসে
সর্ব্বগত সত্ত্ব মাত্র,
চিন্তে তত্ত্ব-জ্ঞানী।
জ্ঞান নেত্র নিমীলিয়া, প্রীতি-পূত পুষ্প দিয়া,
নিত্য আত্ম-দেবে পূজি,
চরিতার্থ মানি।

আত্ম-হারা।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

তুমি, দেশকালাতীত, স্বয়ম্ভু, সচ্চিত,
সর্ব্বগত হরি।
আছ অন্তরে, বাহিরে, নিকটে, সুদূরে,
শূন্য পূর্ণ করি!
আমি, ভগন কলসী, মগন সাগরে,
ভোরপূর বারি উপরে ভিতরে,
তুমি, পরিপূর্ণ জ্ঞান! পূর্ণ জ্ঞানে প্রাণ,
সমাধান করি॥
আমি, আত্ম-হারা কোথায় যাই?
কি করি কারে ছাড়ি কারে ধরি,
তুমি প্রলয়-জলধি, জগত সংসার
রহিয়াছ ভরি!

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত আরও কয়েকখানি নূতন পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, সেগুলি আগামী সংখ্যায় সমালোচ্য।

নূতন সংবাদ।

১। জয়পুরের মহারাজা ভারতদুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা স্থায়ী ফণ্ডে গবর্ণমেণ্টের হস্তে গচ্ছিত থাকিবে এবং ইহার সুদ হইতে দুর্ভিক্ষের সাময়িক সাহায্য হইবে।

২। বুবদিগের প্রধান সেনাপতি জেনারল জুবেয়ার উদরাময়ে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভারতেশ্বরী এবং ইংরাজ সেনানায়ক লর্ড রবার্টও ইঁহার বিয়োগে শোক প্রকাশ করিয়া ইঁহার বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করিয়াছেন।

৩। অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের রাজধানী ব্লুমফণ্টিন ইংরেজাধিকৃত হইয়াছে এবং তত্রত্য অনেক লোক ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। ফ্রিষ্টেটের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট ষ্টিন পদচ্যুত হইয়াছেন।

৫। সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-পত্নী

জাহ্নবী চৌধুরাণী পরলোক-গতা হইয়াছেন। ইনি অতি তেজস্বিনী ছিলেন। স্কুল প্রভৃতি ইহাঁর কতকগুলি সৎকীর্ত্তিও আছে।

৬। সমগ্র ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডের সাহায্যে কার্য্য করিতেছে।

৭। রাজপ্রতিনিধি সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া ২৭এ এপ্রেল সিমলায় উপনীত হইবেন।

৮। দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

৯। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ও ষ্টিন মিলিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাঁরা সন্ধির জন্য সকল সভ্যজাতির সহায়তা চাহিয়াছিলেন, কেহ তাহাতে সম্মত হন নাই। সন্ধি-স্থাপকেরা ধন্য, খ্রীষ্টের এ আশীর্ব্বাদ কে লাভ করিবেন?

১০। ১লা এপ্রেল হইতে কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিধির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

১১। বাঁকীপুর, মোকামা প্রভৃতি পাটনা বিভাগের অনেক স্থানে প্লেগ অত্যন্ত প্রবল।

বামারচনা।

আত্ম-নিবেদন।

কে তুমি মঙ্গলময়, করি এ হৃদয় জয়,
লুকা'য়ে রয়েছ কোথা, না পাই সন্ধান;
চেয়ে দেখি দশ দিক্, কিছুই না পাই ঠিক্,
অলক্ষ্যে থাকিয়া মুগ্ধ করিতেছ প্রাণ।১
চর্ম্ম চক্ষে নাহি দেখি, খুলিয়া মানস-আঁখি
পবিত্র মূরতি তব দেখিবারে যাই;
সে নেত্রে নাহিক জ্যোতিঃ, সেও যে দুর্ব্বল অতি,
ও সুন্দর মূর্ত্তি তাই দেখিতে না পাই।২
যে হও সে হও তুমি, তমোময় চিত্তভূমি,
আলোকিত করিয়াছ রূপের প্রভায়;
দেখিতে না পাই, কিন্তু হৃদয়ে অমৃতবিন্দু,
ঢালিছ হে কৃপাসিন্ধু, স্নিগ্ধ করি তায়।৩
জলে স্থলে শূন্য দেশে, চিত্ত-বিমোহন বেশে,
কাহার মূরতি শোভে দিগন্ত ব্যাপিয়া?
ওই রূপ মনোহারী, হৃদয়ে ধরিতে নারি,
সসীম হৃদয় যায় অসীমে মিশিয়া।৪
দুঃখানলে হৃদি জ্বলে, আঁখি যবে ভাসে জলে,
কোথা হ'তে এসে তুমি সে অশ্রু মুছাও;
কহি সান্ত্বনার কথা, ঘুচাও সে মনো-ব্যথা,
এমন প্রাণের বন্ধু দেখি না কোথাও।৫
সংসার-বন্ধুর-পথে, যদি কভু যেতে যেতে,
ভ্রান্তিবশে হয় মোর স্খলিত চরণ;

স্বগুণে করুণা করি, উঠাও যে করে ধরি
আবার কর্ত্তব্য-পথে চালাও তখন।৬
কত যে বিপদ-সিন্ধু, তরাইলে, দীনবন্ধু,
তথাপি তোমারে কিন্তু নারিনু চিনিতে;
অধিকার ক'রে চিত্ত, নিকটে রয়েছ নিত্য,
তবুতো তোমার তত্ত্ব না পারি জানিতে।৭
জনক জননী-প্রাণে, স্নেহ মায়া দয়া দানে,
করিলে কল্যাণ কত, স্নেহের আধার;
জল বায়ু রবি শশী, ফল শস্য রাশি রাশি,
যোগাইছ দিবানিশি, কে তুমি আমার?৮
তব আশীর্ব্বাদ পেয়ে, পতিপুত্রকন্যা ল'য়ে,
যা দিয়াছ, সুখী হ'য়ে রয়েছি এ ভবে।
দিয়াছ অমূল্য ধন,— সুস্থ দেহ, সুস্থ মন,
সদা কেন ওচরণ নাহি ভাবি তবে! ৯
হৃদয়ের মলিনতা, দূর কর বিশ্বধাতা,
মনশ্চক্ষে যেন সদা হেরি ও চরণ;
পাদপদ্ম-মকরন্দে, পান করি মহানন্দে,
সার্থক করি হে যেন মম এ জীবন।১০
কি সম্পদে কি বিপদে, প্রতি কার্য্যে পদে পদে,
লক্ষ্য যেন থাকে ওই অভয় চরণে;
দাও প্রভু এই ভিক্ষা, দাও শিক্ষা, দাও দীক্ষা,
তোমারে সম্বল ভাবি জীবনে মরণে।১১
যাহা তব মনে লয়, তাই কর দয়াময়,
সুখ দুঃখ যাহা হয় কর হে বিধান;
ঐহিক ঐশ্বর্য্য দিয়ে, রাখিও না ভুলাইয়ে,
ক'র কিছু পারত্রিক সম্বল প্রদান।১২
ভাবি যবে তোমা ধনে, কি আনন্দ পাই মনে,
পুলকে হৃদয় মম তব গুণ গায়;
কিন্তু পুনঃ এ সংসারে, প্রবিষ্ট হইয়া পরে,
সে ভাব-অভাব হয়, ভুলি গো তোমায়।১২
নিয়তির বশে যবে, জীবলীলা সাঙ্গ হবে,
নিঃসম্বল হ'য়ে যেন না করি প্রয়াণ;
সংসার-গরল পানে, জর্জ্জরিত এই প্রাণে,
সঞ্জীবনী সুধা দানে কর হে কল্যাণ।১৪
হৃদে শক্তি দাও ভক্তি, কৃপা করি মহাশক্তি,
তোমা ধনে হৃদাসনে রাখি চিরদিন,
সদা যেন এ রসনা, করে তব উপাসনা,
এই ভাবে তব পদে হই যেন লীন।১৫

শ্রীমতী হরিদাসী দাসী।

পুত্রের জন্মোৎসবে।

(৯ই ভাদ্র—১৩০৬)

শুন বৎস সুকুমার
রাখিতে হইবে মনে,
জীবন গঠিতে হবে
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে।
সে অমূল্য ধনে ধনী
তোমারে দেখিতে চাই,

হরণ করিতে যায়
মরণেরও সাধ্য নাই।
জান কি হে বৎস মোর
কি সে ধন অতুলন?
তার কাছে সমতুল্য
নাহি হয় অন্য ধন।
নির্ম্মল চরিত্র বৎস!
ধর্ম্মেতে গঠিত মন,
শত কোহিনুর চেয়ে
তাহা যে অতুল ধন!
যৌবন আসিছে তব,
বাল্যকাল গত হয়,
ইচ্ছা, শক্তি সাধ, আশা,
সবি বিকসিতপ্রায়।
এ বিষম কালে বৎস!
ধর্ম্মপথে যে না চলে,
জীবনের মহারত্ন
হারায় সে অবহেলে।
লভিয়া অসার ভবে
মানব-জনম সার
জ্ঞান ধর্ম্মে বিমণ্ডিত
হ'তে যদি নাহি পার,
কি কার্য্য সাধিতে তবে
আসিলে এ অবনীতে?
সে জীবন মূল্যহীন
ধর্ম্ম যার নাহি চিতে।
তবে বৎস! চিনে লও
সেই পথ শ্রেষ্ঠতর,
যে পথেতে গিয়াছেন
ধর্ম্মবীর বহুতর।
কে জানে কখন মৃত্যু
আসিয়া বসিবে পাশে,
হায় রে জীবন পুষ্প
অকালেতে যদি খসে।
সুধার্ম্মিক হ'য়ে যদি
যেতে পার পর-দেশে
সান্ত্বনা করিতে পারে
চরিত্রের শোভা এসে।
অনিত্য এ ভবধামে
কোন ধন নিত্য নয়,
ধর্ম্মই সম্বল শুধু
অক্ষয় হইয়া রয়।
এ হেন পরম ধনে
ধনী যেই হ'তে পারে,
সার্থক জনম, সেই
ধর্ম্মবীর এ সংসারে।
আগত ষোড়শ বর্ষ,
যৌবনের এ সোপানে
তাকাও একান্ত চিতে
জগত পিতার পানে।
ধর্ম্মবল ভিক্ষা কর
সহায় হবেন হরি,
তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ
পড়ুক হৃদয় পরি।
যে আশীষে মরুভূমি
ফল ফুলে ভরে যায়,
করুণার ধারা নামে
পাষাণ পর্ব্বত গায়;
যে পবিত্র আশীর্ব্বাদ
শত নিরাশার মাঝে,
আশার তপন হয়ে
উজ্জ্বল আলোকে রাজে;

সকাতরে ভিক্ষা করি
বিধির চরণ' পরে,
সে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ
বর্ষুক তোমার শিরে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

শ্রীক্ষেত্র।

তব কোলে দেড় কোটী দেবতার বাস।
প্রস্তরে ক'রেছ ভূষা,
পাহাড় পর্ব্বতে বাসা,
মন্দির অধর ওষ্ঠ, শঙ্খধ্বনি ভাষ।১
মোহিনী প্রকৃতি রাণী সুমোহন বেশে
ফুলের আলেখ্য আঁকি,
লতায় পল্লব রাখি,
সোণা মুখে সোণামুখী কত হাসি হাসে।২
সাগর তোমার শয্যা, বালী উপাধান,
তরঙ্গ বিশাল পাখা,
সমীরে শরীর ঢাকা,
ঝাউ তরু ভাগ্যলক্ষ্মী সাধিছে কল্যাণ।৩
চারি দিকে কাটেশ্বরী কুসুম সকল,
চরণ-নূপুর-রূপে
শোভিতেছে স্তূপে স্তূপে,
অঞ্চল বানরদল সতত চঞ্চল।৪
লোকনাথ জগন্নাথ কিরীটী কুণ্ডল,
জগন্নাথ পুরী ধাম,
তোমার বিখ্যাত নাম,
শরীর বিমলাদেবী অমল কমল।৫
মার্কণ্ড চন্দনতলা * নয়ন তোমার,
ইন্দ্রদ্যুম্ন * সুবিমল,
শ্বেতগঙ্গা * সুশীতল,
শ্রবণযুগল তব অপূর্ব্ব বাহার।৬
চক্রতীর্থ হইয়াছে কবরী শোভন,
সুন্দর আঠার নলা,
বুঝিবা তোমারি গলা,
সর্ব্বাঙ্গে সন্ন্যাসী সাধু অপূর্ব্ব ভূষণ।৭
স্বর্গদ্বার হয় তব কপালে তিলক,
হৃদয়ে মঠের হার,
ফুলে ফুলে কি বাহার,
বারিপূর্ণ স্বর্ণকূপ নাশার নলক।৮
শ্রী মহাপ্রসাদ তব কমল বদন,
বিল্বপত্র ফুলদল,
অতি পূত হৃদিতল,
সুমধুর হাস্য রোল হরি সংকীর্ত্তন।৯
দূরবা অপরাজিতা অলক তোমার,
জিনিয়া বসন্ত চাঁপা,
পদ্ম-করবীর থোপা,
স্থলপদ্মসম শোভা করে অনিবার।১০
রসনা চরণামৃত নির্ম্মাল্য মেখলা,
সৌন্দর্য্য ঘৃতের বাতী,
কটাক্ষ মন্ত্রের পুঁথি,
দেবকাজে রত সদা তুমি দেববালা।১১
এত দিন তব কোলে ছিলাম জননী,
এখন বিদায়কালে,
ভাসিতেছি নেত্রজলে,
বিদায় দাও মা পুরী পতিতপাবনী।১২
আবার পবিত্র পদে দিও মা আশ্রয়,

* পুষ্করিণীর নাম।

বিষম সঙ্কটে পড়ি,
যাইতেছি তোমা ছাড়ি,
রাখিও রাখিও দুখে সকল সময়।১৩

শ্রীঅম্বুজা।

তবে এস।

কই প্রভু জীবনের কিছুত হলোনা হায়!
এক, দুই, তিন, করে দিন গুলি চলে
যায়।
ছিল এ প্রাণের তলে উচ্চ আশা কত শত,
বাসনা, কামনা, আর আকাঙ্ক্ষা অপ্রতি-
হত।
কই তা মিটিল প্রভু, কই তা পূরিল মোর,
অতৃপ্ত বাসনা লয়ে জনম হইল ভোর।
ছিল সাধ—আমার এ হৃদি, দেহ, প্রাণ মন,
সকলই জগতেরে করিব হে সমর্পণ;
জগতের তরে শুধু রহিবে আমার প্রাণ,
জগতের তরে হবে এ জীবন অবসান;
আমার রবে না কিছু আশা, সাধ, ভালবাসা,
সবি জগতেরে দিব ছিল বড় এই আশা।
ক্ষুদ্র সংসারের মাঝে, আমার আমিত্ব লয়ে,
কাটাব না এ জীবন আত্ম-সুখে মত্ত হয়ে,
বাঁধিব না আপনারে স্বার্থের বন্ধন দিয়ে,
ঘুমাব না নিশিদিন মোহের মদিরা পিয়ে,
পরাণের প্রেম প্রীতি, ঢালিব জগত বুকে,
সকলেরই হব আমি আমার আমিত্ব ঢেকে।
থাকিবে না আত্মপর, ভেদ অভেদের জ্ঞান,
থাকিবে না সুখ, দুঃখ, তুচ্ছ মান অভিমান,
যেথানে দেখিব ব্যথা, স্নেহের সান্ত্বনা দিয়ে
নয়নের অশ্রু দিব সযতনে মুছাইয়ে।
যেথানে দেখিব কভু নিরাশা-ব্যথিত প্রাণ
কাতর নয়নে চেয়ে আছে হয়ে ম্রিয়মাণ,
তাহারে শুনাব নব আশার সতেজ বাণী;
জাগাব প্রাণেতে তার সুখের স্বপন খানি।
স্নেহের ভিখারী, যার নাহি কেহ এ ধরায়,
যার তরে কারো প্রাণ কখনো কাঁদেনা
হায়!
তারে বুকে লয়ে আমি দিব প্রাণে স্নেহ
ঢেলে,
মুছাব নয়ন তার, ভাসিয়ে নয়নজলে।
যার কেহ নাই হেথা, তার আমি সবই হব
জগতের কার্য্যক্ষেত্রে আমারে ঢালিয়া দিব।
আরো কত আশা ছিল বাল্যের সরল
প্রাণে,
সুখ স্বপনের মত কত কি বলিত কানে,
কই প্রভু! সে সব কি শুধু স্বপনের খেলা?
এমনি করিয়া হায়! কাটিবে জীবন বেলা?
এমনি কল্পনা লয়ে এ জীবন ফুরাইবে?
অতৃপ্ত এ আশা সাধ পূর্ণ কভু নাহি হবে?
এক, দুই, তিন, করে দিন গুলি চলে যায়,
আমার জীবনে কই কিছুত হলোনা হায়!
দিনে দিনে স্বার্থ ওই প্রাণেতে বেঁধেছে
বাসা,
কই প্রভু কই হল আমার আমিত্ব নাশা!
ধীরে ধীরে আশা গুলি যায় বুঝি শুথাইয়ে,
প্রাণের বাসনা গুলি যায় বুঝি মিশাইয়ে!

পুরিল না, মিটিল না, তবে দেব এস তুমি ;
বিরাজো পরাণে মোর হইয়া প্রাণের স্বামী।
নবীন চেতনা দাও, জাগিয়া উঠুক প্রাণ,
এ জড়তা, সঙ্কীর্ণতা, হোক্ হোক্ অবসান।
এস প্রভু, ঘুচিবে এ নিরাশা কুহেলী রেখা,
নবীন আশার আলো, পুনঃ প্রাণে দিবে দেখা।
তুমি এস, তবেই হে প্রেমময়, প্রাণাধার,
নবীন বসন্ত আসি জাগিবে প্রাণে আমার।
আবার গাহিবে পিক তুলিয়া পঞ্চম তান,
আবার ফুটিবে ফুল, করিবে সৌরভ দান ;
আবার আবার তবে এ শুষ্ক নীরস প্রাণে,
ছুটিবে প্রেমের স্রোত, ভাসাতে জগত জনে।
এস, তবে এস প্রাণে প্রাণের দেবতা মোর,
জাগিয়া উঠিবে প্রাণে ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর

বনলতা দেবী—বরাহনগর।

প্রভাত সঙ্গীত।

উজলিয়া পূর্ব্বদিক্
শুকতারা ঢালে হাসি।
বিদাইয়া চাঁদিমায়,
বিদাইয়া তারকায়,
নিশার বিদায় গায়
ছড়ায়ে কিরণ রাশি।১
রজনীর গলা ধরি,
নিদ্রাদেবী যায় চলে,
তার সনে পায় পায়,
স্বপন সুন্দরী যায়,
কত স্মৃতি ঢেলে দিয়া
মানব হৃদয়তলে।
আলোক আঁধার দোঁহে
দুজনে জড়ায় বুকে,
অশ্রুজলে ভাসি হায়!
আঁধার বিদায় চায়,
আলোকের চারু হাসি
ফুটে উঠে ম্লান মুখে।
দিবা আগমন হেরি
আবাহন তরে তার,
ধরিয়া রক্তিম ছবি
অচলে দাঁড়ায় রবি,
মঙ্গল নিছনি করে
ছড়ায়ে কনক-ধার।
যামিনী বিরহে বুক
হয়ে গেছে শতখান,
সুখের স্বপন হায়!
ভেঙে গেল সমুদায়,
নীরবেতে দীপশিখা
ত্যজে তাই ক্ষুদ্র প্রাণ।
ভরিল নবীন ভাবে
এ বিশাল ধরাখান,
নবোদ্যমে পুনরায়
খাটে সবে এ ধরায়
কত আশা নিরাশায়
আবার ভরিল প্রাণ।
আমিই অলস হয়ে
বসে আছি নিরালায়,

জীবন প্রভাত মোর,
কখন হয়েছে ভোর,
জীবনের কাজ কিছু
আমারি হল না হায়।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

"স্বর্গীয় পিতামহ দেব কালীমোহন দাস।"

("স্বপ্ন")

দাদা মহাশয়,—
কালি কত কাল পরে দুখিনী সকাশে
দেখা দিতে পুনঃ কি গো এসেছিলে তুমি ?
অথবা আমারি ভ্রম চির দুখার্ণবে
ভাসে যবে নর, চক্ষু যায় যে ধাঁধিয়া !
সেই যে বিদায় দিছি কত যুগ গত—
কাল জুবিলির* রেতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বিচূর্ণ হৃদয়ে যেন বজ্রাহত প্রায়
চির স্নেহার্ণবে মোর সঁপেছি চিতায় !
সেই কি আসিবে পুনঃ দেখিতে তাঁহার
হৃদয়ের রক্তসম দুখিনী কুসুমে ?
ভুলিতে কি পার নাই অথবা এখন
অনন্ত যন্ত্রণা হেরি বিকল-হৃদয় !
দেখ দেব ! এ সংসারে যাহাদের লাগি
এত ধন অগণন গিয়াছিলে রাখি,
কালের প্রচণ্ড বায়ু কোথা হ'তে আসি
কোন্ পথে তাহাদের লইল টানিয়া !
কোথা বা সে ধনৈশ্বর্য্য সুদুর্লভ সুখ ?
সুখ-হারা শান্তি-হারা আহা ! এ জগতে,
বড়ই অসহ্য যবে ডাকে দয়াময়ে,
পিয়ে সেই নামামৃত নব বল পেয়ে
পুনঃ সে খেলিতে যায় সংসারের খেলা !
যার কিছু অশ্রুবারি সহে নাই প্রাণে,
কিরূপে সহিছ দেব ! তার মর্ম্মব্যথা ?
কিছু কি মমতা নাই ও লোক-বাসীর ?
পুরাতন কথা একবারে গেছ কি ভুলিয়ে ?
বিনা যত্ন চিকিৎসায় ঠাকুমা আমার
কৃতঘ্ন মানব হস্তে হারাইল প্রাণ,
তাও সহিয়াছি দেব পাষাণের প্রায়
ভাঙ্গে নাই এ হৃদয় দারুণ পেষণে !
কিন্তু যবে মনে পড়ে সে অতীত কথা
যে বহ্নি জ্বলিয়া ওঠে বক্ষের মাঝারে,
কার সাধ্য নিভাইবে ? আছে কি এমন
সুশীতল বারি যাতে নিভে সে আগুন ?
প্রাণের প্রচণ্ড বহ্নি যাইবে কেমনে ?
স্নেহময়ী জননী যে, সেও ত আমার
নহে আর আপনার ! এ বিশ্ব সংসার
যেন প্রহেলিকাবৎ ভাসে এ নয়নে !
যে জননী এ সংসারে ঠেলে দিলে পায়
উলটিয়া যায় বিশ্ব, তথাপি—তথাপি
প্রাণাধিক সন্তানেরে পারে না বর্জ্জিতে,
সে জননী স্নেহ-হারা ! ললাট-লিখন !
চাহি না সংসারে আর বিন্দু সুখ-কণা !
ওই তব অকৃতজ্ঞ আত্মীয় স্বজন,
যে যাহার আপনার লইয়া বিব্রত,
কি বলিব ? হইয়াছ যে লোক-নিবাসী,
সকলি ভাতিছে দেব তোমার নয়নে !
আজ অশ্রুবারি চির-সহায় আমার,

আর সুখ, সুখ শুধু অতীত স্মরণে।
তোমার সে স্নেহ স্মৃতি নয়নের পাশে,
ভাসে যবে দেব আমি ভুলি এ সংসার—
সংসার ভুলিয়া হই হরষ-মগন!
আর কোন সাধ নাই দুখিনীর প্রাণে,
এই শুধু সাধ—যারা এখনো আমার
আছে এ সংসারে—পতি পুত্র প্রিয়জন,
তাহাদের স্নেহ-ক্রোড়ে যেন যুগ্মনেত্র
নিমীলিত করি যাই তব স্নেহ-ক্রোড়ে!

শ্রীকুসুম কুমারী রায়।
কলিকাতা—৬ই মাঘ।

প্রার্থনা।

হৃদয় বেদনা ভার,
সহিতে না পারি আর,
আসিয়াছি তব দ্বারে ওহে দয়াময়?
তোমা বিনা কেবা আর
ঘুচাবে হৃদয়-ভার?
তাই গো তোমারে ডাকি করিয়া বিনয়।
তুমি দেব অন্তর্যামি,
শরণ লইনু আমি,
কাতরে করুণা কর করুণা-নিধান।
শোকশেলে নিরবধি,
শতধা হতেছে হৃদি,
কৃপা করি কর দেব শান্তি সুধা দান।
তুমি দেব দয়া ক'রে,
দিয়াছিলে মোর করে
প্রিয় দরশন এক অমূল্য রতন;
দিয়া কেন পুনরায়,
তারে কেড়ে নিলে হায়!
খুঁজে নাহি পাই আমি ইহার কারণ।
পিতা মাতা যাহা করে,
সন্তানের ভাল তরে,
তোমার করুণা কত অভাগীর প্রতি;
তুমি দেব যা করিবে,
তা'তে মোর ভাল হবে,
এই জানি, অন্য নাহি বুঝি এক রতি।
কিন্তু এই অনুপম,
সুন্দর শিশুরে মম
ডাকিয়া লইলে দেব মোর কাছ হ'তে,
ইহাতে আমার তাত!
কি ভাল হইল তা'ত
একটুও আমি নাহি পারিনু বুঝিতে।
পরমেশ, তবাদেশে,
নর আসে মর দেশে,
তোমারি আদেশে পুন যায় স্বর্গধামে;
যে কার্য্য সাধন তরে,
আসে নর মর্ত্ত্য পরে,
তাহা সাধি, যায় ফিরে অমর ভবনে।
কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়,
দুমাসের শিশু হায়।
কি কার্য্য সাধিয়া গেল বুঝিতে না পারি!
অভাগী মায়ের তার,
হৃদি করি চুরমার—
চলি গেল, সেই কাজ ছিল কি তাহারি?

তুমি প্রভো সব দাও,
তুমি পুন কেড়ে লও,
সুখ দুঃখ যাহা কিছু তোমারি বিধান;
সে সুন্দর শিশুটিরে,
তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তুমিই আবার নিলে তার ক্ষুদ্র প্রাণ।
কিন্তু আমি অভাগিনী,
হারাইয়া সেই মণি,
কাঁদিতেছি অবিরত পাগলের প্রায়;
ধৈর্য্য নাহি মানে প্রাণ,
সর্ব্বদাই আনচান,
কি করিব দীনবন্ধো, কি হবে উপায়?
কে বুঝিবে মোর কথা,
কে ঘুচাবে মনোব্যথা,
দূর করে হেন জ্বালা সাধ্য আছে কার?
(এ যে) সাধ্যাতীত মানবের,
আছে সুধু তাহাদের,
ভাঙ্গা সুরে দু-চারিটি কথা সান্ত্বনার।
তাই দেব আশা ক'রে,
আসিয়াছি তব দ্বারে,
তুমিই জ্বেলেছ হৃদে দারুণ অনল;
হেন শক্তি দাও প্রভো,
যা দিবে সহিব সব,
এ অনল সহিবার মনে দেহ বল।
অন্তর্যামী তব নাম,
পূর্ণ কর মনস্কাম,
কিছুত অজ্ঞাত নাই নিকটে তোমার;
মনে যাহা করি আশ,
এসেছি তোমার পাশ,
সেই আশা পূর্ণ যেন হয় হে আমার।

শ্রীনী—

"দুঃখিনী।"

কার মুখ চেয়ে, জীবন রাখিবে,
কারে ডেকে কবে দুঃখের কথা?
কেউ নাই আহা! জনম-দুঃখিনী,
তোরা শোন ওর প্রাণের ব্যথা।১
বিষাদের ছায়া আননে উহার,
অতীতের স্মৃতি বুকের মাঝে?
দুঃখিনী বালিকা, কার কাছে যাবে?
তাই ডুবে রয় আপন কাজে।২
আপনার ভাবে আপনি বিভোর
আপনার মনে আপনি গায়,
কারা হাসে, কাঁদে, কারা মালা গাঁথে,
বারেকের তরে দেখে না তায়,
(দেখিবার তরে ফিরে না চায়)।৩
তোরা ডেকে এনে না শুনিলে কথা,
কেমনে তোদের কাছেতে আসে?
আদরে, সস্নেহে, না ডাকিলে তোরা
কেমনে বসিবে তোদের পাশে?৪
দুঃখিনী বালারে ডাকিবি না কেহ?
চুপ্ ক'রে আজ রবি কি সবে?
ওর নয়নের দুই ফোঁটা জল
নয়নেই কি গো লাগিয়া রবে?৫
দুঃখ, হাহাকার, শতেক বেদনা,
নিরাশ প্রাণের চোখের জল,
সব মুছে যাবে তোরা ডেকে নিলে

প্রাণে পাবে বালা নূতন বল ৬
নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে
দুঃখিনী গাহিবে আশার গান।
নিরাশা, বিষাদ, দীর্ঘ হাহাকার,
বালিকা-হৃদয়ে পাবে না স্থান।৭

কুমারী সুকুমারী দাস।

১৩০৬সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

নববর্ষ ... ২
পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা ৫৭
সাউথপোর্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৮৩
বামাবোধিনীর সপ্তত্রিংশ জন্মোৎসব ১২৯
একটী শুভ প্রস্তাব ... ১৫৭
আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত ১৬৫
বঙ্গমহিলা—মানসিক ২৩৩
লিবরপুল অন্নপূর্ণা সমিতি ২৭২
ভারতের অনাথা ও বিধবাগণের জীবিকা লাভের উপায় ... ৩১৩, ৩৪৩
বেথুন কলেজ ও ইহার পারিতোষিক বিতরণ ... ৩৫৫

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আনি বেসাণ্ট ... ৩০
সতীর হাট ... ৯০
পরলোকগতা নীরদবরণী ... ১০৪
কৃষকবালা ... ১৪৮
বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ... ২০৩
কুটীরবাসিনী ... ২৪৪
বীরবালা—কর্ম্মদেবী ... ৩০৬

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

সরোজিনীর মায়ের পরিত্রাণ ... ১৯
সংসারাশ্রম ... ২৭
মুদ্রাস্তোত্র ... ৩৩
আত্মসংযম ৪৩, ১৩৮, ২৬৬
হিন্দুনীতি .. ৪৫
ঈশ্বরের নামাবলী ৪৭, ১৯১, ৩৬২
উন্নতি কাহাকে কহে? ... ৫১
সংসারাশ্রম ... ১০০
কর্ত্তব্যভার ... ১৩৪
চিনির বলদ ... ১৪৫
উপদেশমালা ... ১৫২, ২৩৮
স্বাবলম্বন ... ১৬৯
আত্মার সতীত্ব .. ১৯০
সেফালী ... ২২৪
শিবরহস্য ... ২৪১
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ... ২৫১, ২৭৮
আত্মগরিমা ... ২৭৪
সরযূ ও সরলার কথোপকথন... ২৯৩
উদাসীনের চিন্তা ... ৩০১
আমাদের কষ্টিপাথর ... ৩০৩
নারীজীবনের কর্ত্তব্য .. ৩০৯
সংসার ... ৩১২
কুলবধূ ... ৩৩৯
অমানুষিক বন্ধুপ্রেম ... ৩৬৩
শ্লোক—(দান সম্বন্ধে) ... ৩৬৭

৪। ইতিহাস ও জীবনচরিত।

বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম ৬
দেবলরাজ ৯৭৭, ১১২, ১৩২
রথ বা মহাবোধি মহোৎসব ৩৫, ১৮৬
লোকমাতা ইবের সমাধিমন্দির ৬৮
নারী-সুহৃদ্ ... ৮৪
ভক্ত সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৯০
চন্দন তলার চাপ ... ১১৬, ১৪১
আর্য্যজাতি ... ১২০, ২২৬
ইংরাজ রাজত্বের সুফল ... ১৪৩
সুন্দরীর মেলা ... ২১৩
শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা ... ২৩৭
ট্রান্সভাল যুদ্ধ ... ২৫৫
কপিলাবস্তু বা কপিল নগর ... ২৮৪
ট্রান্সভাল ইতিবৃত্ত ... ২৯৮
স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি ৩১৬
বনবাসিনীর পত্র ... ৩৬৫
ব্যাসকাশী ... ৩৭০
তাহিতী দ্বীপের পুরাবৃত্ত ... ৩৭২

৫। উপন্যাস।

প্রভাতী ... ৩৯, ২৮৮
বলেন্দ্র ও বলবতী ৫৪, ৭২, ১০৩
লজ্জাবতীর ভালবাসা ... ১৬১
পুণ্যাশ্রম ... ২০৬
কুলীনকুমারী ... ৩৩৩

৬। বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান রহস্য ৫, ৬৬, ১৫৯ ২৮৫, ৩৬৮
মানবদেহের বৃদ্ধি ২১
ঘটিকা যন্ত্র ২৩
মশকের উপকারিতা .. ২৫
ধূলিকণা ... ৬৯
টিক্‌টিকি ও ফড়িং .. ৮১
উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান ... ৯৮
সিন্ধূর্ম্মির উচ্চতা ... ৯৯
রসায়ন ... ১৫৪
শ্বাস প্রশ্বাস ... ২১১
পৃথিবীর ক্ষয় ... ২১১
জন্তুদিগের ভোজন প্রণালী .. ২৩১
বারিবিজ্ঞান ... ২৬৮, ৩৫৮
আশ্চর্য্য বৃক্ষ ... ২৮২

৭। গৃহচিকিৎসা ও গৃহধর্ম্ম।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ ... ২২২, ৩৭৭
গৃহচিকিৎসা .. ২২৭
ব্যায়াম ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম... ৩৫২

৮। পদ্য ও সঙ্গীত।

অভিমানের প্রতি ... ২৬
আমার ভ্রমর ... ৪২
জীবন শেষ সঙ্গীত ... ৫৭
মহাভারতের কথা ... ৭১
শান্তি সাধনা ... ৭৬
মাগো জননী ... ১০৩
প্রকৃতির বীরত্ব ... ১১১
অন্তঃসলিলা ... ১৪০
ইলিয়ড ... ১৭৬, ২৩৬
নরদেবতা ... ২০৯
কর্ত্তব্যগিরি ... ২৩২
বিপদে ... ২৭১
মরণ সঙ্গীত ... ২৮৩
গিরিদর্শন ... ৩০৫
মডার ক্ষেত্রে বুরসেনাপতি ক্রঞ্জি ৩৫০

৯। বিবিধ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা (১৩০৬ সালের) ১
ইংরাজী শিক্ষা ও জাতিভেদ... ১৩
তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা ৮৬
সক্রেটিসের গল্প ... ১৬৮
আমাদের বামারচনা স্তম্ভ ... ২১৫
কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯
বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম দর্শন ... ২৪৯
বিবিধ বিবরণ ... ৩৩১
পাগলের মায়া ... ৩৪৬
কাব্যবোধ ... ৩৭৫

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩, ৬৫, ৯৭, ১৩০, ২০১, ২৬৫, ৩২৯

১১। নূতন সংবাদ।

৫৮, ৯১, ১২২, ১৯২, ২৫৮, ৩২১, ৩৮০

১২। পুস্তকাদি সমালোচনা।

৯৩, ১২৩, ১৯৫, ৩১৮, ৩৭৯

১৩। বামারচনা।

নববর্ষ আবাহন ... ৬০
নববর্ষের প্রার্থনা ... ৬১
বোন, সবি ভুল,শেষ ... ৬২
ব্রততী ... ৬৩
নিবেদন ... ৬৩
শোকসন্তপ্তা জননীর বিলাপ... ৬৪
জিজ্ঞাসা ... ৯৩
নরেন্দ্র, স্মৃতি ... ৯৫
মিত্রবিয়োগ ... ১২৪
স্বর্গারোহণ ... ১২৫
শিশুর চুম্বন ... ১২৬
উচ্ছ্বাস ... ১২৬
কেন পাঠাইলে? ... ১২৭
খোকার বিদায় ... ১২৮
শারদগীতি ... ১৯৫
জন্মদিন ... ১৯৬
প্রার্থনা ... ১৯৭
রমেশ বিয়োগ ... ১৯৭
বৈতরণী নদী ... ১৯৮
রাখিবন্ধন ... ১৯৯
নীরবে ... ২৫৯
শান্ত ... ২৬০
দেবতা আমার ... ২৬১
কল্পনা ... ২৬২
জন্মদিনের উপহার ... ২৬৩
মধুময় ... ২৬৪
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন ... ৩২৩
সন্তানের মমতা ... ৩২৪
বসন্তের মাতৃ-আহ্বান ... ৩২৫
উপহার ... ৩২৭
পেচক, পূজা ... ৩২৮
আত্ম-নিবেদন ... ৩৮১
পুত্রের জন্মোৎসব ... ৩৮২
শ্রীক্ষেত্র ... ৩৮৪
তবে এস ... ৩৮৫
প্রভাত সঙ্গীত ... ৩৮৬
স্বর্গীয় পিতামহ দেব কালীমোহন দাস ৩৮৭
প্রার্থনা ... ৩৮৮
দুঃখিনী ... ৩৮৯
১৩০৬ বিষয়ানুসারে সূচীপত্র... ৩৯০